কিতাবুত্ তাহ্‌রীদ্
كتاب التحريض على القتال
মুস'আব ইলদিরিম
(সকল পর্ব একত্রে)

ইনশাআল্লাহ্, ‘দাওয়াহ্ ইলাল্ জিহাদের’ ময়দানে এক নতুন বিপ্লব……

‘দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্’ ফোরামে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি কিতাব…….

كتاب التحريض على القتال

কিতাবুত্ তাহ্‌রীদ্ ‘আলাল্ ক্বিতাল্

বি.দ্র: কিতাবটি সম্পাদনা করেছেন:

দাওয়াহ ইলাল্লাহ্ ফোরাম (https://dawahilallah.com/) সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম।

একটি বিশেষ সতর্কতা:

এই কিতাবে প্রদত্ত সমস্ত লিংক ব্রাউজ করার জন্য অবশ্যই Tor Browser ব্যবহার করুন।

উৎসর্গ:-

"কিতাবুত্ তাহরীদ্ 'আলাল ক্বিতাল" কিতাবটি সেই সকল মর্দে "মুজাহিদ ফী সাবিলিল্লাহ্" ভাইদের প্রতি উৎসর্গ করা হল-

- যারা হক প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এবং তাগুত ও বাতিলের মূলোৎপাটনে শীশাঢালা প্রাচীর।
- যারা নিজেদের জান-মাল আল্লাহর কাছে বিক্রয় করে দিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।
- যারা নিজেদের বাড়ী-ঘর ত্যাগ করে পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ও গিরিগুহাকে নিজ আবাসস্থল বানিয়ে নিয়েছেন।
- যারা কখনো বন্দুকের ছায়াতলে আবার কখনো ট্যাংকের গোলায় জান্নাত খুঁজে বেড়ান।
- যারা অসহায় উম্মাহর নারী-শিশু ও মজলুমানদের ফরিয়াদের জবাবে অলী ও নাসীর (বন্ধু ও সাহায্যকারী) হয়ে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।
- যারা উম্মাহর ইয়াতীম শিশুদের পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য নিজেদের সন্তানদেরকে ইয়াতীম করছেন।
- যারা উম্মাহর মা-বোনদের ইজ্জত-আব্রু আর সম্ভ্রম রক্ষার্থে নিজেদের মা-কে সন্তানহারা আর স্ত্রীকে বিধবা বানাচ্ছেন।
- যারা গভীর রজনীতে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে মহান রবের দরবারে শাহাদাতের মৃত্যুর জন্য আবেদনে মগ্ন।
- যারা দুশমনের মোকাবেলা করতে গিয়ে হাত-পা, নাক-কান ইত্যাদি হারিয়ে পঙ্গুত্বের জীবন যাপন করছেন।
- যারা ঘোড়ার লাগাম ধরে কোনো অসহায় নারী ও শিশুর চিৎকার ও মজলুম ভাইয়ের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত।

আমার প্রাণপ্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা!

আপনাদের করকমলে আমার হৃদয়ের উষ্ণ ভালোবাসার এক চিলতে এই নযরানা মেহেরবানী করে গ্রহণ করুন।

আপনাদের এক নগণ্য আশেক

-মুস'আব ইলদিরিম

ইনশাআল্লাহ, "কিতাবুত্ তাহরীদ্ 'আলাল ক্বিতাল" কিতাবটি যাদের চুলকানি ও অন্তর্জ্বালা ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি করবে:

• যারা তাদের প্রভু ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের খুশি করার জন্য কুরআন থেকে জিহাদকে সম্পূর্ণরূপে তুলে দিতে আগ্রহী।

• যারা কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য জায়গায় বর্ণিত জিহাদকে 'ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ' বলে আখ্যায়িত করে মুসলিম যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করার কাজে লিপ্ত।

• যারা ধর্মকে রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে আলাদা করে বহু ইলাহ ও বহু রবের ইবাদতে লিপ্ত।

• সেই তাগুত সরকার, যে জিহাদকে 'জঙ্গিবাদ' ট্যাগ দিয়ে তার প্রতি তথাকথিত 'জিরো টলারেন্স' ঘোষনা করেছে।

• তথাকথিত 'সন্ত্রাসবিরোধী' তাগুতের ভাড়াটিয়া বাহিনী, গোয়েন্দা বিভাগ, কাউন্টার টেররিজম ইত্যাদি যাদের মাথা ব্যথা কেবল মুজাহিদদেরকে নিয়ে।

• সেই সকল তথাকথিত 'সুশীল সমাজ' যারা চায় মুসলমান যুবকদের মাঝে খাহেশাহ্ ও ফাহেশাহ্ বিস্তার লাভ করুক।

• 'জিহাদ' শব্দটা শুনলেই যাদের কপালে ভাজ পড়ে যায়।

• এক কথায় সকল নাস্তিক, মুরতাদ, তথাকথিত প্রগতিশীল, ইসলাম বিদ্বেষী।

======যাদের চুলকানির একমাত্র ঔষধ "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ"।

-মুস'আব ইলদিরিম

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَى ٱلۡقِتَالِ
“হে নবী ! আপনি মু’মিনদেরকে
যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন ।”
(সূরা আন্‌ফাল ০৮:৬৫)
rawpixel

ভূমিকা:

"তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল": একটি ভুলে যাওয়া ফরয

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده- أما بعد

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি, মুসলিম উম্মাহর উপর একের পর এক অবিরাম আগ্রাসন, মুসলিম ভূমিসমূহ হতে মুসলমানদের উৎখাত ও জবরদখল, বন্দী ভাইদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার আর মা-বোনদের বে-ইজ্জতি, মুসলিম দেশগুলোতে মুরতাদ সরকারের উপস্থিতি ইত্যাদি বিবেচনায় উম্মাহ্‌র 'হকপন্থী' ফুকাহায়ে কেরাম এই মত পোষণ করেন যে- "বর্তমানে জিহাদ ও ক্বিতাল (সশস্ত্র যুদ্ধ) সারা বিশ্বের প্রতিটি সক্ষম মুসলমানের উপর ফরযে আইন, যতক্ষণ না মুসলিম ভূমিসমূহ আবারো পুনরুদ্ধার হচ্ছে, মুরতাদ সরকারগুলোকে হটানো হচ্ছে এবং সারা বিশ্বে খিলাফাহ কায়েম হওয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। যুদ্ধ করতে সক্ষম কেউই এই হুকুমের বহির্ভূত নয়।"

'ফরযে আইন' বলা হয় আল্লাহ্ সুব্‌হানাহু ওয়া তা'লার ঐ সকল ফরয হুকুমকে যেগুলো আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের উপর আলাদাভাবে ব্যক্তিপর্যায়ে ফরয। যেমন: প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা, রমযান মাসে সিয়াম পালন করা, নামায শুদ্ধ হয় পরিমাণ কুরআন কারীম শুদ্ধ করা ও মুখস্থ করা ইত্যাদি।

আর যে সকল হুকুম আলাদাভাবে ব্যক্তিপর্যায়ে ফরয নয়, কিছু মুসলমান আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়, তাদেরকে 'ফরযে কিফায়া' বলা হয়। যেমন: জানাযার সালাত, কুরআন কারীম হিফয্ করা ইত্যাদি।

আর কিছু কিছু হুকুম অবস্থার আলোকে কখনো ফরযে কিফায়া আবার কখনো ফরযে আইন হয়ে যায়। যেমন জিহাদ করা/আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করা; যা সাধারণভাবে 'ফরযে কিফায়া', ক্ষেত্র বিশেষে 'ফরযে আইন'। বর্তমানে জিহাদ অবশ্যই ফরযে আইন, তথা ব্যক্তিগতভাবে সক্ষম প্রতিটি মুসলমানের উপর জিহাদ করা বর্তমানে ফরয। কেউ এই হুকুম পালন না করলে সে আল্লাহ সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলার নিকট 'ফরয তরককারী' (ফাসেক) হিসেবে গণ্য হবে; যদিও সে দ্বীনের অন্য কোনো শাখায় মেহনত করে থাকে।

দ্বীনের অন্য কোনো ক্ষেত্রে মেহনত করলেও যেমন সালাত আদায় করা কিংবা সিয়াম পালন করার হুকুম রহিত হয়ে যায় না, ঠিক তেমনি জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় অন্য কোন মেহনতের ওযরে জিহাদ পরিত্যাগ করা যাবে না। অবশ্যই প্রত্যেককে জিহাদ করতে হবে। নতুবা সে ফরয তরককারী (ফাসেক) হিসেবে গণ্য হবে, যদিও তিনি দ্বীনের অন্যান্য ক্ষেত্রে 'তারকাসম'(!) হন। এই অবস্থায় জিহাদ ত্যাগ করা 'গুনাহে কবীরা'। আর একটি কবীরা গুনাহ্‌ই জাহান্নামে নেয়ার জন্য যথেষ্ট।

দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমানে জিহাদ করাটা মুসলিম উম্মাহর জন্য যতটুকু জরুরী, উম্মাহ ঠিক ততটুকুই গাফেল। উম্মাহ্ এখনো গভীর নিদ্রায় শায়িত। তাই এখন সময় উম্মাহ্‌কে জাগ্রত করার।

বর্তমানে জিহাদ যেমন প্রতিটি সক্ষম মুসলিমের উপর ফরযে আইন, ঠিক তেমনি জিহাদের জন্য সার্বিক প্রস্তুতির অংশ হিসেবে উম্মাহকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা (তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল)-ও ফরযে আইন; ঠিক যেমনটি সালাতের জন্য ওযু ফরযে আইন। কেননা জিহাদী আন্দোলনকে সফল করা তো আর একা একজন কিংবা দুয়েকজনের পক্ষে সম্ভবপর

নয়। এরজন্য চাই সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র সম্মিলিত প্রয়াস। সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে জাগ্রত করার লক্ষ্যেই আমাদের আজকের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস "কিতাবুত তাহ্‌রীদ্ আলাল ক্বিতাল"।

সশস্ত্র জিহাদ তথা ক্বিতালের জন্য মুমিনদেরকে উৎসাহিত করার জন্য আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করে ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ

"হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।"(সূরা আনফাল ০৮:৬৫)

فَقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ

"(হে নবী!) আপনি (একা হলেও) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুন; আপনার আপন সত্ত্বা ব্যতীত অন্য কারো দায় আপনার উপর বর্তাবে না (আপনার ডাকে অন্য কেউ যদি জিহাদ না করে তাহলে এজন্য আপনি দায়ী নন)। আর আপনি মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করতে থাকুন।" (সূরা নিসা ৪: ৮৪)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ফরয দায়িত্ব আদায় করে আমাদের দেখিয়ে গেছেন কিভাবে তা করতে হয়- নিজে ময়দানে বীরত্ব প্রকাশের মাধ্যমে কিংবা কখনো জিহাদ ও শাহাদাতের ফাযায়েল বর্ণনা করে, কখনোও বা উত্তপ্ত ভাষণের মাধ্যমে, কখনো দুনিয়াবী যিন্দেগীর হাকীকত অনুধাবন করিয়ে আবার কখনোবা জান্নাতের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে। আর প্রিয় নবীর প্রিয় সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম আযমাঈনগণও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে উম্মাহকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছেন। কয়েকটি উদাহরণ-

- উহুদ যুদ্ধের পরের ঘটনা। আবু সুফিয়ান (তখনও তিনি মুসলমান হননি) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বদরের প্রান্তরে দ্বিতীয়বার যুদ্ধের আহ্বান করেন। নবীজী ﷺ তার এই আহ্বানকে সানন্দে গ্রহণ করেন। এদিকে আবু সুফিয়ান কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে বলেন, তিনি সৈন্য পাঠানোর আগে মুসলমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতে চান। তিনি এ লক্ষ্যে ইহুদীদের হাত করেন এবং দ্বিগুণ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে তাদেরকে মদীনায় পাঠান। তাদের দায়িত্ব ছিল, মদীনায় গিয়ে এই গুজব ছড়ানো যে, কুরাইশরা বিশাল এক বাহিনী নিয়ে বদরে আসছে, যা ইতোপূর্বে মুসলমানরা দেখেনি। মদীনার মুসলমানরা এই গুজবকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। ফলে তাদের চেহারায় এক মারাত্মক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। শেষ পর্যন্ত এই গুজব এবং তাতে সাহাবায়ে কেরামের ভীতির কথা নবীজী ﷺ-এর পবিত্র দরবারে পৌঁছলে, তিনি সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন-

والذي نفسي بيده، لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد

(হে সাহাবীরা! তোমরা যদি মূর্তি-পূজারী মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে ভয় পেয়ে থাক, তাহলে শুনে নাও!) যে সত্তার হাতে আমি মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর নামে শপথ করে বলছি, কেউ না গেলেও আমি একাই তাদের মোকাবেলার জন্য বদরে যাবো।

নবীজী ﷺ-এর এক কথাতেই সাহাবায়ে কেরামের মাঝে গোজবের প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়। পরের দিনই মুসলমানরা বদরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। ঐদিকে আবু সুফিয়ানও প্রথমে তার বাহিনী নিয়ে বের হয়েছিলেন, কিন্তু অজানা ভীতির কারণে, মাঝপথ থেকে তিনি তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ না করেই মক্কায় পালিয়ে যান। (আল মাগাযি লিল ওয়াকিদি, ৩৮৭/১)

- রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে শাহাদাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করার জন্য নিজে শাহাদাতের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে ইরশাদ ফরমান,

والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل
"সে সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জান! অবশ্যই আমি আশা করি: আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাব এবং এতে শহীদ হয়ে যাব, এরপর আবার জিহাদে যাব এবং আবার শহীদ হবো, এরপর আবার জিহাদে যাব এবং আবার শহীদ হয়ে যাবো।" (বুখারী-৩১২৩ এবং মুসলিম-১৮৭৬)

- মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি এবং সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছেন। তিনি কাবাঘরের চাবি গ্রহণ করেছেন এবং সাহাবাসহ তাওয়াফ করছেন। অতঃপর ষষ্ঠ হিজরীর পহেলা জিলকদ চৌদ্দশ, মতান্তরে পনেরশ সাহাবীসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সঙ্গে নিলেন মুসাফিরসুলভ অস্ত্র (কেবল কোষবদ্ধ তরবারি)।

মক্কার কুরাইশরা নবীজি ﷺ-এর আগমনের সংবাদ শোনামাত্রই পরামর্শ করে যে কোনো মূল্যে তাঁকে বাইতুল্লাহ্য় প্রবেশে বাধা দেয়ার সংকল্প করে।

নবীজি ﷺ সানিয়াতুল মারার নামক স্থানে উপস্থিত হলে বুদায়ল ইব্‌নু ওয়ারাকা খুযাঈ তার খুযাআ গোত্রের কতিপয় ব্যক্তিদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে আসল। তারা তিহামাবাসীদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। বুদাইল বলল, আমি কা'ব ইব্‌নু লুওয়াই ও আমির ইব্‌নু লুওয়াইকে দেখে এসেছি। তারা হুদাইবিয়ার প্রচুর পানির নিকট অবস্থান করছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে বাচ্চাসহ দুগ্ধবতী অনেক উষ্ট্রী। তারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও বাইতুল্লাহ্ যিয়ারতে বাধা দেয়ার জন্য প্রস্তুত। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ গর্জে উঠলেন,

إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً، وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا، وَإِلاَّ فَقَدْ جَمُّوا، وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي، وَلَيُنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ

'আমি তো কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসিনি; বরং 'উমরাহ করতে এসেছি। যুদ্ধ অবশ্যই কুরাইশদের দুর্বল করে দিয়েছে, কাজেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা চাইলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে পারি, আর তারা আমার ও কাফিরদের মধ্যকার বাধা তুলে নিবে। যদি আমি তাদের উপর বিজয় লাভ করি তাহলে অন্যান্য ব্যক্তি ইসলামে যেভাবে প্রবেশ করেছে, তারাও ইচ্ছা করলে তা করতে পারবে। আর না হয়, তারা এ সময়ে শান্তিতে থাকবে। কিন্তু তারা যদি আমার প্রস্তাব অস্বীকার করে, তাহলে সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার গর্দান আলাদা না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। আর অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।' (বুখারী-২৭৩২)

- মুতার যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে এক ভয়াবহ অসম যুদ্ধ। এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনজন সেনাপতি নির্বাচন করে দিয়েছিলেন এই শর্তে যে, একজন শহীদ হলে আরেকজন পতাকা তুলে নিবেন। মুতার যুদ্ধে মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্য দুই লক্ষাধিক রোমান-আরব সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মুসলমানরা এই বিশাল সংখ্যক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে প্রস্তুত ছিলেন না। আসলে তারা কল্পনাও করেননি, কাফেরদের বাহিনী এত বিশাল হবে। তাই সিদ্ধান্ত হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে পত্র পাঠিয়ে শত্রুর লোক লস্করের সংখ্যা জানাবেন। তিনি হয় আরো সৈন্য পাঠাবেন, নচেত যা ভালো মনে করেন নির্দেশ দিবেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়ালাহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন,

يَا قَوْمِ، وَاللَّهِ إِنَّ الَّتِي تَكْرَهُونَ، لَلَّتِي خَرَجْتُمْ تَطْلُبُونَ الشَّهَادَةُ، وَمَا نُقَاتِلُ النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ، مَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَّا بِهَذَا الدِّينِ الَّذِي أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِهِ، فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا هِيَ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِمَّا ظُهُورٌ وَإِمَّا شَهَادَةٌ

"হে মুসলমানগণ! আল্লাহ্‌র কসম, আজ তোমরা যা অপছন্দ করছ সেটাই তোমরা কামনা করছিলে। আর তা হলো শাহাদাত। আমরা সংখ্যা-শক্তি বা সংখ্যাধিক্যের জোরে লড়াই করি না। যে জীবনব্যবস্থার দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন সেটির জন্য আমরা লড়াই করি। অতএব এগিয়ে যাও, বিজয় বা শাহাদাত এ দুটো উত্তম জিনিসের যে কোন একটা অবশ্যই আমাদের জন্য নির্ধারিত আছে।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩৭৫/২)

এভাবে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করার অসংখ্য ঘটনায় সীরাত ও হাদীসের গ্রন্থসমূহ সমৃদ্ধ। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য।

প্রিয় ভাই!

জিহাদ আল্লাহ পাকের বিধান। আর আল্লাহ পাক কারো উপর তার সাধ্যাতীত কোন কিছু চাপিয়ে দেন না। ইসলাম ফিত্‌রাত তথা মানবের সহজাত প্রবৃত্তির ধর্ম। একজন মু'মিনের 'ঈমান' এমনি এক শক্তির নাম যা উপযুক্ত পরিবেশ, সঠিক দিক-নির্দেশনা এবং পথ প্রদর্শন পেলে বিস্ফোরিত হয়। তাই আমাদের এখন ফরয দায়িত্ব হলো একজন মুসলিমের সুপ্ত কিংবা গুপ্ত, অথবা বিলুপ্তপ্রায় সেই জিহাদী চেতনায় ঝড় কিংবা সাইক্লোন সৃষ্টি করা, আর এমন ঈমানী স্ফূলিঙ্গ তৈরী করে দেয়া যা জিহাদের দাবানলে পরিণত হয়ে দুনিয়ার তাবৎ বাতিলকে ভস্ম করে দিবে, ইনশাআল্লাহ।........

এই লক্ষ্যকেই সামনে রেখে আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে কিছুটা চেষ্টা করা হয়েছে আপনাদের সামনে সামান্য একটি উপহার পেশ করতে, যার নাম "কিতাবুত্ তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল"। আশা করা যায়, ইনশাআল্লাহ কিতাবটি পাঠক উম্মাহর ঘুমন্ত হৃদয়গুলোকে জাগ্রত করে দিবে, পাথরসম অন্তরগুলো থেকে প্রবাহিত করবে জিহাদপ্রেমের অমীয়ধারা, হীম-শীতল রক্তগুলো পরিণত হবে বিস্ফোরণ্মুখ গোলা-বারুদে, 'আশীদ্দাউ আলাল কুফ্ফারের' মূর্ত প্রতীকে, দিকে দিকে সৃষ্টি করবে জিহাদের গুঞ্জরণ আর চূর্ণ হবে আকীদা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের দুর্জ্ঞেয় সব প্রাচীর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন কিতাবটিকে এমনিভাবে কবুল ফরমান। আমীন।

প্রিয় ভাই! আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই কিতাবের কথাগুলো প্রকৃতপক্ষে আমার হৃদয়ের একার কথা নয়, এই কথা ও ব্যথা উম্মাহ দরদী প্রতিটি মুজাহিদ ভাইয়ের ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের তপ্ত অনুভূতি ও রক্তাক্ত কথামালা। আল্লাহ্ পাক সারা দুনিয়ার সকল মুজাহিদ ভাইদেরকে কবুল ফরমান, তাদেরকে কুদরতীভাবে নুসরত করেন ও বিজয় দান করেন এবং আমাকেও এই কাফেলার একজন সৈনিক বানিয়ে দেন। আমীন।

সবশেষে, কিতাবটিকে পরিপূর্ণ, নির্ভুল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে যারা অক্লান্ত ও নিরলস পরিশ্রম করেছেন, শ্রম আর দুআ দিয়ে আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ, তাদের জন্য আমার অশেষ দুআ রইল। বিশেষতঃ "দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্ ফোরাম" এর ভাইদের ঋণ আমি কোনোদিনই শোধ করতে পারব না, তাদের প্রতিদান একমাত্র রব্বে কারীমই দিতে পারবেন। দুআ করি, তিনি যেন তাঁর শান অনুযায়ী ভাইদেরকে এর উত্তম প্রতিদান দান করেন। আমীন।

প্রিয় ভাই! আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিতাবটিতে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কেননা, আমি বা আমরা মানবীয় সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে নই। যদি কোন ভুলত্রুটি বা অসঙ্গতি কারো নজরে পরিলক্ষিত হয়,

আমাদেরকে অবশ্যই অবহিত করবেন। আমরা আপনাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব ইনশাআল্লাহ। প্রতিটি পর্বের শেষে "দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্" ফোরামের পোস্ট লিংক দেয়া আছে সেখানে আমাদেরকে কমেন্টে জানাতে পারেন ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ পাক আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন। আমাদের নাযাতের উসীলা বানান। আমাদেরকে মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ এবং দা'ঈ ইলাল্লাহ হিসেবে কবুল করুন। এবং সর্বশেষে শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে "রফীকে আ'লা"র সাথে মিলিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন। ছুম্মা আমীন।

-মুস'আব ইল্‌দিরিম

কিতাবুত্ তাহরীদ্ 'আলাল্ ক্বিতাল্

পর্ব পরিচিতি

কিতাবুত্ তাহ্রীদ 'আলাল ক্বিতাল্

পর্ব ১ :

আগ্নেয়গিরি হতে অগ্ন্যুৎপাত

মুস'আব ইলদিরিম

প্রথম পর্ব:

আগ্নেয়গিরি হতে অগ্ন্যুৎপাত

সূচিপত্র

সারা বিশ্বব্যাপী কুফ্ফারদের বিষাক্ত থাবার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত এক জাতির নাম 'মুসলিম জাতি'। মাশরিক থেকে মাগরিব, শিমাল থেকে জুনুব - মুসলিম জাতি আজ 'অসহায়' বানে ভাসা খড়কুটার ন্যায়। যুগ যুগ ধরে যে জাতি বিশ্বকে নেতৃত্ব দিল, যে জাতি সম্মান ও ইজ্জতের স্বর্ণশিখরে আরোহন করেছিল, যে জাতি বিশ্ববাসীকে সভ্যতার আলোর সন্ধান দিয়ে আসল, আজ সে জাতিই অসভ্য, বর্বর কুফ্ফারদের আক্রমনের একমাত্র লক্ষ্য। আজ মুসলমানদের ইতিহাস মানেই রক্তক্ষরণের ইতিহাস। আজ মুসলমানদের ইতিহাস মানেই অপমান-অপদস্তি, যুলুম-নির্যাতন, ধর্ষণ-অপহরণ, গুম আর জেলবন্দির ইতিহাস। আজ মুসলমানদের ইতিহাস মানেই অধিকার হরণ আর পরাধীনতার ইতিহাস। আজ মুসলমানদের ইতিহাস মানেই 'ঈমান বিক্রয়কারী' মুনাফেক আর গাদ্দার কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতায় শিকার হওয়ার ইতিহাস। আজ মুসলিম দেশগুলোতে মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও তাদের সাথে সংখ্যালঘুদের ন্যায় আচরণ করা হচ্ছে; ধর্মীয় স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করা হচ্ছে। কিন্তু কেন আজ মুসলমানদের এই দুরবস্থা???

অথচ আমাদের ছিল এক সোনালী অতীত, গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। একদিন অর্ধজাহান শাসন করেছি আমরা। পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে ঘোড়া ছুটিয়েছে আমাদের বীরেরা। আমাদের দেহ ছিল তেজোদ্দীপ্ত। শির ছিল উন্নত। সেদিন আমাদের খুনে স্ফূলিঙ্গ উঠতো, নিঃশ্বাসে লাভা ছড়াতো। সন্ধ্যাবেলা আমরা তাবুতে ফিরতাম ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহে, রক্তাক্ত বদনে। তথাপি গভীর রজনীতে আমাদের তাঁবুগুলো থেকে ভেসে আসতো কান্নার ধ্বনি। আমরা ছিলাম দিনের বীর, রাতের সন্ন্যাসী। কন্টকাকীর্ণ, দুর্গমগিরি আমাদের কাফেলাকে রুখতে পারেনি। তেমনি পারেনি সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা। সমুদ্রবুকে ঘোড়া হাঁকানো সেতো আমাদের গর্ব। গভীর জঙ্গলে হিংস্র হায়েনার সাথে সহাবস্থান সেতো আমাদের ঐতিহ্য। এভাবেই ইতিহাসের পরতে পরতে আমরা জন্ম দিয়েছি অবিশ্বাস্য নানা বিশ্বাসের। পৃথিবীর কোথাও আমাদের কেউ লাঞ্ছিত হবে, এটি ছিল অসম্ভব। আমাদের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাবে, এটা ছিল অকল্পনীয়।

কিন্তু হায়! আজ সবই অতীত ইতিহাস। যেন রূপকথার গল্প। দুই চোখ মেলে পৃথিবীর চারিদিকে একটু তাকিয়ে দেখি, কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি আজ আমরা। চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হয়ে যাবে। হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। জবান স্তব্ধ হয়ে যাবে। দেহ নিথর হয়ে আসবে। যেন হাহুতাশ আর আফসোস করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। কিন্তু কেন?

ইসলামের প্রাথমিক যুগে একবার মদীনায় আদমশুমারি হয়েছিল। তখন সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল মাত্র দেড় হাজারের মত। এই দেড় হাজার সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম আযমাঈনগণকে নিয়েই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাকেন্দ্রিক ইসলামী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, যার বিস্তৃতি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর যামানাতেই অর্ধপৃথিবী ছাড়িয়ে যায়।

প্রশ্ন হলো, পৃথিবীতে আল্লাহ্র দ্বীন ও মুসলমানদের নিরাপত্তা কায়েমের জন্য যদি দেড় হাজার সাহাবীই যথেষ্ট হয়, তাহলে বর্তমান বিশ্বে একশ সত্তর কোটি মুসলমান গেল কোথায়?

লক্ষ লক্ষ হাফেয-আলেম-মুফতী, লেখক, গবেষক, তালিবে ইল্ম, সালেকীন-যাহেদীন, দাঈ-মুবাল্লিগ থাকা সত্ত্বেও কেন আজ মুসলমানদের এই হালত?

কেন আজ পশ্চিমা শক্তি মুসলিম বিশ্বের উপর অবিরত ক্রুসেড পরিচালনা করে যাচ্ছে?

কেন আজ মুসলমানদের ঘরে ঘরে কারবালার মাতম আর আহাজারি? কেন আজ মায়ের বুক খালি হচ্ছে, ভাইয়ের বুক থেকে রক্ত ঝরছে?

কেন আজ গর্ভবতী মায়ের গর্ভের শিশুকে স্নাইপার দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে?

কেন আজ দুধের অবুঝ শিশুর শাহাদাতের উপর মমতাময়ী মায়ের আহাজারি আর আর্তচিৎকার?

আজ কোন্ সাহসে একজন মাত্র খ্রিস্টান মসজিদে ঢুকে শতাধিক মুসলমানকে "ভিডিও গেম্স খেলা"র মতো হত্যা করছে?

আজ কেন বোমার আঘাতে মুসলমানের দেহ টুকরা টুকরা হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে?

আজ কেন মুসলমানদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে, হত্যা করে গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর বিরান করে দেয়া হচ্ছে?

আজ কেন মুসলমানদেরকে তাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে?

আজ কেন রাসায়নিক বোমা মেরে হাজার হাজার মুসলিম শিশুকে শহীদ করা হচ্ছে?

আজ কেন মায়ের বুক থেকে কোলের শিশুকে কেড়ে নিয়ে পদদলিত করে হত্যা করা হচ্ছে?

আজ কেন আফগান থেকে কাশ্মির পর্যন্ত, ইরাক থেকে ফিলিস্তিন পর্যন্ত, চেচনিয়া থেকে উইঘুর পর্যন্ত, মায়ানমার থেকে আসাম পর্যন্ত, ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত অভিশপ্ত ইহুদী আর হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান মালাউনরা পানির মত সস্তা মনে করে মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করছে?

আবু গারীব কারাগারের ফাতেমা নূর থেকে নিয়ে মুসলিম নারী ড. আফিয়া সিদ্দিকীর মত অগণিত বোনেরা কেন আজ তাদের বর্বরতার শিকার হচ্ছে?

আজ কেন আমার মা-বোনকে ধর্ষণ করে তাদের স্তন কাটা হচ্ছে? তাদের লজ্জাস্থান বিকৃত করা হচ্ছে?

আজ কেন আমার মা-বোনের গর্ভে কুকুর, শূকর আর হায়েনাদের ভ্রূণ প্রস্ফূটিত হচ্ছে?

আজ কেন বোরকা পরিহিতা আমার বোনকে হত্যা করে বুকের উপর পা রেখে জারজ হারামীর বাচ্চারা কফি খাচ্ছে?

কেন আজ মুসলমানদেরকে পতঙ্গের ন্যায় আগুনে পুড়িয়ে কুফ্ফাররা আনন্দ উল্লাস করছে?

গুয়ান্তানামো বে থেকে বাগরাম জেল পযর্ন্ত, কেল্লায়ে জঙ্গী থেকে শিবারগান জেল পর্যন্ত এবং সিআইএ এর গোপন কারাগার থেকে নিয়ে মোসাদ আর 'র' এর বন্দীশালা পর্যন্ত, রিমান্ডের নামে কেন আজ হাজারো মুসলিম নওজোয়ান আমেরিকা ও তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের জুলুমের চাকায় নিষ্পেষিত হচ্ছে?

আজ তাগুতের কারাগারগুলোতে আমার মুসলিম ভাই-বোনদেরকে উলঙ্গ করে পিরামিড বানানো হচ্ছে; লজ্জাস্থানগুলোতে ইলেক্ট্রিক শক দেয়া হচ্ছে; নখ উপড়ে ফেলা হচ্ছে; নখের নিচে সুঁচ ঢোকানো হচ্ছে; বাঁশ-ডলা দেয়া হচ্ছে; দিন-রাত পিটিয়ে রক্তাক্ত করে শহীদ করে দেয়া হচ্ছে; কেন?

আজ কেন মসজিদ সমূহ আগুনে ভস্ম করা হচ্ছে? কুরআন কারীমকে জ্বালিয়ে অবমাননা করা হচ্ছে?

আজ কেন, কোন্ সাহসে মাল্উন হিন্দুরা নাপাক মূর্তির পায়ের নিচে কুরআন রেখে কুরআনের অবমাননা করছে? এই অবমাননা কি কেবল কুরআনের?? এই অবমাননা আল্লাহ্ তা'আলার, এই অবমাননা আল্লাহ্র রাসূলের, এই অবমাননা প্রতিটি মুসলমানের!

আজ কেন মালাউন হিন্দুরা মুসলমানদেরকে "জয় শ্রীরাম" বলতে বাধ্য করছে?

গো-মূত্র পানকারী নাপাক হিন্দু সন্ত্রাসীরা 'গরু কুরবানী' করার অপরাধে কেন আজ মুসলমানদের হত্যা করছে?

আজ সারা দুনিয়ায় এত মুসলমান থাকতেও নাস্তিক-মুরতাদ জারজ-হারামীরা কেন, কোন্ সাহসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে কটুক্তি করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে? আজ কিভাবে তারা আল্লাহ্র রাসূলের ব্যঙ্গচিত্র অংকন করার সাহস পাচ্ছে?

কী সেই কারণ, যার জন্যে মুসলমানদের প্রথম কেবলা 'বাইতুল মাকদিস্' নাপাক ইহুদীরা যেদিন দখল করে, সেদিন বুক ফুলিয়ে গর্বভরে বলছিল, "মুহাম্মাদ তো চলে গেছে, কিছু রমণী রেখে গেছে!"?

ইউরোপ-আমেরিকার গৃহপালিত জানোয়ার ইসরাঈল আজ কেন, কোন্ সাহসে ট্যাংক ও স্থলবাহিনী দিয়ে ঘেরাও করে গাজাকে মুসলমানদের জন্য এক অগ্নি-কারাগারে পরিণত করেছে?

আজ যুদ্ধ-বিধ্বস্ত মুসলিম এলাকাগুলোর বাসিন্দাদের নিকট কুফ্ফারদের বিমান থেকে বর্ষিত বোমা ছাড়া খাবার মতো কিছুই নেই, সেখানকার মুসলমানরা একবেলা আহারের জন্য হারাম কুকুর-বিড়ালও পাচ্ছেনা, কেন?

কিসের জন্য আজ মুসলমানরা বানে ভেসে আসা খরকুটোর মতো?

কী তার কারণ? কেন এমন হচ্ছে?.........

উম্মাহ এলবাম প্লেট-০১ ফিলিস্তিন অধ্যায়

মাসজিদুল আকসা,
মুসলমানদের প্রথম কেবলা,
মুসলিমের প্রাণের স্পন্দন,
আজ অভিশপ্ত, নাপাক-
ইহুদিদের দখলে।

উম্মাহ এলবাম
প্লেট-০২
ফিলিস্তিন অধ্যায়
MASJID AL AQSA
ON FIRE?

ফিলিস্তিনের উপর অভিশপ্ত ইহুদীবাদের আগ্রাসন

উম্মাহ এলবাম
প্লেট-০৪
ফিলিস্তিন অধ্যায়
ROUND THE CORNER
NEWS

উম্মাহ এলবাম
প্লেট-০৫
ফিলিস্তিন অধ্যায়

উম্মাহ এলবাম
প্লেট-০৬
সিরিয়া ও ইরাক অধ্যায়

উম্মাহ এলবাম
প্লেট-০৭
সিরিয়া ও ইরাক অধ্যায়

উম্মাহ এলবাম
প্লেট -৮
সিরিয়া ও ইরাক অধ্যায়

উম্মাহ এলবাম প্লেট-০৯ সিরিয়া ও ইরাক অধ্যায়
gettyimages

উম্মাহ এলবাম
প্লেট-১০
সিরিয়া ও ইরাক অধ্যায়

উম্মাহ এলবাম
প্লেট-১১
সিরিয়া ও ইরাক অধ্যায়

উম্মাহ এলবাম
প্লেট-১২
'গুয়ান্তানামু বে' কারাগার অধ্যায়

উম্মাহ এলবাম
প্লেট-১৩
গুয়ান্তানামো বে কারাগার অধ্যায়
নির্যাতনের
বিভিন্ন পন্থা
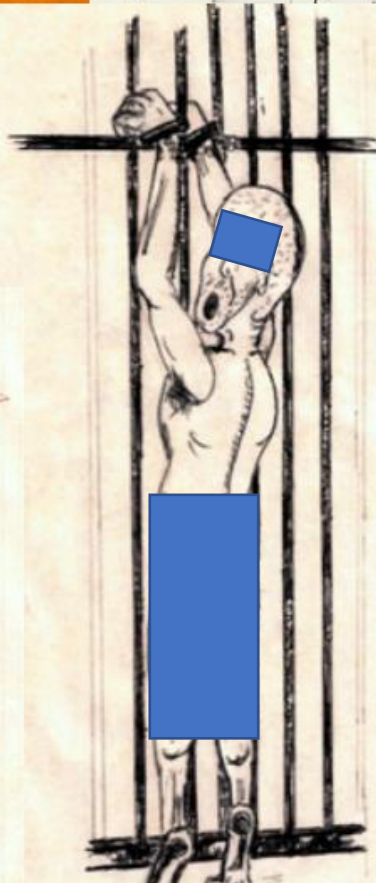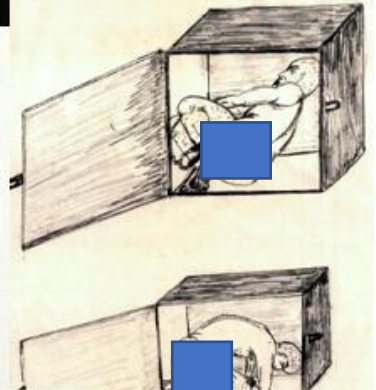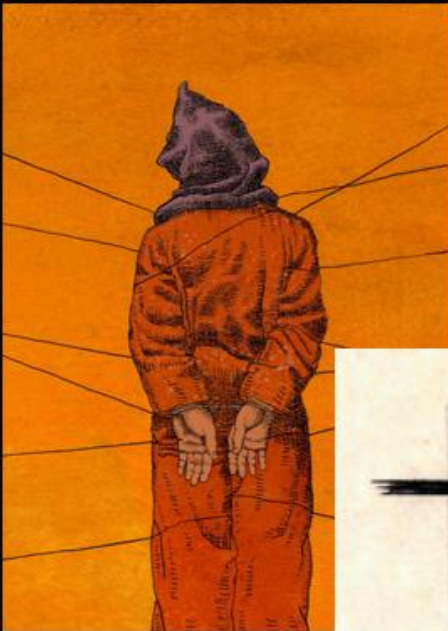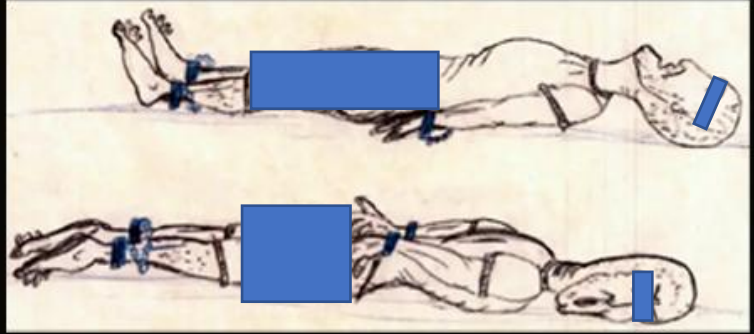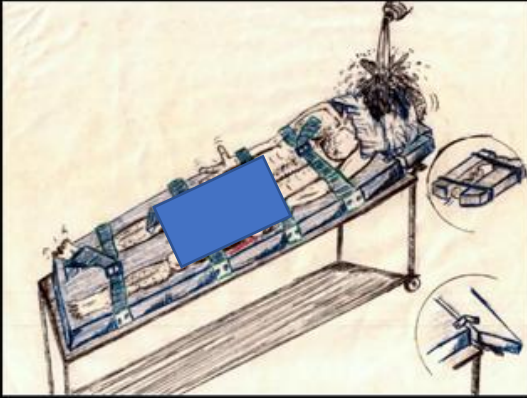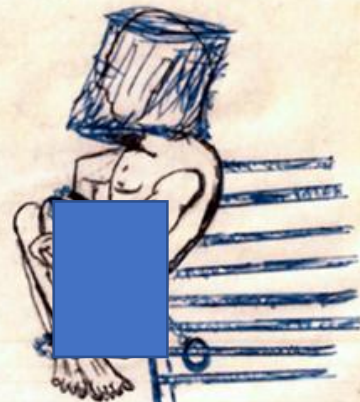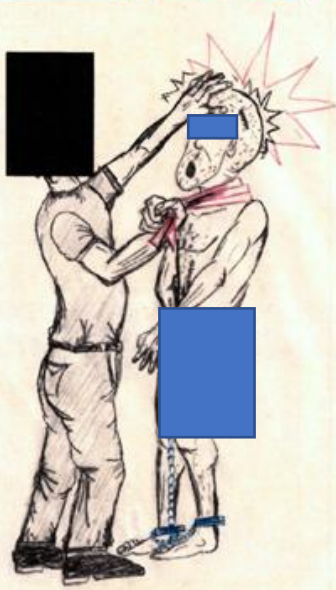
উম্মাহ এলবাম
প্লেট-১৪
উইঘুর অধ্যায়

উম্মাহ এলবাম

উইঘুর অধ্যায়

উম্মাহ এলবাম
প্লেট-১৬
কাশ্মীর, ভারত অধ্যায়
BAN
হিন্দু
সন্ত্রাসী

উম্মাহ এলবাম
প্লেট-১৭
কাশ্মীর, ভারত অধ্যায়

উম্মাহ এলবাম
প্লেট-১৮
কাশ্মীর, ভারত অধ্যায়

উম্মাহ এলবাম
প্লেট-১৯
কাশ্মীর, ভারত অধ্যায়

উম্মাহ
প্লেট-২০
কাশ্মীর, ভারত অধ্যায়

উম্মাহ এলবাম
প্লেট-২১
কাশ্মীর, ভারত অধ্যায়
আর কতকাল আমাদেরকে মা-বোন
আর ভাইদের এমন
আহাজারি শুনতে হবে??
SYSTEMATIC EXTERMINATION
Stop
Genocide
in
Kashmir
OF MUSLIMS

প্লেট-২৩

আরাকান (রোহিঙ্গা) অধ্যায়

আরাকানে গ্রামের পর গ্রাম
জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়েছে
বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা

উম্মাহ এলবাম

আরাকান (রোহিঙ্গা) অধ্যায়

রোহিঙ্গা ভাই-বোনদের উপর বর্বরোচিত গণহত্যা

উম্মাহ এলবাম
প্লেট-২৫
আরাকান (রোহিঙ্গা) অধ্যায়
রোহিঙ্গা
গণহত্যা

উম্মাহ এলবাম
প্লেট-২৬
আরাকান (রোহিঙ্গা) অধ্যায়
AP
উম্মাহ্‌র
আর্তনাদ
সূত্র: ইন্টারনেট

কিছু আত্মসমালোচনা

আজ কোথায় পাশ্চাত্যের পা-চাটা গোলামেরা; ৫৭টি দেশের মুসলিম শাসকরা আজ কোথায়?

কেন আজ তারা অসহায় মুসলমানদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে না? কেন তারা মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধের পতাকা উত্তোলন করছে না?

ইসলামের শুরু হতে আজ পর্যন্ত আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা, হাকিম বিন জাবালাহ, আশতার মালিক, মুখতার ছাকাফী, হাসান বিন সাব্বাহ, ইবনে আলকমা, নাসীরুদ্দীন তুসী, ফাতেমী শিয়া, মীর জাফর, মীর সাদিক, ইয়াহিয়া খানের মতো মুনাফিকদের উত্তরসূরীদের খাতায় মুসলিম দেশের মুসলমান নামধারী শাসকবৃন্দ কেন তাদের নাম লিখিয়েছে?

আজ পৃথিবীর কোণায় কোণায় মুসলমানদের লাশের উৎকট গন্ধ! দিকে দিকে মুসলমানদের বিভৎস লাশ আর জীবিতদের অর্ধমৃত-মানবেতর জীবন! এসব দেখেও কেন আজ বুক ফাটা কান্না আসে না?

এক মুসলমান মেয়ের ডাকে সিন্ধু বিজেতা মুসলিমের সন্তান পরিচয়দাতারা আজ ফাতেমা নূর, ড. আফিয়া সিদ্দিকী আর অন্যান্য শহীদানের ডাকে কেন ছটফট করে না?

এক খ্রিস্টান নারীর আহ্বানে স্পেন বিজয়ী মুসলমানের অনুসারীরা আজ ক্রুসেডীয় জুলুমের শিকার হাজারো বসতহীন মুসলিম বাচ্চাদের প্রতিরক্ষার জন্য কেন ময়দানে আসে না? আজ কোথায় একশ সত্তর কোটি মুসলমান? কোথায় তারা?...........

আজ কোথায় উম্মতের খালিদ বিন ওয়ালিদ?

কোথায় উম্মাহ্‌র মুছান্না ইবনে হারেছা?

কোথায় কা'কা' ইবনে আমর?

কোথায় নুমান ইবনে মুকরিন?

কোথায় সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস?

কোথায় সে মানবতার বাহাদুরী?

কোথায় মুসলিম প্রজন্মের বিবেক-বুদ্ধি?

কোথায় ইজ্জত-সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ?

কোথায় ঘুনে ধরা সমাজের সংশোধনী পদক্ষেপ?

কোথায় দ্বীনের সঠিক বুঝ? কোথায় সঠিক আকীদা?

কোথায় জান্নাতাকাঙ্ক্ষী পবিত্র জামাত?

কোথায় আল্লাহ্‌র পথের যোদ্ধারা?

কোথায় সৎ কাজের আদেশ দাতারা?

কোথায় অসৎ কাজের নিষেধকারীরা?

কোথায় তারা, যারা নিজেদের ইজ্জত-সম্মান, স্ত্রী-সন্তান, ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পত্তি রক্ষায় লড়াই করে?

উম্মতের দরদীরা আজ কোথায়?

কোথায়? কোথায় তারা??................

আজও কি প্রতিটি মুসলমানের উপর জিহাদ 'ফরযে আইন' হয়নি?

এখনো কি মুসলমানদের জন্য ময়দানের ইবাদত (জিহাদ) করার সময় আসেনি?

আজও যদি না হয়, তাহলে আর কবে হবে?.......................

এত কিছুর পরও কি আমরা জাগ্রত হব না?

এত কিছুর পরও কি আমাদের হুঁশ ফিরবে না?

এরপরও কি আমাদের চুপ করে বসে থাকার সুযোগ আছে?

আজ কোথায় সারা দুনিয়ার দ্বীনদার ভাইয়েরা?

আজ কোথায় আমার দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সাথী ভাইয়েরা?

কেন আমরা ময়দানে আসছি না? কেন আমরা জিহাদ ও কিতালের মেহনত করছি না?

কেন আমরা আজ দাওয়াতকেই 'সবচেয়ে বড় নবীওয়ালা কাম' মনে করে জিহাদ ত্যাগ করেছি?

কেন আমরা আজ ময়দানে না এসে মসজিদে বসে থেকে 'জিহাদের ফাযায়েল' তালাশ করছি?

কেন আমরা কেউ কেউ মুসলমানদের রক্ত ঝরানোকেই 'জিহাদ' মনে করছি? বাতিল নয়, কেন আমাদের লাঠি আজ উম্মতেরই মাথা ফাটাচ্ছে? কেন আজ আমাদের হতভাগা তরবারিগুলো মুসলিম মায়ের বুককেই খালি করছে?

কেন আমরা আজও প্রকৃত দাওয়াতের দিকে ফিরে আসছি না?

কেন আমরা আজও প্রকৃত 'অসৎ কাজের নিষেধ' করছি না?

কেন আমরা আজও মসজিদে জিহাদের এলান করি না? কেন আমরা আজও মসজিদে জিহাদের বয়ান করি না?

কেন আমরা আজও তালিমের হালকায় "ফাযায়েলে জিহাদ" পড়ি না?

আজও কেন আপসে 'ক্বিতাল ও শাহাদাতের' মুজাকারা হয় না? কেন আজও মাশোয়ারা মজলিসে জিহাদের পরামর্শ হয় না?

আজও কেন আমাদের মুরুব্বীরা "আজীবন চিল্লা"র (হিজরত ও জিহাদের) তাশকিল করেন না?

প্রাণপ্রিয় মুবাল্লিগ ভাইয়েরা!

আমাদের 'খুরুজ' কবে জিহাদের জন্যে হবে? আমাদের 'গাশ্‌ত' কবে অভিযানের রূপ নিবে?

'আড়াই ঘণ্টার মেহনত' শেষ হয়ে আমাদের যিন্দেগী কবে জিহাদের জন্য ওয়াক্‌ফ হবে? আমাদের 'ঈমান গড়ার মেহনত' কবে শেষ হবে? আমাদের ঈমান আমাদেরকে কবে জিহাদের উপযুক্ত করবে?

আমাদের 'মারকাজের পাহারাদারি' কবে 'মুসলিম ভূমির সীমানার পাহারাদারি' (রিবাত-এ) রূপ নিবে?

আমাদের হীম-শীতল রক্ত কবে কুফ্ফারদের বিরুদ্ধে বারুদে পরিণত হবে?

আমাদের হাতের লাকড়িগুলো কবে মেশিনগান হয়ে কথা বলবে?

আমাদের পিঠের গাট্টিগুলো কবে 'মাইনে' পরিণত হবে?

আমাদের ছামানাগুলো কবে বোমা হয়ে বিস্ফোরিত হবে?

আমাদের চুলাগুলো থেকে কবে 'প্রতিশোধের আগুন' উত্থিত হবে?

আর কতকাল আমার ভাইদের জন্য ময়দান অপেক্ষায় থাকবে? আর কতদিন?............

কোথায় আজ হক্কানী পীর সাহেবানরা? কোথায় তাদের মুরীদানরা? কোথায় আজ খানকাহ্ওয়ালা ভাইয়েরা?? কোথায় আমরা???

প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা!

কেন আজ আমরা ঘরে বসে থেকে, এক ফোঁটা ঘামও না ঝরিয়ে, নিজেদেরকে 'মুজাহিদে আকবর' মনে করছি?

আমরা কোন্ বৈরাগ্য অবলম্বন করছি? জিহাদের চেয়ে বড় কোনো বৈরাগ্য আছে কি?

আমরা কোন্ 'নফসের কুরবানী ও মুজাহাদা' করছি? জিহাদের চেয়ে বড় 'নফসের কুরবানী ও মুজাহাদা' আছে কি?

আমরা কোন্ খাল্ওয়াত (একাকীত্ব) অবলম্বন করছি? পাহাড়ের অন্ধকার গুহার চেয়ে সুন্দর খাল্ওয়াত আর কোথাও পাব কি?

আমাদের খানকাহ্গুলো কবে দুর্গে পরিণত হবে?

আমাদের 'মাজলিস'গুলোতে কবে জিহাদের আলোচনা হবে?

জিহাদ হতে পলায়ন কি আত্মার রোগ নয়?

অন্তরে 'তাগুত ও বাতিলের প্রতি ভয়' থাকা কি আত্মার ব্যাধি নয়?

'মৃত্যুর ভয়' দূর করার মেহনত কি ইসলাহী মেহনত নয়?

কাপুরুষতার গলায় ছুরি চালানো কি 'তায্কিয়া' নয়?

প্রিয় ভাই!

জিহাদ আল্লাহ পাকের হুকুম নয় কি?

জিহাদ পরিত্যাগ করা 'গুনাহে কবীরা' নয় কি?

আত্মার পরিশুদ্ধি করা যেই আল্লাহ তা'আলার ফরয বিধান, জিহাদ করাটাও সেই একই আল্লাহ তা'আলার ফরয বিধান নয় কি?

বলুন!

আমাদের নিঃশব্দ যিকিরগুলো কবে 'গগনবিদারী রণহুঙ্কার' হয়ে বাজবে? আমাদের হাতের তাসবিহ্গুলো কবে শহীদের লাশ গণনা করবে?

আমাদের অশ্রুসিক্ত জায়নামাযগুলো কবে বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হবে? কবে আমরা জাগ্রত হব? আর কবে?................

আজ কোথায় আমার ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মী ভাইয়েরা?

জিহাদ মনে করে যারা রাজপথ কাঁপাচ্ছি, কেন আমরা প্রকৃত জিহাদের জন্য ময়দানে ছুটে যাচ্ছি না?

মঞ্চে যারা 'গণতন্ত্রের জয়গান' গাই, তারা কেন ময়দানে এসে তাকবীরে তাকবীরে আকাশ বাতাস মুখরিত করছি না?

মিছিলে যারা বাতিলের বিপক্ষে স্লোগান দিয়ে গলা ফাটাচ্ছি, ময়দানে এসে বাতিলের বিরুদ্ধে কেন আমরা অস্ত্র ধরছি না?

ও আমার প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা!

আমাদের সভা-সমাবেশগুলো থেকে এখনো কেন জিহাদের আওয়াজ ভেসে আসে না?

তথাকথিত 'ভোটযুদ্ধ' বাদ দিয়ে কেন আমরা হক 'সশস্ত্র জিহাদ' করছি না?

আব্রাহাম লিঙ্কনের গান্ধা গণতন্ত্রের মাধ্যমে আজ পর্যন্ত কোথায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়েছে?

এরদোগান আর মুরসি কি পেরেছেন মদকে হারাম করতে? তারা কি পেরেছেন সুদকে উৎখাত করতে? তারা কি পেরেছেন পতিতালয়গুলোকে বন্ধ করতে? তারা ক্ষমতায় গিয়ে কতভাগ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন?

আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে কয়দিন মিছিল করেছিলেন? তাদের দাবীগুলোকে নিয়ে কয়দিন কুফ্ফারদের কাছে স্মারকপত্র প্রদান করেছিলেন?

আল্লাহর রাসূল ﷺ কুফুরির সাথে কয়দিন আপোষ করেছিলেন?

জিহাদই কি প্রকৃত ইসলামী রাজনীতি নয়?

আর কতদিন আমরা নিজেদেরকে ধোঁকা দিব?

আর কতদিন আমরা নিজের মনকে মিথ্যা বুঝ দিব? আর কতদিন?..............

আজ কোথায় আমার দানশীল, দানবীর ভাইয়েরা?

যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য অকাতরে দান করেন, তারা আজ কোথায়?

প্রিয় ভাই আমার!

আমরা যারা মসজিদ, মাদরাসায় দুই হাত উজাড় করে দান করি, আমরা কেন জিহাদের ময়দানে দান করার কথা ভাবি না? অথচ জিহাদের জন্য দান করা প্রয়োজন ও সওয়াবের দিক দিয়ে অধিক উপযোগী!

আমরা যারা গরীব মিসকিনদের দান করার জন্য সর্বদা এগিয়ে আসি, আমরা কেন গোরাবা (অপরিচিত) মুজাহিদ ভাইদের দিকে হাত বাড়াই না? অথচ জিহাদের কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য প্রয়োজন অপরিসীম অর্থকড়ি?

যেসব মুজাহিদ ভাই নিজের ঘর-সংসার ফেলে, অর্থ-সম্পদ ফেলে আল্লাহর রাস্তায় খালি হাতে বেড়িয়ে যায়, তাদেরকে কে দান করবে?

খোদার রাহে বেড়িয়ে পড়া মুজাহিদের অসহায় পরিবারের অর্থ যোগান কে দিবে?

আল্লাহর রাস্তার শহীদ ভাইদের পরিবারবর্গের অশ্রু কে মুছে দিবে? সেই সকল ক্ষুধার্ত ভাই-বোনদের মুখে কে আহার তুলে দিবে?

তাগুতের কারাগারে বন্দী ভাইদের মুক্ত করার জন্য টাকা কে যোগাড় করবে?

উপার্জনে অক্ষম যুদ্ধাহত গাজী ভাইদের পাশে কে এসে দাঁড়াবে?

আজ সারা দুনিয়ায় জিহাদের মেহনতকে জিন্দা করার জন্য, দুনিয়ার বুকে ইসলামের চিহ্ন বাকী রাখার জন্য হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন। কে দিবে এই অর্থ, আমরা যদি এগিয়ে না আসি তো কারা এগিয়ে আসবে?

আজ কোথায় আহলে হাদীস/সালাফী ভাইয়েরা?

সহীহাইনে কি 'কিতাবুল জিহাদ' নেই?

সহীহাইনে কি 'কিতাবুল মাগাযী' নেই?

এ সকল হাদীসের উপর কে আমল করবে?

সালাফদের যিন্দেগীতে কি জিহাদ ছিল না?

সালাফদের সীরাতে কি ই'দাদ ছিল না?

আমাদের সালাফরা কি 'দিগ্বিজয়ী বীর' ছিলেন না?

আমাদের সালাফদের ভয়ে কি কুফ্ফারদের ঘুম মিটে যেত না?

আমাদের সালাফদের নাম শুনলেই কি তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত না?

তাহলে কেন আমাদের এই অবস্থা? কেন আমাদের এই জিহাদবিমুখতা?

আমরা তাহলে কোন্ সালাফদের অনুসরণ করছি?

প্রিয় ভাই আমার!

একজন মুসলমান ভাই একটি মুস্তাহাবের উপর আমল করল না, তাতেই আমার মনে অনেক ব্যথা অনুভূত হয়, অথচ আজ সারা দুনিয়া থেকে ইসলাম মিটে যাচ্ছে, উম্মাহ্র অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে, ক্রুসেডাররা একজোট হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের শেষ চিহ্নটুকু মুছে দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে, তারা সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে, অথচ আমরা ঘুমিয়ে আছি, আমরা ছোটখাটো বিষয়ে মতানৈক্য করে একে অন্য হতে আলাদা হয়ে যাচ্ছি, একে অন্যকে

গালমন্দ করছি, শরীয়তের শাখাগত বিষয় নিয়ে মেতে রয়েছি, অথচ বর্তমান যামানার জন্য সবচেয়ে বড় ফরয আমার ও উম্মতের কাছ থেকে ছুটে যাচ্ছে- সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই করছি না!

উম্মত শরীয়ত বাদ দিয়ে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে নিজেদের উন্নতি খুঁজে বেড়াচ্ছে, দলে দলে জাহান্নামের দিকে ধাবিত হচ্ছে, অথচ সেজন্য আমার হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে না! আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হচ্ছে না! আমার অন্তরে কোনো ভাবোদয় হচ্ছে না! কেন ভাই, কেন?

কবে আমরা জিহাদের কথা ভাবব? কবে আমরা জিহাদের পথে হাঁটব? কবে আমরা জিহাদের কথা বলব? কবে ভাই, কবে?.......

কোথায় আমার প্রাণপ্রিয় মা ও বোনেরা!

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা আল্লাহর রাস্তায় সন্তান কুরবানী করার জন্য আল্লাহর কাছে সন্তান কামনা করতো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা তাদের সন্তানদেরকে শহীদ হিসেবে দেখার জন্য ছোট্ট সময় দুগ্ধপান করাতো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যাদের মাতৃদুগ্ধে এই পরিমাণ ধার ছিলো যে, তাদের সন্তানরা কিসরা-কায়সারের সাম্রাজ্যগুলোকে তছনছ করে দিয়েছিলো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা নিজের হাতে অস্ত্র ক্রয় করে সন্তানের হাতে তুলে দিতো, এই আশায় যে, তার সন্তান আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত লাভ করবে?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা তাদের পুত্র বধূ হিসেবে জান্নাতের হূরদের দেখতে বেশি ভালোবাসতো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা তাদের সন্তানদের সাথে হূরের বিবাহের জন্য মোহরানা দুনিয়াতেই আদায় করে দিতো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা তাদের সন্তানদের শাহাদাতের উপর গর্ববোধ করতো?

আজ কোথায় আমার সেই মায়েরা, যাদের সন্তান শহীদ হলে তার গৃহে বিয়ে বাড়ির আমেজ চলে আসতো? আনন্দ মিছিল বের হতো? আজ কোথায় তারা?

আজ কোথায় সেই বোনেরা, যারা জিহাদ হতে পিছুহটা ভাইদেরকে ভর্ৎসনা করত? তিরস্কার করে তাদেরকে বালা আর বোরকা এগিয়ে দিত?

কোথায় আজ ছফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব?

কোথায় আজ উম্মে উমারা?

কোথায় আজ আসমা বিনতে আবু বকর? (রাদিয়াল্লাহু আন্হুন্না আযমাঈন)

সেই মায়েরা আজ কোথায়? সেই বোনেরা আজ কোথায়?

সেই স্ত্রীরা আজ কোথায়, যারা বাসর ঘর থেকে তাদের স্বামীদেরকে হাসিমুখে জিহাদের ময়দানে পাঠিয়ে দিতো?

কোথায় আজ তারেক বিন যিয়াদ আর মুহাম্মাদ বিন কাসীমের বোনেরা?

পরম মমতাময়ী, সোহাগিনী, প্রেমময়ী কিন্তু পাহাড়ের মতো অটল-অবিচল ঈমানওয়ালী; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মহব্বতকারিনী, প্রিয়তমের বিচ্ছেদে সবরকারিনী আমার সেই বোনেরা আজ কোথায়?

কেন তারা আবারো বুকে পাথর বেঁধে ধৈর্য্য ধারণ করছে না?

কেন তারা আজ আরো লাখো মুসলিম মা-বোনের উপর অত্যাচার-নির্যাতন আর ধর্ষণের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাদের স্বামী-সন্তান-ভাইদেরকে ময়দানে পাঠাচ্ছে না?

আল্লাহ তা'আলা আমাদের হাবীব ﷺ এর উম্মতের মা-বোনদের প্রতি রহম করুন। তাদের ইযয্ত-আব্রুর সর্বোচ্চ হেফাযত করুন। আমীন।

আজ কোথায় মিম্বারওয়ালা ভাইয়েরা?

আমাদের মিম্বারগুলোতে আজও কেন জিহাদের আযান শুনা যায় না?

আজও কেন আমাদের মিম্বারগুলোতে আমরা নবীওয়ালা ইসলামের আলোচনা করি না? সেখানে আজও কেন জিহাদের 'মুযাকারা' হয় না?

মিম্বারগুলো থেকে কেন আজ সাধারণ মুসল্লিদের জিহাদী জযবা জাগ্রত হয় না? কেন?............

কোথায় আজ উম্মতের ওয়ায়েজ-বক্তারা?

যখন আমরা মাইক কাঁপাচ্ছি, তখন কেন আমরা উম্মতকে জাগ্রত করছি না?

উম্মতকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা, কিতালের জন্য তাশকিল করা কি আমাদের দায়িত্ব নয়?

তাহলে কোন্ বয়ান আমাদেরকে "আন্তর্জাতিক খ্যাতি" এনে দিয়েছে?

কোথায় আজ উম্মতের রাহ্বার- উলামা ভাইয়েরা? আমার প্রাণপ্রিয় তালিবুল ইলম ভাইয়েরা আজ কোথায়?

আজও কেন আমরা নিশ্চুপ?

আহ্! কী আর বলবো! কষ্টে যেন আজ বুক ফেটে যাচ্ছে, হৃদপিণ্ড স্তব্ধ- স্থবির হয়ে যাচ্ছে! মুখ দিয়ে যেন আর কথা বের হতে চাচ্ছে না?

আজ আমরা আলেম সমাজ কি চার দেয়ালের মাঝে বসে আছি না?

আজ উম্মতের এই অবস্থার জন্য আমাদেরকেই সবচেয়ে বেশি জবাবদিহি করতে হবে!

আমাদেরকে কি সেই জিনিস দেয়া হয়নি, যা দেয়া হয়েছিল নবী-রাসূলদেরকে? আমাদেরকে কি সেই জিনিস দেয়া হয়নি, যা দেয়া হয়েছিল সাহাবায়ে কেরামদেরকে?

উম্মতের নেতৃত্ব কি আমাদেরই দেয়ার কথা ছিল না?

উম্মতের দুর্দিনে আমাদেরই কি প্রথম এগিয়ে আসার কথা ছিল না?

উম্মতের ব্যথায়, উম্মতের কষ্টে আমাদেরই কি প্রথম অশ্রুপাত করার কথা ছিল না?

আমাদেরই কি প্রথম ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা ছিল না?

সর্বপ্রথম আমাদেরই কি হাতে অস্ত্র তুলে নেয়ার কথা ছিল না?

আমাদেরই কি উম্মতের শ্রেষ্ঠ বীর হওয়ার কথা ছিল না?

উম্মতকে সঠিক ইসলামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব কার? নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা ইসলামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব কার?

উম্মতকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব কার?

আহ্! কী হলো আজ আমাদের!.............

যে কুরআন সাহাবাদেরকে "বীরত্বের মুকুট" পরিয়েছিল, সেই কুরআনের বাহকরা আমরা আজ কেন "নারীত্বের মালা" গলায় ধারণ করেছি?

যে কুরআন সাহাবায়ে কেরামকে "আল্লাহর সিংহ", "আল্লাহর বাঘ" আর "আল্লাহর তরবারি" বানিয়েছিল, সেই কুরআনের বাহকরা আমরা আজ কেন "অসহায়-নিরীহ" হয়ে গিয়েছি?

যে কুরআন সাহাবাদেরকে ঘরে থাকতে দিত না, ময়দানে তাড়িয়ে নিয়ে যেত, সেই কুরআনের বাহকরা আমরা আজ কেন 'অবলা গৃহবধূ'র মত হয়ে গিয়েছি?

যে কুরআন সাহাবাদেরকে "পারমাণবিক বোমা" বানিয়েছিল, সে কুরআনের বাহকরা আমরা আজ কেন একটা "ককটেল"ও হতে পারছি না?

কেন আজ কুরআন আমাদের গলার নীচে নামছে না?

আজ আমরা যাদের বর্ণিত হাদীস অধ্যয়ন করছি, সেই সকল মহান সাহাবীদের যিন্দেগীর দিকে কেন তাকিয়ে দেখছি না?

সাহাবাদের এলেম যদি তাঁদেরকে যোদ্ধা বানায়, এ যামানায় আমাদের এলেম কেন আমাদেরকে "ভীরু-কাপুরুষ", "জিহাদ বিরোধী" বানায়?

কেন আজ আমরা সাহাবাদের মতো গর্জে উঠছি না, কেন আজ আমরা বাকরুদ্ধ?

কেন আজ আমাদের মাঝে পৌরুষত্ব জেগে উঠছে না?

কেন আজ বাতিল আমাদেরকে 'মশা-মাছি তুল্য' মনে করে? কী তার কারণ? কেন এমন হচ্ছে?...........

কেন আমরা আজ নিজেদের ঈমান সস্তায় বিক্রি করে দিচ্ছি?

কেন আমরা বাতিলের গোলামী করছি? আজ কিভাবে আমরা ক্ষমতাসীনদের খাবারের টেবিলে আমন্ত্রিত হচ্ছি? তাগুতদের উপঢৌকনে আমরা কিভাবে সজ্জিত হচ্ছি? বাতিলের বিষাক্ত ফল আহার করে আমরা কেন বাতিলের গুণকীর্তন করছি?

আজ কেন আমরা তাগুত সরকারের তাবেদারি করছি? কেন আজ আমরা অনেকেই জিন্দিক তাগুত শাসকবর্গের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হচ্ছি?

আজ কেন আমাদের শিক্ষার সরকারি স্বীকৃতির প্রয়োজন হচ্ছে?

যে সকল মর্দে মুজাহিদ উম্মতের জন্য নিজের বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছে, আজ কেন তাদেরকে আমরাও 'জঙ্গী', 'সন্ত্রাসী' বলে গালি দিচ্ছি?

আজ কেন আমরা 'দারুল হারব' কে 'দারুল আমান' ফতোয়া দিচ্ছি? "জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে"- কেন আমরা এই ফতোয়া দিতে ভয় পাচ্ছি?

আমরা কী উম্মতের অবস্থা দেখছি না?

অসহায় নারী-শিশু-বৃদ্ধদের আহাজারি আর আর্তনাদ কি আমাদের কানে পৌঁছে না?

আমরা কিসের অপেক্ষা করছি? আমরা কার অপেক্ষা করছি?

আমরা কোন্ দিনের অপেক্ষা করছি? আমরা কি সেদিন "জিহাদ ফরযে আইন" ফতোয়া দিব, যেদিন আমাদের চোখের সামনে আমাদের স্ত্রীদেরকে গণধর্ষণ করা হবে? নাকি, যেদিন আমাদের চোখের সামনে আমাদের কন্যাকে বে-ইজ্জতি করা হবে? যেদিন আমাদের মায়েদের স্তন কাটা হবে? যেদিন আমাদের কোলের শিশুকে পায়ের নিচে পিষ্ট করে হত্যা করা হবে? যেদিন আমাদের দুধের শিশুকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে? যেদিন আমাদের মাদরাসাগুলোকে তালাবদ্ধ করে দেয়া হবে? যেদিন আমাদেরকে পাইকারী হারে হত্যা করা হবে? যেদিন আমাদেরকে আবারো গাছে ঝুলানো হবে? সেদিন?

মাদরাসাগুলোকে কুফ্ফার সরকারের কাছে 'জঙ্গীমুক্ত' হিসেবে পরিচয় দিতে কেন আজ এত ব্যস্ততা?

জিহাদের কথা বলায় তালিবুল ইলমদেরকে পিটিয়ে মাদরাসা থেকে কেন বহিস্কার করে দিচ্ছি?

আজ কেন আমরা জিহাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছি? কেন আজ পৃথিবী থেকে জিহাদকে বিদায় জানানোর জন্য "জিহাদ বিরোধী" ফতোয়ায় লাখো মুফতী (?) স্বাক্ষর করছি?

কেন আজ আমরা এ.সি রুমে বসে, পোলাও-কোরমা-বিরিয়ানী খেয়ে, তপ্ত ময়দানের "না খেতে পাওয়া" ক্ষুধার্ত জানবাজ মুজাহিদ ভাইদের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজী করছি?

কিসে আমাদেরকে এমনটি করতে বাধ্য করছে? কেন আমরা ন্যাক্কারজনক এইসব ফতোয়া দিয়ে তৃপ্তিবোধ করছি?

এসব নষ্ট ফতোয়াবাজী করে আজ আমরা কিসের দায়মুক্ত হতে চাই? এসব করে আমরা কাকে সন্তুষ্ট করতে চাই?

আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ এবং একনিষ্ঠ মুমিনগণ আমাদের এসকল কর্মকাণ্ডকে কক্ষনো মেনে নিবেন না! আমাদের উপর কক্ষনো সন্তুষ্ট হবেন না! কস্মিনকালেও না! ময়দানে মাহ্শারে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দিকে তাকিয়েও দেখবেন না!!

মুজাহিদরা কেন? কেন আমাদের কলম আজ বাতিলের বিরুদ্ধে চলে না? আজ কেন আমাদের কলম সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খোলে না? নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কেন আমরা কথা বলি না? আমাদের পৌরুষত্ব কেন নারী নেতৃত্বের মসনদকে গুড়িয়ে দেয় না?

আজ কোন্ হেকমতের কারণে আলেমকুল শিরোমণি 'হাজারো আলেমের রক্তে রঞ্জিত' নারী নেত্রীর হাতে হাত মিলিয়ে মুসাফাহা করেন?

আজ কেন 'তাগুত কন্যা'কে 'ক্বওমী জননী' উপাধি দেয়া হচ্ছে? এই শিক্ষা কোন্ ইসলামের? এই শিক্ষা কোন্ কুরআনের? এই শিক্ষা কোন্ হাদীসের?

আজ কেন মুশরিকদেরকেও 'কাফের' বলতে আমরা কেউ কেউ লজ্জা (!) পাচ্ছি? নাস্তিককে 'নাস্তিক' বলতে আমরা ভয় (!) পাচ্ছি? কেন আমরা সমাজে নাস্তিক-মুরতাদ খোঁজে পাচ্ছি না?

আমরা কার অনুসরণ করছি? আমরা কোন ইসলামকে আঁকড়ে ধরে আছি? আমরা কোন্ রাসূলের ওয়ারিশ? আমরা কোন্ নবীর নায়েব?

আমাদের নবী কি তরবারির নবী (নাবীউস্ সাইফ্) ছিলেন না? আমাদের নবী কি 'যুদ্ধে'র নবী (নাবীউল্ মালাহিম্) ছিলেন না? কুফ্‌ফারদেরকে জবাই করতে কি তাঁকে প্রেরণ করা হয়নি? নবীজির যিন্দেগীতে কি ছোট-বড় ৬৩ টি যুদ্ধাভিযান ছিল না? তাহলে আমাদের যিন্দেগীতে জিহাদ কোথায়? আমাদের সিল্‌সিলাতে কোথায় এসে জিহাদ 'নাই' হয়ে গেল?

'দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী রাজনীতি'র নামে আজ কেন আমরা জিহাদ বাদ দিয়ে কুফুরী ও ভ্রান্ত পন্থা অবলম্বন করছি? কেন আমরা আব্রাহাম লিংকনের পঁচা-গান্ধা, নিরেট কুফর 'গণতন্ত্র'কে ইসলামী রাজনীতি নাম দিয়েছি? কেন আমরা আজ 'ইসলামী গণতন্ত্রের' নামে পশ্চিমা জাতির 'নষ্ট দুধ' গোগ্রাসে পান করছি? কেন? আমাদের কিসের অভাব? কেন আমরা মুসলিম উম্মাহ্‌কে ধোকা দিচ্ছি?

'সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি'ই কি ইসলামী অর্থনীতি? 'গণতন্ত্রের পতিতাবৃত্তি'ই কি ইসলামের নারী স্বাধীনতা?

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ- কে গালি দেয়া'-ই কি গণতন্ত্রের বাক স্বাধীনতা নয়? 'মাদকসেবন আর অবাধ যৌনাচার'-ই গণতন্ত্রের 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' নয়?

দ্বীন কায়েমের জন্য মিটিং-মিছিল করা, খালি হাতে কেবল তাসবীহ আর জায়নামায নিয়ে অবরোধ করা- এগুলো কার সুন্নাহ?

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শানে কটুক্তি কারীদের বিচারের জন্য তাগুতের কাছেই বিচার চাওয়া, তাদেরকে স্মারকলিপি প্রদান করা- এগুলো কার তরীকা?

কেন আমরা এগুলোকে ঈমানী দায়িত্ব বলে উম্মাহ্‌র সামনে পেশ করছি? এসবের সাথে রাসূলে আরাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনীত দ্বীন ও মান্‌হাজের কি সামঞ্জস্য রয়েছে? এগুলোর সাথে ইসলামের কী মিল রয়েছে? কেন আমরা নিজেরা বিভ্রান্ত হচ্ছি, উম্মাহ্‌কেও বিভ্রান্ত করছি?

কেন আমরা এসব নিত্য নতুন 'জাহান্নামী' আকীদা ও বিশ্বাসের জন্ম দিচ্ছি? কেন? কেন ভাই, কেন??

না, ভাই, না! আর চুপ করে থাকা যায় না!! দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে!!!

আজ আমার মুখের লাগাম খুলে গিয়েছে! আজ কেউ আমার যবান ধরে রাখতে পারবে না!

আজ আমি বিদ্রোহী! বাতিল ও তার গোলামদের জন্য আজ আমি অভিশাপ! আজ আমি সর্বত্র 'দ্রোহের ঝাণ্ডা' উড্ডয়ন করেছি!

আজ আমি যত মনগড়া, স্ব-রচিত, নব্য ইসলামের বিরদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছি! আজ আমি শান্তিপূর্ণ (!), ভ্রান্ত, তথাকথিত আধুনিক ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছি!

যে ইসলাম বাতিলের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখায় না, যে ইসলাম 'দিগ্বিজয়ী সিপাহসালার' তৈরি করে না, পক্ষান্তরে যে ইসলাম ঘরকুনো 'কাপুরুষে'র জন্ম দেয়, উম্মতকে খোঁজা করে দেয়, আমার দ্রোহ আজ সে ইসলামের বিরুদ্ধে!

দিকে দিকে 'ঈমানের কেল্লাগুলোতে' আজ আমি সেই ইসলামের নিশান উত্তোলন করছি, যে ইসলাম সাহাবাদেরকে শিখিয়েছিলেন স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আজ আমি সেই ইসলামের গানই গাইব, যে ইসলামকে পরম মমতায় বুকে আগলে রেখেছিলেন সাহাবায়ে কেরামগণ!

না, আজ আমার যবান থেকে 'গীত' নয়, অনল বর্ষিত হবে। আজ আমার কলম 'তরবারি' হয়ে 'উন্মত্ত খুনের পয়গাম' রচনা করে যাবে!

আজ আমার দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় রক্ত নয়, আগুন বইছে!

আজ আমার অস্তিমজ্জা 'রক্তকণিকা' নয়, 'অগ্নিস্ফূলিঙ্গ' তৈরি করছে!

আজ আমি লেলিহান অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলন করেছি, যা প্রতিশোধের দাবানল হয়ে সমস্ত বাতিল, তাবেদারদের শিবির জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিবে।

আজ আমি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবো না, কারো শক্তি কিংবা ক্ষমতার পরোয়া করবো না, কারো রক্ত-চক্ষুকে তোয়াক্কা করবো না! আজ আমি কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবো না! আমাকে যে যাই বলুক তাতে আমার কিছুই আসে যায় না!

আজ কেউ না আসুক, আমি একাই লড়ব! সারা দুনিয়ার ত্বগুতের বিরুদ্ধে আমি একাই জিহাদ করব!

আমি জানাজা চাই না, কাফন-দাফন চাইনা, আজ আমি শাহাদাত চাই! ইসলাম মিটে যাওয়ার আগে আমি নিজেই মিটে যেতে চাই!.....

কী হবে এ জীবন দিয়ে, কী হবে আর বেঁচে থেকে! আজ কোনো স্বৈরাচার কিংবা যালেম, কেউই আমাকে ফিরাতে পারবে না!

আল্লাহ, তার রাসূল ﷺ এবং "উম্মতে মুহাম্মাদী"র জন্য আমার জান কুরবান!

যেদিকে তাকাই সেদিকেই উম্মতের এ হালত দেখে, যেদিকেই কর্ণপাত করি, সেদিক হতেই উম্মতের আর্তনাদ শুনে, আজ আমি প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়েছি, তাই আজ সত্যকে 'সত্যরূপে' প্রকাশ করতে কোনো দ্বিধা-সঙ্কোচ করবো না, দয়াকরে আমাকে কেউ বাধা দিবেন না! আজ কেউই আমার গলা টিপে ধরবেন না!.........

যারা প্রকৃত অর্থে "আহলে হক", যাদের যিন্দেগী আমার রাসূলের ﷺ যিন্দেগীর সাথে মিলে, যাদের যিন্দেগী সাহাবাদের যিন্দেগীর মতো, উম্মতের সেই সকল গোরাবা (অপরিচিত) ভাইদের জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক!

আমি তাদের ক্রীতদাস, ইচ্ছা করলে তারা আমাকে গোলাম বানিয়ে রাখবে, নতুবা আযাদ করে দিবে। আমি তাদের জুতা বহন করে দিবো, তাদের জুতা সোজা করে দিবো। তাদের পায়ের জুতাকে আমার মাথার টুপি বানিয়ে রাখবো। তাদের জন্য আমার জীবন বিলিয়ে দিবো।.........

ব্যথার ঔষধ

আমার প্রিয় ভাই!

একথা অস্বীকার করার কি কোন উপায় আছে, আজ জিহাদ ত্যাগ করার কারণেই উম্মত নেতৃত্বহীন, অভিভাবকহীন হয়ে সব জায়গায় কুফ্ফারদের হাতে মার খাচ্ছে, তাদের যুলুম অত্যাচারের শিকার হচ্ছে।

আজ উম্মত কেন অলসতার যিন্দেগী যাপন করছে? আজ উম্মত কেন জিহাদ পরিত্যাগ করেছে?

যে উম্মত একসময় সারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে, যে উম্মত একসময় সমস্ত বিজাতীয়দের রাহ্বারী করেছে, সে উম্মতকে পিছনে ঠেলে কেন অন্যরা তার জায়গা দখল করে নিয়েছে?

একটু চিন্তা করুন, আর কোনো কারণ নেই। যেদিন হতে উম্মত জিহাদ ত্যাগ করে দুনিয়ায় মত্ত হয়েছে, সেদিন থেকেই উম্মতের ধ্বংস শুরু হয়েছে।

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا " . فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ " بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ " . فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ " حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ " .

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এমন এক সময় নিকটবর্তী, বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী তোমাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধে তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য) একে অপরকে এভাবে আহ্বান করবে, যেভাবে আহারকারী লোকেরা খাদ্যপাত্রের দিকে একে অপরকে ডাকাডাকি করে।" (এ কথা শুনে) কেউ জিজ্ঞাসা করল, সেদিন কি সংখ্যায় কম থাকার কারণে আমাদের এ অবস্থা হবে? তিনি ﷺ উত্তর দিলেন, "না; বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অনেক বেশি থাকবে, কিন্তু তোমরা বন্যায় ভেসে আসা আবর্জনার (/খড়কুটোর মতো প্রাণহীন ও ওজনহীন) হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় উঠিয়ে নিবেন, (এর বিপরীতে) তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহন' ঢেলে দিবেন।" কেউ জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, 'ওয়াহন' অর্থ কি? তিনি ﷺ উত্তরে বললেন,"দুনিয়াপ্রীতি এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।" (আবু দাউদ-৪২৯৭, বায়হাকী)

জেনে রাখুন! দুনিয়ার মহব্বত আর মৃত্যুর ভয়- এ দুটোর অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে "জিহাদ বিমুখতা", জিহাদ পরিত্যাগ করা।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا۟ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝٧٧ أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ

".....অতঃপর যখন তাদের প্রতি ক্বিতাল (যুদ্ধ)-কে ফরয করা হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। এমনকি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় আমাদের পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর যুদ্ধকে ফরয করলে! আমাদেরকে কেন আরোও কিছুকাল অবকাশ দিলে না (দুনিয়া ভোগ করার জন্য)! (হে রাসূল!), আপনি তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমাণও খর্ব করা হবে না। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই- যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভিতরেও অবস্থান কর, তবুও।......" (০৪ সূরা নিসা:৭৭-৭৮)

عَنْ اِبْنِ عُمَر قَالَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْل، اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتىّٰ تَرْجِعُوْا اِلىٰ دِيْنِكُمْ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, "যখন তোমরা 'ঈনাহ' পদ্ধতিতে (এক ধরনের সুদ ভিত্তিক ব্যবসা) ক্রয় বিক্রয় এবং ব্যবসা বাণিজ্যে পুরাপুরি মশগুল হয়ে যাবে এবং গরুর লেজ ধরে খেত খামারে মগ্ন হয়ে যাবে আর জিহাদ করা ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দিবেন, যা ততক্ষণ পর্যন্ত দূর হবে না যতক্ষণ না তোমরা আপন দ্বীনের (জিহাদের) দিকে ফিরে আসবে।" (আবু দাউদ ৩৪৬২, বায়হাকী ১০৪৮৪, জামেউল আহাদীস ১৬০৩, কানযুল উম্মাল ১০৫০৩, বুলুগুল মারাম ৮৪১)

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدّيْقِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْل، مَا تَرَكَ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اِلَّا ضَرَبَهُمْ اللهُ بِذِلٍّ وَلَا أَقَرَّ قَوْمٌ الْمُنْكَرَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ اِلَّا عَمَّهُم اللهُ بِعِقَابٍ

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন যে, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি ﷺ বলেছেন, যদি কোন জাতি জিহাদ ছেড়ে দেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সবার উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন। আর যদি কোন জাতি তাদের মধ্যে কোন অন্যায়কে আশ্রয় দেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করেন।" (জামে'আ আহাদীস ২৭০৩৫, মুজামুল আওসাত ৩৮৩৯, কানযুল উম্মাল ৮৪৪৭)

حَدَّثَنَا عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ ".

উরওয়াহ বারিকী (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশ গুচ্ছে কল্যাণ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত। অর্থাৎ (আখিরাতের) পুরষ্কার এবং গনীমতের মাল। (বুখারী, হাদিস নং ২৮৫২)

প্রিয় ভাই!

জিহাদ! জিহাদ!! জিহাদ!!!

একমাত্র যুদ্ধ-ই মুসলিম উম্মাহর হারানো ইজ্জত ও সম্মান ফিরিয়ে দিতে পারে। তাই, বর্তমান বিশ্বব্যাপী কুফ্ফারদের আগ্রাসন হতে মুসলিম উম্মাহর বাঁচার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে 'জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ' তথা আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করা।

"যখন তোমরা জিহাদ করা ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দিবেন, যা ততক্ষণ পর্যন্ত দূর হবে না যতক্ষণ না তোমরা আপন দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে।" উপর্যুক্ত হাদীসটিতে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে-

১. আল্লাহর রাসূল ﷺ জিহাদকে দ্বীনের সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এ থেকেই জিহাদের গুরুত্ব বুঝে আসে। দ্বীনের অস্তিত্ব জিহাদের সাথে কিভাবে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, তাও এ হাদীস থেকে বুঝা যায়।
২. বর্তমান যামানার উম্মতের উপর এই যে অপমান-অপদস্থি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই এসেছে, তিনিই চাপিয়ে দিয়েছেন।
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ

"হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে (দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে) সাহায্য কর, আল্লাহ তা'আলাও তোমাদেরকে (সকল বিষয়ে) সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন।" (৪৭ সূরা মুহাম্মাদ: ৭)

এটি আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওয়াদার খেলাফ করেন না। আল্লাহ তা'আলা যদি চাইতেন ফিলিস্তিন মুসলমানদের দখলে থাকুক আর ইহুদীরা চাইতো তারা দখল করে নিবে, তা কখনোই সম্ভব হতো না, আল্লাহ তা'আলাই ফিলিস্তিনের মুসলমানদের উপর ইহুদীবাদের অভিশাপ চাপিয়ে দিয়েছেন। কেন? কারণ উম্মত জিহাদ ছেড়ে দিয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী কিংবা অন্যান্য দুনিয়াবী বা দ্বীনী খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছে। মায়ানমারের মুসলমানদের উপর আল্লাহ তা'আলাই বৌদ্ধদের চাপিয়ে দিয়েছেন। কারণ কী? কারণ একটাই। আল্লাহ তা'আলা সিরিয়ার মুসলমানদের উপর নানা জাতির কুফ্ফারদের চাপিয়ে দিয়েছেন, কারণ কী? কারণ একটাই? জিহাদ ছেড়ে দেয়া।

৩. বর্তমান এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ কেবল দুআ কিংবা দ্বীনি অন্য কোনো মেহনত দিয়ে হবে না, জিহাদে ফিরে আসতে হবে। উম্মত যতক্ষণ পর্যন্ত না আমভাবে জিহাদের জন্য তৈয়ার হবে আল্লাহ তা'আলাই একের পর এক জাতিকে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিতে থাকবেন।

প্রিয় ভাই! আমরা কেন জিহাদ করছি না? আমরা কেন জিহাদ করার কথা চিন্তাও করছি না? অথচ তা ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে? আমরা কার অপেক্ষা করছি? আমরা কিসের ভয় করছি?

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ
ٱلطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓاْ أَوۡلِيَآءَ ٱلشَّيۡطَٰنِۖ إِنَّ كَيۡدَ ٱلشَّيۡطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦

"যারা ঈমানদার তারা জিহাদ করে আল্লাহ্‌র রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত নিতান্তই দুর্বল।" (সূরা নিসা ৪:৭৬)

আল্লাহ তা'আলা আরেক স্থানে ইরশাদ করেন,

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي

"সুতরাং তোমরা তাদেরকে (অর্থাৎ বাতিল, তাগুত, সারা দুনিয়ার কুফুরী শক্তিকে) ভয় করো না। ভয় কর আমাকেই।" (সূরা বাকারা ২:১৫০)

أَتَخْشَوْنَهُمْ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝١٣

"তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও।" (সূরা তাওবা ৯:১৩)

প্রিয় ভাই আমার! আপনিই বলুন-

ইসরাঈল বেশি শক্তিশালী, নাকি আল্লাহ তা'আলা?

আমেরিকা বেশি শক্তিশালী, নাকি আল্লাহ তা'আলা?

ইংল্যান্ড বেশি শক্তিশালী, নাকি আল্লাহ তা'আলা?

রাশিয়া বেশি শক্তিশালী, নাকি আল্লাহ তা'আলা?

ভারত বেশি শক্তিশালী, নাকি আল্লাহ তা'আলা?

চীন বেশি শক্তিশালী, নাকি আল্লাহ তা'আলা?

মায়ানমার বেশি শক্তিশালী, নাকি আল্লাহ তা'আলা?

ইরান বেশি শক্তিশালী, নাকি আল্লাহ তা'আলা?

ফ্রান্স বেশি শক্তিশালী, নাকি আল্লাহ তা'আলা? ....

এভাবে, সারা দুনিয়ার যেখানেই বাতিল ও তাগুত আছে, তাদের সম্মিলিত শক্তি, এক আল্লাহ তা'আলার সামনে কি ক্ষমতা রাখে?

তাদের সমস্ত সৈন্য, অস্ত্র, গোলা-বারুদ, কামান-ট্যাংক, মিসাইল আর পারমানবিক বোমা, এগুলো আল্লাহ তা'আলার এক হুকুমের সামনে কি শক্তি রাখে?

আহ্! আমাদের এই অনুভূতি আজ গেল কোথায়? এই ঈমান গেল কোথায়? কেন আজ আমরা এমন কাপুরুষতার মহা বিমারে ভুগছি?

আমাদের রব্বে কারীম, আমাদের মাওলা (বন্ধু) মহান আল্লাহ সুব্হানাহূ ওয়া তা'আলা কি সকলের উপর শক্তিশালী নন?

তিনিই কি হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামের জাতিকে এক মহা প্রলয়ঙ্করী বন্যায় নিমজ্জিত করে ধ্বংস করেননি? আকাশ কি আল্লাহর হুকুম পালন করেনি, যমীন কি তাঁর হুকুম পালনে কোনো ত্রুটি করেছে? নূহ আলাইহিস্ সালামকে উপহাস কারীরা এখন কোথায়? দুরাত্মা কাফেররা কি নিপাত যায় নি?

হযরত হূদ আলাইহিস্ সালামের জাতি 'আদ' কুফুরী ও শিরকে লিপ্ত ছিল। তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক ভয়াবহ ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা, যা তাদের উপর প্রবাহিত করা হয়েছিল সাত রাত্রি ও আট দিবস অবিরাম, কতিপয় অশুভ দিনে। তাদেরকে দুনিয়ার জীবনেই লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির স্বাদ উপভোগ করানো হয়েছিল, আর আখিরাতের আযাবতো আরো অপমানজনক। তারা কি বলতো না, "পৃথিবীতে আমাদের চেয়ে শক্তিধর আর কে?" কিন্তু তাদের পরিণতি কী হয়েছিল? তুমি যদি তাদেরকে দেখতে পারতে, তাহলে দেখতে, তারা অসার খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে। তাদের কোনো অস্তিত্ব দেখতে পাও কি?

হযরত সালেহ আলাইহিস্ সালামের জাতি 'সামুদ' আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করেছিল। তারা কি এই যামানার হিন্দুদের মতো মূর্তি পূজারী ছিল না? হযরত শোয়ায়েব আলাইহিস্ সালামের জাতি মাদায়েনবাসী। তারা পরিমাপে ও ওজনে কম দিত আর পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াত। আল্লাহ তা'আলা কি তাদের উভয়কে ভয়ংকর মহানাদ দ্বারা পাকড়াও করেননি? ফলে ভোর হতে না হতেই তারা নিজ নিজ গৃহসমূহে

উপুড় হয়ে পড়ে রইল, যেন তারা কোনদিনই সেখানে ছিল না! আখিরাতের আযাব কি আরো কঠিন নয়? তাহলে বর্তমান যামানার মালউনদেরকেও কি শায়েস্তা করা হবে না?

হযরত লূত আলাইহিস্ সালামের জাতি সমকামিতায় লিপ্ত ছিল। তাদেরকে কি নির্মমভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়নি? তাদের জনপদকে শূন্যে উত্তোলন করে উপরকে কি নীচে করে দেয়া হয়নি? তার উপর কি স্তরে স্তরে কাঁকর পাথর বর্ষণ করা হয়নি? এগুলো কে করেছেন, আল্লাহ তা'আলাই কি করেননি? বর্তমান যামানার সমকামি পশ্চিমাদের পরিণতি কি তাদের বাপ-দাদাদের চেয়ে বেশি সুখকর হবে?

নিজেকে "সর্বোচ্চ খোদা" দাবীদার ফিরাউন ও তার অহংকারী জাতি আজ কোথায়? সে তো ছিল দুষ্কৃতিকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়? বহু কীলকের অধিকারী, উঁচু উঁচু প্রাসাদের অধিকারী। সারা দুনিয়ার যুলুম অত্যাচারীদের আদর্শ। ফিরাউন এবং তার জাতিকে আল্লাহ তা'আলা কি নীলনদের পানিতে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করে দেননি? বর্তমান যামানার নব্য ফিরাউনরা কি তাহলে আল্লাহ্ থেকে রেহাই পেয়ে যাবে?

আল্লাহ তা'আলা কি বনি-ইসরাঈল জাতিকে দুর্ভিক্ষের আযাব দেননি? তাদেরকে তুফান দিয়ে শাস্তি কে দিয়েছিলেন? তাদের খেত–খামার আর শস্যগুলোকে ধ্বংস করার জন্য পঙ্গপাল কে পাঠিয়েছিলেন? তাদের মাথার চুল থেকে শুরু করে চোখের ভ্রূ পর্যন্ত খেয়ে ফেলার জন্য উকুন কে পাঠিয়েছিলেন? বিছানায়, খাবারের প্লেটে, ঘরে-বাহিরে, মাঠে-ঘাটে সর্বত্র ব্যাঙের আযাব কে দিয়েছিলেন? তাদের সকল খাদ্য ও পানীয়কে কে রক্তে পরিণত করেছিলেন? 'প্লেগ' নামক মহামারী দিয়ে তাদেরকে আযাব কে দিয়েছিলেন? তিনি কি আল্লাহ তা'আলা নন? বর্তমান যামানার ইহুদীরা কি তাহলে পার পেয়ে যাবে?

আল্লাহ তা'আলা কি নমরূদকে একটি খোঁড়া মশা দ্বারাই ধ্বংস করে দেননি?

কা'বা ঘর ধ্বংস করতে আগত আবরাহার হস্তী বাহিনীকে ছোট্ট পাখি দ্বারা কে ধ্বংস করেছিলেন? তিনি কি মহাশক্তিধর, প্রতিশোধগ্রহণকারী মহান আল্লাহ তা'আলা নন?

আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলার বাহিনী কত বিশাল, তা কি কেউ কোনোদিন কল্পনা করতে পারবে?

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَۚ

"আপনার রবের বাহিনী (কত বিশাল সে) সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।" (৭৪ সূরা মুদ্দাছ্ছির: ৩১)

ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখুন!

وَكَمۡ اَہۡلَکۡنَا قَبۡلَہُمۡ مِّنۡ قَرۡنٍ ؕ ہَلۡ تُحِسُّ مِنۡہُمۡ مِّنۡ اَحَدٍ اَوۡ تَسۡمَعُ لَہُمۡ رِکۡزًا

"আর তাদের আগে আমি বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি! তুমি কি তাদের কারো অস্তিত্ব অনুভব কর অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও কি? (সূরা মারইয়াম ১৯:৭৮)

আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা যদি আমাদের সাহায্য করেন, তাহলে সারা দুনিয়ার ক্রুসেডার ও মুশরিক শক্তি কি আমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে?

إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

"যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত (বিজয়ী) হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহর উপরই মুসলমানদের ভরসা করা উচিত।"(০৩ সূরা আল-ইমরান: ১৬০)

ভাই আমার!

তাহলে আমরা কাকে ভয় করছি? দুনিয়ার সকল কুফ্ফার শক্তি একত্রিত হয়ে একটি মাছির ডানাও তো সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়? অথচ আল্লাহ তা'আলাই কি এদের সকলের সৃষ্টিকর্তা নন? আল্লাহ্ পাক চাইলে এক হুকুমের দ্বারাই তিনি দুনিয়ার সকল বাতিল শক্তিকে শেষ করে দিতে পারেন! কিন্তু তিনি পরীক্ষা নিতে চান, কে বিশ্বাসী আর কে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে, কে জিহাদ করে, আর কে সবরকারী? আর আমাদের কতককে তিনি শহীদ হিসেবে কবুল করতে চান।

ওহে দুনিয়ার মুসলমান! জেগে ওঠো!!!

তোমরা কি পার না 'লিল্লাহি তাকবীর'- "আল্লাহু আকবার" বলে আবারো ময়দান কাঁপাতে?

তোমরা কি পার না তাকবীরে তাকবীরে বাতিলের একেক মসনদ গুড়িয়ে দিতে?

আল্লাহ তা'আলার মহাপবিত্র নামের মাঝে যে অসীম শক্তি আছে, সে শক্তিতে কুফ্ফার গোষ্ঠিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে?

এখনও সময় আছে। বিজয় আমাদেরই পদচুম্বন করবে, ইনশাআল্লাহ্।

"হয়তো শরীয়ত, নয়তো শাহাদত"- এই প্রতীজ্ঞা নিয়ে এখনি ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথেই আছেন। তিনিই আমাদের রব। তিনিই আমাদের মাওলা, তিনিই আমাদের বন্ধু ও অভিভাবক।

نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

কত উত্তম মাওলা তিনি, কতই না উত্তম সাহায্যকারী! (সূরা আনফাল ৮:৪০)

মনে রেখ- যে মুমিন জিহাদের পতাকা উত্তোলন করবে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় সে দুনিয়ার তাবৎ কুফুরি শক্তির জন্য এক মহা আযাব এবং ভয়াবহ যমদূত হিসেবে আবির্ভূত হবে, সন্দেহ নেই।

যে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে, যে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, যে তার দাবীতে সত্যবাদী আর যে আল্লাহর পরিচয় যথার্থরূপে পেয়েছে, তার কাছে বাতিলের সমস্ত সামরিক ও আণবিক শক্তি মশা বা মাছির ডানার মতো মনে হবে।

যে মুমিন জিহাদকে বুঝবে না, যে মুমিন জিহাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে না, যে মুমিন আল্লাহর মান্সাকে না বুঝে নিজের খেয়াল-খুশি মত ইসলাম পালন করবে, ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকবে, এমন মুসলমান দ্বারা যদি আসমান যমীন ভরেও যায়, তবুও তাগুতের মসনদ এতটুকুও নড়বে-চড়বে না, একটুও কাঁপবে না।

অন্যদিকে, পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে যদি এমন একজন মুসলমানও পাওয়া যায় যে হকের উপর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, তার জন্য সারা দুনিয়ার তাগুতী শক্তির ঘুম হারাম হয়ে যাবে, তাকে পাওয়ার জন্য, তাকে খুঁজে বের করার জন্য বা তাকে হত্যা করার জন্য অন্য হাজারো মুমিনকে বন্দী করবে, আরো লাখো মুসলিমের রক্ত ঝরাবে।

ওহে মুসলিম উম্মাহ্!

তোমাদের চিন্তার কোনোই কারণ নেই। তোমরা জিহাদকে বুঝো, জিহাদের জন্য নিজের মেধা, অর্থ, শ্রম ও সময় ব্যয় করো আর আল্লাহর রাহে যুদ্ধের পতাকা উত্তোলন করো।

আল্লাহ তা'আলার সাহায্য অতি নিকটবর্তী। আল্লাহ তা'আলা আবারো আমাদের হাতে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও খিলাফত তুলে দিবেন। অপমান ও লাঞ্ছনার যিন্দেগী হতে তিনি আমাদেরকে মুক্ত করবেন। কুফ্ফারদেরকে আমাদের কদমদাস বানাবেন। তাদের কন্যাদেরকে আমাদের হাতে দাসী-বাদীরূপে তুলে দিবেন। আমাদের হাতে সারা দুনিয়ার বাতিলকে মিটিয়ে দিবেন।

তাই দ্রুত কদম দাও। আগে বাড়।

ইমাম আল-মাহদীর বাহিনী, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম এর বাহিনী; কালো পতাকার বাহিনীতে শরীক হয়ে যাও, যদিও বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়। আখেরাতের মহা বাণিজ্যে লাভের আশায় দুনিয়ার তুচ্ছ বাণিজ্যকে ত্যাগ করে সফলতার পরিচয় দিয়ো।

লক্ষ্য রেখো, মায়ের কোমল মমতা, জীবন সঙ্গিনীর সিক্ত অশ্রু, অথবা নয়নের মণির চেহারাটুকু যেন আমার এবং আমার জন্য আত্মোৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসার পথে কোনরূপ বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

শহরের বড় বড় প্রাসাদ আর চাকচিক্যপূর্ণ বিলাশ বহুল ভবনগুলো তোমাদেরকে পাহাড়ের অন্ধকার গর্তে আশ্রয় গ্রহণের পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। ইট আর মাটি দিয়ে বানানো ঘরগুলোকে বাঁচানোর লক্ষ্যে আখেরাতের চিরস্থায়ী প্রাসাদগুলোকে নষ্ট করে দিয়ো না।

কারাগারের কালো কুঠুরিগুলোতে আবদ্ধ হওয়ার ভয়ে দাজ্জালি শক্তিগুলোর সামনে মাথা নত করো না। মনে রেখো, কবরের চেয়ে কালো কুঠুরি আর ভয়ানক কারাগার কিন্তু দ্বিতীয়টি নেই।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকাঙ্ক্ষা, যা হওয়ার হোক কোনো কিছুকেই পরোয়া করবে না, বরং অবশ্যই ইমাম মাহদীর সেনাদলে এসে শরীক হয়ে যেয়ো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমীন।

কিতাবুত তাহরীদ: প্রথম পর্ব প্রকাশিত হওয়ার পর **"দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্ ফোরাম"** এর মুহতারাম মুজাহিদ ভাইদের রিভিউ: নির্বাচিত কিছু স্ক্রীনশট্ (পোস্ট লিংক: https://bit.ly/tahrid1)

07-20-2022, 12:42 PM

জাযাকাল্লাহ। আল্লাহ আপনার খিদমাতকে কবুল করুন। আমাদের সবাইকে জিহাদের জন্য খাঁটি উৎসর্গপ্রাণ বানিয়ে দিন। দ্বীনের হক অনুযায়ী নিজেদেরকে পেশ করার তাওফিক দান করুন। আসলে তাজকিয়া, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, দাওয়াহ, ইদাদ, জিহাদ ইত্যাদি মুখে বলা অনেক সহজ। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহর চাওয়া অনুযায়ী এগুলো আমলে ধারণকারী লোকের সংখ্যা কতই না কম! আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে আহলে দিল বান্দা বানিয়ে দেন, তাঁর সাথে সততা দান করেন। আমীন।

07-26-2022, 09:53 PM

ওয়াও । অসাধারণ একটি পোস্ট।

07-27-2022, 11:29 PM

অন্তর কে নাড়া দিলো, চিন্তার জগতে নতুন স্রোতের উত্থান ঘটালো।

আল্লাহর কসম, এটি দাওয়াতের জগতে নতুন বিপ্লব ঘটাবে, ইং শা আল্লাহ

07-27-2022, 11:36 PM

আল্লাহ মুসআব ইলদিরিম ভাই এর ইলম ও কলমের জোরকে আরও বাড়িয়ে দিক আর সৃষ্টি করুক নতুন বিপ্লব।

08-01-2022, 01:15 AM

মাশাল্লাহ। খুব ভালো লাগছে বইটার পিডিএফ পড়ে। অনেক অনুপ্রেরণা পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। বাকি পর্বের পিডিএফ এর অপেক্ষায় আছি।
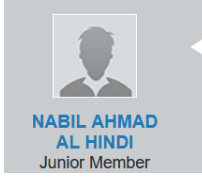
09-07-2022, 10:58 AM

মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহ
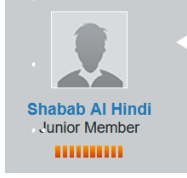
09-11-2022, 09:00 PM #25

মা শা আল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান। অনেক ভালো লাগল কিতাবটি পড়ে। অনেক ঈমানী খোরাক পেলাম। আলহামদুলিল্লাহ, কিতাবের কথাগুলো অন্তরকে নাড়া দিয়ে গেল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মুসআব ইলদিরিম ভাইকে কবুল করুন। কিতাবুত তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল কিতাবটি 'দাওয়াহ ইলাল জিহাদের' ময়দানে এক তুমুল বিপ্লব তৈরি করুক এবং এই কিতাবের উসীলায় উম্মাহর প্রতিটি যুবকের মাঝে জিহাদী জযবার ঝড় সৃষ্টি হোক- রব্বে পাকের দরবারে এই দোয়াই করি।
অবশেষে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে 'হক জিহাদ' করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রব্বাল 'আলামীন।
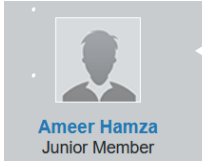
09-19-2022, 05:57 AM

মা শা আল্লাহ। হৃদয়কে নাড়া দেয়ার মত একটি কিতাব। খুব ভালো লাগল কিতাবটি পড়ে। আলহামদুলিল্লাহ।
আল্লাহ পাক আপনাদের খেদমতকে কবুল ও মঞ্জুর করুন। আমীন।
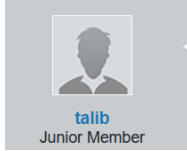
09-19-2022, 11:03 AM

এটা বাস্তবেই তাহরীদ !
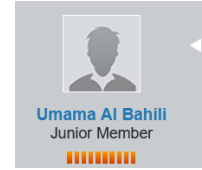
09-30-2022, 11:25 PM #29

মাশাআল্লাহ। অন্তরে ঘুর্ণঝড় সৃষ্টির মত একটি কিতাব।
সুবহানাল্লাহ। জিহাদের প্রতি তাহরীদের জন্য এমন একটি কিতাব যথেষ্ট দরকার ছিল।
বারাকাল্লাহ। আল্লাহ পাক মুস'আব ইলদিরিম ভাইকে কবুল করুন। কলমের ধার আরো বাড়িয়ে দিন। এই কিতাবটি দাওয়াহ ইলাল জিহাদের ময়দানে সত্যিই যেন বিপ্লব সৃষ্টি করে এই দুয়া করি। আল্লাহ পাক কবুল করুন । আমীন।
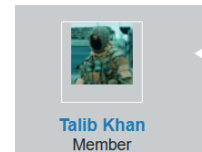
10-09-2022, 07:29 PM

মাশাআল্লাহ ! অত্যন্ত চমৎকার বর্ণনা ! আল্লাহ কবুল করেন ! আমীন !
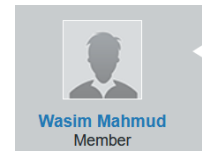
11-13-2022, 06:46 AM

সুবহানাল্লাহ, খুব ভালো পদক্ষেপ, মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি বিলাবে ইনশা-আল্লাহ।

farhad
Junior Member
Join Date: Nov 2022
Posts: 28

11-14-2022, 05:07 AM #35

হে আল্লাহ আপনি আমাদের কলবকে সর্বদায় জিহাদের দিকে ধাবিত করুন এবং মুসআব ইলদিরিম ভাই এর ইলম ও কলমের জোরকে আরও বাড়িয়ে দিন আর সৃষ্টি করুক নতুন বিপ্লব।

আল্লাহুম্মা আমীন। ছুম্মা আমীন।

farhad
Junior Member

11-14-2022, 06:47 PM #36

আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দ্বীনি ভাই, পোস্টটা পড়ে আমি বুঝতে পারলাম, এই পিডিএফ গুলো বই আকারে ছাপিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। আমি আমার নিজস্ব জিহাদ ফান্ড এর টাকা দিয়ে ৬ খন্ডের Pdf গুলো বই আকারে ছাপাতে চাচ্ছি। সকল খন্ডের pdf ফাইল পাইলে উপকৃত হইতাম। এবং বই ছাপানোর বিষয়ে আপনাদের পরামর্শ আশা করছি। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে জিহাদের ময়দানে কবুল করুন, আমীন।

nu'aim
Member

06-13-2023, 11:34 PM

মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর পোস্ট, আল্লাহ কবুল করুন

Sabbir Ahmed
Member

06-17-2023, 10:52 AM

আল্লাহ তায়ালা এই মেহনতকে কবুল করুন। আমাদেরকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ার তৌফিক দান করুন। আমিন

قَـٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

"যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দিবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।

(০৯ সূরা আত্-তাওবাহঃ ১৪)

কিতাবুত্ তাহ্রীদ ‘আলাল ক্বিতাল

পর্ব ২:

তাওহীদ ও জিহাদ

লেখকের কথা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

মুহতারাম ভাইয়েরা!

আলহামদুলিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ!!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আজ আপনাদের সামনে আমরা "কিতাবুত তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল" কিতাবটির "দ্বিতীয় পর্ব: তাওহীদ ও জিহাদ" নিয়ে হাজির হয়েছি। ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ!!!

প্রথম পর্বটি প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা আপনাদের নেক দুআ আর হৃদয়ের উষ্ণ ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আপনাদেরকে এবং আমাদেরকে কবুল করুন। আপনাদের যিন্দেগীতে ভরপুর বারাকাহ দান করুন। আমীন।

কিতাবুত তাহরীদ, দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে কিছু কথা:

কিতাবটি শুরু হয়েছে তাওহীদের আলোচনা দ্বারা। আমরা সবাই কম-বেশি তাওহীদের তত্ত্ব ও তাত্ত্বিকতার সাথে পরিচিত। কিন্তু বক্ষ্যমাণ কিতাবটিতে গতানুগতিক আলোচনার পন্থা পরিহার করে তাওহীদের গূঢ় তত্ত্বগুলোকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কিছুটা অভিনব, আবেদনময় ও সরস পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, যা অঙ্কিত হয়েছে কথাসাহিত্যের তুলিতে। আশাকরি, এ ধরণের উপস্থাপনা পাঠককে আকৃষ্ট করবে, তাওহীদ নিয়ে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করবে, কুফর ও শিরকের শিবিরের সাথে নিখুঁতভাবে পরিচয় করিয়ে দিবে, ইনশাআল্লাহ।

এরপর আসা যাক আলোচ্য কিতাবের জিহাদের আলোচনায়। জিহাদের মাসাইলগুলোর উপস্থাপনা রীতি, বর্তমান যামানায় উম্মাহর মধ্যে জিহাদ সম্পর্কে চিন্তাগত ভ্রান্তিসমূহের আলোচনা ও তার দূরীকরণ এবং জিহাদের গুরুত্ব উম্মাহর সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও একই রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। আশাকরি, ইনশাআল্লাহ, কিতাবটি পড়লে আপনাদের ভালো লাগবে এবং আপনারা তাওহীদ ও জিহাদের আলোচনার মধ্যে একটি ভিন্ন মাত্রা খোঁজে পাবেন। খুব শীঘ্রই বাকী পর্বগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ পাক আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন। কিতাবটিকে মুকাম্মাল ও মুফীদ বানিয়ে দিন। আমাদের নাযাতের উসীলা বানান। আমাদেরকে মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ এবং দা'ঈ ইলাল্লাহ হিসেবে কবুল করুন। এবং সর্বশেষে শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে "রফীকে আ'লা"র সাথে মিলিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন। ছুম্মা আমীন।

-মুস'আব ইলদিরিম

সূচিপত্র

একটি দুর্দান্ত উক্তি

মিসরের প্রসিদ্ধ আলেম, 'তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন'- এর লেখক সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (রহ.) যখন মিশরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র মর্মকথা তুলে ধরলেন, বিশেষ করে 'মাআ'লিম ফিত্ তরিক্ব' বা 'ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা' নামক বইটি লিখলেন তখন মিশরের যুবকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে। তারা আবার নতুন করে ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে মিশর সরকার তাকে গ্রেফতার করে। শেষ পর্যন্ত তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির রায় কার্যকর হওয়ার পূর্বে কোন এক সময় একজন আলেম তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। সাইয়্যেদ কুতুব (রহ.) তার আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ইমাম সাহেব বললেন, 'আপনার তো কিছুক্ষণ পরে ফাঁসি কার্যকর হবে। আর আমার দায়িত্ব হলো যে সকল মুসলিম বন্দিদের ফাঁসি দেওয়া হয় তাদেরকে তওবা করানো এবং কালেমাতুশ শাহাদাত পাঠ করানো।'

সাইয়্যেদ কুতুব (রহ.) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কালেমাতুশ শাহাদাত পাঠ করান? বলুনতো আপনার কালেমায়ে শাহাদাতটা কী? ইমাম সাহেব বললেন, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।'

সাইয়্যেদ কুতুব (রহ.) বললেন, "আশ্চর্য কথা! এই কালেমার কথা বলার জন্যই তো আমার ফাঁসি হচ্ছে। যেই কালেমার কথা বলার অপরাধে আমার ফাঁসি হচ্ছে, সেই একই কালেমা পড়ানোর বিনিময়ে সরকার তোমাকে পয়সা দিচ্ছে। যেই কালেমা বলার অপরাধে সরকার আমার জীবনাবসান করছে, ঐ একই সরকার তোমাকে ঐ কালেমা পড়াবার জন্য জীবিকা দিচ্ছে। বুঝা গেল তোমার কালেমা আর আমার কালেমা এক নয়। "

সুব্হানাল্লাহ!! কী দুর্দান্ত উক্তি! কী ভয়ংকর কথা!! আমার কালিমা তোমার কালিমা এক নয়!!!

প্রিয় ভাই! কখনো ভেবেছেন কি এভাবে?? আমার কালেমাটা আসলে কেমন? আমার কালেমার যে অর্থ আমি নিয়েছি, আমি কালেমাটাকে যেভাবে বুঝেছি, সেটা কি ঠিক আছে? সেটা কার সাথে মিলে? সেটা কি প্রিয় রাসূলের ﷺ কালেমার সাথে মিলে? সেটা কি হযরত আবু বকর, উমর, উসমান আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম আযমাইনদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? নাকি আমি মনগড়া একটি অর্থ দাঁড় করিয়েছি?

সাইয়্যেদ কুতুব (রহ.) তাঁর এই উক্তি "তোমার কালেমা আর আমার কালেমা এক নয়।"- এর দ্বারা আর কী বুঝে আসে চলুন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক, তাহলেই বুঝে আসবে ইনশাআল্লাহ- আমি আসলে কোন্ কালেমার অনুসারী!

"তোমার কালেমা আর আমার কালেমা এক নয়।"-কথাটির অর্থ আর কী কী হতে পারে?:

১. তোমার কালেমা তাগুতের পয়সা খাওয়ায়, আমার কালেমা তাগুতের ফাঁসিতে ঝুলায়। তাই তোমার কালেমা আর আমার কালেমা এক নয়।

২. তোমার কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তাগুতের সংবিধান 'সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ' এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আমার কালেমা শিখায় সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ, জনগণ নয়।

৩. তোমার কালেমা তাগুতের সংবিধানে লিখিত 'দেশের সংবিধান সর্বোচ্চ আইন; অন্যান্য আইনের যতখানি ঐ সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল ঐ আইনের ততখানি বাতিল' এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আমার কালেমা আমাকে শিখায় আল্লাহর কুরআনই সর্বোচ্চ আইন। মানবরচিত অন্যান্য যত আইন-বিচার রয়েছে তার যতখানি ঐ কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক ততখানি বাতিল।

৪. তোমার কালেমা তোমাকে কেবল আসমানের উপরের কথা আর যমীনের নিচের আলোচনা করতে শিখায়। যমিনের উপরে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা, ব্যাংকে, আদালতে, সংসদে, ব্যবসা বাণিজ্যে আল্লাহর বিধান কায়েম করতে শিখায় না। আমার কালেমা আমাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে দ্বীনকে বিজয়ী করতে শিখায়।

৫. তোমার কালেমা তোমাকে ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে 'রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্ম' পালন করতে শিখায়। আমার কালেমা আমাকে রাসূল ﷺ এর পদ্ধতিতে রাজনীতি করতে শিখায়। আমাকে আরও শিখায় 'ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি' যেমন একটি কুফুরী মতবাদ তেমনিভাবে 'রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্ম'ও একটি কুফুরী মতবাদ।

৬. তোমার কালেমা তোমাকে জিহাদ বিমুখ বানায়। আর আমার কালেমা আমাকে দাওয়াত, হিজরত, জিহাদ ও ক্বিতাল- সবই শিখায়।

৭. তোমার কালেমা তোমাকে কাফের-মুশরিক ও মুরতাদ-মুনাফিকদের থেকে আল-বারাআহ্ (সম্পর্ক ছিন্ন করা) করতে শিখায় না। আর আমার কালেমা আমাকে মুমিনদের সঙ্গে আল-ওয়ালা (বন্ধুত্ব) এবং আল্লাহদ্রোহী কাফের-মুশরিক, মুরতাদ-মুনাফিক ও সকল প্রকার তাগুত থেকে আল-বারাআহ্ করতে শিখায়।

৮. তোমার কালেমা মুমিন (মুজাহিদ)-দেরকে অপছন্দ করতে শিখায় আর কাফেরদের প্রতি কোমলহৃদয় বানায়। পক্ষান্তরে আমার কালেমা কুফ্ফারদের প্রতি কঠোর ও মুমিন/মুজাহিদদের প্রতি রহমদীল বানায়।

৯. তোমার কালেমার দাওয়াত প্রচার করতে ইয়াহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ কারো কোনো বাধা নেই। বরং তাদের দেশেও তোমার কালেমার প্রচার-প্রসারের জন্য আনন্দের সঙ্গে ভিসা দেয়। আর আমার কালেমার আওয়াজ শুনলেই তাদের শরীরে চুলকানি শুরু হয়ে যায়। তাদের দেশে যেতে দেয়া তো দূরে থাক, পারলে আমার দেশে এসে আমাকে হত্যা করে দিয়ে যায়।

১০. তোমার কালেমার সভা-সেমিনারে তাগুতেরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। তোমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে থাকে। তারা দল বেধে তোমার কাছে দুআ চাইতে আসে। আর আমার ক্ষেত্রে? তাগুতেরা সর্বশক্তি ব্যায় করে আমাকে খোঁজে পাওয়ার জন্য, আমাকে ধরা কিংবা শহীদ করার জন্যে।

১১. তোমার কালেমার কারণে বাতিল তোমাকে 'হুযুর হুযুর' করে, আর আমার কালেমার কারণে বাতিল আমাকে মৌলবাদী, সন্ত্রাসী ও জঙ্গী ট্যাগ লাগায়।

১২. তোমার কালেমার বদৌলতে তোমাকে হোয়াইট হাউসে দাওয়াত দিয়ে কোরমা-পোলাও খাওয়ানো হয়, আর আমার কালেমার কারণে হোয়াইট হাউস হতে আমার মাথার মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

১৩. তোমার কালেমা তোমাকে শাহবাগ চত্বরে নাস্তিকদের স্টেজে নিয়ে যায় আর আমার কালেমা শাপলা চত্বরে আমার বুকের রক্ত ঝরায়।

১৪. যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে নিয়ে কটুক্তি করা হয়, তখন তোমার কালেমা তোমাকে তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী বানায়। আর আমার কালেমা খোদার দুশমনদের জাহান্নামে পাঠাতে শিখায়।

১৫. তোমার কালেমা তোমাকে তথাকথিত শান্তি(?)প্রিয়, সুবিধাবাদী আর তাগুতের সুবিধাভোগী পা-চাটা গোলাম বানায়। অন্যদিকে আমার কালেমা তাগুত বিরোধী, তাগুত রাষ্ট্রে দেশদ্রোহী, মরণজয়ী মুজাহিদ বানায়।

অতএব, বুঝা গেল, তোমার কালেমা আর আমার কালেমা এক নয়। তোমার কালেমার অর্থ আল্লাহর রাসূলের ﷺ কালেমার সাথে মিলে না। মিলে আমারটার সাথে। কেননা এই কালেমার কথা বলার কারণেই তাঁর উপর ধেয়ে এল সব বিপদ-আপদ আর ঝড়-ঝাপটা। এই কালেমার কথা বলার জন্য কতই না কষ্ট সহ্য করেছেন তিনি। বরং তাঁকে যত কষ্ট দেয়া হয়েছে, তত কষ্ট অন্য কোনো নবী রাসূলকেও দেয়া হয়নি।

তুমি কি দেখনি, মক্কার কুরাইশরা তাঁকে গালমন্দ করেছে, অপবাদ দিয়েছে, রক্তাক্ত করেছে, তাঁর উপর উটের ভুঁড়ি নিক্ষেপ করেছে?

তায়েফে কি দেখনি, তাঁকে কিভাবে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে প্রস্তারাঘাতে? তাঁর দু'পা রক্তাক্ত হয়ে তাঁর জুতো রক্তে পূর্ণ হয়ে গেল।

তুমি কি দেখনি, পাথরের আঘাতে তিনি কিভাবে পড়ে যাচ্ছিলেন, আর দুর্বৃত্তরা তাকে উঠিয়ে পুনরায় পাথর নিক্ষেপ করছিল, তবুও তিনি বলে যাচ্ছিলেন "প্রভু হে! ক্ষমা করো আমার জাতিকে, ওরা যে বুঝে না"?

আর ওহুদের যুদ্ধে? আহ! কুফ্ফারদের আঘাতে তাঁর ডান দিকের নীচের দাঁত মোবারক ভেঙ্গে যায়, নীচের ঠোঁট আহত হয়। কপালে জখম হয়। তাঁর শিরস্ত্রাণের দুটো অংশ ভেঙ্গে তাঁর চোয়ালের ভেতরে ঢুকে যায়। অতঃপর মুসলমানদেরকে তাদের অজান্তে ফেলে মারার জন্য কুফ্ফাররা যে গর্ত খুড়ে রেখেছিল, তার একটিতে পড়ে যান তিনি। দ্বীনের এই কালিমার প্রচারের জন্য তাঁর মতো কষ্ট ও ত্যাগ কে স্বীকার করেছে?

তুমি কি তাঁর সীরাত পাঠ করনি? এই কালেমার জন্যই তিনি প্রত্যক্ষভাবে ২৭ টি যুদ্ধ (গাযওয়া) করেছেন, আর পরোক্ষভাবে ৪৬ টি সারিয়্যা (অভিযান) পরিচালনা করেছেন।

সুতরাং, সব কথার শেষ কথা-"ওহে ভাই! তোমার কালেমা আর আমার কালেমা এক নয়। তোমার কালেমা আর রাসূলের কালেমাও এক নয়। বরং রাসূলের কালেমা ও আমার কালিমা এক ও অভিন্ন। রাসূলের মানহাজই আমার মানহাজ। তাই ভাই, দুনিয়া ও আখিরাতে প্রকৃত সফলতা ও মুক্তি পেতে রাসূলের কালিমাকে রাসূলের মতো করে বুঝার চেষ্টা করো, সেই কালেমাকে নিজের মাঝে ধারণ করো, কালিমার সেই খুনরাঙা পথে চলা শুরু করো, সেই কালিমা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করো, সেই কালেমার জন্যই নিজের জান-মাল-সময় সব কুরবানী করার চেষ্টা করো।"

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমার কালেমার অর্থ

তাহলে, ভাই! আপনি কি জানতে চান আমার কালেমার অর্থটা কী? তাহলে জেনে নিন-

তাওহীদের কালেমা চারটি অংশে বিভক্ত, যথা:

কালেমার প্রথম অংশ: 'লা ইলাহা'

কালেমার দ্বিতীয় অংশ: 'ইল্লাল্লাহু'

কালেমার তৃতীয় অংশ: 'মুহাম্মাদ'

কালেমার চতুর্থ অংশ: 'রাসূলুল্লাহ'

- ### কালেমার প্রথম অংশ: 'লা ইলাহা'র অর্থ:

আমার কালেমা আমাকে শিখায়- আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান আনার আগে প্রথমে আল্লাহ্ ব্যতীত সকল মা'বুদ/উপাস্য তথা ইলাহগুলোকে পরিত্যাগ করতে হবে। শরীয়তের ভাষায় এই ইলাহদেরকে 'তাগুত' বলে। [সূরা বাকারা ২:২৫৬-২৫৭; সূরা নিসা ৪:৫১,৬০,৭৬; সূরা মায়েদা ৫:৬০; সূরা নাহল ১৬:৩৬; সূরা যুমার ৩৯:১৭]

"তাগুতের" আরেকটি সংজ্ঞা হল- যাদের কারণে বান্দা ইবাদত, আনুগত্য, অনুসরণ কিংবা ভালোবাসার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে তাদেরকে 'তাগুত' বলা হয়। আল্লাহর উপর ঈমান আনার (ঈমান বিল্লাহ অর্থাৎ 'ইল্লাল্লাহ'র ঘোষণা দেয়ার) জন্য সর্বপ্রথম কাজ হল কুফর বিত্-তাগুত ('লা ইলাহা'র ঘোষণা দেয়া অর্থাৎ তাগুতকে অস্বীকার/পরিহার করা)।

এখন প্রশ্ন হল, কারা এই তাগুত??

আল্লাহ ব্যতীত যত কিছুর ইবাদত করা হয়, তার সবই তাগুত বলে আমরা বিশ্বাস করি। তাগুত বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন:

১. শয়তান [সূরা নিসা ৪:১১৯; সূরা ফাতির ৩৫:৬; সূরা ইউসূফ ১২:৫২; সূরা বাকারা ২:১৬৮-১৬৯]

২. আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নকারী সম্প্রদায় (যেমন: তাগুত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, এমপি, মন্ত্রী, ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিবৃন্দ) [সূরা মায়েদা ৫:৫০; সূরা নিসা ৪:৬০]

৩. আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পাদনকারী সম্প্রদায় (যেমন: তাগুত রাষ্ট্রের জজ, ব্যরিস্টার, উকিল ইত্যাদি) [সূরা মায়েদা ৫:৪৪; সূরা নিসা ৪:৬৫]

৪. ইসলামের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগকারী সম্প্রদায় (যেমন: তাগুত রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী- সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কারারক্ষী ইত্যাদি) [সূরা নিসা ৪:৭৬]

৫. গায়েবের ইলম দাবীকারী।

৬. আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয় এবং সে ঐ ইবাদতে সন্তুষ্ট থাকে। ইত্যাদি।

প্রিয় ভাই! এ সবই তাগুত, এদেরকে অস্বীকার ও পরিত্যাগ (কুফর বিত-তাগুত) না করে আল্লাহর উপর ঈমান (ঈমান বিল্লাহ), ঈমান হিসেবে সাব্যস্ত হয় না এবং তা দ্বারা মুসলমান হওয়া যায় না।

আর যারা তাগুতের সহযোগী হবে, কুরআনের ভাষায় এরা হল "আউলিয়াআশ্ শাইত্বন" বা শয়তানের ওলী-আউলিয়া তথা শয়তানের বন্ধু বা চ্যালা-প্যালা।

আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ-

فَقَٰتِلُوٓاْ أَوۡلِيَآءَ ٱلشَّيۡطَٰنِۖ إِنَّ كَيۡدَ ٱلشَّيۡطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا

"অতএব, তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, (দেখবে,) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।" (৪ সূরা নিসা: ৭৬)

শয়তানকে মানুষ ইলাহ বানিয়ে পূঁজা করে এটা তো স্পষ্ট। প্রশ্ন হলো-উপরে বর্ণিত বাকী তাগুতগুলো কিভাবে 'ইলাহ' হয়??? এদেরকে কেন বর্জন করতে হবে?

عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت إنا لسنا نعبدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتستحلون قلت بلى قال فتلك عبادتهم.

আদী ইবনে হাতেম রাযি. (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি খ্রিস্টান ছিলেন) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। তখন আমার গলায় একটি ক্রুশ ঝুলছিল। তিনি বললেন, হে আদী! এই মূর্তিটি তোমার গলা থেকে ছুঁড়ে ফেল। আমি তা ছুঁড়ে ফেললাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে গেলাম। দেখলাম, তিনি সূরা বারাআ'র (সূরা তাওবা) এই আয়াত তিলাওয়াত করছেন:

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে'। (সূরা তাওবাহ ০৯:৩১)

আমি আরজ করলাম, আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা যা হালাল করেছেন, তারা তা হারাম করতো আর তোমরাও তা হারাম মানতে এবং আল্লাহ তা'আলা যা হারাম করেছেন, তারা তা হালাল করতো আর তোমরাও তাকে হালাল মেনে নিতে। আমি উত্তর দিলাম- হ্যাঁ, এমনটি তো হয়েছে। তিনি বললেন, এটিইতো তাদেরকে ইবাদত করা। (আত্ তারিখুল কাবির লিল ইমামিল বুখারি: ৭ম খণ্ড, ৪৭১ নং হাদীস, সুনানুত্ তিরমিজি: ৫০৯৩)

প্রিয় ভাই!

যারা আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় বিধান রচনা করে, আল্লাহ্ তা'আলার কৃত হালালকে হারাম করে আর হারামকৃতকে হালাল করে, এরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকে 'বিধানদাতা'র (আল্ হাকীম) আসনে নিজেকে সমাসীন করলো, যা আল্লাহ্ তাআলার একটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য, যা কেবল আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের জন্যই খাস। তাই এরা নিজেরা মুশরিক এবং এদেরকে যারা মেনে নিবে, এদেরকে যারা সমর্থন করবে, এদেরকে সহযোগিতা করবে, এদেরকে নিরাপত্তা দিবে, এদের পক্ষে বল প্রয়োগ করবে, এদেরকে ভালোবাসবে, এদের বানানো বিধানে যারা বিচারকার্য পরিচালনা করবে, এদের কাছে যারা বিচার প্রার্থনা করবে, এদেরকে প্রশংসা করবে, এদের বানানো বিধান বাস্তবায়নের মাঝে যারা দেশ ও জাতির সফলতা খোঁজে পাবে, এরা সকলেই আল্লাহর সাথে শির্ক ও কুফুরী করল।

আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান তথা তাওহীদের উপর বিশ্বাস করার পূর্বে নিচের কাজগুলো করতে হবে (এই কাজগুলোকে 'কুফর বিত্ তাগুত' বলে-

১. এ সকল তাগুতের ইবাদত, আনুগত্য, অনুসরণ ও ভালবাসাকে কুফরী ও বাতিল বলে জানা;

২. তাদের ইবাদত, আনুগত্য, অনুসরণ ও ভালোবাসা পরিত্যাগ করা; (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪)

৩. এদের সাথে আল বারাআহ্ (সম্পর্ক ছিন্ন) করতে হবে, এসকল ইলাহ/তাগুতদেরকে পরিত্যাগ করতে হবে, (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪)

৪. এদেরকে মন ভরে ঘৃণা করতে হবে (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪)

৫. এদের প্রতি পরিপূর্ণরূপে শত্রুতা এবং বিদ্বেষ পোষণ করতে হবে (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪)

৬. এদের প্রতি কঠোর হতে হবে (সূরা তাহরীম ৬৬: ৯;সূরা ফাৎহ ৪৮:২৯)

৭. এদেরকে আল্লাহর দুশমন মনে করতে হবে (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪)

৮. এদের সাথে নিজের জানের দুশমনের মত ব্যবহার করতে হবে (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪),

৯. এদেরকে পরিপূর্ণরূপে বয়কট করতে হবে (সূরা বাকারা ২:২৫৬-২৫৭;সূরা নাহল ১৬:৩৬)

১০. এদের সভা-সেমিনারে যোগদান করা যাবে না,

১১. এদের কোনো হাদিয়া-তোহফা নেয়া যাবে না,

১২. এদেরকে হারামখোর জ্ঞান করতে হবে, এদের উপার্জন হারাম

১৩. এদেরকে সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট কুলাঙ্গার মনে করতে হবে (সূরা বায়্যিনাহ ১০০:৬),

১৪. এদেরকে মুক, বধির ও অন্ধ জানতে হবে (সূরা বাকারা ২:১৮),

১৫. এরা চতুষ্পদ জানোয়ারের ন্যায়, বরং এর চেয়েও নিকৃষ্ট (সূরা আল আনআম ৭:১৭৯),

১৬. এদেরকে দুনিয়া থেকে মিটানোর আগ পর্যন্ত জিহাদ করে যেতে হবে (সূরা বাকারা ২:১৯৩, সূরা আল আনফাল ৮:৩৯)

১৭. এদেরকে "কাফেরের গোষ্ঠী" (দলগতভাবে কাফের) জ্ঞান করতে হবে। (ফলে, 'এলায়ে কালিমাতুল্লাহ' তথা আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য কাফেরদের মত এদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা হবে।) (সূরা মায়েদা ৫:৪৪)

তাগুতকে এভাবে পরিত্যাগ বা অস্বীকার করা ব্যতীত যথাযথভাবে 'কুফর বিত-তাগুত' (তাগুতকে অস্বীকার ও পরিত্যাগ) সাব্যস্ত হয় না। এর সবই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

এভাবে যে এদের সাথে আল-বারাআহ্ করতে পারবে সেই প্রকৃতপক্ষে 'লা ইলাহা' বলল। সেই আসলে বলল, আল্লাহর আগে-পরে আর কাউকে 'ইলাহ' হিসেবে গ্রহণ করিনি।

কোন ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনার পর নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আদায় করা, কিংবা তা'লীম-তরবীয়ত, দাওয়াত, তাযকিয়া ইত্যাদির মেহনত করার পরও এই সকল ইলাহ বা তাগুতকে পরিষ্কার করে (উপরোল্লিখিত ভাবে) পরিত্যাগ করতে হবে। এভাবে তাগুতকে বর্জন না করলে প্রকৃতপক্ষে "লা ইলাহা" বলা হলো না।

অর্থাৎ, আমার কালেমার প্রথম কথা হল, "আল্লাহর উপর ঈমান আনার জন্য এই সকল তাগুতকে পরিহার করার নামই হল 'লা ইলাহা'"।

এক্ষেত্রে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ হল আমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ

"তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীদের মাঝে উত্তম আদর্শ আছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মাঝে ও আমাদের মাঝে চিরশত্রুতা থাকবে।" (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪)

• কালেমার দ্বিতীয় অংশ: 'ইল্লাল্লাহু'র অর্থ

আমার কালেমার দ্বিতীয় কথা হল, উপরোল্লিখিত উপায়ে সকল মিথ্যা ইলাহ বা তাগুতকে অস্বীকার করার পর একজন মুসলিম 'ইল্লাল্লাহু' বলার উপযুক্ত হয়। এই 'ইল্লাল্লাহ'ই হচ্ছে তাওহীদ (একত্ববাদ)।

তাওহীদ চার প্রকার-

১. তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ্ (توحيد الربوبية): (রব' শব্দ হতে রুবুবিয়্যাহ) আল্লাহ্ পাককে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা এবং একমাত্র বিধানদাতা হিসেবে বিশ্বাস করা। এই চার গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান তিনিই আমাদের আল্লাহ্; আমাদের মহান প্রতিপালক।

২. তাওহীদে উলুহিয়্যাহ/তাওহীদে 'ইবাদাহ (التوحيد في العبادة/توحيد الألوهية): ('ইলাহ' শব্দ হতে উলুহিয়্যাহ) একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই বান্দার ইবাদত পাওয়ার যোগ্য-একথা মেনে নেয়া এবং আল্লাহ্ পাকের সকল প্রকার বিধি-নিষেধ কেবল তাঁর জন্যই খাসভাবে করা (অন্য কোনো তাগুত/উপাস্যের ইবাদত ও আনুগত্য না করা)।

৩. তাওহীদে আসমা (নাম) ওয়াস্ সিফাত (গুণ) (توحيد الأسماء والصفات): আল্লাহ্ পাকের গুণবাচক যে সকল নাম বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্যই খাস- একথাকে বিশ্বাস করা।

৪. তাওহীদে হাকামিয়্যাহ্ (توحيد الحاكمية): ('হুকুমত/হাকীম' শব্দ হতে হাকামিয়্যাহ) এটি মূলত 'তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ্'র অন্তর্ভূক্ত। তবে গুরুত্বের বিচারে এটিকে আলাদা করা হয়েছে। 'তাওহীদে হাকামিয়্যাহ'র অর্থ হচ্ছে- আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক সকল প্রকারের বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র এবং কেবলমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার।

প্রিয় ভাই! তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ তথা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন, আল্লাহ খাওয়ান, আল্লাহ্ পালেন- এই কথাগুলোর উপর মক্কার কুরাইশদেরও ঈমান ছিল। তথাপি আল্লাহর রাসূল ﷺ এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। বুঝা গেল, শুধুমাত্র তাওহীদের রুবুবিয়্যাহর উপর ঈমান আনাই যথেষ্ট নয়। মক্কার কাফেরদের তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ্- এর উপর বিশ্বাস ছিল ঠিকই, কিন্তু তারা তাওহীদে উলুহিয়্যাহ/ইবাদাহ এবং তাওহীদের হাকামিয়্যাহকে মেনে নেয়নি। তাই এরা মুশরিক এবং কাফের সাব্যস্ত হয়েছিল।

বর্তমান যামানায় তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ, তাওহীদে উলুহিয়্যাহ এবং তাওহীদে আসমা ওয়াস সিফাতকে মেনে নিবে কিন্তু তাওহীদে হাকামিয়্যাহ্-কে মানবে না, কিংবা কার্যক্ষেত্রে সে মানবরচিত বিধানকে প্রাধান্য দিবে, কিংবা মেনে নিবে, সেও মক্কার কাফেরদের ন্যায় মুশরিক ও কাফের হয়ে যাবে। (নাউযুবিল্লাহি মিন্ যালিক)

আশাকরি, এতক্ষণের আলোচনা হতে এই বিষয়টি পরিষ্কার যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পূর্বে তাগুতকে অস্বীকার করতে হবে। অতঃপর আল্লাহর উপর ঈমান আনতে হবে অর্থাৎ চার প্রকারের তাওহীদকেই পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হবে। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন-

فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

"যে তাগুতকে অস্বীকার করল ('লা ইলাহা'র উপর আমল করল) এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনল ('ইল্লাল্লাহ্' এর চারটি তাওহীদকে গ্রহণ করল), সে এমন এক মজবুত হাতল ধারণ করল যা কখনো ভাঙ্গবার নয়। আর আল্লাহ সবকিছু শুনেন এবং জানেন।" (সূরা বাকারাহ ২: ২৫৬)

প্রিয় ভাই! 'আল্লাহর উপর ঈমান' নিচের ছয়টি কাজের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। যথা:-

১. তাগুতকে অস্বীকার/বর্জন করা
২. চার প্রকারের তাওহীদকে গ্রহণ করা
৩. সকল প্রকারের ইবাদত-বন্দেগী একমাত্র আল্লাহর জন্যই করা।
৪. আল্লাহ্ তা'আলাকে সকল কিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসা।
৫. আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করা (আল-ওয়ালা) এবং
৬. আল্লাহর জন্যই শত্রুতা করা (আল-বারাআহ্)।

• কালেমার তৃতীয় অংশ: 'মুহাম্মাদ' এর অর্থ:

আমার কালেমার তৃতীয় কথা হচ্ছে, ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে সবচেয়ে বেশি, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসা। প্রিয় নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন,

لا يُؤْمِنُ أحدُكم حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّلَدِہٖ، وَوَالِدِہٖ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পুত্র, তার পিতা এবং অপরাপর সকল মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হব।" (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসার অর্থই হচ্ছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য নিজের জীবন দিতে সদাপ্রস্তুত থাকা। কেননা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি মহব্বত করব, কিন্তু জিহাদ করে নিজের জীবন দিতে পারবো না, তাহলে এটি একটি মিথ্যা ও হাস্যকর দাবী। কেননা, নিজের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসার দাবীই হল, যখন জীবন চাওয়া হবে, সেটা জিহাদের ময়দানেই হোক কিংবা অন্য যে কোনো তাকাজাতেই হোক, সাথে সাথে জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া।

• কালেমার চতুর্থ অংশ: 'রাসূলুল্লাহ' এর অর্থ

আমার কালেমার চতুর্থ কথা হচ্ছে, একথা বিশ্বাস করা যে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ- আল্লাহর বান্দা ও সর্বশেষ রাসূল। আমাদের যিন্দেগীর প্রতিটি কাজে, সকল ক্ষেত্রে নবীজি ﷺ-কে পরিপূর্ণরূপে আনুগত্য প্রদর্শন করা ও সুন্নাহর অনুসরণ করা।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে কালেমার সঠিক অর্থ বুঝবার এবং তদনুযায়ী আমল করবার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সকাল বেলার মু'মিন রে তুই, কাফির সন্ধ্যা বেলা

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. (مسلم،ج:١ ص:١١٠ ، صحيح ابن حبان، ج:١٥ ص:٩٦)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন-

"ফেতনাসমূহ প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই যা নেক আমল করার, দ্রুত করে ফেল! কেননা, ফেতনাসমূহ অন্ধকার রাত্রির অংশের মত (কালো) হবে (মানুষ বুঝতেই পারবে না যে সে ফেতনায় পতিত হচ্ছে)। ঐ ফেতনার সময় মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, সন্ধায় কাফের হয়ে যাবে। অথবা সন্ধায় মুমিন থাকবে, সকালে কাফের হয়ে যাবে। দুনিয়ার তুচ্ছ লাভের আশায় স্বীয় দ্বীনকে বিক্রি করে দিবে।" (সহীহ মুসলিম, সহীহ ইবনে হিব্বান)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يأتي على الناس زمان، الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني (سنن الترمذي: ج:٤ ص:٥٢٦)

"মানুষের উপর এমন একটা সময় আসবে যখন দ্বীনের উপর অটল থাকা হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মত কঠিন হয়ে যাবে।" (তিরমিযি)

প্রিয় ভাই!

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বর্তমান যামানাই সেই যামানা যখন একজন মানুষ সকাল করছে ঈমানদার হিসেবে, আর বিকালেই কাফের হয়ে যাচ্ছে। কিংবা সন্ধ্যায় মুসলমান আর সকালেই কাফের হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু সে বুঝতেই পারছে না। কেননা, সে তো সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করছে, সিয়াম পালন করছে। সকাল-সন্ধ্যা তাসবীহ-তাহলীল আদায় করছে। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে কিভাবে সে কাফের হয়ে গেল?

অনেকে মনে করেন, বর্তমান যামানায় রাস্তা-ঘাটে বের হওয়া যায় না, চারদিকে কেবল নারীর ফেতনা। তাই ঈমান ধরে রাখা হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখার চেয়েও কঠিন। কিন্তু ভাই! নারীর ফেতনায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা খুব বেশি থেকে বেশি 'ফিস্ক এর গুনাহ্ (গুনাহে কবীরা) হবে, এটা তো আর কুফর নয়। তাহলে? মানুষ কিভাবে খুব সহজেই ঈমান হারা হয়ে যাচ্ছে?

একটা বিষয় আমাদের স্পষ্ট হওয়া দরকার। পূর্বের যামানায় একজন মানুষকে মুশরিক বা মুরতাদ হওয়ার জন্য ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা দিতে হত বা মূর্তির সামনে সিজদা দিতে হত, কিংবা কোনো ফরযকে অস্বীকার করতে হত। কিন্তু বর্তমান যামানার ফিতনাগুলো এতটাই ভয়াবহ এবং নিকষ কালো আঁধারের ন্যায় যে, একজন মানুষকে মূর্তির সামনে সিজদা করা ব্যতিরেকেই কিংবা মৌখিক ঘোষণা দেয়া ছাড়াই বে-ঈমান, কাফের কিংবা মুশরিক ও মুরতাদ বানিয়ে দেয়। বর্তমান জামানার ফেতনাগুলো কখনোই আমাদেরকে বলবে না যে, তুমি ব্যক্তিগত পর্যায়ে দ্বীনকে অনুসরণ করো না, বরং কখনো কখনো এমন দ্বীনদারিকে উৎসাহিতও করবে; এসকল ফেতনা আমাদেরকে কেবল এতটুকু বলবে, ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে দাও, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। রাষ্ট্র চলবে মানবরচিত বিধানে, আর যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে। ব্যস! কাফের হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

ধরা যাক! একজন মানুষ যদি রাষ্ট্রের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (যা একটি সুস্পষ্ট নাস্তিক্যবাদী মতবাদ এটা)-কে মেনে নেয়, বা যদি মনে করে এতে কোন সমস্যা নেই, বা মনে করে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য এটিই বেশি উপযোগী ইত্যাদি; তবে তার ঈমান চলে যাবে, যদিও সে সালাত-সিয়াম-হজ্জ-যাকাত-দান-সাদাকা-দাওয়াত-তাযকিয়া ইত্যাদি আমলগুলো খুব জোরদার বা মজবুতির সাথে করে থাকে।

এরপর আরোও ধরা যাক 'গণতন্ত্রের' কথা! কোনো মানুষ যদি এমনটি মনে করে যে, মানুষের আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা আছে বা মানুষ নিজেই নিজের রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের অধিকার রাখে বা জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস, সে যদি জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে অংশ নেয় (হয়ত নিজে এমপি পদের জন্য প্রার্থী হয় বা এমপিদেরকে ভোট দেয়), তার এই আকীদা ও আমল-ই তার ঈমানকে 'নাই' বানিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট, যদিও সে সালাত-সিয়াম-হজ্জ-যাকাত-দান-সাদাকা-দাওয়াত-তাযকিয়া ইত্যাদি আমলগুলো খুব জোরদার, মজবুতি বা ইস্তিকামাতের সাথে করে থাকে।

এছাড়াও ঈমান ভঙ্গের আরো সুস্পষ্ট কিছু কারণ আছে, যেগুলো কারো মধ্যে পাওয়া গেলে সে কাফের হয়ে যাবে, যদিও সে বাহ্যিক সুরতে 'লেবাসধারী' দ্বীনদার হয়ে থাকে।

ঈমান ভঙ্গের কারণগুলো হল-

১. আল্লাহর সাথে শিরক করা: [সূরা নিসা ৪:৪৮; সূরা মায়িদাহ্ ৫:৭২; সূরা যুমার ৩৯:৬৫; সূরা লোক্বমান ৩১:১৩]

২. আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে মাধ্যম সাব্যস্ত করা: [সূরা যুমার ৩৯:৩]

যেমন কেউ যদি মনে করে যে, আল্লাহর কাছে কিছু পেতে হলে পীর ধরতে হবে, পীর-ই আল্লাহর দরবারে আমাকে কবুল করাবে, অতঃপর আমার মনের বাসনা পূর্ণ হবে, আমার পীর পরকালে আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এই আকীদা শিরক্ ও কুফর।

৩. কোন কাফেরকে কাফের মনে না করা। [সূরা নিসা ৪:৫১]

যেমন: ইয়াহুদী-খ্রিস্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ বা এরকম অন্য কোনো কাফেরে আছলিকে কাফের মনে না করা বা তাদের ধর্মকে ভ্রান্ত মনে না করা কিংবা ভ্রান্তির ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় রাখা।

বি.দ্র: আমরা "যে ব্যক্তি কাফেরকে কাফের মনে করে না, সে নিজেই কাফের" কথাটাকে শুধুমাত্র তাকফিরুন নসের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ যেসব ব্যক্তি বা জাতি-গোষ্ঠীকে কোরআন সুন্নাহ সুস্পষ্ট কাফের আখ্যায়িত করেছে- তাদের ক্ষেত্রে) প্রযোজ্য মনে করি। এই কথাকে খারেজীদের মতো তাকফিরুল ইজতিহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করি না। যেমন- বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীকে আমরা মুরতাদ মনে করলেও কোন মুসলমান ইলমের স্বল্পতার কারণে কিংবা ভুল ব্যাখ্যার কারণে এদেশের শাসকগোষ্ঠীকে মুরতাদ মনে না করলে, আমরা সেই ব্যক্তিকে কাফের মনে করি না- যেমনটা নব্য খাওয়ারেজরা করে থাকে।

৪. মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করা। [সূরা মায়িদাহ্ ৫:৫১]

যেমন: জাতিসংঘ 'পিস্ (শান্তি?) মিশনে' গিয়ে তাগুত সেনাবাহিনী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তখন তারা দলীয়ভাবে মুরতাদ হয়ে যায়।

৫. দ্বীনের কোনো বিষয়কে মন থেকে ঘৃণা করা। [সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৮-৯]

যদিও কোনো ব্যক্তি নিজে সে ঐ আমলগুলো করে। যেমন: পর্দাপ্রথাকে অপছন্দ করা, জিহাদকে অপছন্দ করার দ্বারা একজন কাফের হয়ে যাবে, যদিও সে অন্যান্য আমল একশতে একশ করে থাকে।

৬. দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা। [সূরা তাওবাহ্ ৯:৬৫-৬৬]

যেমন পর্দাকে 'তাবু'র সাথে তুলনা করে কটাক্ষ করা, মুজাহিদ ভাইদেরকে 'জঙ্গী' বলে গালি দেয়া ইত্যাদি কুফুরী।

৭. যাদু করা, যাদু শেখা। [সূরা বাকারা ২:১০২]

৮. আল্লাহর বিধানের উপর মানবরচিত বিধানকে প্রাধান্য দেয়া। ইসলামী শরীয়তকে পরিপূর্ণ মনে না করা, এর মধ্যে কিছু যোগ-বিয়োগ করার সুযোগ আছে মনে করা। কিংবা, ইসলামী শরীয়তের কোনো বিধান থেকে অন্য কোনো দ্বীন, আদর্শ বা বিধানকে উত্তম, যুক্তিযুক্ত বা অধিক পরিপূর্ণ মনে করা। [সূরা মায়িদাহ্ ৫:৪৪,৫০]

যেমন: গণতন্ত্র/সমাজতন্ত্র/ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ-কে রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা। নির্বাচনে অংশ নেয়া। জাতীয়তাবাদ/ মুক্তচিন্তা/অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী হওয়া। এসকল তন্ত্র-মন্ত্রগুলোর মধ্যে জাতির মুক্তি নিহিত- এরূপ ধারণা করা। মানবরচিত আইনে বিচার কার্য পরিচালনা করা। এই সকল লোকদের বা এই সিস্টেমের পক্ষে সমর্থন করা, দলের পক্ষে দাওয়াত দেয়া, অস্ত্র ধারণ করা, এদেরকে নিরাপত্তা দেয়া, এদেরকে অনুসরণ করা, জনশক্তি বা অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করা, এদেরকে ভোট দেয়া, এসব মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দেওয়া ইত্যাদি সবই কুফুরী।

৯. ভালোবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়া। [সূরা তাওবাহ্ ৯:২৪]

১০. দ্বীন থেকে পরিপূর্ণরূপে গাফেল বা বিমুখ থাকা। [সূরা আ'রাফ ৭:১৭৯]

অর্থাৎ ঈমানদার হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলোও না জানা, না শিখা কিংবা গ্রহণ না করা। যেমন- জন্মসূত্রে মুসলিম কোন ব্যক্তির পিতা-মাতা কোন দিন তাকে ঈমান-ইসলাম শিখায়নি, সে নিজেও তা শিখেনি।

[বি.দ্র: কুফুরী কর্ম সম্পাদনকারী আর 'কাফের' এককথা নয়। একজনের মাঝে কুফরের আলামত পাওয়া গেলেই তাকে সাথে সাথে তাকফীর করা (কাফের ঘোষণা দেয়া) যায় না। সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির উপর কুফর ও ইরতিদাদের হুকুম আরোপ করার জন্য শরীয়তে অনেক শর্ত আছে; অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞতা (الجهل), তাবীল (التأويل) ইত্যাদির মত موانع التكفير তথা তাকফীরের প্রতিবন্ধক বিষয়গুলো লক্ষ্যনীয়। যেমন, কোন কোন আলেমের ভুল ইজতেহাদ ও অগ্রহণযোগ্য ফতোয়ার কারণে অনেকে ইসলামের নামে নাপাক গণতন্ত্রের খপ্পরে পড়েছে। এ সমস্ত 'ইসলামী গণতান্ত্রিকদেরকে' তাদের তাবিলের (নুসুসের ভুল ব্যাখ্যা বুঝা, ভুল প্রয়োগ করা বা বাস্তবতার ব্যাপারে অজ্ঞতা- যা তাকফীরের প্রতিবন্ধক) কারণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফরীতে জড়িত হবার পরও আমরা তাদেরকে তাকফীর করি না। কিন্তু আমরা তাদেরকে ভুল পথের পথিক মনে করি এবং তাদের কাজকে হারাম মনে করি। গণতন্ত্রের ধোঁকা ও প্রতারণা তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করি। সঠিক পথে ফিরিয়ে এনে তাদের বিপ্লবী চেতনাকে ইসলামী পন্থা ও জিহাদের পথে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি। এমনিভাবে, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী/ভোটদাতা সকলকে আমরা ঢালাওভাবে কাফের ঘোষণা করি না- যেমনটা নব্য খাওয়ারেজদের অনেকে করে থাকে। কারণ অধিকাংশ ভোটদাতাই গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞ। এজন্য সংসদীয় নির্বাচনে ভোট দেয়া কুফরী কাজ হওয়া সত্ত্বেও আমরা সাধারণভাবে ভোটদাতা সকলকে তাকফীর করি না।

সুতরাং কাউকে কাফির ঘোষণার ক্ষেত্রে হক্কানী উলামায়ে কেরামই কেবল ফয়সালা দেয়ার অধিকার রাখেন। সাধারণ মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হল- হুটহাট করে কাউকে তাকফীর করা হতে বিরত থাকা, উলামায়ে কেরামের আনুগত্য করা এবং ঈমান বিধ্বংসী কর্মসমূহকে বুঝে ও চিনে তা থেকে বিরত থাকা।]

উপরে বর্ণিত দশটি পয়েন্টকে **'নাওয়াক্বিযুল ঈমান' (نواقض الأيمان) তথা ঈমান ভঙ্গকারী কর্ম** বলা হয়। এগুলো কুফরে আকবার (বড় কুফর) বা কুফরে বাওয়াহ্ (সুস্পষ্ট কুফর)। এগুলোর যে কোন একটিতে লিপ্ত হলে ব্যক্তির ঈমান নষ্ট হয়ে যায়; সে ইসলামের গন্ডি হতে বের হয়ে যায়।

"কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত কাফের হবে না, যতক্ষণ না সে তার অন্তর দিয়ে অস্বীকার করে"- এই কথাটি নব-উদ্ভাবিত একটি বিদআত।

যুগের মুরজিয়া ও জাহমিয়া ফেরকার আকীদা থেকে আমরা নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করছি, যারা বিশ্বাস করে- "কুফর শুধু অন্তর দিয়ে প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মাঝেই সীমাবদ্ধ; অন্তরে আকীদা-বিশ্বাস দুরস্ত থাকলে কথা-কাজের দ্বারা কখনও কাফের হয় না।"

আমরা বলি, আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতে এমন কিছু কথা ও কাজ আছে, তা যদি কোন মুসলিম বলে বা করে, তাহলে সে কথা ও কাজ তাকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দেয়- যদিও তার অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমান বিদ্যমান থাকে। যেমন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নিয়ে কটুক্তি করা, শরীয়তের কোন বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা ইত্যাদি।

তাছাড়া, তাকফীরের ক্ষেত্রে আমরা খারেজীদের মাযহাবকেও প্রত্যাখ্যান করি, যারা কবীরা গুনাহের কারণে মুসলিমদেরকে তাকফীর করে। কোন মুসলমানকে আমরা কবীরা গুনাহের কারণে তাকফীর করি না, যতক্ষণ না সে গুনাহ্টিকে হালাল সাব্যস্ত করে অথবা তার থেকে ঈমান ভঙ্গের অন্য কোনো কারণ প্রকাশ পায়।

বরং, তাকফীরের ক্ষেত্রে আমরা চরমপন্থা (إفراط) ও শিথীলতা (تفريط) উভয়টিকে পরিত্যাগ করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করি।

প্রিয় ভাই! আশাকরি, আমরা এতক্ষণে বুঝে গিয়েছি, কেমন করে ব্যাপকভাবে কুফুরি আকীদা ও কর্মকাণ্ড আমাদের সমাজে দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের নিজেদের এবং চারপাশের লোকগুলোর দিকে তাকালেই আমরা প্রিয় নবীজী ﷺ এর হাদীসের মর্ম ও সত্যতা ভালোভাবে বুঝতে পারব। সত্যিই, বর্তমান যামানাই সেই যামানা যখন ঈমান ধরে রাখা হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার ধরে রাখার চেয়েও কঠিন হয়ে গিয়েছে।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলের ঈমানকে হেফাযত করুন। আমীন।

[বি.দ্র: আক্বীদার বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট করে বুঝার জন্য আমাদের নিম্নের কিতাবগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। কিতাবের লিংক: (অবশ্যই Tor Browser দিয়ে সার্চ করুন:)

১. তাওহীদের কালিমা-শাইখ হারেস আন নায্যারী রহ.: https://archive.org/details/20220820_20220820_1135

২. নেদায়ে তাওহীদ-শাইখ আবু উমার আল মুহাজির: https://archive.org/details/20220820_20220820_1139

৩. তাকফীরের ব্যাপারে সতর্ক হোন- শাইখ আবু হামজা আল মিশরী:

https://archive.org/details/20220827_20220827_0234]

ঈমান আনার পর প্রথম ফরয

শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর লিখিত "মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা" কিতাবে লিখেন, "ঈমান আনার পর প্রথম ফরয হচ্ছে, মুসলিমদের ভূমিকে প্রতিরক্ষা করা। যদি মুসলিমদের ভূমির এক বিঘত পরিমাণের জায়গাও কুফ্ফাররা দখল করে নেয়, তখন প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় (সবার উপর ফরয হয়ে যায়)। ঐ মুহূর্তে জিহাদে বের হওয়ার জন্য পিতা-মাতার কাছ থেকে তার সন্তানের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না এবং স্বামীর কাছ থেকে তার স্ত্রীরও অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।"

["মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা" কিতারের লিংক: (অবশ্যই Tor Browser দিয়ে সার্চ করুন):
https://archive.org/details/20220820_20220820_1144]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه،

"যে আগ্রাসী শক্তি মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়া ধ্বংস করে, ঈমানের পর তাকে প্রতিরোধের চেয়ে গুরুতর ফরয দ্বিতীয় আরেকটি নেই।" (ফাতাওয়া আল কুবরা, খ. ৪, পৃ. ৬০৮)

ঠিক এজন্যই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসার সাথে সাথে জিহাদকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার কথা বলেছেন।

যেমন: আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَـٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَـٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَـٰسِقِينَ

"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা (ক্ষতি বা) বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর, এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত (দেখ, তোমাদের পরিণতি কি হতে যাচ্ছে), আর আল্লাহ তা'আলা ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" (০৯ সূরা তাওবাহ: ২৪)

জিহাদ একটি ফরয আমল

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হতে পারে একটা বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দীয়, অথচ তোমাদের জন্য তা অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলাই জানেন, তোমরা জান না।" (২ সূরা বাকারা: ২১৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ۚ

"আর তোমরা তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করতে থাকো, যে পর্যন্ত না (পৃথিবীর সকল) ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" (৮ সূরা আনফাল: ৩৯)

যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে একজন কাফেরও অবশিষ্ট থাকবে, কিংবা এক বিঘত ভূমিও ইসলামী শাসনের বাহিরে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে ফেতনা অবশিষ্ট থাকবে, যার কারণে কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ একটি ফরয হুকুম হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে।

জিহাদের মূল লক্ষ্য হল:-

১. তাওহীদের পতাকা সমুন্নত করা, কুফরের পতাকা অবনত করা।

২. পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত করা।

৩. ইসলামি খিলাফাহ্ 'আলা-মিনহাজিন্ নুবুওয়্যাহ ফিরিয়ে এনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা।

মুসলিম সাম্রাজ্যের বা খিলাফতের কোন নির্দিষ্ট বর্ডার বা সীমানা নেই, সবটাই ফ্রন্টলাইন বা যুদ্ধক্ষেত্র। ততদিন পর্যন্ত জিহাদ চলবে যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর এক ইঞ্চি মাটিও আল্লাহ তা'আলার বিধান প্রতিষ্ঠা থেকে খালি থাকবে এবং একজন মানুষও আল্লাহর দ্বীনের আওতার বহির্ভূত থাকবে।

কোন ইনসাফকারীর ইনসাফ অথবা কোনো জালিমের জুলুম এই জিহাদকে বন্ধ করতে পারবে না। কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদাই একটি হক্ব জামাত হক্বের উপর জিহাদ চালিয়ে যাবে।

জিহাদের প্রকারভেদ

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দুই কারণে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা তোমাদের উপর ফরয-

ক. আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করা। (ইক্বদামী বা আক্রমনাত্মক বা Offensive জিহাদ)

খ. কাফেরদের হাতে নির্যাতিত মুসলমানদের মুক্ত করা। (দেফায়ী বা প্রতিরক্ষামূলক বা আত্মরক্ষামূলক বা প্রতিরোধমূলক বা Defensive জিহাদ) (তাফসীরে উসমানী, পৃ. ২৪৪)

জিহাদ কখন ফরযে কিফায়া?

প্রিয় ভাই! সহজভাবে বুঝার চেষ্টা করি-

যখন পৃথিবীতে ইসলামী খিলাফাহ্ কায়েম থাকে এবং সাধারণভাবে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিতরে এবং বাহিরে মুসলমানদের শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে তখন জিহাদ ফরযে কিফায়া থাকে, অর্থাৎ উম্মতের কিছু মানুষ জিহাদ করলে সকলের পক্ষে জিহাদ আদায় হয়ে যায়।

এমতাবস্থায় মুসলিম জাহানের যিনি খলীফা, তিনি আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য পার্শ¦বর্তী কোনো কুফর রাষ্ট্রে অভিযান পরিচালনা করবেন। এ জিহাদের মাধ্যমে কোনো কুফর রাষ্ট্রকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়, তা কবুল না করলে 'জিযিয়া কর' দাবী করা হয়, যদি এতে তারা সম্মত হয় তবে তাদের নিরাপত্তার ভার মুসলিমদের হাতে। মুসলমানরা নিজের রক্ত দিয়ে সেসকল অমুসলিমদের জান ও মালের হেফাযত করবে, বহিঃশত্রু থেকে তাদের রক্ষা করবে। আর কোনো অমুসলিম সম্প্রদায় কর দিতে সম্মত না হলে তরবারি (তথা যুদ্ধ) দ্বারা ফয়সালা করা হয়, যারা তরবারি দ্বারা মুজাহিদদের পথ রোধ করবে সেসব সৈন্যদেরকে হত্যা বা বন্দী করা হয়, তাদের নারীদেরকে দাসী-বাঁদী বানানো হয়। সেই ভূমি জয় করে তাতে আল্লাহর বিধান/আইন প্রতিষ্ঠা করা হয়, আর সামর্থ্যবান অমুসলিমদের কাছ থেকে কর আদায় করা হয়।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩

"তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের ঐ সকল লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।" (০৯ সূরা তাওবাহ: ২৯)

প্রিয় ভাই! যেহেতু এই যুদ্ধটি আগে বেড়ে আক্রমণ করা হয়, তাই এটি হলো ইক্বদামী বা আক্রমনাত্মক (Offensive) বা "আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করা"র জিহাদ। এই জিহাদ ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ কিছু মুসলমান এই দায়িত্ব আঞ্জাম দিলেই সকলের পক্ষ থেকে জিহাদের ফরযিয়াত (বাধ্যবাধকতা) আদায় হয়ে যাবে।

ইক্বদামী যুদ্ধের জন্য শর্তসমূহ

এই জিহাদের জন্য কিছু শর্ত আছে, যেমন-

১. মুসলমান হওয়া।
২. বুদ্ধিমান হওয়া।
৩. বালেগ/প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।
৪. জিহাদের ব্যয়-ভার বহনে সক্ষম হওয়া।
৫. শারীরিকভাবে সক্ষম হওয়া।
৬. জিহাদ ফরযে কিফায়া অবস্থায় পিতা-মাতার অনুমতি অপরিহার্য।
৭. পিতা-মাতা না থাকলে দাদা-দাদীর অনুমতির প্রয়োজন হবে।
৮. ঋণী ব্যক্তিকে তার ঋণদাতার কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।
৯. মহিলাদের জন্য তার স্বামীর অনুমতি লাগবে। ইত্যাদি।

জিহাদ কখন ফরযে আইন হয়?

নিম্নের তিনটি ক্ষেত্রে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। যথা-

প্রথম ক্ষেত্র, খলীফা যখন কোনো অমুসলিম/তাগুত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন আর সাধারণভাবে সক্ষম সকলকে/নির্দিষ্ট লোকদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহনের আহ্বান জানান, তখন সক্ষম সকলের উপর/নির্দিষ্ট ঐসকল লোকদের উপর জিহাদে/যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ফরযে আইন হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র, যখন মুসলমানদের একটি দল কুফ্ফারদের সম্মুখীন হয় (যদিও তা ইক্বদামী হোক না কেন) তখন ঐ দলের উপর জিহাদ করা ফরযে আইন হয়ে যায়।

তৃতীয় ক্ষেত্র (দেফায়ী বা প্রতিরক্ষামূলক বা প্রতিরোধমূলক বা Defensive জিহাদ):

পৃথিবীর বুকে ইসলামী খিলাফাহ থাক বা না থাক, মুসলমানদের আমীর থাক বা না থাক, এমতাবস্থায়-

১. যদি আগ্রাসী কোনো বাহিনী মুসলিম ভূমির দিকে কেবল অগ্রসর হয়,
২. যদি কোনো কাফের বাহিনী মুসলমানদের সীমানায় তাঁবু স্থাপন করে,
৩. কোন কাফের বাহিনী মুসলমানদের উপর হামলা করে বসে,
৪. মুসলিম ভূমির এক বিগত মাটিও যদি কুফ্ফাররা দখল করে নেয়,

৫. যদি পৃথিবীর কোথাও কোন একজন মুসলিমও কুফ্ফার কর্তৃক বন্দী হয়, ঐ মুসলমানকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত জিহাদ করতে সক্ষম প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরযে আইন হয়ে যায়।

উপর্যুক্ত ক্ষেত্রবিশেষগুলোতে জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার বিষয়টি সকল মাযহাবেই স্বীকৃত, এই ব্যাপারে কোনো মাযহাবের ইমাম, সালাফ কিংবা খালাফ, নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরাম, কারো কোনো দ্বিমত নেই।

দেখুন-

ফিকহে হানাফী:

১. আল্লামা জাস্সাস (রহঃ) এর ফতওয়া: (আহকামুল কুরআন, খণ্ড:৪, পৃষ্ঠা:৩১২)

২. আল্লামা ইবনে আবেদীন আশ-শামী (রহঃ) এর ফতওয়া: (হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা:২৩৮)

৩. আল্লামা আবূ বকর আল-কাসানী (রহঃ) এর ফতওয়া: (বাদায়েউস সনায়ে, খণ্ড:১৫, পৃষ্ঠা:২৭১)

৪. আল্লামা ইবনু নুজাইম আল-মিসরী (রহঃ) এর ফতওয়া: (আল বাহরুর রায়েক, খণ্ড:১৩, পৃষ্ঠা:২৮৯, ২৯০)

৫. আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহঃ) এর ফতওয়া: (ফাতহুল কাদীর, অধ্যায়: কিতাবুস সিয়ার, খণ্ড:১২, পৃষ্ঠা:৩৪৮)

৬. আল্লামা মূসিলী (রহঃ) এর ফতওয়া: (কিতাবুল ইখতিয়ার, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৪৬৯)

৭. ইমাম যা'লায়ী (রহঃ) এর ফতওয়া: (তাবয়ীনুল হাকায়েক, খণ্ড:৯, পৃষ্ঠা:২৬৬)

ফিকহে শাফি'ঈঃ

১. আল্লামা রমালী (রহঃ) এর ফতওয়া: (নেহায়েতুল মুহতাজ, খণ্ড:৮, পৃষ্ঠা:৫৮)

২. ইমামুল হারামাইন (রহঃ) এর ফতওয়া: (গিয়াছাতুল উমাম, পৃষ্ঠা:১৯১)

৩. আল্লামা খতীব শারবিয়ানী (রহঃ) এর ফতওয়া: (একনা'য়, খণ্ড:২, পৃষ্ঠা:৫১০)

৪. আল্লামা মাওয়ারিদী (রহঃ) এর ফতওয়া: (আল-ইনসাফ, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:১১৭)

৫. ইমাম নববী (রহঃ) এর ফতওয়া: (আল-মাজমূ'য়,খণ্ড:১৯, পৃষ্ঠা:২৬৯; রওযাতুত তলেবীন, খন্ড:৪ পৃষ্ঠা:১)

ফিকহে মালিকী:

১. আল্লামা ইবনে আব্দিল বার (রহঃ) এর ফতওয়া: (আল-কাফী ফী ফিকহে মদীনা, পৃষ্ঠা:৪৬৩)

২. ইমাম কুরতুবী (রহঃ) এর ফতওয়া: (তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড:৮, পৃষ্ঠা:১৫১)

ফিকহে হাম্বলী:

১. আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) এর ফতওয়া: (আল ফাতাওয়াল কুবরা, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা:৬০৮)

২. ইমাম ইবনে কুদামা (রহঃ) এর ফতওয়া: (মুগনী; খণ্ড:৮, পৃষ্ঠা:৩৪৫)

উম্মাহর অন্যান্য ফুকাহাগণের মতামত:

১. শায়েখ হাসানুল বান্না শহীদ (রহঃ) এর ফতওয়া: (দেখুন: শায়েখের রিসালাহ: আল-জিহাদ)

২. ইবনে আতিয়্যা (রহঃ) এর ফতওয়া: (তাফসীরে ইবনে আতিয়্যা, খণ্ড:৮, পৃষ্ঠা:৩৪৬)

জাহেরী ফুকাহাগণের ফতওয়া:

আল্লামা ইবনে হাযম (রহঃ) এর ফতওয়া: (মুহাল্লা, খণ্ড:৭, পৃষ্ঠা:২৯২, ৩০০, ৩৫১]

সমকালীন আরব আলেমগণের ফতওয়া:

১. হামূদ বিন উকলা আশ-শু'আইবী (রহঃ) এর ফতওয়া: (দেখুনঃ http://www.tawhed.ws/r1?i=6126&x=3nh5yxxk)

২. শায়েখ সুলাইমান আল-উলওয়ান (দাঃ বাঃ) এর ফতওয়া: (শরহু কিতাবিস সিয়াম মিন সুনানিত তিরমিজী লিল-আলওয়ান-২১৯)

৩. শায়েখ সলেহ আল মুনাজ্জিদ (রহঃ) এর ফতওয়া: (দেখুনঃ www.islam-qa.com ফাতাওয়াল ইসলাম ওয়া সুয়াল জওয়াব, সুয়াল নাম্বার-৩৪৮৩০)

মুজাহিদীন আলেমগণের ফতওয়া:

১. শহীদে উম্মত আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহঃ) এর ফতওয়া: (আদ-দিফা আন আরাদিয়াল মুসলিমীন আহাম্মু ফুরূজিল আ'ইয়ান)

২. শায়েখ শহীদ আবু ইয়াহইয়া আল-লিবী (রহঃ) এর ফতওয়া: (আল-জিহাদ ওয়া মা'রেকআতুস সুবহাত, পৃষ্ঠা:৩৫) ....ইত্যাদি............ইত্যাদি।

বর্তমানে যে জিহাদ আমাদের সকলের উপর ফরযে আইন

প্রিয় ভাই!

দেফায়ী বা প্রতিরক্ষামূলক বা প্রতিরোধমূলক বা Defensive জিহাদের ক্ষেত্রে আর কারো ঘরে বসে থাকার উপায় থাকে না। সক্ষম সকল মুসলমানের উপর জিহাদ করা ফরযে আইন হয়ে যায়।

- **'নফীরে আম':**

এই পরিস্থিতিকে ফিকহের ভাষায় 'নফীরে আম' বলা হয়। 'নাফীর' অর্থ 'যুদ্ধে বের হওয়া।' আর 'আম' অর্থ ব্যাপক। নফীরে আম দ্বারা উদ্দেশ্য এমন অবস্থা, যখন শত্রুকে প্রতিহত করতে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের সকলের জিহাদে বের হওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, জিহাদের জন্য কারো কাছ থেকে অনুমতির প্রয়োজন নেই। সন্তানের জন্য পিতার কাছ থেকে, স্ত্রীর জন্য স্বামীর কাছ থেকে, ঋণগ্রহীতার জন্য ঋণদাতার কাছ থেকে, গোলাম তার মনিব

থেকে, এমনকি 'নফীরে আম' অবস্থায় মুসলিম আমীরের অনুমতিরও দরকার নেই, জিহাদের জন্য বের হওয়ার ব্যাপারে তার কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞাও মান্য করা যাবে না। কেননা এমতবস্থায় কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা আল্লাহর হুকুমের খেলাফ, তাঁর নাফরমানীর শামিল। আর আল্লাহর নাফরমানী করে কারো আনুগত্য করার অনুমতি শরীয়তে নেই। পবিত্র হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ইরশাদ করেন-

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ـ المصنف لابن أبي شيبة :٣٤٤٠٦

"খালেকের নাফরমানী করে বান্দার আনুগত্য করা যাবে না।" (শরহুস্ সিয়ারিল কাবির: ২/৩৭৮)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ

"আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই, আর তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করে দিয়েছে তোমাদেরকে। বস্তুতঃ ফেতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ।" (০২ সূরা আল বাকারা: ১৯০-১৯১)

وَقَٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ كَآفَّةٗ كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمۡ كَآفَّةٗۚ

"আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে।" (০৯ সূরা আত্-তাওবাহ: ৩৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন,

وَمَا لَكُمۡ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا مِنۡ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهۡلُهَا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّٗا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ۝٧٥

"আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে যালেম, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।" (৪ সূরা নিসা: ৭৫)

- ## উলামায়ে কেরামের ফাতওয়া:

➢ (হানাফী) আল্লামা জাস্সাস (রহঃ) এর ফতওয়া:

ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو، ولم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، وهذا لاخلاف فيه بين

الأمة إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين و سبي ذراريهم (أحكام القرآن : ৩১২ /4).

"সকল মুসলমানদের প্রসিদ্ধ আকীদা হলো, যখন সীমান্তবর্তী মুসলমানেরা শত্রুর আশংকা করবে, আর তাদের মাঝে শত্রু প্রতিরোধের ক্ষমতা বিদ্যমান না থাকবে, তারা নিজ পরিবার-পরিজন, দেশ ও জানের ব্যাপারে শংকাগ্রস্থ হবে, এমতাবস্থায় পুরো উম্মাহর উপর ফরজ হয়ে যায়, যে ব্যক্তিই শত্রুদের ক্ষতি থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম সে জিহাদে বের হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে উম্মাহর মাঝে কোনো দ্বিমত বিদ্যমান নেই। কেননা তাদেরকে সাহায্য না করে বসে থাকা বৈধ, এটা কোন মুসলমানের কথা হতে পারে না, যখন নাকি শত্রুরা মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করছে ও তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দী করছে। (আহকামুল কুরআন, খন্ড:৪,পৃষ্ঠা:৩১২)

- (হানাফী) আল্লামা ইবনে আবেদীন আশ-শামী (রহঃ) এর ফতওয়া:

وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلواولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج-- حاشية ابن عابدين(৩/২৩৮)

"যদি শত্রুরা মুসলমানদের কোনো সীমানায় আক্রমণ চালায়, তাহলে তার নিকটবর্তী যুদ্ধে সক্ষম মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। যদি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন না হয়, তাহলে আক্রান্ত এলাকা থেকে যারা দূরে অবস্থান করছে তাদের উপর জিহাদ ফরজে কেফায়া। তবে শত্রুর নিকটে যারা রয়েছে তারা যদি শত্রুকে প্রতিরোধ করতে অপারগ হয়, অথবা অপারগ না হয় কিন্তু অলসতাবশত জিহাদ ত্যাগ করে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর নামাজ ও রোজার ন্যায় জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়, যা ছেড়ে দেয়া বৈধ নয়। এভাবে ক্রমানুসারে পূর্ব পশ্চিমের সকল মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।" (হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:২৩৮)

- (মালিকী) ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, "(হাম্বলী) ইবনে আতিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينءذ فرض عين. اهـ. تفسير ابن عطيه:١/٢٨٩

"একথার উপর ইজমা চলে আসছে যে, উম্মতে মুহাম্মাদির প্রতিটি ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরযে কিফায়া। যদি মুসলমানদের একাংশ তা আদায় করে, অন্যদের থেকে এর দায়িত্ব-ভার সরে যাবে। তবে শত্রু যদি কোনো ইসলামী ভূ-খন্ডে আগ্রাসন চালায়, তখন তা ফরযে আইন হয়ে যায়।" (তাফসীরে ইবনে আতিয়্যাহ ১/২৮৯; তাফসীরে কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ৩৮)

- (হাম্বলী) শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصاءل عن الحرمة والدين واجب إجماعا، فالعدو الصاءل الذي يفسد الذين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم. اهـ. الفتوى الكبير٤/٦٠٧

"দেফায়ী বা প্রতিরোধমূলক (Defensive) যুদ্ধ মুসলমানদের দ্বীন ও সম্মানের উপর আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর, যা সর্বসম্মতিক্রমে ফরয (ফরযে আইন)। যে আগ্রাসী শক্তি মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়া ধ্বংস করে, ঈমানের পর তাকে প্রতিরোধের চেয়ে গুরুতর ফরয দ্বিতীয় আরেকটি নেই। এই ক্ষেত্রে কোনো শর্ত প্রযোজ্য নয়, বরং সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ করতে হবে। আমাদের ও অন্যান্য (মাযহাবের) ফুকাহায়ে কেরাম সকলেই তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।" (ফাতাওয়া আল কুবরা, খ. ৪, পৃ. ৬০৮)

- (শাফে'ঈ) আল্লামা রমালী রহ. বলেন,

فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم، من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة

"যদি শত্রুরা আমাদের কোনো এলাকায় প্রবেশ করে, আর আমাদের মাঝে ও তাদের মাঝে সফরের দূরত্বের চেয়েও কম দূরত্ব থাকে, তাহলে ঐ দেশের অধিবাসীদের উপর প্রতিরোধ করা ফরজ হয়ে যায়। এমনকি ঐ ব্যক্তিদের উপরও ফরয হয়ে যায় যাদের উপর জিহাদ নেই। যেমন: দরিদ্র, নাবালেগ, গোলাম, ঋণগ্রহীতা, মহিলা।" (নেহায়েতুল মুহতাজ, খণ্ড:৮, পৃ. ৫৮)

- (হানাফী) "আর যখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে ....সন্তানের জন্য তার অভিভাবক থেকে, গোলাম তার মনিব থেকে, স্ত্রী তার স্বামী থেকে এবং ঋণগ্রহণকারী ঋণদাতা থেকে জিহাদের অনুমতির প্রয়োজন হয় না।" [ফাযায়েলে জিহাদ, সগীর বিন এমদাদ, পৃ. ৫১২; মাসায়েলে জিহাদ অধ্যায়, মাসআলা নং-৯]

- (হানাফী) মুফতী শফী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

"এমনিভাবে আল্লাহ না করুন, কখনো যদি কাফেররা কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে আক্রমণ করে এবং প্রতিরোধের জন্য নির্ধারিত বাহিনী তাদের প্রতিরোধে যথেষ্ট না হয়, তখন উক্ত ফরয তাদের অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী সকল মুসলমানের উপর আরোপিত হয়। তারাও যদি সক্ষম না হয়, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর এবং এভাবে ক্রমান্বয়ে সমগ্র বিশ্বের প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় (যখন

কুফফারদের কোনো আগ্রাসন থাকে না, তখন) জিহাদ ফরযে কিফায়া।" (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, খ. ৪, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬, রদ্দুল মুহতার, খ.৩, পৃ. ২৩৮)

➢ (শাইখুল জিহাদ) হযরত আব্দুল্লাহ্ আয্যাম রাহি. বলেন,

ففي هذه الحالة اتفق السلف والخلف والفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الإسلامية إطلاقا أن الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة التي هاجمها الكفار وعلى من قرب منهم .....

"যদি কাফেররা মুসলিমদের ভূমিতে প্রবেশ করে তাহলে সলফে সালেহীনগণ, তাদের উত্তরসূরীগণ, চার মাযহাবের আলেমগণ (হানাফী, মালেকী, শাফেঈ, হাম্বলী), মুহাদ্দীসগণ এবং মুফাস্সীরগণ এবং ইসলামের ইতিহাসের সর্বকালের, সর্বমতের আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, এই অবস্থায় জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। ফরযে আইন ঐ সকল মুসলিমদের উপর যাদের ভূমি কাফেররা আক্রমন করেছে অথবা যারা আক্রান্ত মুসলিম ভূমির কাছাকাছি রয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সন্তানকে তার পিতা-মাতার কাছ থেকে, স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছ থেকে, দাসকে তার মনিবের কাছ থেকে এবং দেনাদারকে তার পাওনাদারের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। যদি ঐ আক্রান্ত অঞ্চলের মুসলিমরা সৈন্যের ঘাটতির কারণে অথবা অক্ষমতা কিংবা গাফলতির কারণে কাফেরদেরকে তাদের ভূমি হতে বিতাড়িত করতে না পারে তখন এই ফরযে আইনের হুকুমটি ঐ আক্রান্ত ভূমির নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর বর্তাবে, যদি তারাও সক্ষম না হয় তাহলে তার নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর প্রযোজ্য হবে। আর যদি তাদেরও গাফলতি অথবা জনশক্তির ঘাটতি থাকে তাহলে পরবর্তীতে তার পার্শ¦বর্তী এলাকার মুসলিমদের উপর এই হুকুমটি বর্তাতে থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ঘাটতি পূরণ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটি চলতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে এটি পুরো দুনিয়ার মুসলিমদের উপর ফরযে আইন হয়ে যাবে।" (আদ্দিফা' আ'ন আ'রাদিল মুসলিমীন, পৃ:২৭)

➢ (হানাফী) আল্লামা ইবনু নুজাইম আল-মিসরী রহ. বলেন,

امرأة مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من الاسر

"যদি প্রাচ্যের মধ্যে একজন মুসলিম মহিলা কারাগারে বন্দী থাকেন, তাহলে পাশ্চাত্যবাসীর উপর ওয়াজিব হবে তাকে বন্দীত্ব থেকে মুক্তি করা।" (আল-বাহরুর রায়েক, খণ্ড:১৩, পৃ. ২৯০)

➢ (শাফে'ঈ) ইমামুল হারামাইন রহ. বলেন,

فأما إذا وطئ الكفار ديار الإسلام فقد اتفق حملة الشريعة قاطبة على أنه يتعين على المسلمين أن يخفوا ويطيروا إلى مدافعتهم زرافات و وحدانا حتى انتهوا إلى أن العبيد ينسلون عن ربقة طاعة السادة، ويبادرون الجهاد على الاستبداد، وإذا كان هذا دين الأمة ومذهب الأئمة فأي مقدار الأموال في هجوم أمثال هذه الاهوال لو مست إليها الحاجة وأموال الدنيا لو قوبلت بقطرة دم لم تعد لها ولم توازها

"ইসলামী শরীয়ার সকল কর্ণধারগণ একমত পোষণ করেছেন যে, যদি কাফেররা কোনো ইসলামী ভূ-খণ্ডে অবতরণ করে তখন সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব হয়ে যায় যে, তারা দ্রুতবেগে, ক্ষিপ্র গতিতে একাকী বা দলবদ্ধভাবে শত্রু প্রতিরোধে বের হয়ে পড়বে। এমনকি তারা এ মতে উপনীত হয়েছেন যে, গোলামরা তাদের মালিকের আনুগত্য মুক্ত হয়ে যাবে এবং সকলে স্ব-উদ্যোগে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে। যখন এটাই উম্মাহর দ্বীন, আইম্মাদের মাযহাব তখন প্রশ্ন আসে, এ ধরনের ভয়ঙ্কর আক্রমণের ক্ষেত্রে কী পরিমাণ মাল ব্যবহার করতে হবে? (এর জবাব হল) যদি একফোঁটা রক্ত রক্ষার জন্য পৃথিবীর সকল অর্থ ব্যয় করতে হয় তাহলে এ রক্ত ফোঁটার সামনে সকল অর্থ নগণ্য ও তুচ্ছ বলে পরিগণিত হবে।" (গিয়াছাতুল উমাম, পৃ. ১৯১)

- হযরত আব্দুল্লাহ্ আয্যাম রাহি. আরো বলেন,

ولذلك الجهاد فرض عين الآن على الأمة الإسلامية جمعاء، ليس من الآن، بل من يوم سقطت الأندلس، من ১৪৯২ ميلادي، قبل خمس قرون صار فرض عين، وخلال خمس قرون الأمة كلها آثمة، لأنها لم ترجع الأندلس، الآن الجهاد فرض عين، ولا ينتهي بتحرير أفغانستان، ولا بتحرير فلسطين، ينتهي فرض العين عندما نرجع كل بقعة، كانت في يوم من الأيام تحت راية لا إله إلا الله، فالجهاد فرض عين عليك حتى تموت، كما أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان إلا إذا مات فالجهاد لا يسقط على الإنسان إلا إذا مات أبدا، احمل سيفك وامض في الأرض، لا ينتهي فرض العين أبدا حتى تلقى الله، وكما أنه لا يجوز أن تقول صمت العام الماضي هذه السنة أريد أن أستريح، أو صليت الجمعة الماضية وهذه الجمعة أريد أن أستريح، كذلك لا يجوز أن تقول جاهدت السنة الماضية وهذه السنة أريد أن أستريح.

"......এ কারণেই জিহাদ গোটা মুসলিম উম্মাহর উপর ফরযে আইন হয়ে আছে। আর তা কেবল এখন থেকে নয় বরং যেদিন ইসলামী আন্দালুস তথা স্পেনের পতন ঘটেছে, সেই ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ তথা আজ থেকে পাঁচ শতাব্দী ধরে ফরযে আইন হয়ে আছে। আর গোটা এই পাঁচশত বছর যাবত মুসলিম উম্মাহ সামগ্রিকভাবে গুনাহগার হয়ে আছে কারণ আন্দালুস এখনো পুনরুদ্ধার হয়নি।

আজ যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে আছে তখন তা কেবল আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিন স্বাধীন হবার মাধ্যমেই আমাদেরকে দায়িত্বমুক্ত করবে না। বরং ফরজ দায়িত্ব তখনই পুরোপুরি পালিত হবে যখন এমন প্রতিটি ভূ-খণ্ড পুনরুদ্ধার হয়ে যাবে, একদিনের জন্য হলেও যেখানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পতাকা উচ্চকিত ছিল।

অতএব আপনার উপর জিহাদ ফরয থাকবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, যেমনিভাবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষ নামাজের ফরজ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে না। অতএব মৃত্যু অবধি সকল মানুষের উপর জিহাদ ফরজে আইন। অতএব আপনি আপনার তরবারি হাতে নিন এবং জমিনের উপর বিচরণ করতে থাকুন। আল্লাহর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটবার আগ পর্যন্ত এই ফরজে আইন দায়িত্ব শেষ হবে না।

আর যেমনিভাবে কারো জন্য এ কথা বলা জায়েজ নেই যে, আমি গত বছরের সিয়াম পালন করেছি, তাই এ বছর আমি বিশ্রাম নিতে চাই অথবা আমি গত সপ্তাহের জুমার সালাত আদায় করেছি অতএব এই সপ্তাহে আমি বিশ্রাম

নিতে চাই। একই ভাবে এ কথা বলাও জায়েজ হবে না যে, আমি গত বছর জিহাদ করেছি তাই এ বৎসর আমি বিশ্রাম নিতে চাই।" (نصيحة الأمة الموحدة بحقيقة الأمم المتحدة: শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী রাহিমাহুল্লাহ, পৃ. ১৬, ১৭)

প্রিয় ভাই!

উপরের আলোচনা হতে কি আমরা এটাই বুঝতে পারছি না যে, বর্তমান যামানাই সেই যামানা, যখন পৃথিবীর প্রতিটি সক্ষম মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে?

সারা পৃথিবী জুড়ে আজ মুসলমানরা কুফ্ফার কর্তৃক আক্রান্ত। যেই সকল মর্দে মুজাহিদ জিহাদ করছেন, তারা এই সকল কুফ্ফারদের প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। কারণ হচ্ছে- মুজাহিদদের সংখ্যার অপ্রতুলতা, শক্তি সামর্থ্যের ঘাটতি, অন্যদিকে ক্রুসেডাররা মুসলিম মুজাহিদদের থেকে সংখ্যায় অনেক বেশি, তারা অনেক বেশি সশস্ত্র, তাদের অস্ত্রগুলো অনেক বেশি উন্নত ও আধুনিকতাসম্পন্ন। এক কথায়, বর্তমানে পৃথিবীতে যেখানে যেখানে মুজাহিদ বাহিনী আছে, তা কুফ্ফারদের প্রতিরোধের জন্য যথেষ্ট নয়।

এসকল কারণে, এই ফরজ হুকুম বিশ্বের অপরাপর সকল মুসলমানের উপর বর্তিয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না কুফ্ফারদের আগ্রাসন বন্ধ হবে, মুসলিম ভূমিগুলো কুফ্ফারদের হাত হতে মুক্ত না করা হবে, কুফ্ফারদের কারাগার হতে শেষ ভাইটি কিংবা শেষ বোনটি মুক্ত হবে, মুসলিম দেশগুলোতে মুরতাদ সরকারগুলোকে হটানো হবে, সারা বিশ্বের সকল মুসলমানদের জন্য নিরাপদ আবাস, একক রাষ্ট্র, ইসলামী খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, সারা পৃথিবীর মুসলমান পুনরায় শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো মুসলমান এই ফরয হুকুম থেকে বাঁচতে পারবে না।

"যখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে শত্রু প্রতিরোধের প্রয়োজন তীব্র হয়, তখন নিঃসন্দেহে জিহাদ সকল ইবাদত থেকে উত্তম। যেমন খন্দকের যুদ্ধে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চার ওয়াক্ত নামায কাযা হওয়ার ঘটনা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার।" (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, খ.৪, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬)

মুহতারাম ভাই!

তাহলে আমরা একটু চিন্তা করি, জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় যদি জিহাদ করতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে আমরা কী করছি? আমরা জিহাদকে কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছি??

বর্তমান সময়ে, মুসলিম উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে, জিহাদ বাদ দিয়ে কেবল আমরা যদি মাদরাসা, খানকাহ, তাবলীগ, রাজনীতি, কিতাবাদি রচনা, চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদি অন্যান্য দ্বীনী খেদমত কিংবা দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত থাকি, তাহলে জিহাদ করবে কে ভাই???

প্রিয় ভাই! আমি যেই মেহনতই করি না কেন, আমার মেহনতের পাশাপাশি আমাকে যেভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে জিহাদও করতে হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমরা যদি বর্তমান যুগে জিহাদকে শুধু এর শাব্দিক অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চাই, কিংবা কলমের জিহাদ, পিতা-মাতার খেদমত কিংবা মাদরাসায় দরস্ দেয়ার মাধ্যমে, নফসের ইসলাহ করা, গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

ইত্যাদি কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে যদি মনে করি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ফরজিয়াত আদায় হয়ে যাবে, তাহলে আমাদের জন্য এটি হবে মারাত্মক ভুল ও ভয়ানক আত্মঘাতী একটি সিদ্ধান্ত!!!

আচ্ছা ভাই! আপনি কি খাইরুল কুরুন ও পরবর্তী সলফে সালেহীনদের যুগে এই সকল চিন্তা চেতনা খুঁজে পেয়েছেন??

হাদীসশাস্ত্র কিংবা ফিকহের কোনো কিতাবে 'কিতাবুল জিহাদে' কি ইলমী খেদমত, তাযকিয়া, সিয়াসাত (রাজনীতি) কিংবা দাওয়াতের ফাযায়েল বা মাসায়েল বর্ণনা করা হয়েছে, নাকি ক্বিতাল তথা সশস্ত্র যুদ্ধের ফাযায়েল বর্ণিত হয়েছে??

হাদীসশাস্ত্র কিংবা ফিকহের কোন্ কিতাবে 'কিতাবুল জিহাদে' সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া জিহাদের ভিন্ন অর্থ করা হয়েছে???

তাহলে ভাই, কেন আমরা জিহাদের 'ভিন্নার্থ' তালাশ করে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছি??? অথচ নবীওয়ালা মেজাজ (প্রকৃত দ্বীন) কি এটাই ছিল না যে, জিহাদের প্রয়োজনে একান্ত অপারগতায় নামায ছুটে যেতে পারে, কিন্তু জিহাদের ব্যাপারে কোনো গাফলতী চলবে না??? কেননা নামায যে শরীয়তের বিধান, খোদ সেই শরীয়ত এবং পাশাপাশি গোটা উম্মতের অস্তিত্ব নির্ভর করে এই জিহাদের উপর। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের (আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের) প্রতি আহ্বান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন।" (সূরা আল আনফাল ৮:২৪)

কুফরের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ

প্রিয় ভাই! আপনি জানেন কি, কুফরের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ কী?

(জাহেরী ফকীহ) আল্লামা ইবনে হাজাম রহ. বলেন,

ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار، وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم

"কুফরের পর সবচেয়ে জঘন্য গোনাহ হল, মুসলিমদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে নিষেধ করা এবং মুসলিমদের পবিত্র স্থানকে তাদের কাছে অর্পণ করতে আদেশ করা।" (মুহাল্লা, খণ্ড:৭, পৃ. ৩০০)

(فإن هجم العدو) أي غلب (ففرض عين) يكفر جاحده ، كما في الإختيار وغيره. اهـ. الدر المنتقي :٢/ ٤٠٨

'অকস্মাৎ শত্রু আগ্রাসন চালালে জিহাদ ফরযে আইন।'- এটা অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যাবে। যেমনটি ইখতিয়ার ও অন্যান্য কিতাবে আছে।' (আদ্দুররুল মুনতাকা: ২/৪০৮)

একাকী হলেও জিহাদ করতে হবে

প্রিয় ভাই!

আমরা আরো ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করি, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে, জিহাদ এমনভাবে ফরয হয়ে গিয়েছে যে, যদি জিহাদ করার মতো একজন উম্মতও থাকে, তবে তাকেও জিহাদ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفۡسَكَۚ

"(হে নবী!) আপনি (একা হলেও) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুন; আপনার আপন সত্তা ব্যতীত অন্য কারো দায় আপনার উপর বর্তাবে না (আপনার ডাকে অন্য কেউ যদি যুদ্ধ না করে তাহলে এজন্য আপনি দায়ী নন)।" (৪ সূরা নিসা: ৮৪)

ইবনে আতিয়্যাহ আন্দালুসি রাহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন,

هذا أمر في ظاهر اللفظ للنبي عليه السلام وحده، لكن لم نجد قط في خبر أن القتال فرض على النبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة مدة ما، المعنى- والله أعلم- أنه خطاب للنبي عليه السلام في اللفظ، وهو مثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه، أي أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول له فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر أن يجاهد ولو وحده،

[ابن عطية ,تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز৮৬/২]

"বাহ্যত দেখা যায়, এ আয়াতের আদেশ শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একার জন্য। তবে কোনো হাদীসেই আমরা এ কথা পাইনি যে, কোনো যামানায় জিহাদ উম্মত বাদে শুধু রাসূলের উপর ফরয ছিল। (কাজেই) ওয়াল্লাহু আ'লাম- (আয়াতে) বাহ্যত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করা হলেও এটি পৃথক পৃথক সকলকে বলাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! আপনি এবং আপনার উম্মতের সকলের প্রতিই নির্দেশ হলো, "তুমি (একা হলেও) আল্লাহর রাস্তায় ক্বিতাল (যুদ্ধ) কর। তোমার উপর তোমার নিজের ছাড়া অন্য কারো দায়ভার বর্তাবে না।"

এজন্য প্রতিটি মুমিনের এই অনুভূতি রাখা উচিত যে, সে একা হলেও জিহাদ করবে।

একই অর্থ বহন করছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণী,

والذي نفسي بيده، لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد

(হে সাহাবীরা! তোমরা যদি মূর্তি-পূজারী মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে ভয় পেয়ে থাক, তাহলে শুনে নাও!) যে সত্তার হাতে আমি মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর নামে শপথ করে বলছি, কেউ না গেলেও আমি একাই তাদের মোকাবেলার জন্য বদরে যাবো। (দ্বিতীয় বদরের যুদ্ধের ঘটনা, আল মাগাযি লিল ওয়াকিদি, ৩৮৭/১)

দেফায়ী যুদ্ধের জন্য শর্ত

প্রিয় ভাই!

এখানে একটি প্রশ্ন রয়ে গেল, দেফায়ী বা প্রতিরক্ষামূলক বা প্রতিরোধমূলক" (Defensive) জিহাদের জন্য শর্ত কি?

ফিকাহ শাস্ত্রের সকল মাযহাবের সকল ইমামগণ এই ব্যাপারে একমত যে, দেফায়ী বা প্রতিরক্ষামূলক বা প্রতিরোধমূলক" (উবভবহংরাব) জিহাদের ক্ষেত্রে (মা'জুর ব্যতীত সক্ষম সকলের জন্য) একমাত্র শর্ত হচ্ছে -**ঈমান**। যে নিজেকে মুসলমান বা ঈমানদার দাবী করবে, তাকেই এই জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

আল্লামা ইবনু নুজাইম আল-মিসরী (রহঃ) বলেন:

ولا بد من قيد آخر وهو الاستطاعة في كونه فرض عين فخرج المريض المدنف، أما الذي يقدر على الخروج دون الدفع ينبغي أن يخرج لتكثير السواد لان فيه ارهابا،

"তবে ফরজে আইন হওয়ার ক্ষেত্রে (ঈমানের সাথে) আরেকটি শর্ত প্রয়োজন, আর তা হল সক্ষমতা। অন্যথায় কঠিন রুগ্ন ব্যক্তিকেও বের হয়ে পড়তে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু বের হতে সক্ষম প্রতিরোধ করতে নয়, তার জন্যও উচিৎ হলো সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বের হয়ে পড়া। কেননা এর মধ্যেও রয়েছে শত্রুদের জন্য ত্রাস। [আল বাহরুর রায়েক, খন্ড: ১৩, পৃষ্ঠা:২৮৯]

এখন, দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, কতটুকু ঈমান অর্জন হলে বা একজন মুসলমানের ঈমান কতটুকু মজবুত হলে বা এক কথায় কতটুকু ঈমান থাকলে একজন মুসলমানের উপর দেফায়ী বা প্রতিরক্ষামূলক বা প্রতিরোধমূলক" (Defensive) জিহাদ ফরযে আইন হয়? বা কতটুকু ঈমান থাকলে দেফায়ী জিহাদের জন্য একজন মুমিনকে তার ঘর ছেড়ে বের হতে হবে? তার পরিবার পরিজন ছাড়তে হবে?

এই ব্যাপারেও ফুকাহায়ে কেরাম একমত যে, যতটুকু ঈমান অর্জন করলে একজন ব্যক্তির উপর নামায ফরয হয়, ততটুকু ঈমান হলেই তাকে জিহাদ করতে হবে। এককথায়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনলেই জিহাদ ফরযে আইন হবে।

- **কিছু 'বাস্তব সত্য' কথা:**

প্রিয় ভাই! উপরের আলোচনা থেকে আমরা কি বুঝতে পেরেছি-

বর্তমান যামানায় এই কথাগুলো বলার কোনো সুযোগ নেই,

১. আমরা এখন ঈমান বানানোর মেহনত করছি, আমাদের ঈমান মজবুত হলে বা ঈমান সেরকম (জিহাদ করার মত) হলে আমরা জিহাদ করব।

২. আমরা এখন ইখলাস অর্জন করার মেহনত করছি, ইখলাস অর্জিত হলে আমরা জিহাদে নামব।

৩. আমার এখনো ইসলাহ-ই হয়নি জিহাদ করব কিভাবে? আগে নফসের ইসলাহ, পরে জিহাদ।

৪. আমি তো নওমুসলিম/নওমুসলিমের মত; ইসলামের তেমন কিছু বুঝি না, এলেম-কালাম তেমন জানা নেই, তিলাওয়াতই সহীহ না, তাহলে যুদ্ধ/জিহাদ করব কিভাবে?

৫. আগে পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তানের হক আদায় করতে হবে, তিলাওয়াত সহীহ/ঠিক করতে হবে (এগুলো ফরয দায়িত্ব), পরে জিহাদ করব।

[জবাব: একাধিক ফরয দায়িত্ব একসাথে সামনে হাযির হলে যেটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটিকে প্রাধান্য দিতে হবে ও আগে আদায় করতে হবে। জিহাদের সাথে আরো অন্য ফরয একসাথে সামনে আসলে জিহাদকে প্রাধান্য দিতে হবে।]

৬. **খন্ডিত ইসলামের দর্শন:** উসমানী খিলাফাহর পতনের পর মুসলিম সমাজ শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। যে যতটুকু পেরেছে ইসলামকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করেছে। এক পর্যায়ে যে যেটা করছেন বা ইসলামের যে অংশের উপর আমল করছেন, সেটাকে তিনি বড় মনে করা শুরু করেছেন। আরো খারাপ ব্যাপার হল, অনেক মুসলমান ভাই দ্বীনের একটি অংশে মেহনত করে মনে করছেন, তিনি পরিপূর্ণ ইসলামের উপর আমল করছেন। যেমন: জিহাদ বাদ দিয়ে কোনো কোনো ভাই ইলম চর্চা নিয়ে ব্যস্ত থেকে, কিংবা দাওয়াতের মেহনত করে, কিংবা আত্মশুদ্ধির মেহনত করেই ভাবছেন তিনিই দ্বীনের সবচেয়ে দামী মেহনত করছেন, সবচেয়ে বড় 'নবীওয়ালা কাম' করছেন। কিংবা তিনি সেটাকেই পরিপূর্ণ দ্বীন মনে করছেন। অন্য মেহনতকে ছোট করে দেখছেন কিংবা অপ্রয়োজনীয় মনে করছেন, কিংবা বাকীগুলোর বিরোধিতা করছেন। বিরোধীতা না করলেও বলছেন, "দ্বীনের অনেক শাখা-প্রশাখা। সবাই তো আর সব করবে না বা করতে পারবে না। একেকজন একেক কাজ করবে। তাই কেউ কেউ জিহাদ করছে আর আমি অমুক মেহনত করছি, যার সাথে আমৃত্যু লেগেই থাকব। আমি জিহাদ করাটা সমর্থন করি, কিন্তু দ্বীনের সকল শাখায় একসাথে কাজ করা সম্ভব নয় বিধায় আমি যেটা করছি সেটাই করতে থাকব। অন্য মেহনত (যেমন জিহাদ) করব না।"

[জবাব: অথচ নফীরে আম বা জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় অন্য কোনো মেহনতের অজুহাতে জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকা বৈধ নয়; সকলকেই 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র কাজে শরীক হতে হবে। যে যেখানেই থাকুক, দ্বীনী যে কোন খেদমতই করুক না কেন, যে পেশাতেই থাকুক না কেন, সকলকেই জিহাদ করতে হবে, জিহাদে অংশগ্রহণ করার পর আমীর যাকে যে কাজে/দ্বীনী খেদমতে নিয়োজিত করবেন তখন তিনি সে কাজ করবেন; যেমনটি আমরা তাবুক, খন্দক, উহুদ ইত্যাদি জিহাদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই।]

৭. আমি যেই মেহনত করছি, এটিই সবচেয়ে দামী মেহনত। এর উপর অন্য কোনো মেহনত নেই। [জবাব: অথচ, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া হলো 'আল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা।" (মুসতাদরাকে হাকেম ২৪০৮ হাদীসটি সহীহ, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী। মুসনাদে আহমদ ২২০৬৪, সুনানে বাইহাকী ১৮২৫৩)

عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، لا يناله الا افضلهم

হযরত আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ইরশাদ করেন- "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। এ আমল ঐ ব্যক্তিই সম্পাদিত করতে পারবে, যে সর্বোত্তম/আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অত্যধিক প্রিয়।" (মু'জামে কাবীর, তাবরানী-৮/২২৪)

عن حنظلة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير أعمالكم الجهاد

হযরত হানযালা কাতিব (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, "তোমাদের আমল সমূহের মধ্যে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট আমল।" (তারিখে ইবনে আসাকির ১/৪৬৮)

অর্থাৎ জিহাদের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, মর্যাদাবান, সওয়াবের ও শানদার কোনো আমল ইসলামে নেই। আমরা যারা এর ব্যতিক্রম বলি বা মনে করি, তাদের ভয় করা দরকার, আমার কথা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর কথার বিপরীত হয়ে যাচ্ছে।]

৮. আমি জিহাদ করি সেটি আমার পিতা-মাতা পছন্দ করেন না। তাহলে পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট করে, তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে কিভাবে জিহাদ হবে?

[জবাব: ভাই! এটা তো ফরযে কিফায়া জিহাদের ক্ষেত্রে শর্ত; বর্তমানে জিহাদ তো ফরযে আইন, তাই সন্তানের উপর পিতা-মাতার অনুমতি বা সন্তুষ্টির প্রয়োজন নেই। আমরা কি পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করব? অথচ এমনটি করতে শরীয়ত অনুমতি দেয়নি। প্রিয় রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . المصنف لابن أبي شيبة :٣٤٤٠٦

"খালেকের নাফরমানী করে বান্দার আনুগত্য করা যাবে না।"

৯. বর্তমানে মুসলমানদের খিলাফাহ নেই, আমীর নেই; তাই জিহাদ-ও নেই। আগে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হোক, পরে খলীফা যখন হুকুম দিবেন, তখন জিহাদ করব। [জবাব: ইসলামী রাষ্ট্র না থাকলে বা খলীফা, রাজা কিংবা শাসকের অনুমতি ছাড়া জিহাদ করা যাবে না বা এই অজুহাতে জিহাদ না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে- এরকম যারা দাবী করেন, তাদের এই দাবীকে আমরা ভুল মনে করি, কেননা, শরীয়তে এ সকল উক্তির কোনো দলীল/ভিত্তি নেই। রাসূল ﷺ, সাহাবায়ে কেরামসহ সালাফে সালেহীনের কেউ জিহাদের ব্যাপারে এ রকম কোনো শর্ত আরোপ করেননি। আল্লাহর বিধানে নেই, এমন বিষয়কে শর্ত হিসেবে জুড়ে দেয়া আল্লাহর বিধানকে অকার্যকর করার নামান্তর।

আরে ভাই! জিহাদ না করলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হবে কিভাবে, কে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করবে আর কেই-ই বা খলীফা হবে!!]

১০. আমরা এখন দুর্বল, আমাদের অস্ত্র নেই, প্রশিক্ষণ নেই; জিহাদ করব কিভাবে?

[জবাব: জ্বি ভাই! জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেলে একাকী হলেও, জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকা ফরযে আইন। মুজাহিদ ভাইদের হক্ব জামাত তালাশ করতে থাকা। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক প্রস্তুতি নেয়া এবং সম্ভব হলে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নেয়া। যদি অস্ত্র, প্রশিক্ষণ বা অন্যান্য দুর্বলতার জন্য জিহাদ শুরু করা সম্ভব না হয় তাহলে এগুলোর সংশোধন করা ফরয হয়ে যায়। এটা স্বতন্ত্র একটা ফরযও বটে। আমরা কি সর্বাত্মক এই প্রস্তুতি যথাযথভাবে নিচ্ছি?]

প্রকৃতপক্ষে, এ ধরনের উক্তি বা আকীদা এগুলো সবই আত্মপ্রবঞ্চনা। 'হিকমাহ' কিংবা 'অজুহাতে'র নামে 'জিহাদ হতে পলায়ন'। আল্লাহ্ পাক হেফাযত করেন। আমীন। আসলে ভাই, এভাবে নিজেকে নিজে আমলের নামে ধোঁকা দেয়া হয়। নিজেকে একটি বুঝ দেয়া হয় যে, আলহামদুলিল্লাহ, আমি তো একটি মেহনত করছিই, তাই অন্য মেহনত (বিশেষতঃ জিহাদ) করার কোনো প্রয়োজন আমার নেই। তাই আমাদের ভয় করা উচিত, আমরা নিজেরা শরীয়তের অনুগামী না হয়ে প্রকারান্তরে দ্বীন ও শরীয়তকে নিজেদের নফসের অনুগামী বানিয়ে ফেলছি কিনা!!!

যদি শত্রুর মোকাবেলা করার সক্ষমতা না থাকে

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন:

وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُم وَآخَرينَ مِن دونِهِم لا تَعلَمونَهُمُ اللَّهُ يَعلَمُهُم وَما تُنفِقوا مِن شَيءٍ في سَبيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيكُم وَأَنتُم لا تُظلَمونَ

"আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলম করা হবে না।" (সূরা আনফাল ৮:৬০)

প্রিয় ভাই! জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার পর যদি শত্রুর মোকাবেলা করার সক্ষমতা থাকে, তাহলে অবশ্যই তাৎক্ষণিক বেরিয়ে পড়া এবং শত্রুর মোকাবেলা করা ফরজ। পক্ষান্তরে মুসলিমদের যদি জিহাদের সামর্থ্য না থাকে, তাহলে সামর্থ্য অর্জন করা পর্যন্ত জিহাদ বিলম্বিত করার সুযোগ আছে। ফুকাহায়ে কেরামের অনেকেই তা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া সামর্থ্যের বাইরে শরীয়ত কোনো বিধানই বান্দার উপর আরোপ করে না। এটি শরীয়তের মানসূস ও সর্বস্বীকৃত একটি নীতি।

كما يجب على المعسرالسعي في وفاء دينه وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بخلاف الاستطاعة قي الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها لأن الوجوب هنا لا يتم إلا بها. . مجمع الفتاوى: ٢٨/٢٥٩

"যেমনিভাবে অভাবী ঋণগ্রস্তের উপর ওয়াজিব, ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করা, যদিও নগদে তার সামর্থ্যের চেয়ে অতিরিক্ত পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হবে না এবং সামর্থ্য না থাকার কারণে জিহাদ বিলম্বিত হওয়ার ক্ষেত্রে তেমনিভাবে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ, শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত করা ওয়াজিব। কারণ ওয়াজিব যা ব্যতীত আদায় করা যায় না, তাও ওয়াজিব। পক্ষান্তরে হজ্জ ইত্যাদির সামর্থ্য। এখানে সামর্থ্য অর্জনের চেষ্টা করা ওয়াজিব নয়। কারণ, এখানে সামর্থ্য ব্যতীত বিধানটি ওয়াজিবই হয় না।" (মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/২৫৯)

শায়খ সালিহ আলফাওযান রহ. বলেন,

إما إذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار فهم يؤجلون الجهاد إلى أن يقدروا. . الجهاد وضوابطه الشرعيه،

ص:٤٧

"মুসলিমরা যদি কাফেরদের সঙ্গে কিতালের সামর্থ্য না রাখে, সামর্থ্য হওয়া পর্যন্ত কিতাল বিলম্বিত করবে।"

তবে এই সুযোগ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য! জিহাদ ফরজ হওয়ার পর তা বিলম্বিত করার এই সুযোগটা শুধুই প্রস্তুতি গ্রহণ ও সামর্থ্য অর্জন করার জন্য, বসে থাকার জন্য নয়। যে সামর্থ্যরে অভাবে শত্রুর মোকাবেলা করা যাচ্ছে না, এসময় তা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ফরজ।

ইমাম আবুল হাসান তুসূলি রহ. বলেন,

قال- سيدي- "العربي الفاسي": لا يبرأ المسلمون من عهدة المدافعة، ونصرة من عجز، إلا إذا استفرغوا الوسع في إزاحة الكفار من المدائن التي أخذوها للمسلمين، (فلو نازلوها فلم تفتح، وجب عليهم معاودتها كلما أكنهم ذلك، حتى يفتحيا الله عليهم، ولا فرق في ذلك بين المدائن المأخوذة للمسلمين حديثا أو قديما)

لأن الوجوب والتعيين متعلّق بالمسلمين، لا بقيد زمان، ولا مكان، إلا أنه: يتيّن على الحاضر زمانا ومكانا، على ما مرّ ترتيبه - فانا (فإذا) لم يفعل لعذر، أو لغيرعذر، وجب على غيره ممن يليه

كما قاله "ابن عرفة"، عن "المازري": (وترك من تقدم من أئمة المسلمين مدائن الإسلام في أيدي الكفار، هم بذلك في محل محل العصيان، لا في محل الأقتداء والاستنان، وقديما قيل: "أسلك سبيل الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، واترك طريق الردى، ولا يضرك كثرة الهالكين")

١ اهـ كلامه.- أجوبة التسولى عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد، ص: ٢٧٩-٢٨٠

"সাইয়িদি ফাসি রহ. বলেছেন, মুসলিমরা অক্ষমদের সাহায্য ও শত্রু প্রতিহত করার দায় থেকে কেবল তখনই মুক্ত হতে পারবে, যখন তারা মুসলিমদের ওই সকল শহর থেকে কাফেরদের বিতাড়িত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবে, যেগুলো কাফেররা দখল করে নিয়েছে।.....চাই তারা মুসলিমদের এই শহরগুলো নতুন করে দখল করুক বা আগে দখল করে থাকুক।

কারণ, ফরজে আইনটা মুসলিমদের সঙ্গে সম্পৃক্ত; স্থান ও কালের শর্তমুক্ত। হ্যাঁ, ইতিপূর্বে আলোচিত বিন্যাস অনুসারে তা আদায় করবে তারাই, যারা স্থান কালের বিচারে উপস্থিত। তারা যদি ওজরে কিংবা বিনা ওজরে না করে, যারা তাদের নিকটবর্তী, তাদের উপর ফরজ।

যেমন ইবনে আরাফা রহ. মাযুরি রহ. এর উদ্বৃতিতে বলেছেন, পূর্ববর্তী শাসকদের জন্য ইসলামী শহরগুলো কাফেরদের হাতে ছেড়ে রাখার ক্ষেত্রে তারা গুনাহগার। এখানে তাদেরকে আদর্শ বানানো বা তাদের অনুসরণ করার সুযোগ নেই। বহুকাল আগেই বলা হয়েছে, তুমি সঠিক পথে চল। এ পথের পথিক কম হওয়া তোমার ক্ষতি করবে না। বিভ্রান্ত পথ ছাড়। সে পথে ধ্বংসপ্রাপ্তদের আধিক্যও তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।" (আজবিবাতুত তুসূলি: ২৭৯-২৮০)

প্রিয় ভাই! সতর্ক হোন!

১. আমরা যারা জিহাদ করছি না, জিহাদ করার জন্য যথাসাধ্য ও যথার্থ প্রস্তুতি গ্রহণ করছি না, জিহাদ করার চিন্তা-ফিকিরও করছি না, আমরা একটি বিষয় চিন্তা করি, ভাই! আমরা যদি এটা বুঝে থাকি, 'জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে', তাহলে একটু লক্ষ্য করি-

আমাদের দ্বারা শরীয়তের একটি ফরযে আইন হুকুম পরিত্যাগ করা হচ্ছে। ওযর বা অপারগতা বশতঃও যদি এক ওয়াক্ত নামায ছুটে যায় বা রমজান মাসের একটি রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, তবুও আমরা কতই না আফসোস করি, নিজেকে কতই না ধিক্কার দেই। অথচ আমার দ্বারা শরীয়তের আরেকটি ফরযে আইন হুকুম ছুটে যাচ্ছে সেদিকে আমি কোনো ভ্রুক্ষেপই করছি না।

তাই আমরা যারা জিহাদের মেহনত করছি না, ভয় হয়, আমরা আল্লাহ পাকের কাছে ফরয তরককারী সাব্যস্ত হয়ে যাচ্ছি কিনা, আমার দ্বারা ফরয তরকের গুনাহ হয়ে যাচ্ছে কিনা, যদিও আমরা দ্বীনী অন্য কোনো মেহনতের সাথে জড়িত!!

যদিও আমি আলেম হই, জিহাদ পরিত্যাগ/না করার কারণে আমি আল্লাহ পাকের কাছে হয়ে যেতে পারি ফরয তরককারী আলেম। যদিও আমি আমার অন্তর ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের অন্যান্য সকল গুনাহ থেকে পবিত্র 'সালেক' হই, তবুও আমি জিহাদী মেহনত না করার অপরাধে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে ফরয তরককারী সাব্যস্ত হয়ে যেতে পারি। যদিও আমি আমার যিন্দেগীর সকল কিছু কুরবানী করনেওয়ালা দাঈ কিংবা মুবাল্লিগ হই আর জিহাদ না করি, তাহলেও আল্লাহ তাআলার দরবারে জিহাদ না করার অপরাধে আমি পাকড়াও হতে পারি। তাই, এই ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করি।

আমি আলেম হয়েছি, তাই বলে কি ভাই আমার উপর জিহাদের হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে? না, হয়নি। কেবল মাদরাসার খেদমত করে আমি হয়ত আল্লাহর দরবারে পার পাব না। তাই আমাকে ইলমী ময়দানে বিচরণের পাশাপাশি জিহাদের ময়দানেও বিচরণ করতে হবে, ইনশাআল্লাহ!

আমি হক্কানী পীর সাহেবের মুরিদ কিংবা খলীফা হই, তাই বলে কি ভাই আল্লাহ্ তা'আলা আমার থেকে 'জিহাদ' তলব করবেন না? অবশ্যই করবেন। কেননা, নফসের তাযকিয়া যেমনি ফরয, এটিও তো বর্তমানে ফরযে আইন মেহনত। তাই, ভাই! তাযকিয়ার মেহনতের পাশাপাশি আমাকে অবশ্যই জিহাদের মেহনত করতে হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমি যদি দাঈ কিংবা মুবাল্লিগ হই, ভাই! আমাকেও মনে রাখতে হবে, দাওয়াতের হুকুম যিনি করেছেন, জিহাদের হুকুমও তিনিই দিয়েছেন। তিনি কি আমাকে এমনি এমনি ছেড়ে দিবেন? জিহাদের হিসাব নিবেন না? জিহাদ ত্যাগ করে যদি আমি 'ফরয তরককারী' সাব্যস্ত হই, তাহলে আল্লাহর শাস্তি আমাকেও পাকড়াও করতে পারে, ভাই। তাই, ভাই, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের পাশাপাশি আমাদেরকে মজবুতির সাথে জিহাদের মেহনতও করতে হবে, ইনশাআল্লাহ!

এইভাবে, আমরা যে যাই করি না কেন, যেখানেই থাকি না কেন, আমাদেরকে যার যার কর্ম, পেশা বা মেহনতের পাশাপাশি অবশ্যই জিহাদের মেহনতের সাথে জুড়তে হবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য কবুল করুন। জিহাদ করা আমাদের জন্য সহজ করে দিন। আমীন।

আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের মধ্যে জিহাদকারীকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি (জিহাদের ব্যাপারে) তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি।" (৪৭ সূরা মুহাম্মাদ:৩১)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٤٢﴾

"তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ তাআলা এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্য্যশীল।" (৩ সূরা আলে ইমরান: ১৪২)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا۟ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

"তোমরা কি মনে কর, তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নিবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।" (সূরা তাওবাহ্ ০৯:১৬)

إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"তোমরা যদি (তাঁর পথে জিহাদের জন্য) বের না হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন (দুনিয়াতে তোমাদের উপর কুফফারদের চাপিয়ে দিয়ে আর আখিরাতে জাহান্নামের আগুন দিয়ে) এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দিবেন, তোমরা তার কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (০৯ সূরা তাওবা: ৩৯)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার শাস্তি ও ক্রোধ থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

২. আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার। জিহাদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। জিহাদের প্রাথমিক পর্যায়- হল **দাওয়াত ও ই'দাদের (প্রস্তুতি) পর্যায়।** আর শেষ পর্যায় হল- হিজরত ও ক্বিতাল (তথা সশস্ত্র যুদ্ধ)। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার মত সক্ষমতা অর্জিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দাওয়াত ও ই'দাদের মেহনত চালিয়ে যেতে হবে। দাওয়াত ও ই'দাদ (আমীরের পরামর্শ সাপেক্ষে) আমাদের দ্বীনী বা দুনিয়াবী অন্যান্য কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি চালিয়ে নেয়া সম্ভব।

'দাওয়াত' বলতে বুঝাচ্ছি- মুসলিম উম্মাহর ঈমান ও আকীদা সহীহ করার মেহনত করা, বিশুদ্ধ তাওহীদের বুঝ প্রদান করা, আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ (আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা করতে শিখানো), সর্বোপরি জিহাদের গুরুত্ব বুঝিয়ে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা (তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল) এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ্ তৈরি করা। এই কাজগুলো আমীরের পরামর্শ সাপেক্ষে ঘরে বসে এবং অন্যান্য মেহনতের পাশাপাশি করাও সম্ভব।

আর 'ই'দাদ' (প্রস্তুতি) বলতে বুঝাচ্ছি- মানসিক ভাবে যুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা, জিহাদের ফায়দা-ফাযায়েল ও মাসাইল ভালভাবে আত্মস্থ করা, শারীরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা (নিয়মিত ব্যায়াম করা), অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়া, দাতা সংগ্রহ করা, অস্ত্রের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা, ইত্যাদি। এ সকল কাজেরও অধিকাংশ আমীরের পরামর্শ সাপেক্ষে ঘরে বসে এবং অন্যান্য মেহনতের পাশাপাশি করা সম্ভব।

দাওয়াত ও ই'দাদ যদি জিহাদের জন্য হয়, তাহলে তা-ও জিহাদের অন্তর্ভূক্ত, এবং একাজ করেও জিহাদের সওয়াব হাছিল হবে, ইনশাআল্লাহ। সুতরাং ভাই, আমাদের কি একথা বলে বসে থাকার সুযোগ আছে যে, "আমরা জিহাদ করব কিভাবে? আমাদের জিহাদ করার মত সক্ষমতা নেই।" না ভাই, সে সুযোগ নেই। ক্বিতাল বা চূড়ান্ত যুদ্ধের আগে আমাদেরকে অবশ্যই 'যুদ্ধের মাঠ' প্রস্তুত করতে থাকতে হবে।

বাকী রইল **'হিজরত ও ক্বিতাল'**। জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় যখন জিহাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে, যুদ্ধের মাঠ প্রস্তুত হয়ে যাবে বা ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ার প্রয়োজন হবে, তখন কিন্তু ভাই আমাদেরকে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে। আমাদের ঘরবাড়ি, পরিবার পরিজনদের ত্যাগ করে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য বেড়িয়ে পড়তে হবে ও যুদ্ধ করার জন্য যেখানে যাওয়া দরকার সেখানে যেতে হবে (এটি হল **হিজরত**)। আর যখন আমরা বাতিল ও আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব, লড়াই করব- সেটা হল জিহাদের সর্বশেষ পর্যায় অর্থাৎ **ক্বিতাল** তথা সশস্ত্র যুদ্ধ। অবশ্য, জিহাদে অংশগ্রহণের পর জিহাদের প্রয়োজনে আমীর যাকে যে কাজ দিবেন, তিনি সেটাই করবেন, সেটাই তার জন্য জিহাদ। আমীর যাকে ময়দানে লড়াইয়ের দায়িত্ব দিবেন, তিনি লড়াই করবেন; যাকে ইলম চর্চা ও গবেষণার দায়িত্ব দিবেন, তিনি সেটা করবেন; যাকে চিকিৎসার দায়িত্ব দিবেন, তিনি চিকিৎসা করবেন; যাকে মিডিয়ার দায়িত্ব দিবেন, তিনি মিডিয়ায় কাজ করবেন ইত্যাদি। এভাবে প্রত্যেকের কাজই তখন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর অন্তভর্‚ক্ত হবে, প্রত্যেকেই জিহাদের সওয়াব লাভ করবেন, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

৩. নবুয়তের যামানায় সর্বপ্রথম যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তাআলা মুনাফেকদের মুখোশ উন্মোচন করেন তা হলো ওহুদের যুদ্ধ। মুনাফেকদের সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার অনুসারী ৩০০ জন মূল বাহিনী থেকে পেছনে সরে যায়। বাকী ৭০০ জন সাহাবী ৩০০০ কাফেরের বিরুদ্ধে ওহুদের ময়দানে যুদ্ধ করেন। এ থেকে বুঝা গেল, সাহাবায়ে কেরামের জামাতে ঘাপটি মেরে বসেছিল এমন মুনাফেকের সংখ্যা ৩০%।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এই মুনাফিকরা সকল আমলই করত। তারা নামায পড়ত, রোযা রাখত, যাকাত দিত, দান-খয়রাত করত, হজ্জ করত, সবই করত। করতো না শুধু একটি আমল, যেই আমল থেকে এরা সর্বদা পিছিয়ে থাকত। যেহেতু জিহাদের ময়দানে গেলে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে, তাই এরা মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ থেকে পালাত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে সে যুদ্ধ করেনি, কিংবা মনে মনে যুদ্ধ করার ইচ্ছাও পোষণ করেনি, সে মুনাফেকির একটি অংশ নিয়ে মারা গেল।" (সহীহ মুসলিম-৫০৪০)

তাই, জিহাদ না করে ঘরে বসে থেকে আমরা নিজেদের ব্যাপারে কিভাবে এতটা নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে, আমাদের অন্তরে নেফাক নেই?

অথচ সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আযমাঈনগণ সর্বদা নিজেদের ব্যাপারে নিফাকের ভয় করতেন আর এই ভয়ে তাঁরা কখনো জিহাদ পরিত্যাগ করেননি। হযরত ইবনে আবি মুলাইকা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি ত্রিশজন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম আযমাঈনদের সহিত সাক্ষাৎ করেছি। তাঁরা প্রত্যেকে নিজের সম্পর্কে মুনাফিক হওয়ার ভয় করছিলেন।" (বুখারী)

৪. যে সকল ভাই মা-শা-আল্লাহ জিহাদের বুঝ এবং অনুপ্রেরণা রাখেন তাদেরকে বলছি। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে-

জিহাদ মানেই না জেনে না বুঝে যখন তখন যেখানে সেখানে এলোপাতাড়ি কিছু আক্রমণ করা নয়। এজন্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট মাসআলা-মাসায়েল রয়েছে, শরীয়াহ'র সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। জিহাদের জন্য প্রথমে জিহাদের প্রয়োজনীয় ইলম অর্জন করতে হবে। তারপর শরীয়াহ্ ও সমর বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে শরীয়াহ'র নীতিমালা অনুসারে জিহাদের কাজ আঞ্জাম দিতে হবে।

৫. 'জিহাদ ফরজে আইন' বললে কেউ কেউ মনে করেন, তাহলে আমরা যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, এই মুহূর্তেই আমাদেরকে জিহাদে বেরিয়ে পড়তে হবে; এমনকি আমাদের যদি শত্রুর মোকাবেলা করার সামর্থ্য নাও থাকে, তবুও বের হতেই হবে এবং বর্তমান সামর্থ্যে যতটুকু সম্ভব, তাতেই কিছু একটা করে ফেলতে হবে। কারণ তা ফরজে আইন।

এই ধারণার ফলে বাস্তবে বেশ কিছু সমস্যাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। যারা এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী, তারা এমন কিছু করে বসেন, যা প্রকৃত অর্থে জিহাদের জন্য ক্ষতিকর। তাদের বাস্তবতা বিবর্জিত ও অপরিণামদর্শী এসব কর্মকাণ্ডের ফলে জিহাদের বদনাম হয়, তেমনি চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে জিহাদী কার্যক্রম প্রচণ্ডভাবে বাধাগ্রস্ত হয়, চলমান জিহাদী মিশন বহু বছর পিছিয়ে যায়। তাছাড়া জিহাদ সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ মুমিনগণও জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেন এবং যারা সঠিক পদ্ধতির জিহাদের কথা বলতে চান, তাদের কথাও তারা শুনতে রাজি হন না। তাই জিহাদের দাবী হল, মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সবসময় লাভ-ক্ষতির হিসাব ভালোভাবে কষে, ভবিষ্যৎ পরিণাম ও ফলাফল চিন্তা করে, ছোট স্বার্থের উপর বড় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার খাতিরে প্রয়োজনে ছোট অভিযানগুলোকে পরিহার করা। যেন আমার বিক্ষিপ্ত কোনো কাজ বা অভিযানের দ্বারা ময়দানে সক্রিয় মুজাহিদ ভাইদের ভারসাম্যপূর্ণ মানহাজের অগ্রগতির অন্তরায় সৃষ্টি না হয়। প্রিয় ভাই, আমাদেরকে শুধু 'জযবাতি' হলে চলবে না, 'নযরিয়াতি' হতে হবে। শুধু জযবায় বা জোশে কিছু করা যাবে না, হুশের সাথে অগ্রসর হতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, হিন্দুস্তান (ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান) এই ভূমিতে যারা অবস্থান করছি, এবং যারা জিহাদ করতে ইচ্ছুক তাদের মূল টার্গেট হল 'হিন্দুত্ববাদী শক্তি' (সাপের মাথা)। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ

"সুতরাং তোমরা কুফর প্রধান (সাপের মাথা)-দের সাথে যুদ্ধ কর।" (০৯ সূরা তাওবা:১২)

অতএব, এতদঞ্চলে বাধ্য না হলে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আমরা এখনি অস্ত্র ধরব না। কেননা এর দ্বারা লাভের চেয়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আমাদেরকে আবেগ/জযবা পরিত্যাগ করে মাথা ঠান্ডা রেখে দুরদর্শী চিন্তা করতে হবে এবং সেকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পবে। আমার একটি ভুল পদক্ষেপের কারণে যেন ময়দানে কাজের পরিবেশ নষ্ট না হয়। হিন্দুত্ববাদী শক্তির বিরুদ্ধে যতটুকু শক্তি আমাদের অর্জন করা দরকার তা অর্জন হওয়ার আগেই যেন আমরা দুর্বল হয়ে না যাই। ছোট তাগুতের পিছনে সময়, অর্থ আর জীবন খরচ করে শেষ করে ফেললে পরে মূল তাগুতের বিরুদ্ধে আমরা লড়তে পারবো না। ফলে, আমাদের মূল মাকসাদে (ফেতনা, কুফর ও শিরকের মূল উৎপাটন করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা, যেন দ্বীন সার্বিকভাবে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য হয়ে যায়) পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমরা যদি হিন্দুত্ববাদী শক্তির ধ্বংস সাধন করতে পারি, তাহলে দাদাদের পা-চাটা গোলাম মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী এমনিতেই সোজা হয়ে যাবে, তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের উচিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বানী করা কালো পতাকার বাহিনীতে যোগ দিয়ে ভাইদের দিক-নির্দেশনা মোতাবেক জিহাদী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া, আর যারা কালো পতাকার বাহিনীর ভাইদের সন্ধান পাইনি তারা এই জামাতকে এখলাসের সাথে তালাশ করতে থাকা এবং আলোচ্য পর্বের শেষাংশে যে কার্যতালিকা দেয়া হয়েছে তা অনুসরণ করতঃ যুদ্ধের ময়দান প্রস্তুত করতে থাকা, ইনশাআল্লাহ্।

আলহামদুলিল্লাহ, বর্তমানে কালোপতাকার বাহিনীর ভাইয়েরা বৈশ্বিক/ আন্তর্জাতিক জিহাদী মিশন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। আপনার আশেপাশেই ভাইয়েরা আছেন। তাই নতুন করে জিহাদী কোনো জামাত তৈরির প্রয়োজন নেই। আমাদের কাজ হল নিজেদেরকে প্রস্তুত করা এবং কালো পতাকার ভাইদের সাথে জুড়ে যাওয়া। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে জিহাদের এই মোবারক কাফেলায় শরীক হওয়ার জন্য কবুল করুন। আমীন।

৬. অন্যদিকে আরেকদল ভাই আছেন, তারা যেহেতু দেখেন, এই মুহূর্তে কার্যত জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার মতো অবস্থা, শক্তি-সামর্থ্য আমাদের নেই, সুতরাং তারা মনে করেন, বর্তমানে জিহাদ ফরজ এই কথাও বলা যাবে না। আমাদেরকে এখন জিহাদি সকল কার্যক্রম থেকে হাত পা গুটিয়ে দ্বীনের অন্য কাজগুলোই করে যেতে হবে। জিহাদের বিষয়টি আপাতত স্থগিত রাখতে হবে। এই ধারণার ফলে তারা বর্তমান পরিস্থিতিতে যা করা শরীয়তের হুকুম তা থেকেও বিরত থাকেন। তারা মনে করেন, আমাদের যেহেতু শত্রুর মোকাবেলা করার সামর্থ্য নেই, সুতরাং আমাদের করার কিছুই নেই। এজন্য তারা সময়ের দাবি, হেকমত ও শরীয়তের মানসা মনে করেই অজ্ঞতাবশত চলমান সহীহ পদ্ধতির জিহাদেরও বিরোধিতা করেন।

অবশ্য তাদের কেউ কেউ প্রস্তুতির কথা বলেন এবং দাবিও করেন, আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। কিন্তু প্রস্তুতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ এমনভাবে করেন, যার সঙ্গে জিহাদ ও কিতাল তথা যুদ্ধের কোনো দূরবর্তী সম্পর্কও নেই, বস্তুত তাদের ভবিষ্যত হাজার বছরের কর্মতালিকা ও কর্মপরিকল্পনাতেও জিহাদ ও যুদ্ধের নাম গন্ধও নেই। যা আছে তা

হল জিহাদ ও কিতালের বিরোধিতা, তাহরীফ (জিহাদের অর্থ বিকৃতি) ও অপব্যাখ্যা। তাদের দৃষ্টিতে জিহাদ ও কিতালের নাম নিলেও যেহেতু শত্রুরা নারাজ হয়, সুতরাং আমাদের এই দুর্বলতার মুহূর্তে তাদেরকে নারাজ করা যাবে না। আমরা কিছু করতে গেলেই আমেরিকার গোয়েন্দারা নিজ দেশে বসেই সব দেখে ফেলে, শুনে ফেলে। তাই (এই ভয়ে) এখন জিহাদের ব্যাপারে কোনো নড়াচড়া কিংবা 'টু' শব্দটিও করা যাবে না। তাগুত ও কাফের মুরতাদদের দৃষ্টিতে 'ভাল'(?) থেকে তাদের আস্থা অর্জন করার জন্য, জিহাদ বাদে অন্যান্য মেহনত টিকিয়ে রাখতে যা যা করা দরকার, এখন আমাদেরকে তাই করতে হবে।

বর্তমানে দ্বীনের কাজ করতে হলে, তাগুতের কাছে নিজেকে এতটাই 'পরিচ্ছন্ন' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে যে, জিহাদের নামটিও মুখে উচ্চারণ করা যাবে না; বরং দুশমনরা যেন কোনো ছুতো নাতায় আমার প্রতি সন্দেহের দৃষ্টিও দিতে না পারে, এজন্য আগে বেড়ে 'জঙ্গীবাদ' বিরোধী কিছু কর্মকাণ্ডতেও সক্রিয় থাকতে হবে। জিহাদ ও কিতালের আলোচনা করা, জিহাদ ও মুজাহিদের পক্ষে কথা বলা, এমনকি জিহাদ ও কিতালের ইলম চর্চাকেও হেকমত ও প্রজ্ঞাপরিপন্থী মনে করতে হবে। এজন্য আগে বেড়ে নিজের মাদরাসাকে 'জঙ্গীবাদ'মুক্ত ঘোষণা দিতে হবে, 'জিহাদ ও সন্ত্রাস' বিরোধী মানববন্ধনে অংশ নিতে হবে, জিহাদ বিরোধী ফতোয়ায় লাখো মুফতীর স্বাক্ষর নিতে হবে, যে সকল তালিবুল ইলম মাদরাসায় ই'দাদ গ্রহণের চেষ্টা করবে তাদেরকে পিটাতে হবে, আর যে সকল তালিবুল ইলম কিংবা মাদরাসার শিক্ষক জিহাদ নিয়ে কথা বলেন, তাদেরকে মাদরাসা থেকে বহিস্কার করতে হবে।

৭. তাত্ত্বিক ইসলামের দর্শন: এই দর্শনটি আমাদের অনেক উলামায়ে কেরামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু ইলমে দ্বীনের তাত্ত্বিক অধ্যয়ন করা, শিক্ষা দেওয়া বা আলোচনা করা, বয়ান করা, ছোট খাট শাখাগত বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হওয়া, ইত্যাদিকেই কেবল দ্বীনদারি মনে করতে থাকা বা দ্বীনের আসল কাজ মনে করা বা কেবল এতটুকুর উপর সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকা। ব্যবহারিক ইসলামের দিকে না আসা, দা'ওয়াহ্, ই'দাদ ও জিহাদের পথে অগ্রসর না হওয়া।

৮. হায় আফসোস! আমরা কেউ কেউ জিহাদের অর্থই পাল্টিয়ে ফেলছি। জিহাদের অর্থ কেউ কেউ করছি 'দাওয়াত'। তাই দাওয়াতের মধ্যে জিহাদের ফায়দা-ফাযায়েল সম্বলিত আয়াত ও হাদীসগুলোকে ব্যবহার করছি। এর দ্বারা কী ফায়দা হচ্ছে, ভাই?? এর দ্বারা উম্মত জিহাদ বাদ দিয়ে, জিহাদকে ভুলে গিয়ে দাওয়াতী মেহনতে জুড়ে থাকবে, জিহাদ করার কোনো প্রয়োজনই তারা অনুভব না করবে না। সুতরাং আমাদের এহেন কর্মকাণ্ডের দ্বারা লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হচ্ছে!

কেউ কেউ জিহাদের অর্থ করছি 'গণতান্ত্রিক রাজনীতি'। তাই কুফুরী ও শিরকের আস্তানা গণতন্ত্রের মিটিং-মিছিলকে আমরা জিহাদ ভাবছি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা লাভ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দিবাস্বপ্ন(!) দেখছি। আর এটাকেই জিহাদ ভাবছি। নিজেদেরকে (গণতান্ত্রিক!) 'মুজাহিদ' ভাবছি। কেউ কেউ তো এরকম বলেই ফেলেন, এখন বেলটের জিহাদ চলবে, বুলেটের নয় (!!!)

হায়! আফসোস আমাদের জন্য! আমরা যা করছি তার জন্য! আর কতকাল আমরা এভাবে নিজেদেরকে ধোকা দিতে থাকব??

যে যত বেশি জিহাদের অর্থকে বিকৃত করতে পারছি, কিংবা জিহাদ থেকে পালানোর যত বেশি উপায় আবিষ্কার করতে পারছি, আমরা নিজেদেরকে তত বেশি 'হেকমতওয়ালা' ভাবছি। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!!!

৯. কোনো কোনো ভাই, নিজে যা করছি তাকেই জিহাদ নাম দিচ্ছি, আর এই অলীক আত্মতৃপ্তিতে ভুগছি, আমিও জিহাদ করছি। যেমন কলমের জিহাদ, বয়ান-বক্তৃতার জিহাদ, তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধির/ নফসের জিহাদ ইত্যাদি। এভাবে আমরা নিজেরাও বিভ্রান্ত হচ্ছি, উম্মাহকেও বিভ্রান্ত করে যাচ্ছি। আল্লাহ পাক হেফাযত করুন। আমীন।

১০. অবশেষে, আল্লাহ পাক আমাদের যাদেরকে জিহাদের বুঝ দিয়েছেন, যারা কোনো না কোনো ভাবে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত আছি, যারা কোনো না কোনো ভাবে জিহাদের জন্য মেহনত করছি, সেসকল ভাইদেরকে বলছি! আমরা যেন নিজেদেরকে 'বড়' ভেবে অন্যান্য মেহনতের ভাইদেরকে 'ছোট' বা 'তুচ্ছ' না ভাবি। আমরা এক উম্মত, আমরা সকলে ভাই-ভাই, একে অপরের সহযোগী; যেন একটি শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, একটি বৃক্ষের ডাল-পালা।

যারা অন্যান্য ময়দানে মেহনত করছেন যেমন ইলমী খেদমত, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত, তাযকিয়ার মেহনত ইত্যাদি করছেন তাদেরকে দীল থেকে মহব্বত করি। তারাও দ্বীনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও দামী দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

তবে, জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় সেকল ভাইদেরও যে অনেক করণীয় আছে, সে সম্পর্কে আমরা তাদেরকে মহব্বত ও দরদের সাথে দাওয়াত দিতে থাকব, হিকমতের সাথে বুঝাতে থাকব এবং নিজের ও ভাইয়ের কবুলিয়তের জন্য দুআ করতে থাকব, ইনশাআল্লাহ।

আর নিজেকেই আমরা তুচ্ছ ও কমজোর মনে করব। কেননা, আজকে ঐ ভাই হয়ত বুঝছেন না, আগামীকাল হয়ত বুঝবেন, হতে পারে তখন আল্লাহ পাক তার দ্বারা আমার চেয়ে বেশি খেদমত নিবেন। আর আমার শেষ পরিনতি কী হবে, তা তো আমার জানা নেই। তাই ভাই! 'আমি অন্যদের চেয়ে নিজেকে ছোট মনে করি'- এটা শুধু কথায় বললে হবে না, আমার আচার-আচরণ, অঙ্গ-ভঙ্গি ও উচ্চারণ, বলা ও লিখায়ও যেন তা সর্বদা প্রকাশ পায়।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে সকল প্রকার ভ্রান্ত আকীদা, চিন্তা-চেতনা ও কার্যকলাপ থেকে হিফাযত করুন। আমীন।

জিহাদের অপর নাম 'জীবন'!! - একটি ইতিহাস ভিত্তিক পর্যালোচনা:

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْۖ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের 'সে কাজের' প্রতি আহ্বান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন।" (সূরা আল আনফাল ৮:২৪)

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ أَيْ: لِلْحَرْبِ الَّتِي أَعَزَّكُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا بَعْدَ الذُّلِّ، وَقَوَّاكُمْ بِهَا بَعْدَ الضَّعْفِ، وَمَنَعَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ بَعْدَ الْقَهْرِ مِنْهُمْ لَكُمْ

প্রখ্যাত মুফাসসির মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রহঃ বিশিষ্ট তাবেয়ী উরওয়াহ ইবনে যুবাইর রহঃ থেকে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ এই আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে " لِمَا يُحْيِيكُمْ (যা তোমাদেরকে জীবনদান করবে)" এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল- "**যুদ্ধ** -যার দ্বারা লাঞ্ছনার পর আল্লাহ তোমাদেরকে সম্মানিত করেছেন, দুর্বলতার পর শক্তিশালী করেছেন, তোমাদের উপর শত্রুদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করার পর তোমাদেরকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

ইমাম রাজী রহঃ, ইমাম কুরতুবী রহঃ ও একই তাফসির করেছেন।

প্রিয় ভাই, লক্ষ্য করুন! আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন কেন বললেন, জিহাদের মধ্যে আমাদের জন্য রয়েছে জীবন??

আমরা তো মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ করিনা, বা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছি; অথচ যতদিন জিহাদ ছিল, উম্মাহ যতদিন জিহাদ করেছে, তখন কি উম্মাহ্ অধিক হারে জীবন দিয়েছে, তখন কি উম্মাহর রক্তক্ষরণ বেশি হয়েছে, নাকি উম্মাহর গাফলতীর যামানায়, যখন উম্মাহ্ হয় জিহাদের ব্যাপারে ছিল উদাসীন কিংবা জিহাদ বিমুখ??

এ বিষয়টি আমরা ইতিহাসের আলোকে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

নবুয়তের যামানায় সংগঠিত হওয়া যুদ্ধ সমূহের পরিসংখ্যান				
যুদ্ধের নাম	মুসলিম সৈন্যসংখ্যা	শহীদের সংখ্যা	কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা	নিহত কাফেরের সংখ্যা
বদর যুদ্ধ	৩১৩	১৪	৯৫০	৭০
উহুদ যুদ্ধ**	৭০০	৭০	৩০০০	২২
খন্দক যুদ্ধ	৩,০০০		১০,০০০	
বনু কুরায়যার যুদ্ধ				৬০০-৭০০
খায়বার যুদ্ধ		১৬		৯৩
মূতার যুদ্ধ	৩,০০০	১২	২,০০,০০০	অগণিত
হুনাইনের যুদ্ধ	১২,০০০	০৪		৭০

হযরত আবু বকর রাদি. এর খিলাফতের সময় সংগঠিত যুদ্ধসমূহ				
শিকলের যুদ্ধ				অসংখ্য
মাযারের যুদ্ধ				৩০,০০০
ওয়ালাজার যুদ্ধ				অসংখ্য
উল্লায়শ (বা আমগিশায়ার) যুদ্ধ				৭০,০০০
ফিরাযের যুদ্ধ				অসংখ্য
আযনাদাইন	৩০,০০০	৪০০	১,০০,০০০	অসংখ্য

হযরত উমর রাদি. এর খিলাফতের সময় সংগঠিত যুদ্ধসমূহ				
ফিহল	২৫,০০০		৮০,০০০	প্রায় ৮০,০০০
ইয়ারমুকের যুদ্ধ	৩৬,০০০	৪,০০০	২,৪০,০০০; মতান্তরে ৪,০০,০০০	৭০,০০০; মতান্তরে ১,২০,০০০
নামারিকের যুদ্ধ	১০,০০০		১,০০,০০০	
সেঁতুর যুদ্ধ**		৪,০০০		৬,০০০
বুআইবের যুদ্ধ	১২,০০০		১,৫০,০০০	প্রায় ১,৫০,০০০
কাদেসিয়ার যুদ্ধ	৬০,০০০	৮,৫০০	৩০,০০০	গণনাতীত

হযরত উসমান রাদি. এর খিলাফতের সময় সংগঠিত যুদ্ধসমূহ				
মাস্তুলের যুদ্ধ (৩৫ হিজরী)	২০০ নৌযান	অসংখ্য	১,০০০ নৌযান	অসংখ্য

বি.দ্র:

১. শূন্য ঘরগুলোর তথ্য ঐতিহাসিকগণ নির্ণয় করতে পারেননি।

২. ** এই যুদ্ধে মুসলিমদের জয় হয়নি, সাময়িক বিপর্যয় হয়েছিল, বাকি সকল যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করেন।

উল্লেখ্য, নাহাওয়ান্দ যুদ্ধে ও রোম-পারস্য বিজয়কালে হওয়া শহিদদের হিসাব, মাস্তুলের যুদ্ধের শহিদদের হিসাবও ঐতিহাসিকরা নির্ণয় করতে পারেননি। মাস্তুলের যুদ্ধের ব্যাপারে ইমাম তাবারি রাহি. বলেছেন, এ যুদ্ধে পানির উপর রক্ত প্রাধান্য পেয়েছিল।

তবে, নবুয়তের যামানার দশ বছরের মোট ৬৩ টি যুদ্ধ এবং খোলাফায়ে রাশেদার যামানার সকল যুদ্ধ মিলে বিশ বছরে মোট শহীদদের সংখ্যা বিশ হাজারের উপর হবে, সন্দেহ নেই।

উপরের পরিসংখ্যান থেকে কয়েকটি বিষয় বুঝে আসে-

১. 'খাইরুল কুরুন' সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের মাঝে প্রতি বছর গড়ে প্রায় এক হাজার শহিদ হয়েছেন, যারা দ্বীনের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। সুতরাং, যারা মনে করে বা বলে, 'তরবারি দ্বারা ইসলাম প্রচার হয়নি।'- এটি মূলত একটি ঐতিহাসিক 'ডাহা মিথ্যা কথা'; ইসলামের বিরুদ্ধে জ্বলজ্যান্ত মিথ্যাচার, শহিদানের রক্তের অবমাননা, ইতিহাস বিকৃতি, উম্মাহকে বিভ্রান্ত ও জিহাদ বিমুখ করার হীনপ্রচেষ্টা মাত্র।

২. অন্যদিকে, মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে কুফফারদের লক্ষ লক্ষ নিহত হয়েছে। এই স্বল্প সময়েই অর্ধ পৃথিবী জয় হয়েছে। কুফফারদের উপর মুসলিমদের আধিপত্য ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩. এমনকি উমাইয়া খিলাফতের সময় ৪১-১৩২ হিজরি (৬৬১-৭৫০ ঈসায়ী) মুসলিম ভূমির বিস্তৃতি প্রায় ১,৫০,০০,০০০ (দেড় কোটি) বর্গ কিমি হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ।

৪. মাত্র বিশ বছরে বিশ হাজার শহীদানের রক্তের বিনিময়ে বিশ্বব্যাপী শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হয়। সারা বিশ্বে মুসলমানরা পরিপূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে। পৃথিবীর কোথাও কোনো একজন মুসলিমকে নির্যাতিত হতে হবে বা হত্যা করা হবে, এটা ছিল অসম্ভব!! কিংবা কোথাও কোনো একজন মুসলিম মা-বোনের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাবে, (ধর্ষণ করবে এটা তো ছিল বহু দূরের কথা) এটা তখন ছিল অকল্পনীয়!!!

দুটি উদাহরণ দেখুন-

এক. উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের শাসনামলে ৯০ হিজরি সনে একটি আরব বণিক কাফেলা সরনদ্বীপ (সিলন/বর্তমান শ্রীলংকা) থেকে আঠারটি জাহাজে করে ইরাকে ফেরার পথে সিন্ধুর দেবল বন্দর (বর্তমানে পাকিস্তানের করাচী) অতিক্রম করার সময় একদল দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। দস্যুরা জাহাজগুলোকে লুট করে ও মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুদের দেবলে নিয়ে কারাগারে আটকে রাখে। তখন চিঠি মারফত বন্দী এক বোনের আহ্বানে ৯২ হিজরি সনে হাজ্জাজ তার চাচাতো ভাই ও জামাতা মুহাম্মাদ বিন কাসিম আস্ সাকাফির নেতৃত্বে সিন্ধু অভিমুখে বার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদ বিন কাসিম পথিমধ্যে অনেক অঞ্চল জয় করে অবশেষে ৯৩ হিজরীতে দেবল নগরী ও দেবল দুর্গ জয় করে মুসলমান নর-নারী আর শিশুদের উদ্ধার করেন এবং অবশেষে সিন্ধু বিজয় করেন।

দুই. বাইজান্টাইন সম্রাট থিওফেল (Theophilos) আব্বাসী রাষ্ট্রের সীমান্ত নগরী যিবাতরায় হামলা চালিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালানোর পাশাপাশি অনেক মুসলিম মা-বোনকে বন্দি করে নিয়ে যায়। জনৈক হাশিমি বোন রোমানদের হাতে বন্দি অবস্থায় 'হায় মু'তাসিম!' বলে চিৎকার করেছে, খলিফা মুতাসিম (২১৮-২২৭ হিজরি) যখন এই সংবাদ জানতে পারলেন, তখন সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন ও অস্থির চিত্তে বলে উঠলেন, লাব্বাইক! আমি উপস্থিত আছি, হে আমার বোন। এরপর তিনি নফীরে আম-এর ঘোষণা দেন এবং যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন। রোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত নগরী 'আম্মুরিয়া'কে পঞ্চান্ন দিন অবরোধ করে রাখার পর মুজাহিদ বাহিনী তা জয় করে এবং অপহৃত হাশিমি মুসলিম বোনকে উদ্ধার করে।

এই ছিল তখনকার মুসলিমদের প্রতাপ ও ক্ষমতার দৃষ্টান্ত; এই ছিল তৎকালীন মুসলিমদের শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থা।

অতঃপর যখন মুসলিম খলিফারা 'নববী মানহাজ' হতে বিচ্যুত হয়ে দুনিয়ার মোহ আর বিলাসিতায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে, জিহাদের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করতে শুরু করে, কুদরতের নিয়ম মেনেই তখন 'সুন্নাতুল্লাহ' কার্যকর হওয়া শুরু হয়-

إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"তোমরা যদি (তাঁর পথে জিহাদের জন্য) বের না হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দিবেন, তোমরা তার কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (০৯ সূরা তাওবা: ৩৯)

মুহাম্মাদ আলী সবূনী (রহঃ) উপর্যুক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন:

[إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما] أى ان لا تخرجوا الى الجهاد مع رسول الله ، يعذبكم الله عذابا اليما موجعا ، باستيلاء العدو عليكم في الدنيا ، وبالنار المحرقة في الاخرة ،

"যদি তোমরা যুদ্ধে বের না হও, তিনি তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি দেবেন" অর্থাৎ তোমরা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জিহাদে বের না হও, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন, দুনিয়াতে তোমাদের উপর শত্রুকে চাপিয়ে দিয়ে। আর পরকালে জ্বলন্ত আগুন দিয়ে। [সফওয়াতুত তাফাসীর, দেখুন:উক্ত আয়াতের তাফসীর]

عَنْ اِبْنِ عُمَر قَالَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْل، اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهٗ حَتىّٰ تَرْجِعُوْا اِلىٰ دِيْنِكُمْ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, "যখন তোমরা 'ঈনাহ' পদ্ধতিতে (এক ধরনের সুদ ভিত্তিক ব্যবসা) ক্রয় বিক্রয় এবং ব্যবসা বাণিজ্যে পুরাপুরি মশগুল হয়ে যাবে এবং গরুর লেজ ধরে খেত খামারে মগ্ন হয়ে যাবে আর জিহাদ করা ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এমন অপমান/জিল্লতি চাপিয়ে দিবেন, যা ততক্ষণ পর্যন্ত দূর হবে না যতক্ষণ না তোমরা আপন দ্বীনের (জিহাদের) দিকে ফিরে আসবে।" (আবু দাউদ ৩৪৬২, বায়হাকী ১০৪৮৪, জামেউল আহাদীস ১৬০৩, কানযুল উম্মাল ১০৫০৩, বুলুগুল মারাম ৮৪১)

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْل، مَا تَرَكَ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اِلَّا ضَرَبَهُمْ اللهُ بِذِلٍّ وَلَا أَقَرَّ قَوْمٌ الْمُنْكَرَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ اِلَّا عَمَّهُم اللهُ بِعِقَابٍ

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন যে, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি ﷺ বলেছেন, "যদি কোন জাতি জিহাদ ছেড়ে দেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সবার উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন। আর যদি কোন জাতি তাদের মধ্যে কোন অন্যায়কে আশ্রয় দেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করেন।" (জামে'আ আহাদীস ২৭০৩৫, মুজামুল আওসাত ৩৮৩৯, কানযুল উম্মাল ৮৪৪৭)

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا " . فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ " بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ " . فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ " حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ " .

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এমন এক সময় নিকটবর্তী, বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী তোমাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধে তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য) একে অপরকে এভাবে আহ্বান করবে, যেভাবে আহারকারী লোকেরা খাদ্যপাত্রের দিকে একে অপরকে ডাকাডাকি করে।" (এ কথা শুনে) কেউ জিজ্ঞাসা করল, সেদিন কি সংখ্যায় কম থাকার কারণে আমাদের এ অবস্থা হবে? তিনি ﷺ উত্তর দিলেন, "না; বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অনেক বেশি থাকবে, কিন্তু তোমরা বন্যায় ভেসে আসা আবর্জনার (/খড়কুটোর মতো প্রাণহীন ও ওজনহীন) হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় উঠিয়ে নিবেন, (এর বিপরীতে) তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহন' ঢেলে দিবেন।" কেউ জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, 'ওয়াহন' অর্থ কি? তিনি ﷺ উত্তরে বললেন, "দুনিয়াপ্রীতি এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।" (আবু দাউদ-৪২৯৭, বায়হাকী)

سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۝٢٣

"আর এটাই আল্লাহর সুন্নত (রীতি), যা পূর্ব থেকে চালু আছে। আর আপনি আল্লাহর সুন্নতের মধ্যে কোনো পরিবর্তন পাবেন না।" (সূরা ফাতহ ৪৮:২৩)

আর এভাবে জিহাদের ব্যাপারে গাফলতী ও শিথিলতার অনিবার্য ফলস্বরূপ মুসলিম বিশ্বে একের পর এক ট্রাজেডি ঘটতে থাকে, একের পর এক খিলাফতের উত্থান ও পতন ঘটতে থাকে, শেষ পর্যন্ত ১৯২৪ সালে উসমানী খিলাফতের পতনের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী বরকতময় ইসলামী শাসনের পতন ঘটে। নিকষ কালো আঁধারে ছেয়ে যায় পুরো মুসলিম বিশ্ব। মুসলিমদের উপর নেমে আসে কুফ্ফারদের একের পর এক আগ্রাসন, যার একটি অপরটি হতে বেশি মারাত্মক, একটি আরেকটি হতে অধিক রক্তক্ষয়ী, যা বর্তমান সময় পর্যন্ত চলমান।

প্রিয় ভাই, ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাস হতে অল্প কিছু ট্রাজেডির দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন-

*** বাইতুল মোকাদ্দাসকে মুসলমানদের হাত হতে ছিনিয়ে নিতে রোমান ক্যাথলিক চার্চের পোপ দ্বিতীয় আরবানের আহ্বানে তিন লক্ষ সৈন্যের বহুজাতিক খ্রিস্টান বাহিনী ফ্রান্স হতে বাইতুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। একচল্লিশ দিন অবরোধের পর ক্রুসেডাররা আল কুদস জয় করে এবং ব্যাপক গণহত্যা চালায়। মুসলমানদের রক্তে কুদস নগরী প্লাবিত হয়। প্রায় **সত্তর হাজার** সাধারণ মুসলমান ক্রুসেডারদের হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়। ৪৯২ হিজরি সনের শাবান মাসে (১০৯৯ ঈসায়ীর জুলাই মাসে) মর্মান্তিকভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসের পতন ঘটে।

*** ৬১৬ হিজরি সনের ৪ জিলহজ্জ (১২২০ ঈসায়ীর ফেব্রুয়ারি মাসে) চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে তাতাররা বুখারায় প্রবেশ করে সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। দুদিনের আগের সুবিশাল ও সুসমৃদ্ধ বুখারা নগরী পরিণত হয় বিধ্বস্ত এক ধ্বংসস্তুপে, যেন গতকালও সেখানে কেউ বসবাস করেনি। ৬১৭ সালের মুহাররাম মাসে (১২২০ ঈসায়ীর মার্চ মাসে) একই ভাবে সমরকন্দকেও ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা হয়। এরপর তাতাররা মুসলমানদের অন্যান্য ভূমিগুলোতে একের পর এক ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে।

চেঙ্গিস খান যখন মুসলিম ভূ-খণ্ডে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল, মুসলিম বিশ্বের অভিভাবক আব্বাসি খলিফা নাসির লি দ্বীনিল্লাহ তখন ব্যস্ত জনসাধারণের উপর জুলুম করে তাদের সম্পদ লুণ্ঠনে এবং নারী ও ভোগবিলাসের মধ্যে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে!

*** এরপর এলো ৬৫৬ হিজরি। এ বছরেই ১২ মুহাররাম মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চেঙ্গিস খানের পৌত্র তাতার শাসক হালাকু খান পুরো বাহিনী নিয়ে বাগদাদে উপস্থিত হয়। তার বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ। হালাকু খানের উজির ছিল গাদ্দার নাসিরুদ্দিন তুসি। অন্যদিকে, বাগদাদের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য, অশ্বারোহী সৈন্য দশ হাজারও হবে না। রাফিজি উজির আলকামির প্ররোচনায় খরচ কমাতে খলিফাতুল মুসলিমীন সেনাবাহিনীর সংখ্যা এক লক্ষ থেকে দশ হাজারে কাট-সাট করে নিয়ে এসেছিল আগেই। (জিহাদের প্রতি তৎকালীন খলীফাতুল মুসলিমীনের কেমন অবহেলা ছিল, তা লক্ষ্য করার মত বিষয়!!) এরপর হালাকু বাহিনী পুরো বাগদাদে চল্লিশ দিন ব্যাপী স্মরণকালের ইতিহাসের অন্যতম নৃশংস গণহত্যা চালায়। সর্বমোট **বিশ লক্ষ** নারী-পুরুষ, শিশু-তরুণ-বয়োবৃদ্ধ সকলকেই হত্যা করা হয়। বাগদাদের অলি-গলিতে রক্তের বন্যা বয়ে যায়। আমিরুল মুমিনীনকে বস্তায় ভরে পদদলিত করে হত্যা করা হয়।

*** ৮০৩ হিজরি সনে তাতার তৈমুর লং আলেপ্পোকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে দামেশক অভিমুখে রওনা হয়। অতঃপর তৈমুর লং দামেশকে প্রবেশ করে আলেপ্পোর মতো দামেশকেও প্রচুর ধ্বংসযজ্ঞ ও রক্তপাত ঘটায়।

*** ৮৯৭ হিজরি সনের ২ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৪৯২ ঈসায়ীর ২ জানুয়ারি আন্দালুসের (মুসলিম স্পেনে) শেষ ইসলামি দুর্গ গ্রানাডার পতন ঘটে। স্পেনের পতনের পর সেখান থেকে বিতাড়িত করা হয় প্রায় **ত্রিশ লক্ষ** মুসলমানকে। অপরদিকে যারা স্প্যানিশ খ্রিস্টানদের নির্মম গণহত্যার শিকার হয়, তাদের সংখ্যাও প্রায় **ত্রিশ লক্ষের** মত।

*** তাতার আগ্রাসনের পর এক শতাব্দীর মধ্যে তাতাররা প্রায় সবাই মুসলমান হয়ে যান। অতঃপর, তাতার মুসলিমরা একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রাশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইসলামের পতাকা উড্ডীন রেখেছিল। এরপর তাদের মধ্যেও যখন জিহাদের ব্যাপারে দুর্বলতা, নিজেদের মধ্যে বিভাজন ও কতিপয় গাদ্দারের প্রকাশ ঘটে, এই সুযোগে কুফফার, খোদার দুশমন রাশিয়া তাতার মুসলিমদের এলাকাগুলো একে একে দখল করতে থাকে। এবং দখলকৃত এলাকাগুলোতে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ ইত্যাদি ঘটতে থাকে। দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা, বাড়িঘর ধ্বংস করা, মসজিদগুলোকে ভেঙে সেগুলোকে গির্জা, ঘোড়ার আস্তাবল, সেনাক্যাম্প, নাট্যশালা, মদের আড্ডা ইত্যাদিতে পরিণত করা, দ্বীনি মাদরাসা-মক্তবগুলোকে খ্রিস্টধর্মের প্রচারকেন্দ্র বানানো, মুসলমানদের উপর দুঃসাধ্য করের বোঝা চাপানো, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা ইত্যাদি- এরূপ বহুবিধ পন্থায় তাতার মুসলমানদের উপর রাশিয়ান কুকুররা নির্যাতন করত।

*** সোভিয়েত আমলে মুসলিমদের উপর অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সোভিয়েত নেতা স্টালিনের শাসনকালেই প্রায় **১১ মিলিয়ন (এক কোটি দশ লক্ষ)** মুসলিমকে হত্যা করা হয়।

*** বর্তমানে চীনের স্বায়ত্তশাসিত শিনচিয়াং প্রদেশে (উইঘুরে) পুনঃশিক্ষার নাম দিয়ে শুধু **১০ লাখ** উইঘুর মুসলিমকে রাজনৈতিক বন্দিশিবিরে রাখা হয়েছে। সবমিলিয়ে **২০ লাখ** মুসলিমকে উগ্রপন্থী সন্দেহে আটক রাখা

হয়েছে দীর্ঘদিন। সেখানে বন্দীদেরকে ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করছে, যৌন হয়রানি করছে, মদপান ও শূকর খেতে বাধ্য করছে। বন্দিদেরকে তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে দিচ্ছে না।

*** ভারতীয় মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসন:

=> মুসলমানরা প্রায় ছয়শত বছর হিন্দুস্তান তথা ভারতবর্ষ শাসন করেছে। কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের জিহাদবিমুখতা ও দুর্বলতার সুযোগে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের উপর গণহত্যা, গণধর্ষণ, গুম, মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির বানানো ইত্যাদি নানাভাবে মুসলিমদের উপর আগ্রাসন চালাচ্ছে।

=> ১৯৪৬ এর কলকাতা ম্যাসাকার এর দুই মাস পর হত্যাযজ্ঞ চালানো হয় বিহারে। উনিশ দিনের দাঙ্গায় হত্যা করা হয় **বিশ হাজারের** উপর মুসলিমকে।

=> ১৯৪৭ এর দেশভাগের সময় হিন্দুস্তান জুড়ে ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয়। ভারতের বঞ্চিত-নির্যাতিত মুসলিমরা নিজেদের জান-মাল নিয়ে হাজার হাজার মাইলের অনিশ্চিত পথে পাড়ি জমায় পাকিস্তানের দিকে। এই দীর্ঘ পথে সংঘবদ্ধ হিন্দুত্ববাদী গেরোয়া সন্ত্রাসীরা হাজার হাজার মুসলিমদেরকে হত্যা করে, লুটপাট করে, মা-বোনদের ধর্ষণ করে। যাওয়ার পথে ট্রেনেও অভিশপ্ত হিন্দুরা আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এই দাঙ্গায় **১ লক্ষ ৩৭ হাজার** মুসলমান শহীদ হয়।

=> ১৯৪৭ সালেই ভারত সরকার কাশ্মীরের শাসক মহারাজাকে সহায়তা করতে বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে দেয়। তারা ঘোষণা করে, যারা পাকিস্তানে যেতে ইচ্ছুক তাদের সহায়তা দেয়া হবে। মুহাজিরদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমা হতে আহ্বান জানানো হয়। যখন অনেক মুসলমান মুহাজির শিবিরে একত্রিত হলেন, তখন তাদের উপর চালানো হয় নৃশংস হামলা। এ ঘটনায় **৫ লক্ষ** মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। আর সমপরিমাণ মুসলমান পাকিস্তানে হিজরত করতে সক্ষম হয়। মালাউন হিন্দুরা বহু মুসলিম নারীকে নির্যাতন করে। খুন, ধর্ষণ, এমনকি পরিবারের সামনে নৃশংস ভাবে তাদের স্তন কেটে ফেলে। এভাবে কয়েক লক্ষ মুসলিমকে শহীদ করা হয়।

=> এরপর ছোট-বড় অনেকগুলো দাঙ্গা সংগঠিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ১৯৪৭ সালে হায়দরাবাদে অপারেশন পোলোর পরে মুসলমানদের ব্যাপকহারে হত্যা, ১৯৫০ সালে বরিশাল দাঙ্গা ও ১৯৬৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তান দাঙ্গার পরে কলকাতায় মুসলিম দাঙ্গা, ১৯৬৯ সালের গুজরাত দাঙ্গা, ১৯৮৪ ভীভান্দি দাঙ্গা, ১৯৮৫ গুজরাত দাঙ্গা, ১৯৮৯ সালের ভাগলপুর দাঙ্গা, বোম্বাই দাঙ্গা, ১৯৮৩ সালে নেলি এবং ২০০২ সালে গুজরাতের দাঙ্গা, ২০১৩ সালে মুজাফফরনগর দাঙ্গা ও ২০২০ সালে দিল্লি দাঙ্গা ইত্যাদি। এসকল দাঙ্গায় **হাজার হাজার** মুসলিমদের গণহত্যা আর গণধর্ষণ করে হিন্দুত্ববাদী মালাউনরা।

=> ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল আরএসএস এবং এর সহযোগী সংগঠনের লাখ লাখ হিন্দু ভারতের উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অযোধ্যা শহরে অবস্থিত বাবরি মসজিদকে শহীদ করে দেয়।

*** **বসনিয়া গণহত্যা:**

১৯৯৪-৯৫ সালে বসনিয়ার যুদ্ধে মুসলিমরা নির্মম গণহত্যার শিকার হয়। প্রায় **৩১,৫৮৩ জন** মুসলমানকে হত্যা করা হয়, প্রায় **২০,০০০** মত মা-বোনকে ধর্ষণ করা হয়।

সারায়েভো গণহত্যায় বলির শিকার হয় প্রায় **১,৫০০** শিশুসহ **১০,০০০** এর মত মুসলিম।

সেব্রেনিৎসা গণহত্যার সময় মোট **৮,৩৭২** জন বসনিয়াক মুসলিমদের হত্যা করা হয়।

২০০৪ সালে যুদ্ধ-অপরাধ আদালতের তথাকথিত রিপোর্টে বলা হয়, **২৫ থেকে ত্রিশ হাজার** বসনীয় মুসলিম নারী ও শিশুকে জোর করে অন্য অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং স্থানান্তরের সময় তাদের এক বিপুল অংশ ধর্ষণ ও গণহত্যার শিকার হয়। গণহত্যা ও নারী-শিশুদের ধর্ষণের সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে অন্যান্য রিপোর্টে বলা হয়েছে।

বসনিয়ার মুসলমানদের উপর এইসব হত্যাকাণ্ড ছিল সুপরিকল্পিত ও সংঘবদ্ধ অভিযানের ফসল। বসনিয়ার যুদ্ধ চলাকালে সার্ব সেনা ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা কখনও কখনও কোনো একটি অঞ্চলে হামলা চালানোর পর সেখানকার সমস্ত পুরুষকে হত্যা করতো অথবা অপহরণ করতো এবং সেখানকার নারীদের ধর্ষণের পর তাদের হত্যা করতো। তারা বহুবার গর্ভবতী নারীর পেট ছুরি দিয়ে কেটে শিশু সন্তান বের করে ওই শিশুকে গলা কেটে হত্যা করেছে মায়ের চোখের সামনে এবং কখনওবা আরো অনেকের চোখের সামনেই। আর এ ধরনের হত্যাকাণ্ড ও নৃশংস পাশবিকতার বহু ঘটনা ঘটানো হয়েছে হল্যান্ডের তথাকথিত শান্তি(?)রক্ষীদের চোখের সামনেই। এমনকি মাত্র ৫ ছয় মিটার দূরে যখন সার্ব সেনারা এইসব পাশবিকতা চালাতো তখনও এই সকল তথাকথিত শান্তি(?)রক্ষীরা কেবল বোবা দর্শকের মতই নীরব থাকতো ও হেঁটে বেড়াতো।

*** যুগ যুগ ধরে চলে আসা আরাকানের মুসলিমদের উপর বৌদ্ধ সন্ত্রাসী কর্তৃক নির্যাতন, **হাজার হাজার** রোহিঙ্গা মুসলিমদের গণহত্যা, গণধর্ষণ, শিশুদের পুড়িয়ে হত্যা করা, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে গ্রামের পর গ্রাম বিরান করে দেয়ার ঘটনা আমাদের থেকে দূরবর্তী নয়।

*** এছাড়াও বিগত কয়েক দশকে আমেরিকা ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গ পশ্চিমা ক্রুসেডার কর্তৃক মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেওয়া আফগানিস্তান যুদ্ধ, ইরাক যুদ্ধ, সিরিয়া যুদ্ধ, ইয়েমেন যুদ্ধ, পূর্ব আফ্রিকা ও পশ্চিম আফ্রিকার মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে **লক্ষ লক্ষ** মুসলিম নিহত হয়েছে।

[তথ্যসূত্র: ইসলামি ইতিহাস, প্রথম থেকে পঞ্চম খণ্ড: ড. রাগিব সরাজানি]

....

প্রিয় ভাই! মুসলিমদের উপর যুগে যুগে গণহত্যার ইতিহাসের আলোচনা শেষ হবার নয়।

আশাকরি, এতক্ষণের আলোচনায় নিচের কয়েকটি বিষয় আমাদের সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে-

এক. নবুয়তের যামানা হতে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদার ত্রিশ বছর, যখন ইসলামী জিহাদের স্বর্ণযুগ ছিল এবং মুসলিমরা তাদের জান-মালের সর্বস্ব জিহাদের জন্য ব্যয় করে সারা বিশ্বে ইসলামী খিলাফাহ কায়েম করলেন আর জীবন দিতে হল মাত্র বিশ থেকে ত্রিশ হাজার শহীদানের।

দুই. আর যখন আমরা দুনিয়ার মহব্বত আর মৃত্যুর ভয়ে জিহাদের ব্যাপারে শিথীলতা ও জিহাদ বিমুখতা প্রদর্শন করা শুরু করলাম, মৃত্যু থেকে পলায়ন করার চেষ্টায় লিপ্ত হলাম, মৃত্যুই তখন আমাদের উপর চেপে বসল; মুসলিম জাহানের উপর এক এক করে যে সকল বিপর্যয় আসতে লাগল, তাতে এই পরিমান জান-মালের ক্ষতি সাধিত হল যার হিসেব করা অসম্ভব!!!

তিন. ইসলামের চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসে যুগে যুগে আমরা গণহত্যার শিকার হয়েছি। বিপর্যয়ের মুহূর্তগুলোতে আমাদের মধ্যে অবশ্যই জিহাদ করতে সক্ষম বালেগ পুরুষ ছিল। তখন যদি আমরা জিহাদের ব্যাপারে 'প্রয়োজন পরিমাণ' যত্নশীল থাকতাম, তাহলে হয়ত আমাদেরকে এমন পরিণতি লাভ করতে হত না; হয়ত কুফ্ফাররা আমাদের উপর এমন নৃশংস গণহত্যা চালানোর সাহস পেত না, মা-বোনদের বে-ইজ্জতি করার মত দুঃসাহস দেখাতে পারত না, আমাদের ভূমিগুলোর দিকে তাদের লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারতো না; যেমনটি পারেনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে। হায়! গণহত্যার শিকার হয়ে আমাদের তো মরতে হলই, যদি আমরা বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে মরতাম!!

প্রিয় ভাই, কাপুরুষতা হায়াত বৃদ্ধি করে না, কেবলই জিল্লতি ও লাঞ্ছনা বয়ে নিয়ে আসে। অপরদিকে, বীরত্ব হায়াতকে কমাতে পারে না। তবে দুনিয়া ও আখিরাতে ইজ্জত ও শুভ পরিণতি বয়ে নিয়ে আসে।

তাহলে ভাই, কেন আমরা জিহাদ করবো না??? মরতেই যখন হবে, কাপুরুষতার মৃত্যু কেন?? কেন অপমান আর অপদস্তির মৃত্যু??? হয়ত আমরা দুনিয়ার বুকে শরীয়ত কায়েম করব, নতুবা শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে অমরত্ব লাভ করব। দুটি কল্যাণের একটি অবশ্যই লাভ করব, ইনশাআল্লাহ।

চার. কুফ্ফাররা কেন আমাদের উপর আগ্রাসন চালায়? কেন আমাদের উপর গণহত্যার পথ বেছে নেয়? কেন আমাদেরকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়?? কী আমাদের অপরাধ? কুফ্ফারদের কাছে আমাদের অপরাধ একটাই! আমরা মুসলিম, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর। অন্যরা যখন বলে আমি ইহুদী, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু কিংবা নাস্তিক; তখন আমরা ঘোষণা দেই যে, আমরা মুসলমান।

ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيۡرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُۗ

"তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ!" (সূরা হজ্জ ২২:৪০)

وَمَا نَقَمُواْ مِنۡهُمۡ إِلَّآ أَن يُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ ۝٨

"তারা (কুফ্ফাররা) তাদেরকে (মুসলিমদেরকে) শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।" (সূরা বুরুজ ৮৫:৮)

পাঁচ. আমাদের দ্বীন, আমাদের ঈমান-আমল, মসজিদ-মাদরাসা-মারকাজ-খানকাহসহ অন্যান্য দ্বীনী প্রতিষ্ঠানসমূহ হেফাযতের জন্যও জিহাদ করা একান্ত জরুরী। জিহাদ না করলে এমন একটি সময় আসবে যখন আমাদের মসজিদ, মাদরাসা, মারকাজ আর খানকাহগুলোতে তালা দেয়া হবে, কিংবা ধ্বংস করে দিয়ে ইতিহাস বানিয়ে দেয়া হবে, যেমনটি আমরা ইতিহাসের পাতায় পাতায় বারবার দেখেছি।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন-

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ۝٤٠

"আল্লাহ্ যদি মানুষদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত (ইসলাম আগমনের পূর্বে) নাসারা সংসার বিরাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় এবং (ইসলাম আগমনের পর) মসজিদসমূহ-যাতে খুব বেশী স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন যে আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।" (সূরা হজ্জ ২২: ৪০)

ছয়. আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা জিহাদ করি বা না করি- আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আমাদের দুশমনরা আমাদেরকে **ধর্মত্যাগ** কিংবা **দুনিয়াত্যাগ** দুটোর একটি বেছে না নেয়া পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে, সুযোগমত গণহত্যা চালাতেই থাকবে, যেমনটি আমাদের প্রভু রব্বে রাহীম আমাদেরকে অবহিত করেছেন-

وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟ ۚ

"আর তারা সবসময় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়।" (সূরা বাকারা ২:২১৭)

আর তাই কুফ্ফাররা চায়ও এটি যে, আমরা **অস্ত্র ত্যাগ** করে নিরস্ত্র হয়ে বসে থাকি। আর তারা তাদের হীন লিপ্সা চরিতার্থ করুক!

وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَٰحِدَةً ۚ.............وَخُذُوا۟ حِذْرَكُمْ ۗ

"কাফেররা চায় যে, তোমরা কোনরূপে (অস্ত্র/জিহাদ থেকে) অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে।........আর তোমরা অস্ত্র ধারণ কর।" (০৪ সূরা নিসা: ১০২)

প্রিয় ভাই! আমাদেরকে এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা কি কুফ্ফারদের চাহাদ-**অস্ত্রত্যাগ, ধর্মত্যাগ কিংবা দুনিয়াত্যাগ,** তিনটির কোনো একটাকে বেছে নিব, নাকি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দ্বীন রক্ষার্থে আমরণ লড়াই করব???

সাত. সারকথা হল, জিহাদের অপর নাম জীবন। যুদ্ধের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের হায়াত; শান্তি-নিরাপত্তা, ইজ্জত-সম্মান আর স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব লাভের মাধ্যমে দুনিয়াতে; শাহাদাত ও চিরস্থায়ী জান্নাতুল ফিরদাউস লাভের মাধ্যমে পরকালে। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝٢١٦

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হতে পারে একটা বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে

পছন্দীয়, অথচ তোমাদের জন্য তা অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলাই জানেন, তোমরা জান না।" (২ সূরা বাকারা: ২১৬)

একজন মুসলমানের রক্তের দাম কতটুকু?

দুনিয়াব্যাপী আজ চারিদিকে কেবলই মুসলিমদের আর্তনাদ আর আহাজারি শুনা যাচ্ছে। দিকে দিকে কেবল মুসলিমদের রক্তস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। মা-বোনদের বে-ইজ্জতি করা হচ্ছে। যেন মুসলিমরা মানুষই নয়; যেন 'মানুষ' শব্দটি মুসলিমদের জন্য নয়; যেন 'মানবতা' কথাটি তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়; মুসলিমদের যেন মানবাধিকার থাকতে নেই।

অথচ ভাই, একজন মুসলিমের রক্তের দাম আল্লাহ্ পাকের কাছে কতটুকু জানেন কি? জানেন কি একজন মুমিনের কী দাম তার রবের নিকট?

ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك

একদিন ইবনু উমার (রাঃ) বাইতুল্লাহ বা কা'বার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কতই না ব্যাপক ও বিরাট! তুমি কতইনা সম্মানিত কিন্তু তোমার চেয়েও মু'মিনের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে অনেক বেশি।" [হাসান, মিশকাত (৫০৪৪) , তা'লীকুর রাগীব (৩/২৭৭)]

আবূ বারযা আল-আসলামী (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে একই রকম বর্ণিত আছে।

عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله " .

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন : 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলার মতো একটি মানুষ অবশিষ্ট থাকতে কিয়ামত হবে না।" (সহীহ মুসলিম-২৭০)

অর্থাৎ এই আসমান যমীনে যা কিছু আছে, তার সবকিছু মিলে সেই দাম রাখে না, যেই দাম আল্লাহ্ পাকের নিকট একজন আদনা থেকে আদনা মুমিনের জন্য রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন,

لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق

"অন্যায়ভাবে একজন মুমিনের রক্তপাত অপেক্ষা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট তুচ্ছ।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-২৬১৯; সুনানে তিরমিজি, হাদীস নং- ১৪৫২,১৪৫৩)

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا

"ঐ সত্ত্বার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, কোনো মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা আল্লাহর কাছে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া অপেক্ষাও গুরুতর।" (সুনানে আন-নাসায়ী)

বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একজন মুসলিমের রক্তের দাম এতবেশি যে, একজন মুসলমানকে মহাবিশ্বের সকল মাখলুক মিলে যদি অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা মহাবিশ্বের সকল মাখলুককেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

তাহলে ভাই, আমরা কি বুঝতে পেরেছি, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমাদের, একজন মুসলমান ভাই কিংবা একজন মুসলিম বোনের কী মর্যাদা??

প্রিয় ভাই! একটি প্রশ্ন:

যদি পৃথিবীর কোথাও কোনো একজন মুসলিমও কুফ্ফার কর্তৃক বন্দী হয়, ঐ মুসলমানকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত জিহাদ করতে সক্ষম প্রতিটি মুসলমানের উপর যদি ফরযে আইন হয়ে যায়; তাহলে প্রশ্ন হল, যদি পৃথিবীর কোথাও কোনো একজন মুসলিমকে কুফ্ফাররা হত্যা করে, এই ক্ষেত্রে হুকুম কী?

আমাদের কী মনে হয়, এক্ষেত্রে কী হুকুম হতে পারে?

উত্তর: এক্ষেত্রে জিহাদ করে প্রতিশোধ নেওয়াটা অবশ্যই ফরজে আইন হবে। যেমনটি আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে হুদাইবিয়ার ঘটনায় দেখতে পাই যে, উসমান রাদি. এর হত্যার সংবাদ শুনা মাত্র বলে উঠেনঃ

لَا نَبْرَحُ حَتَّى نُنَاجِزَ الْقَوْمَ

[ابن كثير ,البداية والنهاية ط الفكر ,৪/১৬৭]

অর্থাৎ "(যদি এ খবর সত্য হয়ে থাকে) আমরা এখান থেকে কিছুতেই সরে যাব না যতক্ষণ না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি।"

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত ১৪০০ (মতান্তরে ১৫০০) সাহাবীর থেকে মৃত্যুর বাইয়াত নেন, এই মর্মে- 'হয়ত শরীয়ত, নয়ত শাহাদাত'; স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এই বাইয়াতের উপর সন্তুষ্ট হয়ে এই আয়াত নাযিল করেন-

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴿١٠﴾

"নিশ্চয় যারা আপনার কাছে বাই'আত গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহরই হাতে বাই'আত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। তারপর যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করার পরিণাম বর্তাবে তারই উপর এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তবে তিনি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দান করেন। (৪৮ সূরা ফাতহ:১০)

لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴿١٨﴾

"অবশ্যই আল্লাহ মুমিনগণের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নীচে আপনার কাছে বাই'আত গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জেনে নিয়েছেন; ফলে তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয়ে পুরস্কৃত করলেন।" (৪৮ সূরা ফাতহ:১৮)

তাহলে ভাই, আপনিই বলুন,

আজ পৃথিবীতে কি একজন মুসলিমও কুফ্ফারদের হাতে বন্দী হয়নি?

একজন মুসলমানকেও কি কুফ্ফাররা পৃথিবীতে হত্যা করেনি?

ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, মায়ামানমারে কী একজন মুসলমানও শহীদ হয়নি? তাহলে বর্তমান পৃথিবীতে জিহাদ করতে সক্ষম সকল মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হবে না কেন?

তাই, আল্লাহ্ পাকের হুকুম, একজন মুসলমানের রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য যদি সমস্ত মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেকেরই রক্ত দিতে হয়, তবু তাই দিতে হবে। একজনের জন্য যদি সকলকেই জীবন দিতে হয় তবুও দিতে হবে। মুসলিমের প্রতিটি রক্তের ফোঁটার হিসেব রাখতে হবে। একজন মুসলমানের একটি রক্তের ফোঁটার জন্য আমাদের সকলকে জিহাদ করতে হবে। প্রয়োজন পড়লে দুনিয়ার সমস্ত শক্তি ও অর্থ ব্যায় করতে হবে। একজন মুসলমানকে হত্যা করার পিছনে যদি একশ কিংবা এক হাজার কিংবা এক কোটি কিংবা কোনো একটি জাতির সকলের হাত থাকে, তবে সকলকেই হত্যা করতে হবে। এটিই আল্লাহর বিধান।

বাইয়াতে রিযওয়ানের ঘটনাটা আমরা আবারো একটু স্মরণ করি। একজন উসমান রা. এর হত্যার সংবাদ (যা কিনা গোজব ছিল, তা) পাওয়া মাত্রই তাঁর রক্তের বদলা নিতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং ১৪০০ সাহাবী শাহাদাতের উপর বাইয়াত গ্রহন করেছিলেন, একজনের রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ১৪০০ জন রক্ত দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। আর আল্লাহ্ পাকও সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন।

সুবহানাল্লাহ!!! একজন মুসলিমের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য যদি সকল সাহাবী যুদ্ধের শপথ নিয়ে থাকেন, মউতের উপর বাইয়াত গ্রহণ করেন, তাহলে ভাই, বর্তমান যামানায় লক্ষ লক্ষ মুসলিমের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য আমাদের তাহলে কী করা উচিত?? লক্ষ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমহানীর বদলায় আমাদের কী করা উচিত???

বাইয়াতে রিযওয়ানের ঘটনায় আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয়- আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এজন্য কোনো তিরস্কার করেননি যে, হে নবী! আপনি কেন একটি সংবাদ সত্য/মিথ্যা যাচাই না করেই যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে বসলেন?? বরং উল্টো মুসলমানদের জিহাদের এই জযবাকে নিজের সন্তুষ্টি দ্বারা পুরস্কৃত করলেন। যার জন্য যুদ্ধের এই বাইয়াত 'বাইয়াতে রিযওয়ান' (بيعة الرضوان) হিসেবে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করে। [রিযওয়ান অর্থ সন্তুষ্টি, এখানে আল্লাহর সন্তুটি উদ্দেশ্য]

এ ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয়, জিহাদ করাটা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কতটুকু প্রিয়! আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জিহাদ করা কতটুকু পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে, জিহাদই আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল।

সকল আমল/মেহনতের মধ্যে জিহাদই সর্বশ্রেষ্ঠ

عن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير أعمالكم الجهاد

হযরত হানযালা কাতিব (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, "তোমাদের আমল সমূহের মধ্যে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট আমল।" (তারিখে ইবনে আসাকির ১/৪৬৮)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ أَوْ أَيُّ الأَعْمَالِ خَيْرٌ قَالَ " إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ " . قِيلَ ثُمَّ أَىُّ شَيْءٍ قَالَ " الْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ " . قِيلَ ثُمَّ أَىُّ شَيْءٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলঃ সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কাজ কোনটি এবং উত্তম বা কল্যাণকর কোন্ ধরনের কাজ? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা। আবার প্রশ্ন করা হল, এরপর কোন্ জিনিস উত্তম? তিনি বললেনঃ জিহাদ হচ্ছে সকল কাজের চূড়া বা শিখর। আবার প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! এরপর কোন্ জিনিস উত্তম? তিনি বললেনঃ (আল্লাহ তা'আলার নিকট) কবুল হওয়া হাজ্ব। (বুখারী-২৬, মুসলিম-৮৩)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ الْعَمَلِ خَيْرٌ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

আবূ যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেনঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং মহান মহীয়ান আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং-৩১২৯)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ " لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ " . فَرَدُّوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ " لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ " . فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ " مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُ الْقَائِمِ الصَّائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করে, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হল, "কোন কাজটি সওয়াবের দিক থেকে আল্লাহর পথে জিহাদের সমতুল্য?" রাসূলে আকরাম ﷺ বললেন, তোমরা সে কাজের মতো শক্তির অধিকারী নও।" সাহাবায়ে কিরাম দুই কিংবা তিনবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসূলে আকরাম প্রতিবার এটাই বলছিলেন, "তোমাদের এরূপ করার মতো শক্তি-সামর্থ্য নেই। এরপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত থাকে তার দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে রোযা রাখে, কিয়াম করে, আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করে, এবং নামায-রোযার ব্যাপারে গাফিল থাকে না (অনবরত করতেই থাকে যতক্ষণ না); মুজাহিদ জিহাদ শেষে বাড়িতে ফিরে আসে।" (বুখারী-২৮৯৬ ও মুসলিম, তিরমিজি)

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ. قَالَ " لاَ أَجِدُهُ ـ قَالَ ـ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُرَ وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ ". قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ

বুখারীর এক বর্ণনা হল: এক ব্যক্তি নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমায় এমন কোনো আমলের কথা বলুন যা জিহাদের সমতুল্য? তিনি ﷺ বললেন, "আমি এমন কোনো আমল তো দেখছি না।" তারপর আবার বললেন, "তুমি কি এতটা শক্তির অধিকারী, যখন জিহাদকারী আল্লাহর পথে বের হয়, তখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে, অতঃপর নামায পড়তে থাকবে, এবং গাফলতি করবে না এবং রোযা রাখবে কিন্তু ইফতার করবে না।" সে ব্যক্তি বললেন, "এ কাজ করার ক্ষমতা কার আছে?" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৭৮৫)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ " رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ " ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হল, কোন্ ধরনের মানুষ সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার পথে যারা জিহাদ করে। তারা আবার প্রশ্ন করলেন, তারপর কে? তিনি বললেনঃ পাহাড়ের কোনো উপত্যকায় যে মু'মিন আশ্রয় নিয়ে নিজের প্রতিপালককে ভয় করে চলে এবং মানুষকে নিজের অনিষ্ট হতে নিরাপদে রাখে।" (সহীহ্, তালীকুর রাগীব (২/১৭৩), নাসা-ঈ, জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬৬০)

عَنْ اَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ: أَىُّ الْمُئْمِنِيْنَ أَكْمَلُ إِيْمَانًا؟ قَالَ: رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللهَ فِيْ شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ، قَدْ كَفَى النَّاسَ شَرِّهِ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদি. হইতে আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল, ঈমানদারদের মধ্যে সবচেয়ে কামেল ঈমানদার কে? তিনি ﷺ এরশাদ করলেন, "মানুষের মাঝে সবচেয়ে কামেল ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যিনি নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। আর দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যিনি পাহাড়ী কোনো ঘাঁটিতে অবস্থান করে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করে এবং অন্যান্য মানুষকে নিরাপদ রাখে।" (আবু দাউদ- ২৪৮৫)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الأَوْدِيَةِ يُقِيمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ فِي خَيْرٍ " .

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ সর্বোত্তম জীবন হলো সে ব্যক্তির জীবন যে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্যে ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে। শত্রুর উপস্থিতি ও শত্রুর দিকে আহ্বান শুনামাত্র ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে যথাস্থানে সে শত্রুকে হত্যা এবং নিজ শাহাদাতের সন্ধান করে। অথবা ঐ লোকের জীবনই উত্তম যে ছাগপাল নিয়ে কোন পাহাড় চূড়ায় বা (নির্জন) উপত্যকায় বসবাস করে আর যথারীতি সলাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং আমৃত্যু তার প্রভুর 'ইবাদাতে নিমগ্ন থাকে। লোকটি কেবল মঙ্গলের মধ্যেই রয়েছে।" (সহীহ মুসলিম-৪৭৮৩)

عن إبن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس في الفتن رجل أخذ بعنان فرسه أو قال: برسن فرسه خلف أعداء الله، يخيفهم ويخيفونه، أو رجل معتزل في باديته يؤدي حق الله الذي عليه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي رحمه الله. (المستدرك على الصحيحين، ج:٤ ص:٥١٠)

"ফেতনার যামানায় শ্রেষ্ঠ মানুষ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর শত্রুদের পেছনে ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেও আল্লাহর শত্রুদের সন্ত্রস্ত করে তুলবে, তারাও তাকে ভয় দেখাবে। কিংবা সেই ব্যাক্তি, যে নিজ চারণভূমিতে নিভৃত জীবন অবলম্বন করে নিজের দায়িত্বে আল্লাহ পাকের যেসব হক আছে, সেগুলো পালন করবে।" (মুসতাদরাকে হাকেম, খ. ৪, পৃ. ৫১০)

ইমাম হাকীম রহ. হাদিসটিকে বুখারী-মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী রহ.ও তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

عن أم مالك البهزية قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها؟ قال رجل في ما شيته يؤدي حقها و يعبد ربه ورجل أخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه.

উম্মে মালেক বাহযিয়া রা. বলেন যে, নবী করীম ﷺ একদা ফেতনাসমূহের বর্ণনা দিলেন। খুলে খুলে সবকিছুর বিবরণ পেশ করলেন। তখন আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তখন সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে হবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺইরশাদ করলেন, "ফেতনার যামানায় সবচেয়ে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি, যে তার ঘরবাড়ি ও পশুপালের মাঝে জীবন অতিবাহিত করবে, সেগুলোর হক্ব আদায় করবে এবং আপন রবের ইবাদতে নিমগ্ন থাকবে। আর সেই ব্যাক্তি, যে আপন ঘোড়ার মাথা ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে (সব সময় জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে) আর ইসলামের শত্রুদের সন্ত্রস্ত রাখবে। তারাও তাকে ভয় দেখাবে।" (সহীহ, আল ফিতান: খ. ১, পৃ. ১৯০)

عن عبد الرحمان بن زيد بن أسلم عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الجهاد حلوا أخضر ما قطر القطر من السماء، وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم: ليس هذا زمن جهاد، فمن أدرك ذلك الزمان، فنعم زمان الجهاد، قالو يا رسول الله : واحد يقول ذلك؟ قال نعم... من عليه لعنة الله والملاءكته والناس أجمعين.

নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন, "যতদিন পর্যন্ত আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, ততদিন পর্যন্ত জিহাদ সতেজ ও সুমিষ্ট থাকবে। আর অদূর ভবিষ্যতে মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যে যুগের কিছু আলেম বলবে, এটি জিহাদের যুগ নয়। অতএব, যে ব্যক্তি সে যুগটি পাবে, তার জন্য সেটি হবে জিহাদের শ্রেষ্ঠ যুগ।" সাহাবায়ে কেরাম অবাক হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! একজন মুসলমান কি এমন কথা বলতে পারে? নবীজী ﷺ বললেন, "হ্যাঁ, এমন মুসলমানরা বলবে, যারা আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপে অভিশপ্ত।" (আস্সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খ. ৩, পৃ. ৭৫১)

বর্তমান যামানা যে সেই ফিতনার যামানা, এটাকে অস্বীকার করার মতো কি কোনো উপায় আছে? কেননা বর্তমান যামানায়ই কতিপয় নামধারী আলেমের(?) মুখে এ ধরণের ভয়ানক কথা শুনা যাচ্ছে (এখন জিহাদের সময় নয়, বা এখন যা চলছে তা জিহাদ নয়, জিহাদ অন্য কিছু)। সাহাবায়ে কেরামের ঢাল-তলোয়ারের যুদ্ধের সাথে বর্তমান যামানার কামান-ট্যাংকের যুদ্ধের তারা কোনো মিল খোঁজে পাচ্ছেন না। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

প্রিয় ভাই!

বর্তমানে সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন হাদীসে উল্লেখিত দুই শ্রেণি। এই দুই শ্রেণির মধ্যে আবার মুজাহিদে ইসলাম শ্রেষ্ঠ হবেন, সন্দেহ নেই। কেননা, যারা নিজের চারণভূমিতে অবস্থান করবে, তারাতো কেবল নিজের ঈমান হেফাযত করবে। পক্ষান্তরে 'মুজাহিদীনে ইসলাম' নিজেদের ঈমানের পাশাপাশি গোটা উম্মতের ঈমান ও অস্তিত্ব রক্ষার কাজে

নিজের জীবনের বাজি লাগাবে। এর জন্য তারা বাড়ি-ঘর, পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান ও সহায়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে বুক পেতে দাঁড়াবে। তারা শত্রুদেরও হত্যা করবে, নিজেরাও শহীদ হবে।

লক্ষ্য করুন ভাই, হাদীসটিতে সশস্ত্র লড়াই ছাড়া 'হেকমত' খাটিয়ে জিহাদের অন্য কোনো ব্যাখ্যা করার অবকাশ আল্লাহর রাসূল ﷺরাখেননি। কেননা তিনি জানতেন, তাঁর শেষ যামানার উম্মত জিহাদ থেকে পালানোর জন্য নানা রকম 'হেকমত' (?) ও 'উদ্ভট ফতোয়া' উদ্ভাবন করবে। তাই, তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহর পথের শত্রুদের মোকাবেলায় অস্ত্র হাতে বুকটান করে দাঁড়ানো, ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখা (যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা), কখন ডাক আসবে আমি রণাঙ্গনে ছুটে যাবো, ইসলামের দুশমনদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখা, তাদেরকে হত্যা করা, নিজেরাও শাহাদাত বরণ করা, এগুলো কারা করছেন?

আমার প্রিয় ভাই!

আপনিই উত্তর দিন, এই কাজগুলো কাদের??

এ কাজের কৃতিত্বের দাবীদার কি কেবল মাত্র দ্বীনের মুজাহিদ ভাইয়েরা নন???

তাহলে, আপনিই বলুন, ভাই-

তারা কারা, যারা ইসলাম নামক তরীটিকে কুফ্ফারদের বেষ্টনী হতে উদ্ধার করতে নিজেদের জীবন বাজি ধরছে?

তারা কারা, যারা মুসলমানদের হারানো গ্রাম ও শহরগুলোকে উদ্ধার করতে পাহাড়ের অন্ধকার গুহায় পাড়ি জমিয়েছে?

তারা কারা, যারা উম্মতের জন্য এক সাগর ব্যথা বুকে নিয়ে দিবানিশি ছটফট করতে থাকে?

তারা কারা, যারা ইরাক, সিরিয়া আর ফিলিস্তিনের নিরীহ শিশুদের নিরাপত্তার জন্য নিজের সন্তানদের এতীম করছে?

তারা কারা, যারা কাশ্মীরের মা-বোনদের ইজ্জত আর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য নিজের মা-কে সন্তানহারা করছে? নিজের স্ত্রীকে বিধবা করছে?

তারা কারা, যারা আরাকানের ভাই-বোনদেরকে জ্বলন্ত চিতার হাত হতে রক্ষা করতে নিজেরা জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হচ্ছে?

তারা কারা, যারা আপন যৌবনকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবান করে নিজের জীবনের সকল প্রেম-ভালোবাসাকে জলাঞ্জলি দিয়ে যাচ্ছে?

তারা কারা, যারা প্রিয় হাবীব ﷺ-এর উম্মতের মহব্বতে নিজের বুকের তাজা খুন প্রবাহিত করে চলেছে?

তারা কারা?

কারা তারা?

কেন তাদের কথা আমরা স্মরণ করি না?

কেন তাদেরকে আমরা একটু ভালোবাসতে পারি না?

কেন তাদেরকে আমরা 'জঙ্গী' ট্যাগ দিয়ে দূরে ঠেলে দেই?

কেন তাদের কুরবানী আর ত্যাগের কোনো মূল্য আমাদের কাছে নেই?

কেন আমরা তাদের জন্য দুই হাত তুলে একটু দুআও করতে পারি না?

হায়! আফসোস! আমরা কোথায় আছি ভাই, কেন আজ আমাদের এই অবস্থা???......

প্রিয় ভাই! আমরা কি চাই না, সেই সকল মর্দে মুজাহিদ ভাইদের সাথী হতে, যাদেরকে পবিত্র হাদীস শরীফে সর্বোত্তম আখ্যায়িত করা হয়েছে, যেন আমরাও ভাইদের কাতারে শামিল হতে পারি??

আমরা কি উম্মাহর 'শ্রেষ্ঠ সন্তান' হতে চাই না; আমরা কি শ্রেষ্ঠ মুমিন, শ্রেষ্ঠ ঈমানদার হতে চাই না???

মুহতারাম ভাই!

আপনি অবাক হবেন, জিহাদ কেবলই সর্বশ্রেষ্ঠ আমল নয়, বরং বর্তমান যামানায় জিহাদ করা অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় গুরুত্বের দিক থেকে কমপক্ষে পঞ্চাশ গুণ বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, এমনকি সাহাবায়ে কেরামের যামানার চেয়েও!

কি ভাই, বিশ্বাস হচ্ছে না???.........

عن أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ قَالَ قَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالَ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ

আবূ ছা'লাবাহ খুশানী রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "তোমাদের পরবর্তীতে আসছে ধৈর্যের যুগ। সে (যুগে) ধৈর্যশীল হবে মুষ্টিতে অঙ্গার ধারণকারীর মতো। সে যুগের আমলকারীর হবে পঞ্চাশ জন পুরুষের সমান সওয়াব।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! পঞ্চাশ জন পুরুষ আমাদের মধ্য হতে, নাকি তাদের মধ্য হতে?' তিনি বললেন, "না, বরং তোমাদের মধ্য হতে!" অন্য বর্ণনায় আছে, "তোমাদের পঞ্চাশজন শহীদের সমান সওয়াব!" (আবূ দাউদ ৪৩৪৩, তিরমিযী ৩০৫৮, ইবনে মাজাহ ৪০১৪, ত্বাবারানী ১৮০৩৩, সঃ জামে' ২২৩৪ নং)

অর্থাৎ, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, ফেতনার যামানার একজন শহীদ সাহাবাদের সময়কার পঞ্চাশ জন গলাকাটা শহীদের সমান সওয়াব লাভ করবে (গুরুত্বের বিচারে)। সুবহানাল্লাহ! এ থেকেই বুঝা যায়, শেষ যামানায় জিহাদের গুরুত্ব, জটিলতা এবং ভয়াবহতা নবুয়তের যামানা অপেক্ষা পঞ্চাশ গুণ বেশি হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন?

কারণ-

- সাহাবায়ে কেরামের যামানায় স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ জিহাদের নেতৃত্বে ছিলেন, বর্তমানে তেমন কেউ নেই।
- সেই যামানায় নবীজী ﷺ বর্তমান থাকায়, সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের শক্তি ছিল বর্ণনাতীত। কিন্তু বর্তমানে যত দিন যাচ্ছে, উম্মতের ঈমানী শক্তি ততই হ্রাস পাচ্ছে।
- সেই যামানায় মুসলমানদের খিলাফত ছিল, বর্তমানে কোনো খিলাফত নেই।
- সেই যামানায় সাহাবায়ে কেরাম গুনাহমুক্ত ছিলেন বিধায়, আল্লাহর সাহায্য সহজেই আসত, বর্তমানে উম্মত গুনাহ ছাড়তে পারছে না বিধায় আগের মত মদদ নুসরত পাওয়া যাচ্ছে না।

- সেই যামানায় কুফ্ফারদের শক্তি ও সংখ্যা সাধারণত মুসলমানদের চার থেকে ছয়গুণ হতো, কিন্তু বর্তমানে কুফ্ফারদের শক্তির সাথে মুসলমানদের শক্তির কোনো তুলনাই চলে না।
- হাকীকত হচ্ছে, কুফ্ফারদের আছে পারমাণবিক বোমা আর মুসলমানদের কাছে ইট-পাটকেলও নেই।
- বর্তমান যামানার যে কোনো যুদ্ধ পূর্বের যে কোনো যুদ্ধের চেয়ে বেশি ভয়ানক, বেশি ধ্বংসাত্মক, বেশি ক্ষয়-ক্ষতি বয়ে আনে।
- সেই যামানায় দেড় হাজার সাহাবী পৃথিবী জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল, বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে দুনিয়াপ্রীতি ও মৃত্যুর ভয় (ওয়াহন) প্রবেশ করায় একশ সত্তর কোটি মুসলমানও বানের পানিতে ভেসে আসা খড়কুটোর মতো (মূল্যহীন ও দুর্বল) হয়ে গেছে। তাই কুফ্ফাররা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করছে।

এহেন কঠিন ও মারাত্মক পরিস্থিতিতে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমানের কারণে, তাঁদের প্রতি মহব্বতের কারণে, তাঁদের খবরকে সত্য বিশ্বাস করার কারণে, জিহাদের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে, নিজের জীবন বাজি লাগাবে, দুনিয়ার সকল সুখ-শান্তি, চাওয়া-পাওয়াকে আল্লাহর জন্য কুরবানি করবে, তারা উত্তম হবে না তো কারা হবে???

আমরা যারা ঘরে বসে আছি, কোন্ যুক্তিতে আমরা এই সকল মরদে মুজাহিদ্দের সমান বা উত্তম হবো???

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لَّا يَسْتَوِي ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةًۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا - دَرَجاتٍ مِنهُ وَمَغفِرَةً وَرَحمَةًۚ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا

"৯৫. গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান (যারা লড়াই করার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং জিহাদ ত্যাগ করার)- যাদের কোনো সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ সব মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারা সমান নয়। **যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায়** এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। **আল্লাহ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।** ৯৬. এগুলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (৪ সূরা নিসা :৯৫-৯৬)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জিহাদের গুরুত্ব বুঝার তাওফীক দান করেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

তাহলে, বর্তমানে আমরা কিভাবে জিহাদ করব বা জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত হব?

প্রিয় ভাই! সেটা দুই ভাবে হতে পারে-

- **জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রথম উপায়:**

মুজাহিদ ভাইদের কোনো হক্ব জামাতের সাথে জুড়ে যাওয়া। এটিই সর্বোত্তম ও সহজতম উপায়। এক্ষেত্রে, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে কবুল করেন এবং আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বানী করা শেষ জামানার হক জামাত "কালো পতাকার বাহিনী"র সন্ধান পেয়ে যাই এবং ভাইদের সাথে জুড়তে পারি তো আলহামদুলিল্লাহ। এটিই আমার জন্য সবচেয়ে খোশনসীব এবং সৌভাগ্যের বিষয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুন। আমীন। অতঃপর, তানজীমের বা ইমারাহর পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়, তা পালন করতে থাকা।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ فَيُوَطِّئُونَ لِلْمَهْدِيِّ " . يَعْنِي سُلْطَانَهُ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "প্রাচ্য দেশ থেকে কতক লোকের উত্থান হবে এবং তারা (ইমাম আল্) মাহদীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে।" (ইবনু মাজাহ। দঈফাহ ৪৮২৬, দঈফ আল-জামি ৬৪২১)

تخرج من خرسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلياء

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "খুরাসান (বর্তমান আফগানিস্তান) থেকে (ইমাম আল মাহদীর সাহায্যকারী) কালো বর্ণের পতাকাবাহী সৈন্যদল বের হবে। অবশেষে তা বাইতুল মুকাদ্দাসে স্থাপিত করা হবে। কোনো কিছুই তাকে প্রতিহত করতে পারবে না।" (আত-তিরমিযি: ২২৬৯, মুসনাদে আহমাদ: ৮৭৬০)

اذا رأيتم الريات السود قد جاءت من قبل خراسان فاءتوها فان فيها خليفة الله المهدي

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, "যখন তোমরা দেখবে, কালো পতাকাগুলো খোরাসানের দিক থেকে এসেছে, তখন তাদের সাথে যুক্ত হয়ে যেও। কেননা, তাদেরই মাঝে আল্লাহর খলীফা মাহদী থাকবে।" (মুসনাদে আহমদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৭৭; কানজুল উম্মাল, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ২৪৬; মেশকাত শরীফ, কেয়ামতের আলামত অধ্যায়)

تطلع الرأيات السود من قبل المشرق فيقاتلونكم قتلا لم يقتله قوم اذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج

"পূর্বদিক থেকে কালো পতাকাবাহী বাহিনীর আবির্ভাব ঘটবে। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে এত কঠিন লড়াই করবে, যা ইতিপূর্বে কোন জাতি করেনি, তাদেরকে আবির্ভূত হতে দেখলে তোমরা বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের দলে যোগ দিবে।" (সুনানু ইবনি মাজাহ: ৪০৮৪; মুসতাদরাকুল হাকিম:৮৪৩২; মুসনাদ আহমাদ:২২৩৮৭)

ইমাম ইবনে কাসির রহ. বলেছেন, হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী। হাকীম রহ. বলেছেন: এটি বুখারী-মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ। ইমাম জাহাবীও তার সাথে একমত হয়েছেন।

فمن أدرك ذلك منكم، فليأتهم ولو حبوا على الثلج

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে যারা সে যুগ পাবে, তারা যেন বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের নিকট চলে যায়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ফিতনা অধ্যায়, হাদিস নং- ৪০৮২)

• জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দ্বিতীয় উপায়:

প্রিয় ভাই! যারা কালো পতাকার বাহিনীতে এখনো যোগদান করতে পারেননি, তাদের জন্য করনীয় হল-

১. নিজে জিহাদের জন্য খালেছ (খাঁটি) নিয়ত করা। শাহাদাতের হক্ব তামান্না পোষণ করা।

২. নিজে জিহাদের শরয়ী ইলম (ফাযায়েল ও মাসায়েল) শিক্ষা করা। "তাওহীদ ও জিহাদ বিষয়ক ২০০ কিতাবের একটি আর্কাইভ: https://bit.ly/3e9omas । কিতাবগুলো পড়া যেতে পারে ইনশাআল্লাহ।

৩. নিজে শারীরিকভাবে ফিট (জিহাদের উপযুক্ত) থাকা। এজন্য নিয়মিত শরীরচর্চা করা।

৪. সর্বদা এমন নিয়ত রাখা যে, সুযোগ/সন্ধান পেলেই মুজাহিদ বাহিনীর সাথে জুড়ে যাব।

৫. হক তামান্নার সাথে মুজাহিদ ভাইদের হক জামাত তালাশ করতে থাকা এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুলিয়তের জন্য দোয়া করতে থাকা।

অতঃপর নিজের সাধ্যমত নিচের কাজগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকা-

০৬. নিজের সম্পদ দ্বারা জিহাদ করা

০৭. যারা জিহাদে যাচ্ছে তাদের প্রস্তুত হতে সাহায্য করা

০৮. মুজাহিদীনগণ তাদের যে সকল পরিবারবর্গকে রেখে গেছেন তাদের দেখাশোনা করা

০৯. শহীদের পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা

১০. আহত এবং কারারুদ্ধ মুজাহিদীনদের পরিবারের দেখাশুনা করা

১১. মুজাহিদীনদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা

১২. মুজাহিদীনদেরকে যাকাত প্রদান করা

১৩. আহতদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা

১৪. মুজাহিদীনদের প্রশংসা করা, তাঁদের কাজের যৌক্তিকতা তুলে ধরা এবং মানুষদেরকে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার দিকে আহবান করা

১৫. মুজাহিদীনদের অনুপ্রেরণা প্রদান করা এবং তাঁদেরকে (জিহাদ) চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করা

১৬. মুজাহিদীনদের পক্ষে কথা বলা এবং তাদের সমর্থন দেয়া

১৭. মুনাফিক এবং বিশ্বাসঘাতকদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে দেয়া

১৮. মানুষদেরকে জিহাদের দিকে ডাকা এবং উদ্বুদ্ধ করা

১৯. মুসলিম এবং মুজাহিদীনদেরকে পরামর্শ দেয়া

২০. মুজাহিদীনদের গোপন বিষয় গুলো গোপন রাখা যাতে করে তা থেকে শত্রুরা উপকৃত হতে না পারে

২১. মুজাহিদীন এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য দু'আ করা

২২. সঙ্কট কালীন দু'আ (কুনুত আন-নাওয়াযিল) বেশি বেশি পড়া

২৩. জিহাদের সংবাদ সংগ্রহ করা এবং তা প্রচার করা

২৪. তাঁদের প্রকাশিত বই ও প্রকাশনা ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করা

২৫. এরূপ ফাতাওয়া দেয়া যা তাঁদের সাহায্য করবে

২৬. আলেম ও দ্বীনের দা'য়ীদের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং তাঁদেরকে মুজাহিদীনদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা

২৭. অস্ত্র দ্বারা প্রশিক্ষণ নেয়া এবং বন্দুক চালনা করতে শেখা

২৮. সাঁতার কাটতে এবং ঘোড়ায় চড়তে শেখা

২৯. প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান অর্জন করা

৩০. মুজাহিদীনদের আশ্রয় দেয়া এবং তাদের সম্মান করা

৩১. কাফিরদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা এবং তাদের ঘৃণা করা

৩২. বন্দীদের মুক্ত করার চেষ্টা বৃদ্ধি করা

৩৩. বন্দীদের সংবাদ প্রচার করা এবং তাদের বিষয়ে সচেতন থাকা

৩৪. সতর্কতার সাথে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার জিহাদ চালিয়ে যাওয়া

৩৫. কাফিরদের বিরুদ্ধাচরণ করা

৩৬. সন্তানদের জিহাদ ও এর সাথে সংশ্লিষ্টদের ভালোবাসার মানসিকতা দিয়ে গড়ে তোলা

৩৭. বিলাসীতা ত্যাগ করা

৩৮. শত্রুদের পণ্য সামগ্রী বর্জন করা

৩৯. যারা যুদ্ধ করে (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) (হারবিইয়্যিন), তাদের থেকে অধিনস্ত হিসেবে কর্মী নিযুক্ত না করা (উদাহরণ স্বরূপ, আপনি কোন হিন্দুকে আপনার কোন কাজে নিয়োগ দিবেন না; কারণ হিন্দুরা কাশ্মীরে আমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে)

বিস্তারিত পড়ুন: (অবশ্যই Tor Browser দিয়ে ডাউনলোড করুন)

https://archive.org/details/39_20220827

- ## কিভাবে অনলাইন/মিডিয়া জিহাদের সাথে যুক্ত হবো?

=> প্রথম উপায়:

Tor Browser দিয়ে (অবশ্যই) নিচের লিংকগুলো ভিজিট করুন-

লিংক ০১:- https://gazwah.net/?p=32007

লিংক ০২:- https://bit.ly/3ANzGBU

=> দ্বিতীয় উপায়:

নিচের ওয়েবসাইটগুলোতে Tor Browser দিয়ে (অবশ্যই) নিয়মিত ভিজিট করুন:

https://dawahilallah.com
https://alfirdaws.org
https://gazwah.net
https://darulilm.org

প্রিয় ভাই! আমাদেরকে মনে রাখতে হবে-

জিহাদে অংশগ্রহনের জন্য প্রথম ধাপে কাজ না করা পর্যন্ত আমাদের জিহাদ করার ফরয (ফরযে আইন) আদায় হবে না। দ্বিতীয় ধাপে কাজ করার দ্বারা আমরা সাময়িকভাবে জিহাদের প্রস্তুতিমূলক কিছু কাজ করলাম মাত্র, যা অপূর্ণ এবং আংশিক। আমাদেরকে অবশ্যই প্রথম ধাপে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জিহাদে সার্বিকভাবে অংশগ্রহণের তাওফীক দান করুন। আমীন।

কিতাবুত তাহরীদ: দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হওয়ার পর **"দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্ ফোরাম"** এর মুহতারাম মুজাহিদ ভাইদের রিভিউ: নির্বাচিত কিছু স্ক্রীনশট (পোস্ট লিংক: https://bit.ly/tahrid2)

09-08-2022, 03:10 PM #8

জাযাকাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আপনার খিদমাতকে কবুল করুন। উম্মাহর জন্য কল্যাণকর করে দিন। আমীন।

10-01-2022, 07:23 AM #14

মাশাআল্লাহ ! ভাইয়ের তাহরীরকে আল্লাহ কবুল করেন ! আমীন !
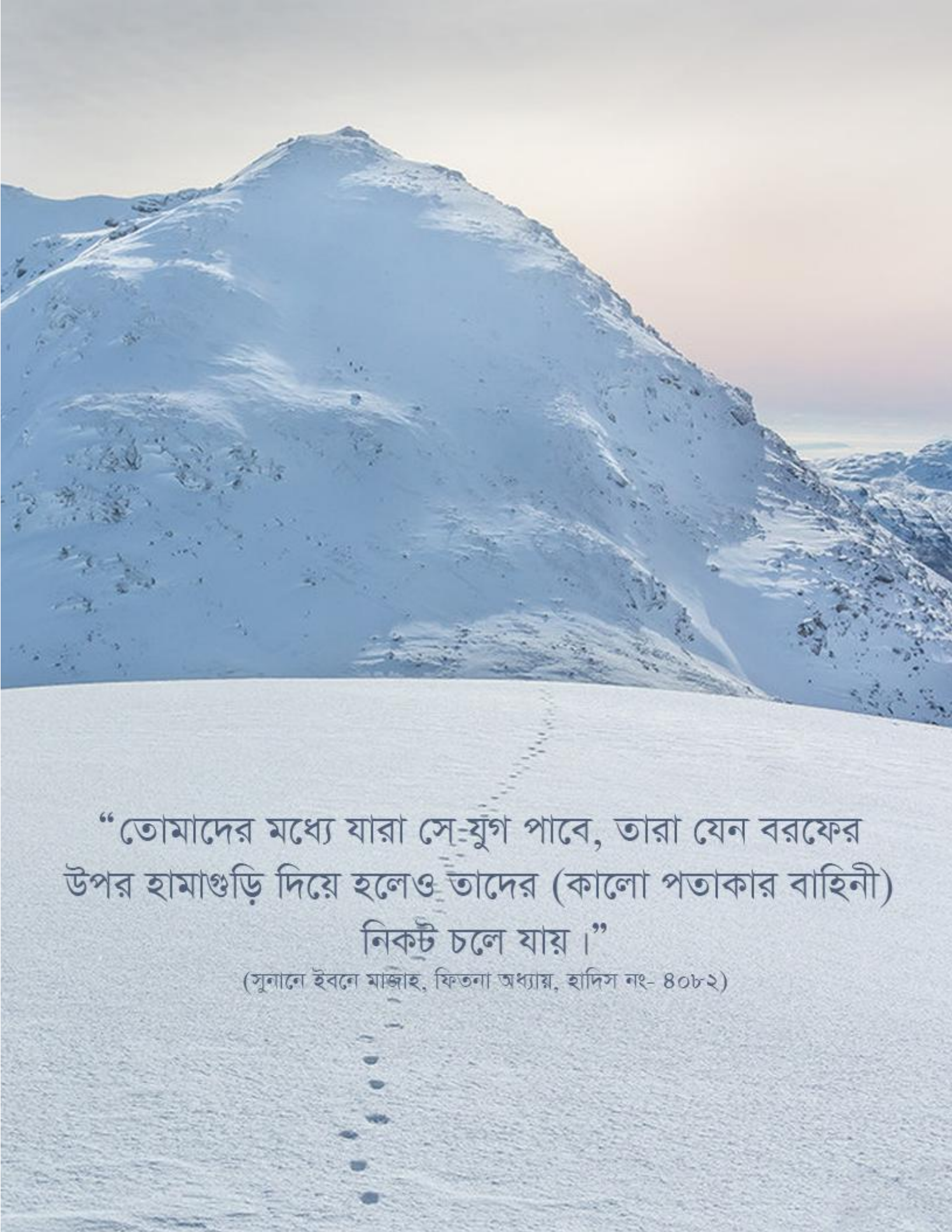
06-14-2023, 04:12 PM #17

"পূর্বদিক থেকে কালো পতাকাবাহী বাহিনীর আবির্ভাব ঘটবে। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে এত কঠিন লড়াই করবে, যা ইতিপূর্বে কোন জাতি করেনি, তাদেরকে আবির্ভূত হতে দেখলে তোমরা বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের দলে যোগ দিবে।" (সুনানু ইবনি মাজাহ: ৪০৮৪; মুসতাদরাকুল হাকিম:৮৪৩২; মুসনাদ আহমাদ:২২৩৮৭)

"তোমাদের মধ্যে যারা সে-যুগ পাবে, তারা যেন বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের (কালো পতাকার বাহিনী) নিকট চলে যায়।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ফিতনা অধ্যায়, হাদিস নং- ৪০৮২)

কিতাবুত্ তাহরীদ্ ‘আলাল ক্বিতাল
পর্ব: ৩
ভালোবাসি তোমায়,
হে জিহাদ!
মুস‘আব ইলদিরিম

লেখকের কথা

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ!

মুহতারাম ভাইয়েরা!

আলহামদুলিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ!!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আজ আপনাদের সামনে আমরা **"কিতাবুত তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল"** কিতাবটির **"তৃতীয় পর্ব: ভালোবাসি তোমায়, হে জিহাদ!"** নিয়ে হাজির হয়েছি। ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ!!! আলহামদুলিল্লাহ! প্রথম এবং দ্বিতীয়- পর্ব দু'টি প্রকাশিত হওয়ার পর আপনারা যেভাবে সাড়া দিয়েছেন, তাতে আমরা আপনাদের হৃদয় নিঙরানো ভালোবাসার উষ্ণ পরশ অনুভব করেছি। ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ!!! আপনাদের নেক দু'আ-ই আমাদের পাথেয়, সম্মুখে পথচলার প্রেরণাধার!

কিতাবুত তাহরীদ, তৃতীয় পর্ব নিয়ে কিছু কথা:

প্রিয় ভাই! আমরা জিহাদী জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে সকলেই কম-বেশি অবগত রয়েছি। জিহাদ কোনো ছেলে খেলা নয়। জিহাদ মানে অশ্রু, ঘাম আর রক্তের হোলিখেলা। জিহাদ মানে সতত ত্রস্ততা, ভয় ও আশংকা। জিহাদ মানে বাতিলের অন্ধকার কারাগারে নির্যাতনের স্টীমরোলার আর ধুঁকে ধুঁকে মরা। জিহাদ মানে দিবানিশি মৃত্যুর হাতছানি আর জীবনের আশংকা। জিহাদ মানে বুলেটের বিদীর্ণ আঘাতে জমিনে লুটিয়ে পড়া; বোমার আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও টুকরো-টুকরো হওয়া।

তাছাড়া, জিহাদ মানে নিন্দুকের নিন্দা, আর সমাজ থেকে বয়কট হওয়া। জিহাদ মানে পরিবার-পরিজন হারানো আর ক্যারিয়ার ধ্বংস হওয়া। এককথায়, জিহাদ মানে দুনিয়ার সর্বস্ব খোয়ানো; সর্বোচ্চ ক্ষয়-ক্ষতি আর দুঃখ-যাতনার সম্মুখীন হওয়া। এ এক ঈমানের ভয়ানক ও চরম পরীক্ষা!

কিন্তু তারপরো কেন আল্লাহ তা'আলা বললেন,

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা (ক্ষতি বা) বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর, এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও **তাঁর রাহে জিহাদ করা** থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত (দেখ, তোমাদের পরিণতি কি হতে যাচ্ছে), আর আল্লাহ তা'আলা ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" (০৯ সূরা তাওবাহ: ২৪)

অদ্ভূত বিষয়! জিহাদের মতো এমন একটি কঠিন আমলকে দুনিয়ার সবকিছু থেকে এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও ভালোবাসতে হবে; এটি কী করে সম্ভব, যার প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে দুঃখ-কষ্টের অমোঘ পঙক্তিমালা??? আবার রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর নিজ হাতে গড়া সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী সলফে সালেহীনদের সীরাতের দিকে তাকালে অবাক হতে হয়, কিভাবে তারা জিহাদকে এত ভালোবেসেছেন!! কিভাবে তারা জিহাদ প্রেমের অকূল দরিয়ায় সতত অবগাহন করেছেন!! কিভাবে জিহাদ প্রেমে তাঁরা তাদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছেন!! এটা কিভাবে সম্ভবপর হয়েছে??? কী তার রহস্য???..............

সেই রহস্যই উন্মোচিত করা হয়েছে আমাদের আজকের পর্বটিতে- **"ভালোবাসি তোমায়, হে জিহাদ!"** (আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন।) যথাসম্ভব সুন্দররূপে জিহাদ প্রেমের নিগুঢ় রহস্য আমাদের সামনে উন্মোচন করার চেষ্টা করা হয়েছে এক অভিনব কায়দায়।

প্রিয় ভাই, চলুন না, আমরাও জিহাদ প্রেমের সেই রহস্য উদ্ঘাটনে নেমে পড়ি এবং জিহাদপ্রেমের অকূল পাথারে ঝাঁপ দিয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করি।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন।

-মুস'আব ইল্‌দিরিম

সুচিপত্র

একজন জিহাদ প্রেমিকের ঐতিহাসিক চিঠি

'ইমামুল জিহাদ' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহর নাম শুনেনি এমন কোনো মুজাহিদ পৃথিবীতে আছে কিনা আমার জানা নেই। যদি থেকে থাকে, তবে এটি মুজাহিদ হিসেবে বড় অন্যায়। তাঁর ছিল অসাধারণ মেধা, অতলান্ত জ্ঞান, সীমাহীন খোদাভীতির পাশাপাশি উন্নত রুচি, শানিত ব্যক্তিত্ব প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও জিহাদের ময়দানে অসাধারণ বীরত্ব। এছাড়া তিনি ছিলেন ইলম ও আহলে ইলমের পৃষ্ঠপোষক, গরীব মিসকীনের দরদী বন্ধু, ওলী আল্লাহ, যাহিদ, আবিদগণের চোখের মনি। নির্যাতিত, নিপীড়িত, অসহায় মুসলমানদের জন্য তার ধমনীতে তপ্ত শোনিত ধারা প্রবাহিত হতো।

তিনি ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম। তিনি নিজেই বলেন,"আমি চার হাজার শাইখ থেকে ইলম অর্জন করেছি।" ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লহ বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের যুগে তাঁর চেয়ে অধিক ইলম অন্বেষণকারী আর কেউ ছিল না।' ইলম হাছিলের উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন বিশ্বের বড় বড় কেন্দ্র যথা: মক্কা, মদীনা, শাম, মিশর, ইয়ামান, কুফা, বসরা, জাযীরা প্রভৃতি এলাকা ভ্রমণ করেন।

তিনি ছিলেন হাদীস শাস্ত্রেরও ইমাম। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহর উস্তাদ ইমাম আলী ইবনে মাদীনী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ইলম দুই ব্যক্তি পর্যন্ত গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। একজন হলেন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক। দ্বিতীয় জন ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন।"

তিনি ফিকাহ শাস্ত্রেরও ইমাম ছিলেন। ইয়াহহিয়া বিন আদম বলেন, "আমি যখন সূক্ষ্ম মাসআলাসমূহ তালাশ করি এবং তা ইবনুল মুবারকের রচনাবলীতে না পাই, তখন আমি তা অন্য কোথাও পাওয়ার ব্যাপারে হতাশ হয়ে যাই।" এই ছিল ফিক্হ শাস্ত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহর স্থান। কিন্তু তাঁর এই পর্যায়ে পৌঁছা কোন্ মহান ব্যক্তিত্বের অনুগ্রহের ফসল ছিল তা তাঁর মুখ থেকেই শুনুন। তিনি বলেন,

تَعَلَّمْتُ الْفِقْهَ مِنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ

"আমি ফিক্হ ইমাম আবু হানীফা থেকে অর্জন করেছি।"

এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনের একটি উজ্জ্বল দিক হলো তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি একজন অসম সাহসী বীরপুরুষও ছিলেন। জীবনের বিপুল সময় তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহে কাফিরদের সাথে জিহাদ করে কাটিয়েছেন। তাঁর জীবনীতে পাওয়া যায় তিনি "ত্বরাসূস" নগরীতে বহুবার জিহাদের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। জিহাদের ময়দানে তিনি ছিলেন একজন পরীক্ষিত বীর সেনানী। তাঁর সহযোদ্ধাগণ জিহাদের ময়দানে তাঁর অসাধারণ বীরত্বের চমকপ্রদ ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন।

আবদাহ বিন সুলায়মান মারওয়াযী বলেন, আমরা রোমের ভূ-খণ্ডে ইবনে মুবারকের সাথে এক বাহিনীতে ছিলাম। এক সময় আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি হলাম। উভয়পক্ষ সারিবদ্ধ হল। এমন সময় শত্রু সৈন্যের এক ব্যক্তি বের হয়ে এসে আমাদেরকে দ্বৈতযুদ্ধের আহ্বান করল। তখন আমাদের সারি থেকে এক ব্যক্তি বের হলেন এবং লোকটিকে হত্যা করলেন। শত্রু সারি থেকে দ্বিতীয় আরেকজন বের হয়ে আসল। তিনি তাকেও হত্যা করলেন। তৃতীয় জন আসলে তাকেও হত্যা করলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে মোকাবেলার জন্য আহ্বান করতে লাগলেন। শত্রু সারি থেকে চতুর্থ এক ব্যক্তি বের হয়ে আসল। তিনি তার সাথে কিছুক্ষণ লড়াই করার পর তাকেও হত্যা করলেন। তখন

লোকেরা তাঁকে দেখবার জন্য ভীড় করতে লাগল কিন্তু তিনি তার পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্ত দ্বারা তার মুখ ঢেকে রাখছিলেন। আমি তার কাপড়ের প্রান্ত ধরে টান দিলাম, ফলে তার মুখ অনাবৃত হয়ে গেল। দেখলাম, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক। এ জাতীয় বীরত্বের ঘটনা আরো বহু আছে। এক ময়দানে তিনি এরূপ দ্বৈতযুদ্ধে একের পর এক ছয়জন রোমান বীরকে হত্যা করেন।

[কিতাবুল জিহাদ, "আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ." অধ্যায় দ্রষ্টব্য, পৃ:৫৫-৭৫; কিতাব লিংক: https://archive.org/details/kitabuljihad_202210]

যাইহোক, একবার বিখ্যাত তাবেয়ী, আবেদ হযরত ফুযাইল বিন আয়াজ রাহিমাহুল্লাহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ কে বাইতুল্লাহ্য় এসে রমযান মাসে নফল উমরাহ, সুন্নত ইতিকাফ করার পরামর্শ দিয়ে চিঠি লিখেন। কেননা বাইতুল্লাহ্য় এক রাকাত নামায আদায় করলে এক লক্ষ রাকাতের সওয়াব হয়। কাবাঘরের দিকে তাকালে প্রতি পলকে এক লক্ষ নেকী। সেখানে গেলে ঈমান চাঙ্গা হয়। সারা দুনিয়ার আল্লাহ্‌র ওলীরা এখানে আসেন, তাঁদের সোহবত মিলবে। রমযান মাসে তো সওয়াবের কোনো হিসাবই নেই। তাছাড়া মদীনা শরীফে এক ওয়াক্ত নামাযে পঞ্চাশ হাজার রাকাতের সাওয়াব মিলবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ এখানে আছেন। তাঁর সোহবতে থাকা যাবে। তাই এত লাভের আমল ছেড়ে এত কষ্ট করে জিহাদের ময়দানে থাকার কী দরকার!

জবাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ এক ঐতিহাসিক চিঠি লিখেন। তিনি লিখেন,

يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنَا - لَعَلِمْتَ أَنَّكَ فِيْ الْعِبَادَةِ تَلْعَبُ
مَنْ كَانَ يَخْضَبُ جِيْدُهُ بِدُمُوْعِهِ - فَنُحُوْرُنَا بِدِمَائِنَا يَتَخَضَّبُ
أَوْ كَانَ تَتْعَبُ خَيْلُهُ فِيْ بَاطِلٍ - فَخُيُوْلُنَا يَوْمَ الصَّبِيْحَةِ تَتْعَبُ
رِيْحُ الْعَبِيْرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيْرُنَا - رَهْجُ السَّنَابِكِ وَالْغُبَارُ الْأَطْيَبُ
وَلَقَدْ أَتَانَا مِنْ مَّقَالِ نَبِيِّنَا - قَوْلٌ صَحِيْحٌ صَادِقٌ لَا يَكْذِبُ
لاَ يَسْتَوِىْ غُبَارُ خَيْلِ اللهِ فِيْ - أَنْفِ امْرِئٍ وَدُخَانُ نَارٍ تَلْهَبُ
هٰذَا كِتَابُ اللهِ يَنْطِقُ بَيْنَنَا - لَيْسَ الشَّهِيْدُ بِمَيِّتٍ لَا يَكْذِبُ

"ইবাদতে মগ্ন আবেদ হায়রে মক্কা-মদিনায়!
দেখলে মোদের জানতে তুমি লিপ্ত খেল-তামাশায়।
তোমরা বক্ষ ভাসাও সেথায় নয়নের জল বানে,
মোরা হেথায় রঙ্গীন করি বক্ষ তাজা খুনে।
তোমাদের অশ্ব ক্লান্ত হয় বৃথা অকারণে,
মোদের অশ্ব ঢলে পড়ে লড়ে যুদ্ধ-রণে।
মৃগনাভীর ঘ্রাণ যদিও তোমাদের কাছে প্রিয়,
যোদ্ধা ঘোটকের ক্ষুরধুলি মোদের পছন্দনীয়।
প্রিয় নবীজীর অমর বাণী বেজেছে মোদের কানে,
সত্য, সঠিক, শুদ্ধ যাহা কে তারে মিথ্যা জানে।
জাহান্নামের ধোঁয়া সেথায় ঢুকবে কেমন করে,
জিহাদের ধুলিকণা ঢুকেছে যার নাসিকা ভরে?
কুরআন পাকে ঘোষিত হয়েছে সত্য মোদের তরে,
শহীদ কখনো যায় না মরে, কে বলে মিথ্যা তারে?"

চিঠিটি হাতে পেয়ে হযরত ফুযাইল রাহিমাহুল্লাহ কান্না শুরু করে দেন এবং বলেন, ইবনুল মুবারক আমাকে অনেক নসীহত করেছে! সে সত্য বলেছে।

প্রিয় ভাই!

উল্লেখিত শেরগুলোর মাঝে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহি. কুরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় মুজাহিদগণের ফযিলত বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদের জীবন ও মরণ উভয়টি একজন আবেদ অপেক্ষা অতি উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। হযরত ফুযাইল বিন আয়ায ছিলেন একজন বিখ্যাত তাবেয়ী (সাহাবায়ে কেরামের পরেই যাদের মর্যাদা), মুহাদ্দিস, আবেদ ও যাহেদ; তিনি দিবা-নিশি মক্কা-মদীনায় ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রাহি.) এর পত্রটি অত্যন্ত আনন্দচিত্তে গ্রহণ করে নিয়েছেন। পত্র পড়ে মূল্যবান নসিহতের জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের শুকরিয়া আদায় করেছেন। এবং পত্র বাহককে পুরষ্কৃত করেছেন।

যাইহোক, এই চিঠিটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষতঃ চিঠিটির প্রথম স্তবকটি আবেদ ব্যক্তিদের জন্য অনেক বড় একটি নসীহত। মক্কা-মদীনার হেরেম শরীফে ইবাদত করা, সেখানে ইতিকাফ করা, আল্লাহর রাসূলের রওযা মুবারকে জীবনে একবার অন্ততঃ সালাম দিতে পারা কতই না সৌভাগ্যের বিষয়!

কিন্তু যে সকল ভাই জিহাদ ত্যাগ করে "হারামাইন শরীফাইন"-এ সওয়াবের আশায় যিন্দেগী কাটান ('খাইরুল কুরুন' হওয়া সত্ত্বেও) তাদের ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ কেন বললেন যে, "এটা মূলতঃ ইবাদতের নামে আল্লাহ তা'আলার সামনে খেল-তামাশায় লিপ্ত হওয়ার নামান্তর"! আসলে এটি গভীরভাবে ভাববার বিষয়- কেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ একথা বললেন, আর তাঁর বন্ধু ফুযাইল রাহিমাহুল্লাহ কী বুঝে কাঁদলেন!

প্রিয় ভাই আমার! আমরা কি এথেকে কিছু বুঝতে পেরেছি???

চলুন! বিষয়টি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা যাক।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক রাহিমাহুল্লাহ হয়তো তাঁর বন্ধুকে এই কথাগুলোই বুঝাতে চেয়েছিলেন-

ইবাদত নিয়ে খেল-তামাশা!!!

❖ *ওহে ইবাদতকারী! ওহে 'আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি' অন্বেষণকারী!*

বন্ধু! তোমার ইবাদতের লক্ষ্য কি? সারা জীবন হারামাইন শরীফাইনে পড়ে থেকে ইবাদত করার মাক্সাদ কী? তোমার ইবাদতের লক্ষ্য যদি হয়ে থাকে "আল্লাহর সন্তুষ্টি", তাহলে তো তুমি ময়দানের ইবাদত করতে, কেননা, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো "তাঁর রাহে জিহাদ করা"। জিহাদী মেহনত করলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হতেন!

দলীল: হযরত আবু সালেহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাঁরা (কয়েকজন সাহাবী) আলোচনা করছিলেন, "যদি আমরা জানতে পারতাম, কোন্ আমলটি সর্বোত্তম বা আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক পছন্দনীয়!" তখন নাযিল হলো.....

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ۝١٠ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝١١

"মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে উত্তম ব্যবসার সন্ধান দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বুঝ।" (সূরা আস সাফ ৬১: ১০-১১)

(কিতাবুল জিহাদ, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ., পৃ. ৮১)

যদি তুমি সত্যিই ইবাদত করাকে ভালোবেসে থাক আর তুমি যদি এমন একটি ইবাদতের সন্ধানকারী হও, যেটিতে আল্লাহপাক তোমার উপর সর্বাধিক সন্তুষ্ট হবেন, এমন আমলের সন্ধান পেলে তুমি আমৃত্যু তা করে যেতে, তাহলে সে তো 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্'। কেননা, একবার কয়েকজন আনসারী সাহাবী, যাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন, তাঁরা এমন একটি আমল তালাশ করছিলেন যে আমলটি আল্লাহপাক সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন; আর তাঁরা নিয়ত করেছিলেন যে, তারা এমন একটি আমলের সন্ধান পেলে আজীবন সেই মেহনতের সাথে জুড়ে থাকবেন। তখন তাদের ব্যাপারেও যে আয়াতসমূহ নাযিল হয়, তা হলো সূরা ছফের আয়াতসমূহ। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত লাভের পূর্ব পর্যন্ত জিহাদে লিপ্ত ছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنۡيَٰنٞ مَّرۡصُوصٞ ﴿٤﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে এমনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে, যেন তারা এক শিশাঢালা সুদৃঢ় প্রাচীর।" (৬১ সূরা ছফ: ০৪)

عن ابي أمامة رضي الله عنه عن النبيى صلى الله عليه وسلم قال: ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، لا يناله الا افضلهم

হযরত আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন- "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। এ আমল ঐ ব্যক্তিই সম্পাদিত করতে পারবে, যে সর্বোত্তম/আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অত্যধিক প্রিয়।" (মু'জামে কাবীর, তাবরানী-৮/২২৪)

বন্ধু! আমরা তো নানান রকম নিয়ত করে থাকি, যেমন- অমুক আমল বা অমুক মেহনত আজীবন করতেই থাকব, অমুক আমল বা অমুক মেহনতের সাথে আজীবন লেগেই থাকব, অন্য কোনো আমল বা মেহনত করবো না, তাইনা? বন্ধু, তুমি কি জান, উম্মাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানগণ অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম, যারা হলেন আমাদের আদর্শ, তারা কোন্ আমলের সাথে আজীবন, মওত পর্যন্ত জুড়ে থাকার জন্য শপথ করেছিলেন?

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ كَانَتْ الأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُوْلُ:

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدَا * عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِيْنَا أَبَدَا

فَأَجَابَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ * فَأَكْرِمْ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ খন্দকের যুদ্ধের দিন আবৃত্তি করছিলেনঃ

মুহাম্মদের সা. হাতে করেছি শপথ জিহাদের,
পিছু হটবনা কভূ পূর্বে মউতের।

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উত্তর দিয়ে বললেনঃ হে আল্লাহ্! পরকালের সুখ হচ্ছে প্রকৃত সুখ; তাই তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সম্মানিত কর। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৯৬১)

❖ *ওহে সওয়াব প্রত্যাশী!*

তুমি যদি হেরেম শরীফে ইবাদত করে থাক অধিক সওয়াবের আশায়, তাহলে তোমার জানা উচিত ছিল, জিহাদই হলো সর্বোত্তম, লাভজনক ব্যবসা, অল্প পরিশ্রমে অনেক বেশি মুনাফা লাভ হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ۝١٠ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝١١

"মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে উত্তম ব্যবসার সন্ধান দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বুঝ।" (সূরা আস সাফ ৬১: ১০-১১)

عن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير أعمالكم الجهاد

হযরত হানযালা কাতিব (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, "তোমাদের আমল সমূহের মধ্যে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট আমল।" (তারিখে ইবনে আসাকির ১/৪৬৮)

عَنْ سُهَيْلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَقَامُ أَحَدِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ سَاعَةً خَيْرٌ لَّهُ مِنْ عَمِلِهِ عُمَرُهُ فِيْ أَهْلِهِ

হযরত সোহাইল রাদি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এরশাদ করতে শুনেছি যে, "তোমাদের কারো সামান্য সময় আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় (যুদ্ধের কাতারে/জিহাদের জন্য) দাঁড়ানো তার পরিবার পরিজনের মধ্যে থেকে সারা জীবনের নেক আমলের চেয়ে উত্তম।" (মুসতাদরাকে হাকেম)

বন্ধু তুমি কি জান, জিহাদের জন্য হিজরত করা কেমন সওয়াবের আমল?

عن أبي فاطمة رضى الله عنه قال:قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, "তুমি আল্লাহ্র রাস্তায় হিজরত করতে থাক। কেননা হিজরতের ন্যায় (সওয়াবের) কোনো আমল নেই। অর্থাৎ হিজরত সবচেয়ে উত্তম আমল।" (নাসাঈ-৪১৭২)

عن عبدالله بن عمرو كنتُ عندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم وطلَعتِ الشَّمسُ، فقالَ: يأتي اللَّهَ قومٌ يومَ القيامةِ، نورُهُم كَنورِ الشَّمسُ، فقالَ أبو بَكْرٍ: أنَحنُ هم يا رَسولَ اللَّهِ؟ قالَ: لا، ولَكُم خيرٌ كثيرٌ، ولَكِنَّهمُ الفُقَراءُ والمُهاجرونَ الَّذينَ يُحشَرونَ مِن أقطارِ الأرضِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম, তখন সূর্য উদিত হলো। তিনি বলেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট এমন

একটি দল উপস্থিত হবে যাদের নূর সূর্যের আলোর ন্যায় চমকাতে থাকবে। তখন আবূ বকর (রাঃ) বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমরাই কি তারা? তিনি ﷺ উত্তর দিলেন, "না, তোমাদের জন্য তো অনেক কল্যাণ রয়েছে, কিন্তু তারা হলেন দরিদ্র ও মুহাজিরগণ, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাদেরকে একত্রিত করা হবে।" (মুসনাদে আহমাদ)

বন্ধু! তুমি কি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের জন্য ব্যয় করার ফযীলত জান?

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ "

প্রিয় রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) কিছু ব্যয় করে, তার আমলনামায় সাত শত গুণ লেখা হয়ে থাকে।" (তিরমিযী-১৬২৫, মিশকাত-৩৮২৬, নাসাঈ, তা'লীমুর রাগীব ২/১৫৬)

বন্ধু হে! তোমার কাছে কি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের কাজে এক সকাল বা এক বিকাল ব্যয় করার ফযীলতের হাদীস সমূহ পৌঁছেছে?

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا "

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় (জিহাদের/যুদ্ধের ময়দানে) একটি সকালের ব্যয় পৃথিবী এবং এর মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম। জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা পৃথিবী এবং এর মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম।" (সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৭৫৬), নাসা-ঈ, জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৬৪৮)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ".

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "আল্লাহর পথে (যুদ্ধের ময়দানে/জিহাদের কাজে) একটা সকাল কিংবা একটা বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও তার সমস্ত জিনিস (এর অধিকারী হওয়া কিংবা তা সাদাকা করার সওয়াব) হতে অধিক উত্তম।" (বুখারী-২৭৯২ ও মুসলিম)

عَنْ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ : غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَلَوْ قُوْفُ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ رَجُلٍ سِتِّيْنَ سَنَةً

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! এক সকাল কিংবা এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে নিয়োজিত রাখাটা (যুদ্ধ করা) গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সমস্ত জিনিস হতে উত্তম। আর তোমাদের কারোও যুদ্ধের ময়দানে কাতার বন্দী হওয়া ষাট বৎসরের (নফল) নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।" (মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক-৫/২৫৯, হাদীস নং-৯৫৪৩)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: يَوْمٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ

হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাদি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এই এরশাদ করতে শুনেছি যে, "আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় (জিহাদের ময়দানে) একদিন উহা ব্যতীত হাজার দিন অপেক্ষা উত্তম।" (নাসাঈ-৩১৭২)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ

আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ্‌র রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল বের হওয়া সেসব কিছু থেকে উত্তম, যার উপর সূর্য উদিত হয় অথবা অস্ত যায়।" (সহীহ; সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১১৯)

বন্ধু! তুমি কি জান, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের জন্য একদিন বা এক রাত্রি সীমানা পাহারা দেয়া কী পরিমাণ সওয়াবের কাজ?

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَرَوْحَةٌ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لَغَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'আলার পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেওয়া পৃথিবী ও তার উপরের সকল কিছু হতে উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো চাবুক পরিমাণ জায়গা পৃথিবী ও তার মধ্যকার সব কিছু হতে উত্তম। (জিহাদের কাজে/যুদ্ধের ময়দানে/সীমান্ত পাহারাদারীতে) বান্দার এক বিকাল অথবা এক সকালের ব্যয় পৃথিবী ও তার উপরের সকল কিছু হতে কল্যাণকর।" (সহীহ্, বুখারী-২৭৯৪, ২৮৯২, ৬৪১৫; জামে' আত-তিরমিজি-১৬৬৪)

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ইরশাদ করেন,

رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ

"আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিনের সীমান্ত পাহারায় রত থাকা অন্যান্য স্থানের হাজার দিন হতে উত্তম।" (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৬৯)

عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَابَطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً كَانَتْ لَهُ كَصِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، فَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ

সালমান ফারসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন এবং এক রাত সীমান্ত পাহারায় রত থাকে তার জন্য এক মাস সাওম পালন করার ও (রাত জেগে) ইবাদতের সওয়াব রয়েছে। সে ইন্তিকাল করলেও তার সে আমল জারি থাকবে যা সে করত (কিয়ামত পর্যন্ত বর্ধিত করা হবে) আর সে সকল ফিতনা/কবরের আযাব হতে রক্ষিত থাকবে, আর (কবরে) তাকে (শহীদদের মত) রিযিক বরাদ্দ করা হবে।"

[সহীহ্, সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৬৮, জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৬৬৫; ফাযালা ইবনু উবাইদ (রাঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা দেখুন- মিশকাত তাহকীক ছানী (৩৪) এবং (৩৮২৩), তা'লীকুর রাগীব (২/১৫০), সহীহা (৫৪৯), সহীহ্ আবূ দাউদ (১২৫৮), জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৬২১, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৫০০]

رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام ألف يوم، وقيام ألف ليلة

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত প্রহরা দেয়া হাজার দিন রোযা রাখা এবং হাজার রাত্রি ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।" (তিরমিযী, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: حَرْسُ لَيْلَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ رَجُلٍ وَقِيَامِهِ فِيْ أَهْلِ أَلْفِ سَنَةٍ اَلسَّنَةُ ثَلَاثُ مِأَةٍ وَسِتُّوْنَ يَوْمًا وَالْيَوْمُ كَأَلْفِ سَنَةٍ

হযরত আনাস বিন মালেক রাদি. বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "জিহাদের ময়দানে একটি রাত পাহারাদারী করা ঘরে বসে এক হাজার বছর নামায-রোযা করার চেয়ে উত্তম। উল্লিখিত বছর হবে তিনশত ষাট দিনে। তবে একদিন হবে এক হাজার বছরের ন্যায়। (সুনানে ইবনে মাজাহ-২/২০৪)

"সুবহানাল্লাহ"। উল্লিখিত হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করলে সত্যিই অবাক হতে হয় যে, এক রাত জিহাদের ময়দানে পাহারার কি পরিমাণ ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। চলুন, অংকটা একটু হিসেব করে নেই,

হাদীসের ভাষ্যমতে,
এক বছর = ৩৬০ দিন
অতএব, ১০০০ বছর = ১,০০০ × ৩৬০= ৩,৬০,০০০ দিন
আবার, প্রতিটি দিন ১০০০ বছরের সমান।
তাই, ০১ দিন হবে = ৩,৬০,০০০ দিনের সমান
অতএব, ১০০০ বছর বা ৩,৬০,০০০ দিন হবে=
৩,৬০,০০০ × ৩,৬০,০০০= ১২,৯৬০,০০,০০,০০০ (বার হাজার নয়শত ষাট কোটি) দিনের সমান=
৩৬,০০,০০,০০০ (ছত্রিশ কোটি) বছরের সমান।
আল্লাহু আকবার!!!
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিনের পাহারাদারির সওয়াব = বারহাজার নয়শত ষাট কোটি দিন ইবাদাতের সাওয়াব লাভ হবে।

সুতরাং প্রিয় বন্ধু! উপরের হাদীস থেকে তো এটিই বুঝে আসে যে, আমার একরাত্রির পাহারাদারির সওয়াব = তোমার ছত্রিশ কোটি বছরের নামায ও ছত্রিশ কোটি বছরের রোযার সমান সওয়াব!!!!!!

বন্ধু তুমি কি জান, কারা সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে??

عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله -عز وجل- لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟!! قال: إنهم كانوا عبادا يعبدوني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور، ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار». صحيح لغيره

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ "তোমরা কি জান আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে কে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে? তারা বললঃ আল্লাহ এবং তার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে অভাবী ও মুহাজিরগণ, যাদের দ্বারা সীমান্তসমূহ বাঁধ দিয়ে রক্ষা করা হয় ও যাদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে কষ্টকর বিষয়সমূহ থেকে বাঁচা হয়। তাদের কেউ মারা যায়

কিন্তু তার প্রয়োজন তার অন্তরেই থাকে, তা পূর্ণ করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতাদের থেকে যাকে ইচ্ছা বলবেন, তাদের কাছে যাও, তাদেরকে সালাম কর। অতঃপর ফেরেশতারা বলবে, আমরা আপনার আসমানের অধিবাসী, আপনার সর্বোত্তম মাখলুক, আপনি আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন তাদের কাছে যাব এবং তাদেরকে সালাম করব?! তিনি বলেন, তারা এমন সব বান্দা ছিল যারা আমার ইবাদত করত, আমার সাথে কাউকে শরীক করত না। তাদেরকে দ্বারা সীমান্তসমূহ বাঁধ দিয়ে রক্ষা করা হতো ও তাদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে কষ্টকর বিষয়সমূহ থেকে বাঁচা হতো, তাদের কেউ মারা যেত কিন্তু তার প্রয়োজন তার অন্তরেই থাকত, সে তা পূর্ণ করতে পারত না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ অতঃপর তখন তাদের নিকট ফেরেশতাগণ আসবেন, প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবেন এ কথা বলতে বলতে যে, তোমাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক, কারণ তোমরা ধৈর্যধারণ করেছো,আর আখেরাতের প্রতিদান কতইনা সুন্দর!" (মুসনাদে আহমদ)

বন্ধু, তুমি কি আল্লাহ্র জন্য জিহাদের ময়দানে একটি তাকবীরের ফযীলত জান?

عن إبن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: من كبّر تكبيرة في سبيل الله، كانت كصخرة في ميزانه يوم القيامة أثقل من السماوات والأرض وما فيهن، ومن قال في سبيل الله لا إله إلا الله، والله أكبر رافعاً صوته بها كتب الله له بها رضوانة الأكبر ومن يكتب له رضوانه الأكبر جمع الله بينه وبين محمد وإبراهيم وسائر الأنبياء-عليهم الصلاة والسلام

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,"যে আল্লাহ্র পথে (জিহাদের ময়দানে) একটি তাকবীর দিবে, কিয়ামত দিবসে তা মীযানে এমন পাথরের আকার ধারণ করবে, যা আসমান, যমীন ও তার মাঝের সবকিছুর চেয়ে বেশি ভারী হবে। আর যে আল্লাহর পথে উচ্চস্বরে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" বলবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য 'মহাসন্তুষ্টি' লিখে দিবেন, তাকে মুহাম্মাদ ﷺ, ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ও সকল নবীর সাথে একত্রিত করবেন।" (তানযীহুশ শরীয়াহ, খ. ২, পৃ. ১৭৮)

ফকীহ আবুল লাইস সমরখন্দী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মহাসন্তুষ্টি"-এর ব্যাখ্যায় মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, তা আল্লাহ তা'আলার দীদার। আবার কেউ বলেন, তা আল্লাহর এমন সন্তুষ্টি, যার পর তিনি আর অসন্তুষ্ট হবেন না। (তাম্বীহুল গাফিলীন, পৃ. ৩৯১)

বন্ধু, তুমি কি জান, মুজাহিদের ঝিমুনি ত্রিশটি গোলাম আযাদ করার চেয়েও বেশি সওয়াবের কাজ?

وروى عثمان بن عطاء، عن أبيه قال: دخل رجل مع عبد الرحمن بن عوف في حائط له فأعتق ثلاثين رقبة، فجعل الرجل يتعجب من ذلك، فقال له عبد الرحمن: أفل أخبرك بعمل أفضل منه؟ قال: نعم. قال: بينما رجل يسير في سبيل الله تعالى على دابة وسوطه متعلق في أصبعه ، إذ نعس نعسة فسقط سوطه، فلروعته بسوطه أفضل مما رأيتني صنعت.

এক ব্যক্তি আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়ালাল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর বাগানে প্রবেশ করল। বাগানে প্রবেশ করে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু ত্রিশটি গোলাম আযাদ করে দিলেন। লোকটি তা দেখে দারুন বিস্মিত হলো। তখন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আচ্ছা, তাহলে কি আমি তোমাকে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমলের কথা বলে দিব? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, "যখন কেউ তার বাহন জন্তুতে আরোহন করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য চলতে থাকে আর তার চাবুকটি আঙ্গুলে ঝুলানো থাকে। এমনি

অবস্থায় ঝিমুনিতে তার চাবুকটি পড়ে যায়। তার চাবুকটি পড়ে যাওয়ার কারণে তাঁর যে কষ্ট হলো এবং তার পরিবর্তে সে যে সওয়াব পেল, তা আমি যা দান করেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি।" (তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ৩৯১)

❖ *ওহে হেরেম শরীফের আবাদকারী!*

যদি তুমি প্রতি রাকাতে এক লক্ষ রাকাতের সওয়াবের প্রত্যাশায় কাবার আঙিনায় নামায আদায় করে থাকো, তাহলে জেনে নাও, আমি অন্ধকার গুহায় নামায আদায় করে প্রতি রাকাতে দুই লক্ষ রাকাতের সাওয়াব লাভ করছি। কেননা, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

صلاة في مسجدي هذا أفضل من عشرة ألاف في غيره إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة في غيره، وصلاة في سبيل الله أفضل من مئتى ألف صلاة

"আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) একবার নামায আদায় করা মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য মসজিদে দশ হাজার বার নামায আদায় করার সমান। মসজিদে হারামে নামায আদায় করা এক লক্ষ বার নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহর পথে (যুদ্ধে) একবার নামায আদায় করা দুই লক্ষ বার নামায আদায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" (তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ৩৮৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ أَوْ أَيُّ الأَعْمَالِ خَيْرٌ قَالَ " إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ " . قِيلَ ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ قَالَ " الْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ " . قِيلَ ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম -ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন্ কাজটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা।" আবারো জিজ্ঞাসা করা হলো, এরপর কোন্ কাজটি উত্তম? নবীজী ﷺ উত্তর দিলেন, "এরপরে উত্তম হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, এরপর কোন্টি উত্তম? প্রিয় নবীজী ﷺ উত্তর দিলেন, "এরপর হচ্ছে, মাবরূর (মকবুল) হজ্জ।" (বুখারী-২৬, মুসলিম-৮৩)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ الْعَمَلِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন আমলটি সর্বশ্রেষ্ঠ? তিনি বললেনঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الحَجَرِ الْأَسْوَدِ

রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন, "আল্লাহ্‌র পথে (পাহারার/জিহাদের কাজে) একটি মুহূর্ত অবস্থান করা কদরের রাতে হাজরে আসওয়াদকে সামনে নিয়ে ইবাদত করার চাইতে উত্তম।" (ইবনে হিব্বান ১৫৮৩, ইবনে আসাকির, বায়হাকী)

عَنْ اٰدَمَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ إِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: لَسَفَرَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسِيْنَ حَجَّةٍ

হযরত আদাম বিন আলী (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন,"আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা পঞ্চাশবার হজ্ব করার চেয়ে উত্তম।" (সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর-৩/২/১৬৭-১৬৮, কিতাবুল জিহাদ, আব্দুলাহ ইবনে মুবারক)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ نَوْمَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِيْنَ حَجَّةً تَتْلُوْهَا سَبْعُوْنِ عُمْرَةً - (كشف الاستار كتاب الجهاد باب فضل الجهاد، مشارع اشواق)

হযরত সাঈদ বিন আব্দুল আজীজ (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র রাহে মুজাহিদের ঘুম ওমরাসহ সত্তর বার হজ্ব করার চেয়েও উত্তম।

عَنْ أَنَسَ بِنْ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَزْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعْدَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ حَجَّةٍ. (كشف الاستار كتاب الجهاد باب فضل الجهاد، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق: ٢٠٦/٢١٥)

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, "ফরয হজ্ব আদায় করার পর আল্লাহ্ তা'আলার রাহে কোনো একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা এক হাজার বার হজ্ব করার চেয়ে উত্তম।" (কাশফুল আসতার, মাশারিউল আশওয়াক্ব ইলা মাসারিয়িল উশশাক)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

۞أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَجَٰهَدَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩﴾

"তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো ও কাবা ঘর আবাদ করাকে সে ব্যক্তির কাজের সমপর্যায়ের মনে করো- যে ঈমান আনে আল্লাহ তা'আলার উপর, পরকালের উপর এবং জিহাদ করেছে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায়; এরা কখনো আল্লাহর কাছে সমান নয়; আল্লাহ তা'আলা কখনো যালেমদের সঠিক পথ দেখান না।" (৯ সূরা তাওবা: ১৯)

অতএব, হে বন্ধু! ওহে সওয়াব তালাশকারী! কাবাঘর আবাদ করে, বছর বছর হজ্জ-উমরা করেও যদি একজন মুজাহিদের সমান সওয়াব লাভ করতে না পার, তাহলে পৃথিবীর কোথায় ইবাদত করে তুমি তার সমান সওয়াব পাবে?

বন্ধু, আরো লক্ষ্য কর! শেষোক্ত আয়াতে "আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেমদের সঠিক পথ দেখান না।" এই কথাটি কেন বললেন?

"যার যতটুকু মর্যাদা তাকে ততটুকু মর্যাদা না দেয়াটা তার উপর যুলুম।" যেমন ধর, একটি স্বর্ণের গলার হারকে যদি একটি কুকুরের গলায় পরানো হয়, তবে তা ঐ গলার হারটির উপর যুলুম হবে। কেননা, এটি একজন নারীর গলায় শোভা পাবার কথা। ঠিক এমনিভাবে, জিহাদ সর্বোত্তম, সর্বাপেক্ষা শানদার, সর্বোচ্চ এবং ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল, যার উপর গোটা ইসলামের অস্তিত্ব নির্ভর করে; তাই তুমি যদি জিহাদকে ততটুকু গুরুত্ব ও মর্যাদা না দাও, যতটুকু গুরুত্ব ও মর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল ﷺ দিয়েছেন, তাহলে তুমি 'জিহাদ'এর উপর যুলুম করলে, এককথায় তুমি আল্লাহ পাকের নিকট 'যালেম' সাব্যস্ত হলে। আর আল্লাহ এরূপ ব্যক্তিকে পথ দেখান না। অর্থাৎ জিহাদের গুরুত্ব বুঝার তাওফিক তিনি পাবেন না। একারণেই দেখা যায়, হেফ্জখানার ছোট্ট একটি ছেলে

জিহাদের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করে অথচ অনেক সময় একজন মুফতী, মুফাসসির কিংবা মুহাদ্দিস সাহেব জিহাদের অপব্যাখ্যা করেন। যালেমদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন। আমীন।

আর এমনটি তখনই হয়, যখন জিহাদকে উপলব্ধি না করার কারণে, জিহাদের আহ্বানে না সাড়া দেয়ার কারণে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক বান্দা ও তার অন্তরের মধ্যে অন্তরায় হয়ে যান, ফলে সে কখনোই হক ও সঠিক পথ তথা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্র পথ পায়না। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের (আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধের) প্রতি আহ্বান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখ, (জিহাদ না করলে/জিহাদের প্রতি অবহেলা করলে) আল্লাহ্ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুত, তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে।" (সূরা আল আনফাল ৮:২৪)

সুতরাং বন্ধু, সাবধান!

❖ *ওহে আল্লাহর ভয়ে ভীত পরহেযগার ব্যক্তি!*

যদি তুমি আল্লাহ তা'আলার শাস্তির ভয়ে ইবাদত করে থাক, তাহলে জেনে নাও, শাস্তি থেকে বাঁচার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ۝١٠ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ

"হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে উত্তম ব্যবসার সন্ধান দিব না, **যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে,** উহা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।" (৬১ সূরা সফ: ১০-১১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَجْتَمِعُ فِي النَّارِ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ أَبَدًا " .

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, "কোন কাফির ও তার হত্যাকারী (মুসলিম) কখনও জাহান্নামে একত্রিত হবে না।" (সহীহ, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৪৯৫)

বন্ধু! তুমি জান কি, যে জাহান্নামের ভয়ে তুমি ইবাদত কর, আল্লাহ্র রাস্তার ধুলাবালি-ই সেই জাহান্নামের আগুনকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট??

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ مَدَنِيٌّ .

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,"আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে যে লোক ক্রন্দন করে তার জাহান্নামে যাওয়া এরূপ অসম্ভব যেমন অসম্ভব দোহন করা দুধ আবার পালানের মধ্যে ফিরে যাওয়া। আল্লাহ্ তা'আলার পথের ধুলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কখনও একত্রিত হবে না (অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার পথের মুজাহিদ কখনো জাহান্নামে যাবে না)।" [সহীহ্, মিশকাত (৩৮২৮), তা'লীকুর রাগীব (২/১৬৬), সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১০৭, জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৬৩৩]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَأَبِي رَيْحَانَةَ . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ رُزَيْقٍ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছিঃ "জাহান্নামের আগুন দুটি চোখকে স্পর্শ করবে না। আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে যে চোখ ক্রন্দন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় যে চোখ (নিরাপত্তার জন্য) পাহারা দিয়ে ঘুমবিহীনভাবে রাত পার করে দেয়।" [সহীহ্, মিশকাত (৩৮২৯), তা'লীকুর রাগীব (২/১৫৩); জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৬৩৯]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا خَالَطَ قَلْبَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ رَهْجٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ

হযরত আয়েশা রাদি. বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এই ইরশাদ করতে শুনেছি যে, "যার শরীরে আল্লাহ্র রাস্তার ধুলাবালি প্রবেশ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর জাহান্নামের আগুনকে অবশ্যই হারাম করে দিবেন।" (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ-৫/৫০২)

আল্লাহর রাসূল ﷺ আরো ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِيْ جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا

" আল্লাহর পথের ধূলি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোনো বান্দার উদরে কখনো একত্রিত হবে না।" (তিরমিযী, নাসাঈ-৩১১২, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ .... لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِيْ مَنْخَرِيْ مُسْلِمٍ أَبَدًا

"আল্লাহ তা'আলার রাস্তার ধূলাবালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনও কোনো মুসলমানের নাকের ছিদ্রে একত্র হতে পারে না।" (নাসাঈ-৩১১৫, তিরমিযী)

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْبَرُّ وَجْهُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا أَمَّنَ اللهُ وَجْهَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তির চেহারা আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় (জিহাদের ময়দানে) ধুলিময় হয়, আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিন তার চেহারাকে অবশ্যই (দোযখের আগুন হতে) রক্ষা করবেন।" (বাইহাকী-৪/৪৩)

مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ

"আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের ময়দানে) বান্দার দুটি পা ধূলি ধূসরিত হবে এবং আবার তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে, এমনটি কখনো হতে পারে না।" (বুখারী-২৮১১)

عَنْ أَبِيْ عَبْسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

"যার দুটি পা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধুলি ধুসরিত হয়, মহান আল্লাহ্‌ উক্ত পা দুটির উপর জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিয়েছেন।"(সহীহ বুখারী ২৮১১, নাসায়ী ৩১১৬; তিরমিযী ১৬৩২; বায়হাকী ৬০৮৭; আহমাদ ১৪৯৯০)

তাহলে বন্ধু! ভেবে দেখেছ কি? এককথায়, হাত-পা, নাক-মুখ, উদর ইত্যাদি শরীরের যে কোনো এক অংশে আল্লাহ্‌র রাস্তার ধূলাবালি লাগলেই হলো, ব্যস! আল্লাহ্‌ তা'আলা ঐ বান্দার জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিবেন। সুব্‌হানাল্লাহ!!

বন্ধু! তুমিতো চাও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে, তাইনা? তাহলে, তুমি কি চাওনা তোমার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যাক?

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন,

حُرِّمَتْ عَيْنٌ عَلَى النَّارِ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"যে চোখ আল্লাহ্‌র রাস্তায় (সীমান্ত পাহারাদারী বা যুদ্ধের কাজে) বিনিদ্র থাকে, তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করা হয়েছে।" (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১১৭)

সুব্‌হানাল্লাহ!!

বন্ধু! আল্লাহ্‌র রাস্তায় (জিহাদে) একদিন রোযা রাখার দ্বারা জাহান্নাম কতদূরে যায় জান কি?
রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ "

"কোন লোক যদি একদিন আল্লাহ্‌ তা'আলার রাস্তায় রোযা আদায় করে, তাহলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার ও জাহান্নামের মাঝখানে আকাশ ও যমীনের মাঝখানের দূরত্বের সমতুল্য একটি পরিখা সৃষ্টি করে দিবেন। [হাসান সহীহ্‌, সহীহা (৫৬৩), জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৬২৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ زَحْزَحَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا " . أَحَدُهُمَا يَقُولُ سَبْعِينَ وَالآخَرُ يَقُولُ أَرْبَعِينَ

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "যে লোক একদিন আল্লাহ্‌ তা'আলার পথে রোযা আদায় করে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছরের (পথের) দূরত্বে রাখবেন।" (উরওয়া ও সুলাইমানের) একজনের বর্ণনায় সত্তর বছর এবং অপরজনের বর্ণনায় চল্লিশ বছর উল্লেখ আছে। [সহীহ্‌, তা'লীকুর রাগীব (২/৬২), জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৬২২]

عَنْ عُمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : " مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعُدَتْ مِنْهُ النَّارُ مَسِيْرَةَ مِائَةَ عَامٍ

রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় রোযা রাখল, তার নিকট হতে জাহান্নামের আগুন একশত বছরের দূরত্ব পরিমাণ দূর হয়ে যাবে।" (তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৩/৪৪৪)

সুবহানাল্লাহ!!!

প্রিয় বন্ধু! আবার শুন! আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ধমকি শুনে রাখ! যেই আযাব থেকে তুমি পালাতে চাচ্ছ, জিহাদ ত্যাগ করার কারণে সেই আযাবই তোমাকে গ্রেপ্তার করবে।

إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"তোমরা যদি (তাঁর পথে জিহাদের জন্য) বের না হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন (দুনিয়াতে লাঞ্ছনা ও কুফ্ফারদের চাপিয়ে দিয়ে আর আখিরাতে জাহান্নাম দিয়ে) এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দিবেন, তোমরা তার কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (০৯ সূরা তাওবা: ৩৯)

❖ *ওহে ইবাদতে কল্যাণ প্রত্যাশী!*

যদি তুমি কামনা করে থাক, ইবাদতের দ্বারা দ্রুত কল্যাণ লাভ হোক, তাহলে জিহাদই সবচেয়ে দ্রুত কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

"মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে উত্তম ব্যবসার সন্ধান দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বুঝ।" (আস সাফ ৬১: ১০-১১)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হতে পারে একটা বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দীয়, অথচ তোমাদের জন্য তা অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলাই জানেন, তোমরা জান না।" (২ সূরা বাকারা: ২১৬)

❖ *ওহে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থী!*

যদি তুমি চাও, ইবাদতের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিল করে তোমার গুনাহ মাফ করাবে, তাহলে তোমার জন্য জিহাদই ছিল গুনাহ মাফের সবচেয়ে সহজ উপায়।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ۝١٠ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝١١ يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ وَيُدۡخِلۡكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ۝١٢

"মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে উত্তম ব্যবসার সন্ধান দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর; যদি তোমরা বুঝ। **তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন** এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য।" (আস সাফ ৬১: ১০-১২)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ.............

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তা'আলা শহীদকে ছয়টি পুরস্কার দান করবেন। ১. রক্তের প্রথম ফোটাটি মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়......." (তিরমিযী-১৬৬৩ ও ইবনে মাজাহ শরীফ)

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيئَةٍ " . فَقَالَ جِبْرِيلُ إِلاَّ الدَّيْنَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِلاَّ الدَّيْنَ "

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "আল্লাহ্ তা'আলার পথে মৃত্যুবরণ করা সকল পাপের কাফ্ফারা হয়ে যায়।" তখন জিবরাঈল (আঃ) বললেন, ঋণ ব্যতীত (তা ক্ষমা করা হয় না)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "ঋণ ব্যতীত।" (সহীহ্, মুসলিম-১৮৮৬, জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৬৪০)

❖ *ওহে জান্নাতের আকাঙ্ক্ষাকারী!*

যদি তুমি ইবাদতের দ্বারা জান্নাত প্রত্যাশী হও, তাহলে জেনে রাখ, জান্নাতে যাওয়া এতো সহজ নয়, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে জান্নাতে দেয়ার আগে অবশ্যই জেনে নিবেন, কে জিহাদ করেছে, আর কে জিহাদ করেনি। বন্ধু! এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমার আমল তোমার কোনো কাজে আসবে কিনা, ভয় রয়ে যায়!!

أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّا يَعۡلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمۡ وَيَعۡلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ ۝١٤٢

"তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ তা'আলা এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্য্যশীল।" (৩ সূরা আলে ইমরান: ১৪২)

أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّا يَأۡتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلِكُمۖ مَّسَّتۡهُمُ ٱلۡبَأۡسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلۡزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصۡرُ ٱللَّهِۗ أَلَآ إِنَّ نَصۡرَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ ۝٢١٤

"তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর

প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাঁদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী। (২ সূরা বাকারা: ২১৪)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا۟ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নিবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হতে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" (০৯ সূরা তাওবাহ: ১৬)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের মধ্যে জিহাদকারীকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ (অবস্থা ও কর্মকাণ্ড) যাচাই করি।" (৪৭ সূরা মুহাম্মাদ:৩১)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

"মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে উত্তম ব্যবসার সন্ধান দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর; যদি তোমরা বুঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন **এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য।"** (আস সাফ ৬১: ১০-১২)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾
يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَٰنٍ وَجَنَّٰتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾
خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

"যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, এবং আল্লাহর রাহে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে; তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারাই সফলকাম। (২১) তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। (২২) তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে (আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদদের জন্য) আল্লাহর কাছে আছে মহা পুরস্কার।" (০৯ সূরা তাওবাহ: ২০-২২)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "জেনে রাখ, জান্নাত তরবারির ছায়াতলে অবস্থিত।" (সহীহ বুখারী ২৮১৮)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন,

اِنَّ اَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ

"নিঃসন্দেহে জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারীর ছায়াতলে অবস্থিত।" (মুসলিম)

عَنْ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ؟ قَالَ: بَخٍ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيْمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ تَعْبُدُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وتُقِيْمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى رَأْسِ الْأَمْرِ وَعُمُوْدِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ أَمَّا رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَمَّا عُمُوْدُهُ فَالصَّلَاةُ وَأَمَّا ذُرْوَةُ سَنَامِهِ فَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

হযরত মুআজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! আমাকে এমন আমল বলে দিন, যে আমল আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বাহ্! তুমি একটি গুরুত্বপূর্ণ কঠিন বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। তবে এটা আল্লাহ তা'আলা যার জন্য সহজ করে দেন তার জন্য খুবই সহজ। আর তা হলো: এক আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। ফরজ সালাতগুলো কায়েম করবে। ফরজ যাকাত আদায় করবে। আমি কি তোমাকে সকল কাজের মূল ভিত্তি, তার পিলার বা খুঁটি এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া সম্পর্কে বলবো না? সকল কাজের মূল হলো ইসলাম। তাই তুমি ইসলাম গ্রহণ করো এবং শান্তিতে থাক। আর তার পিলার বা খুঁটি হলো সালাত। এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া হলো 'আল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা। (মুসতাদরাকে হাকেম ২৪০৮ হাদীসটি সহীহ, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী। মুসনাদে আহমদ ২২০৬৪, সুনানে বাইহাকী ১৮২৫৩)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ "

তিনি ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তাদের জন্য জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে, প্রতিটি স্তরের পার্থক্য আসমান-যমীনের সমান। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহ তা'আলার কাছে চাইবে, জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে, কেননা সেটিই জান্নাতের সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ মাকাম। এরই উপরিভাগে পরম করুনাময় 'আর-রহমানের' আরশ অবস্থিত।" (বুখারী)

সুবহানাল্লাহ!!!

তাই বন্ধু! যদি তুমি পরকালে সহজে জান্নাত চাও, তাহলে জিহাদ ও সবরের পরীক্ষায় অবশ্যই বসতে হবে; আল্লাহর রাস্তায় অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে; এ পরীক্ষায় তোমাকে অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে। নচেৎ জান্নাত মিস্ হয়ে যায় কিনা, তোমার জন্য ভয় হয়, বন্ধু!!

আর বন্ধু! যেহেতু তুমি ইবাদতের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করতে চাও, তুমি কি চাওনা তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাক???

مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভূক্ত যে কোনো ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।" (আবু দাউদ-২২১৬/২৫৪১, তিরমিযী-১৬৫৭, সুনানে আন-নাসায়ী-৩১৪১,)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ "

মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, "যে মুসলমান আল্লাহ্ তা'আলার পথে উষ্ট্রীর দুইবার দুধ দোহনের মধ্যবর্তী (সময়ের পরিমাণ) সময় জিহাদ করল তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'আলার পথে যে আহত হল অথবা আঘাতপ্রাপ্ত হল, এই জখম কিয়ামতের দিবসে আরো তাজা হয়ে উপস্থিত হবে। এই জখমের রং যাফরানের মত হবে এবং এর ঘ্রাণ কস্তুরীর মত সুগন্ধময় হবে।" (সহীহ্, ইবনু মাজাহ-২৭৯২; জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৬৫৭)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ : صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنْبِلَهُ، وَارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا،

'উক্ববাহ ইবনু 'আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : একটি তীরের কারণে মহান আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তীর প্রস্তুতকারী, যদি সে জিহাদের নেক আশা নিয়ে প্রস্তুত করে, (যুদ্ধে) তীর নিক্ষেপকারী এবং যে ব্যক্তি তা নিক্ষেপের উপযোগী করে নিক্ষেপকারীকে সরবরাহ করে (নিক্ষেপের জন্য তীর এগিয়ে দেয়)। তোমরা তীরন্দাজী ও অশ্বারোহীর প্রশিক্ষণ নাও। তোমাদের অশ্বরোহীর প্রশিক্ষণের চাইতে তীরন্দাজীর প্রশিক্ষণ আমার নিকট অধিক প্রিয়।" [সুনান আত-তিরমিযী (২৭৭/১৭০৩), যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ (৬১৮/২৮১১); সুনানে আন-নাসায়ী, -৩১৪৬]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي " يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ إِنْ قَبَضْتُهُ أَوْرَثْتُهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ "

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমার পথে জিহাদকারীর জন্য আমি নিজেই যামিন। আমি তার জীবনটা নিয়ে নিলে তবে তাকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেই। আমি তাকে (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) ফিরিয়ে আনলে তবে তাকে ছাওয়াব বা গানীমাতসহ ফিরিয়ে আনি।" [সহীহ্, তা'লীকুর রাগীব (২/১৭৮), জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৬২০]

❖ *ওহে আল্লাহর বান্দা!*

তুমি যে জান্নাত কামনা করছ, তুমি কি এখন পর্যন্ত তোমার জানকে আল্লাহ তা'আলার কাছে বিক্রয় করতে পেরেছ? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

"আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে, অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক (সত্যবাদী)? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য।" (৯ সূরা তাওবা: ১১১)

বন্ধু, ভালোভাবে খেয়াল কর-

এই আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনের সাথে একটি ব্যবসা করছেন। এখানে ক্রেতা স্বয়ং আল্লাহ পাক নিজে, বিক্রেতা ঈমানদারগণ (যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং পরকালে বিশ্বাসী), যে জিনিস রব্বে কারীম ক্রয় করছেন তা হলো মুমিনের জান ও মাল, বিনিময় হচ্ছে জান্নাত।

আচ্ছা, বন্ধু! এই আয়াতটিকে তোমরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে ব্যবহার কর; অথচ এই ব্যবসায়ের স্থান (বাজার) কোথায় হবে, তা তো আল্লাহ পাক নিজেই বলে দিয়েছেন "তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে, অতঃপর মারে ও মরে" অর্থাৎ, জিহাদের ময়দান। 'মারা আর মরা' তো যুদ্ধের ময়দান ছাড়া সম্ভব নয়। আর এই ওয়াদা (যুদ্ধের বিনিময়ে যে জান্নাত দিবেন তা) যে সত্য এই ব্যাপারে তিনি সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনের দলীল দিচ্ছেন।

সুতরাং, বন্ধু! জান্নাত পেতে হলে তোমার জান ও মালকে আল্লাহর রাস্তা তথা যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বিক্রয় করতে হবে।

❖ *ওহে হারামাইনের আবেদ!*

বন্ধু! তুমি জান্নাত থেকে কত পিছনে পড়ছ একটু চিন্তা কর!

রাসূলুল্লাহ ﷺ মূতার যুদ্ধাভিযানে (সারিয়্যা) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রা.) কে প্রেরণ করলেন। যেদিন সকালে জামাত যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে গেল, সেদিন ছিল শুক্রবার, জুমুআর দিন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রদিয়াল্লহু আনহু চিন্তা করলেন, এই যুদ্ধে যদি শহীদ হয়ে যাই, তাহলে তো আল্লাহর রাসূলের ﷺ চেহারা মুবারক আর হয়তো কখনো দেখা হবে না, তাঁর পিছনে আর হয়তো কোনোদিন নামায আদায় করতে পারবো না, তাহলে এক কাজ করি, জুমুআর নামায আল্লাহ্র রাসূলের পিছনে আদায় করে, পরে বেরিয়ে পড়ব। আর যেহেতু আমার ঘোড়া অনেক দ্রুতগামী, তাই অন্যদের সাথে সহজেই জুড়তে পারব।

আল্লাহর রাসূল ﷺ জুমুআর নামাযের সালাম ফিরানোর পর দেখলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লহু আনহু এখনো বের হননি। ফলে তিনি মনঃক্ষুণ্ন হলেন। তখন নবীজী ﷺ আফসোস করে বললেন,

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ

"তুমি দুনিয়ার সব কিছু আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করলেও তাদের সকালে বের হয়ে যাওয়ার সমান ফযীলত পাবে না।" (সুনানে তিরমিযী-১/১১৮, মুসনাদে আহমাদ)

মুসনাদে আহ্মদের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, মা'আয ইবনে আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জান, তোমার সাথীরা তোমার চেয়ে কত অগ্রে পৌঁছে গেছে? সে ব্যক্তি উত্তর দিলেন, এক

সকাল মাত্র। রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন, তোমার সাথীরা দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে যে দূরত্ব রয়েছে তার চেয়েও অধিক দূরত্বে পৌঁছে গেছে। (মুসনাদে আহ্মদ -৩/৪৩৮)

عَنْ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ : غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَلَوْ قُوْفُ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ رَجُلٍ سِتِّيْنَ سَنَةً

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! এক সকাল কিংবা এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে নিয়োজিত রাখাটা (যুদ্ধ করা) গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সমস্ত জিনিস হতে উত্তম। আর তোমাদের কারোও যুদ্ধের ময়দানে কাতার বন্দী হওয়া ষাট বৎসরের নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক-৫/২৫৯, হাদীস নং-৯৫৪৩)

প্রিয় ভাই! মক্কা-মদীনায় জন্মগ্রহণ করা কিংবা সেখানে মৃত্যুবরণ করতে পারা কতই না সৌভাগ্যের বিষয়, তাই না! এটাতো আমরা সবসময়ই কামনা করে থাকি। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূলের ﷺ মেজাজ দেখ!

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ»، قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ»

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদি. বলেন, এক ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তেকাল করলেন। তার জন্মও আল্লাহ্র রাসূলের ﷺ শহর মদীনায়ই হয়েছিল। প্রিয় নবী তার জানাযার নামায পড়ালেন এবং তার জন্য আফসোস করে বললেন, "হায়! এই ব্যক্তি যদি তার জন্মস্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে মৃত্যুবরণ করত!" সাহাবা রাদি. জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কেন এরূপ বললেন?" তিনি এরশাদ করলেন, "মানুষ যখন (জিহাদের প্রয়োজনে) তার জন্মস্থান ব্যতীত অন্যত্র ইন্তেকাল করে, তখন তার জন্মস্থান থেকে মৃত্যুস্থান পর্যন্ত জায়গা মেপে তা তাকে জান্নাতে দান করা হয়।" (নাসাঈ-১৮৩৩)

❖ *ওহে ঘরে উপবিষ্ট মিসকিন!*

আল্লাহর রাসূলের পিছনে মসজিদে নববীতে জুমুআর নামায আদায় করে, তাঁর চেহারা মোবারক দর্শন করেও যদি আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল দেরী করার কারণে সারা দুনিয়ার সকল সম্পদ দান করেও তার সমান ফযীলত হাছিল করতে না পারা যায়; আল্লাহ্র রাস্তায় বের হতে এক সকাল কিংবা এক বিকাল দেরী করার কারণে যদি দুই বান্দার মধ্যে মর্তবার পার্থক্য পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান হয়ে যায়; জিহাদ না করে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেও যদি আল্লাহ্র রাসূলের আফসোস শুনতে হয়; তাহলে বন্ধু! চিন্তা করে তুমিই বল, তুমি তো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বেরই হওনি, তাহলে তুমি ঘরে বসে থেকে তোমার স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি দান করে দিয়ে, কিংবা অন্য কোন্ আমলের/মেহনতের বদলায় তুমি একজন মুজাহিদের এক সকাল কিংবা এক বিকালের ফযীলত হাছিল করতে পারবে? জান্নাত থেকে, জান্নাতের উঁচু মর্তবা থেকে তুমি কত হাজার বছর পিছিয়ে পড়ছো, তা কি একবার চিন্তা করে দেখেছো, বন্ধু?

❖ *ওহে, স্ত্রীর আচলের ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণকারী ব্যক্তি!*

বন্ধু! তুমি যদি কাবা ঘরের ছাদের ছায়ায় দাঁড়িয়েও কেয়ামত পর্যন্ত নামায আদায় কর, তাহলেও তুমি 'ঘরে উপবিষ্ট' ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত হবে। হও না তুমি কাবাঘরের ইমাম, হও না তুমি মসজিদে নববীর ইমাম, হও না তুমি 'হারামাইন

শরীফাইন'-এর দরস্ দানকারী মুহাদ্দিস, মুফাস্সির কিংবা গ্র্যান্ড মুফতী; কিংবা তুমি হতে পার দ্বীনের অন্য কোনো শাখায় মেহনতকারী সাথী ভাই, তাতে কী!

(জিহাদ ফরযে আইন হওয়া সত্ত্বেও, অন্যান্য মেহনতের পাশাপাশি) জিহাদ না করে যদি তুমি ঘরে বসে থাক, তাহলে কুরআনের ভাষায় তুমি 'ক্বায়ীদূন' (গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান)! আর এ ধরণের ব্যক্তিরা কখনোই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের সমকক্ষ হবে না।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

"৯৫. গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান (যারা লড়াই করার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং জিহাদ ত্যাগ করার)- যাদের কোনো সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ সব মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারা সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। ৯৬. এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

(৪ সূরা নিসা :৯৫-৯৬)

❖ *প্রিয় বন্ধু! একজন আবেদ কখনোই (সওয়াব ও মর্যাদার দিক থেকে) একজন মুজাহিদের সমান হতে পারে না:*

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِيْ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَهُ مَالٌ كَثِيْرٌ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ أُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَقَالَ كَمْ مَالُكَ؟ قَالَ سِتَّةَ الَافَ دِيْنَارٍ، فَقَالَ لَوْ أَنْفَقْتَهَا فِيْ طَاعَةِ اللهِ لَمْ تَبْلُغْ غُبَارَ شِرَاكِ نَعْلِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهَ أَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ أُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَقَالَ لَوْ قُمْتَ اللَّيْلَ وَصُمْتَ النَّهَارَ لَمْ تَبْلُغْ نَوْمَ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ -ﷺ এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আমার সম্পদ দান করি, তাহলে কি আল্লাহর পথে মুজাহিদদের আমলে পৌঁছতে পারব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার সম্পদের পরিমাণ কত? লোকটি বলল, ছয় হাজার দিরহাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই সম্পদ যদি আল্লাহ তা'আলার মনোনীত পথে দান করে দাও তবেও একজন মুজাহিদের পায়ের নিচে জুতার বালি সমপরিমাণ হতে পারবে না।

অন্য এক ব্যক্তি এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে এমন কিছু আমল বর্ণনা করে দিন যার দ্বারা আমি মুজাহিদের আমলের সমপর্যায়ে পৌঁছব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যদি তুমি সারা রাত্র নামায পড় আর দিন ভর রোযা রাখ তবেও মুজাহিদগণের ঘুমের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না। (সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর-২/১৫০)

وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله كيف لي أن أنفق من مالي حتى أبلغ عمل المجاهد في سبيل الله؟ قال: ومالك؟ قال: ستة ألف. قال: لو تصدّقت بها كان عدل نومة الغازي في سبيل الله.

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি আমার সম্পদ দান করি, তাহলে কি আল্লাহ্র পথে মুজাহিদদের আমলে পৌঁছতে পারবো? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার সম্পদের পরিমাণ কত? লোকটি বলল, ছয় হাজার দিরহাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "তুমি যদি তা দান করে দাও, তবে তা আল্লাহ্র পথে মুজাহিদের ঘুমের সমানও হবে না।" (তাম্বীহুল গাফিলীন, পৃষ্ঠা: ৩৯১)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الطَّاعِمُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَالصَّائِمِ فِيْ غَيْرِه سَرْمَدًا - (كشف الاستار كتاب الجهاد باب فضل الجهاد، مشارع الاشواق:١١٩/١٦٠)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "জিহাদের ময়দানে মুজাহিদগণের আহার করা জিহাদ ব্যতীত অন্যদের সারা জীবন রোযা রাখার সমান।"
(কাশফুল আসতার, মাশারিউল আশওয়াক্ব ইলা মাসারিয়িল উশ্শাক)

أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " مثل المجاهد في سبيل الله - والله أعلم بمن يجاهد في سبيله - كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة، أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة ".

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন,"আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ, আর আল্লাহ্ পাকই সবচেয়ে ভালো জানেন কে তাঁর রাস্তায় যুদ্ধ করে, এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মত (যে মুজাহিদ জিহাদ হতে ফিরে আসা পর্যন্ত) অবিরত অক্লান্ত অবস্থায় রোযা ও নামাযে মশগুল থাকে। আর আল্লাহ পাক তাঁর পথে জিহাদকারীর জন্য এই দায়িত্ব নিয়েছেন যে, যদি তাকে মৃত্যু দান করেন, তবে তাকে জান্নাত দান করবেন আর যদি ফিরিয়ে আনেন তবে নিরাপদে সাওয়াব ও গনীমত সহ ফিরিয়ে আনবেন।" (বুখারী-২৭৮৭ ও মুসলিম)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ " لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ " . فَرَدُّوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ " لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ " . فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ " مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُ الْقَائِمِ الصَّائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করে, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হল,"কোন কাজটি সওয়াবের দিক থেকে আল্লাহর পথে জিহাদের সমতুল্য?" রাসূলে আকরাম ﷺ বললেন, তোমরা সে কাজের মতো শক্তির অধিকারী নও।" সাহাবায়ে কিরাম দুই কিংবা তিনবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসূলে আকরাম প্রতিবার এটাই বলছিলেন, "তোমাদের এরূপ করার মতো শক্তি-সামর্থ্য নেই। এরপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত থাকে তার দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে রোযা রাখে, কিয়াম করে, আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করে, এবং নামায-রোযার ব্যাপারে গাফিল থাকে না (অনবরত করতেই থাকে যতক্ষণ না); মুজাহিদ জিহাদ শেষে বাড়িতে ফিরে আসে।" (বুখারী-২৮৯৬ ও মুসলিম, তিরমিজি)

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ. قَالَ " لاَ أَجِدُهُ - قَالَ - هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُرَ وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ ". قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ

বুখারীর আরেক বর্ণনা হল: এক ব্যক্তি নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমায় এমন কোনো আমলের কথা বলুন যা জিহাদের সমতুল্য? তিনি ﷺ বললেন, "আমি এমন কোনো আমল তো দেখছি না।" তারপর আবার বললেন, "তুমি কি এতটা শক্তির অধিকারী, যখন জিহাদকারী আল্লাহর পথে বের হয়, তখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে, অতঃপর (মুজাহিদ ফিরে আসার আগ পর্যন্ত) নামায পড়তে থাকবে, এবং গাফলতি করবে না এবং রোযা রাখবে কিন্তু (মুজাহিদ ফিরে আসার আগ পর্যন্ত) ইফতার করবে না।" সে ব্যক্তি বললেন, "এ কাজ করার ক্ষমতা কার আছে?" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৭৮৫)

তাহলে বন্ধু!!!

এত লাভের কাজ রেখে মিছামিছি কিসের পিছনে ছুটছ, বলতো? ঘরে বসে ইবাদত করে কতটুকুই আর সওয়াব কামাই করতে পারবে? নেক আমলের ধোকায় পড়ে কেন ঘরে বসে আছ, বলতো?

❖ *ওহে বন্ধু, ভেবে দেখতো, তুমি কার গোলামী করছ?*

বন্ধু হে! একজন আল্লাহর রাহের মুজাহিদ আল্লাহ্‌র একটি ফরয হুকুম বাস্তবায়নের জন্য দুনিয়ার সব কিছু ত্যাগ করে থাকেন। স্নেহের মা-বাবা, প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী, কলিজার টুকরা সন্তানসন্ততি, ভাই-বোন, ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি, চাকুরী-ব্যবসা, সব। আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদীনকে দুনিয়ার গোলামী থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তারা বান্দার দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর হুকুম পালন করে যাচ্ছেন, তাঁর গোলামী করছেন, তাঁর জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিচ্ছেন।

আর অন্যদিকে, আমরা ঘরের মহব্বত, পরিবারের মহব্বত, মালের মহব্বত, চাকুরী-ব্যবসার (পেশার) মহব্বত ছাড়তে পারছি না। দুনিয়ার গোলামী থেকে 'আযাদ' হতে পারছি না। বলতো বন্ধু, তাহলে আমরা আসলে কার গোলামী করছি, আল্লাহ তা'আলার, নাকি নফ্‌স ও দুনিয়ার?

আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَـٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَـٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَـٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা (ক্ষতি বা) বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর, এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহ্‌র বিধান আসা পর্যন্ত (দেখ, তোমাদের পরিণতি কি হতে যাচ্ছে), আর আল্লাহ তা'আলা ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" (০৯ সূরা তাওবাহ: ২৪)

বন্ধু! বুঝলে তো? পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি ইত্যাদি এগুলো হল দুনিয়া। আর যারা আল্লাহ্‌, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে যুদ্ধ করা থেকে এসব দুনিয়াকে বেশি মহব্বত করবে তারা হচ্ছে ফাসেক (গোনাহে কবীরা সম্পাদনকারী)। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব ফাসেকদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দেন না; জিহাদ বুঝবার, আমল করবার, মুজাহিদের মর্তবা হাছিল করার তাওফীক দেন না। আল্লাহ্‌ পাক আমাদের হেফাযত করুন। আমীন। তাই, বন্ধু, সাবধান!

۞فَلْيُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾

"কাজেই, আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করাই উচিত। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুরস্কার দান করব।" (৪ সূরা নিসা: ৭৪)

❖ *ওহে আবেদ ব্যক্তি! ওহে বুযুর্গ!*

বন্ধু, তুমি তো বুযুর্গি খুঁজে ফির নফল ইবাদতের মধ্যে, আর দ্বীনের একজন মুজাহিদ খুঁজে আল্লাহ পাকের ফরয বিধানের মধ্যে। তুমি তো আতর-সুগন্ধি আর মিষ্টান্ন খাওয়ার মধ্যেই সাওয়াব দেখতে পাও; আর একজন মুজাহিদ ময়দানে সুগন্ধি আর মিষ্টান্ন পাবে কোথায়? আল্লাহর রাস্তার ধুলাবালি, গোলা-বারুদের গন্ধই তার খুশবু, তার মেশক-আম্বর।

শুন বন্ধু! আল্লাহর রাস্তার ধূলাবালিও তো ঘরে বসে ইবাদত করা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। কেননা, তা জাহান্নামের আগুনকে নিভিয়ে দিবে। আর তোমার ঘরের ইবাদত, তোমার আতর-খুশবু আর মিষ্টান্ন খাওয়ার সুন্নত তোমার জন্য জাহান্নামের আগুনকে নিভাতে পারবে কিনা তার তো কোনো গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা নেই। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِيْ جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا

"আল্লাহর পথের ধূলি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোনো বান্দার উদরে কখনো একত্রিত হবে না।"
(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ .... لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِيْ مَنْخَرِيْ مُسْلِمٍ أَبَدًا

নবী করীম ﷺ আরো বলেন, "আল্লাহ তা'আলার রাস্তার ধূলাবালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনও কোনো মুসলমানের নাকের ছিদ্রে একত্র হতে পারে না।" (নাসাঈ, তিরমিযী)

প্রিয় ভাই! তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি হাদীস আবারো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই!

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِأَيَاتِ اللهِ لَا يَفْتَرُ مِنْ صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلٰى أَهْلِهِ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় গমনকারী মুজাহিদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যে রোযা রাখে, রাত্রভর নামাযে কুরআনে পাক তিলাওয়াত করে, এবং ততক্ষণ পর্যন্ত অনবরত রোযা ও সদকা করতে থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় গমনকারী মুজাহিদ ফিরে আসে। অর্থাৎ মুজাহিদ এরূপ ইবাদতকারীর সমপরিমাণ (বরং তার চেয়ে বেশি) সওয়াব লাভ করে।" (ইবনে হিব্বান)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْخَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. হতে আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এই এরশাদ করতে শুনেছি, "আল্লাহ্র রাস্তায় গমনকারী মুজাহিদের দৃষ্টান্ত- আর আল্লাহ্ তা'আলাই খুব ভালো করে জানেন, কে (তাঁর সন্তুষ্টির জন্য) তাঁর রাস্তায় জিহাদ করে- সে ব্যক্তির ন্যায়, যে রোযা রাখে, রাত্রে ইবাদত করে, আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে তাঁর সম্মুখে অনুনয় বিনয় করে, রুকু করে, সিজদা করে।" (নাসাঈ-৩১২৯)

অর্থাৎ আল্লাহ্র রাস্তার মুজাহিদ যিনি আল্লাহ্র দ্বীন কায়েমের জন্য, তাঁর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করেন, তিনি স্বয়ংক্রিয় ভাবেই উক্ত আমলগুলোর সওয়াব লাভ করবেন, একজন মুজাহিদ অটোমেটিক একজন আবেদের সওয়াব/মর্তবা লাভ করে থাকেন, যদিও তিনি সেগুলো না করেন বা কম করে থাকেন।

বন্ধু! তাই বলে এমন ভাবার কোন কারণ নেই যে, মুজাহিদ ভাইয়েরা নাওয়াফেলের (নফল ইবাদতের) কোনো পাবন্দী করেন না! সারাদিন কেবল 'অস্ত্র' আর 'যুদ্ধ' 'যুদ্ধ' করেন! মুজাহিদ ভাইয়েরা নফল নামায, রোযা, যিকির-আযকার ও অন্যান্য নাওয়াফেলের পাবন্দী আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের মতই করে থাকেন। বরং হাকীকত হচ্ছে- আমাদের ময়দানের অনেক ভাইদের নফল ইবাদতের পাবন্দী দেখলে (নিজের নাওয়াফেলের স্বল্পতার জন্য) তুমি লজ্জায় মাথা নিচু করে দিবে! তাদের তিলাওয়াত, তাদের তাহাজ্জুদ, তাদের জিকির-আযকার আর রোনাজারি দেখে আমরাও ঈর্ষান্বিত হই! আহ্! তারাতো দিনের বীর আর রাতের সন্ন্যাসী!!

বন্ধু! অবাক হবার কিছু নেই। কেননা, মুজাহিদরাই প্রকৃত আবেদ! আল্লাহ্র দেয়া সীমাসমূহের সর্বাধিক হেফাযতকারী। সুবহানাল্লাহ!!!

কিন্তু কিভাবে?

বন্ধু! ভালো করে বুঝে নাও– কুরআন কারীমে প্রায় ৬,৬৬৬ টি আয়াত রয়েছে। এর মধ্যে সাড়ে পাঁচ হাজারের মত আয়াতে কেবল তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের বয়ান করা হয়েছে। বাকী রইল এগারোশত আয়াত, যেগুলোতে শরীয়তের সকল বিধি-বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; এগুলোই আল্লাহ্পাকের দেয়া বান্দাদের জন্য হুদুদ তথা সীমানা। এই এগারোশত আয়াতের মধ্যে সাড়ে চারশত আয়াতের উপর (প্রায় অর্ধেক সংখ্যক বিধি-নিষেধের আয়াতে) কেবলই যুদ্ধ-জিহাদের আলোচনা। তাহলে তো বন্ধু! 'আল্লাহ্র দেয়া সীমাসমূহের হেফাযত' মুজাহিদরাই সবচেয়ে বেশি করে থাকে- এক. নিজে সকল বিধি-নিষেধের উপর আমল করার মাধ্যমে (এগুলোর মধ্যে 'জিহাদ' ছাড়া বাকিগুলো তোমরাও করছ), আর দুই. নিজের জীবন আল্লাহ্র রাস্তায় কুরবান করে আল্লাহ্র দ্বীন আল্লাহ্র জমীনে কায়েম করার মাধ্যমে (যেটি তোমরা করছ না। তাহলে, বন্ধু! জিহাদ না করার দ্বারা কি কুরআন কারীমের আমলের তথা বিধি-বিধানের অর্ধেক আয়াতকে বেকার বানিয়ে ফেলা হচ্ছে না??? নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।)

প্রিয় ভাই! আল্লাহ তা'আলা কি আমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করতে নির্দেশ দেননি? তিনি কি বলেননি-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"হে মুমিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ হও, আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাকারা ০২:২০৮)

সুতরাং ভাই, পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করতে হলে আমাদেরকে কি জিহাদ করতে হবে না?

❖ *আবার বন্ধু! জেনে রাখ- মুজাহিদ ভাইয়েরাই সর্বাধিক তাকওয়াবান, আল্লাহ তা'আলাকে ভয়কারী, আল্লাহ্‌র কাছে মুজাহিদ ভাইয়েরাই সবচেয়ে জ্ঞানী এবং সবচেয়ে 'আরেফ বান্দা।"*

এখন প্রশ্ন করতে পার- কিভাবে???

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ-

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟

"নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।" [৩৫ সূরা ফাতির: ২৮] অর্থাৎ ঘুরিয়ে বললে, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে, বুঝা যায় তারাই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী। কেননা, ভয়ের পিছনে যে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও কারণ রয়েছে, তা হলো আল্লাহ্‌ পাক সম্পর্কিত জ্ঞান বা পরিচয় (মা'রিফাত)। এই পরিচয় থেকেই ভয়ের উৎপত্তি। যে যত বেশি আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় করবে, বুঝা যাবে, সে তত বেশি আল্লাহ্‌ তা'আলাকে চিনতে পেরেছে, সে ততবেশি মা'রিফাত লাভ করেছে, সে তত বেশি জ্ঞানী, সে ততবেশি পরহেযগার ও মুত্তাকী!

এখন প্রশ্ন হল, "আল্লাহ্‌র ভয়" কাকে বলে??"

আল্লাহ তা'আলার 'বড়ত্ব ও প্রতাপ' স্মরণের ফলে দিলের মাঝে যে অবস্থা উৎপন্ন হয়, কেবল তাকেই 'আল্লাহর ভয় বা তাকওয়া' বলা যায় না।

কেননা ভাই, আল্লাহ তা'আলাকে এই ধরণের ভয় শয়তানও করে থাকে। যেমন, কুরআনে পাকে এরশাদ হয়েছে,

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكُمْ إِنِّىٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ ۚ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

"আর যখন শয়তান তাদের (কুফ্‌ফারদের) কার্যকলাপকে নিজেদের দৃষ্টিতে সুদৃশ্য করে দিল এবং বলল যে, আজকের দিনে কোনো মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না আর আমি হলাম তোমাদের সমর্থক, অতঃপর যখন সামনাসামনি হল উভয় বাহিনী তখন সে অতি দ্রুত পায়ে পেছন দিকে পালিয়ে গেল এবং বলল, আমি তোমাদের সাথে নেই, আমি দেখছি- যা তোমরা দেখছ না; আমি ভয় করি আল্লাহকে। আর আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন।" (৮ সূরা আনফাল: ৪৮)

كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَٰنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ

"তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি।" (আল হাশ্‌র ৫৯:১৬)

সুতরাং ভাই! "আল্লাহর ভয় বা তাকওয়া"র প্রকৃত সংজ্ঞা হলো- "আল্লাহ তা'আলার 'বড়ত্ব ও প্রতাপ' স্মরণের ফলে দিলের মাঝে উৎপন্ন অবস্থার কারণে যদি আল্লাহ পাকের নাফরমানী ছেড়ে দেয়া হয় এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মানতে নিজেকে বাধ্য করা হয়, তবেই তাকে 'আল্লাহর ভয় বা তাকওয়া বা পরহেযগারী' বলা হবে।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমার মধ্যে ভয় পয়দা হয়েছে কিনা বুঝব কিভাবে? ভয় তো দেখা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না! অন্তরে ভয় থাকলে সেটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আমল ও কার্যকলাপে প্রকাশ পাবে।

প্রিয় বন্ধু, ভালো করে বুঝে নাও, আমার মাঝে 'আল্লাহর ভয়' আছে, বা আমি একজন আল্লাহর ভয়ে ভীত পরহেযগার ব্যক্তি"- এটি দাবী করার বিষয় নয়, প্রমাণ করার বিষয়!!!

সেই 'ভয়'তো ভাই ভয় নয়, যেই ভয় আমাকে গুনাহ থেকে বাঁচায় না!

সেই 'ভয়' তো ভয় নয়, যেই ভয় আমার রাতের ঘুম হারাম করে
আল্লাহর সামনে দাঁড় করায় না!
সেই 'ভয়' তো ভয় নয়, যেই ভয় আমাকে শেষ পরিণতি ও
আখিরাতের চিন্তায় অস্থির করে তুলে না!
সেই 'ভয়' তো ভাই ভয় নয়, যেই ভয় আমার দীল থেকে দুনিয়ার মহব্বত দূর করে না, আমাকে দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে শিখায় না!
সেই 'ভয়' তো আর ভয় নয়, যেই ভয় আমাকে আল্লাহর কোনো ফরয হুকুম আদায় করতে বাধ্য করে না!
এমনিভাবে, সেই 'ভয়' তো ভাই ভয় নয়, যেই ভয় আমাকে (আল্লাহর পাকড়াওয়ের আশঙ্কায়) ঘর থেকে বের করে জিহাদের ময়দানে নিয়ে যায় না!

প্রিয় ভাই! নামায যে আল্লাহর হুকুম, জিহাদও তো সেই আল্লাহ্রই হুকুম।

রোযা যে আল্লাহ্র হুকুম, জিহাদও তো সেই আল্লাহ্রই হুকুম।

তাহলে ভাই, যে আল্লাহর ভয়ে আমি নামায তরক করি না, জিহাদ তরক করার ক্ষেত্রে কেন সেই একই আল্লাহকে ভয় করি না?

যে আল্লাহর ভয়ে আমি রোযা তরক করি না, জিহাদ তরক করার ক্ষেত্রে কেন সেই একই আল্লাহকে ভয় করি না?

এমনিভাবে, যে আল্লাহর ভয়ে আমি তা'লীম, তাযকিয়া আর দাওয়াতের মেহনত তরক করি না, জিহাদ তরক করার ক্ষেত্রে কেন সেই একই আল্লাহকে ভয় করি না?

অথচ, জিহাদ তরক করার ব্যাপারে কত হুমকী ও ধমকী দিয়েছেন কুরআন কারীমে খোদ আল্লাহ্ তা'আলা, এমনকি পরকালে জাহান্নাম এবং দুনিয়াতে আমাদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়ার মতোও হুমকি দিয়েছেন-

إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيۡـًٔاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٣٩

"তোমরা যদি (তাঁর পথে জিহাদের জন্য) বের না হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দিবেন, তোমরা তার কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (০৯ সূরা তাওবা: ৩৯)

মুহাম্মাদ আলী সবূনী (রহঃ) উপর্যুক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন:

[إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما] أى ان لا تخرجوا الى الجهاد مع رسول الله ، يعذبكم الله عذابا اليما موجعا ، باستيلاء العدو عليكم في الدنيا ، وبالنار المحرقة في الاخرة ،

"যদি তোমরা যুদ্ধে বের না হও, তিনি তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি দেবেন" অর্থাৎ তোমরা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জিহাদে বের না হও, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন, দুনিয়াতে তোমাদের উপর শত্রুকে চাপিয়ে দিয়ে। আর পরকালে জ্বলন্ত আগুন দিয়ে। [সফওয়াতুত তাফাসীর, দেখুন:উক্ত আয়াতের তাফসীর]

তাই ভাই, আমরা যদি সত্যিই আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রকৃত অর্থে ভয় করে থাকি, প্রকৃত অর্থে আমরা মুত্তাকী হয়ে থাকি, সত্যিই যদি আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্ পাকের আযাব ও জাহান্নামকে ভয় করে থাকি, তাহলে কিভাবে জিহাদ না করে আমরা বসে থাকতে পারি???

সুতরাং, বুঝা গেল, যেহেতু জিহাদ সবচেয়ে কঠিন ও বিপজ্জনক আমল, আর যে বা যারা সেই সকল বিপদাপদ ও কঠিন পরীক্ষাসমূহ উপেক্ষা করে নিজের জানের বাজি রেখে আল্লাহ্র ভয়ে আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করছেন, তাদের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় সর্বাধিক! আল্লাহ্কে ভয় করার ক্ষেত্রে মর্দে মুজাহিদগণই সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী! সবচেয়ে বেশি

ভয় করার কারণে মুজাহিদ ভাইয়েরাই আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী। তারাই সবচেয়ে বেশি পরহেযগার ও মুত্তাকী! তারাই সবচেয়ে 'আরেফ বিল্লাহ! যেমনটি আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেছেন-

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاءُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।" [৩৫ সূরা ফাতির: ২৮]

সুবহানাল্লাহ্‌! এটিই চরম বাস্তবতা!

❖ *ওহে বৃদ্ধ! ওহে অক্ষম! ওহে যৌবনের আড়ালে যার বার্ধক্যের কঙ্কাল!*

বন্ধুহে, আমার কথায় কষ্ট নিও না! তোমার ঘরের ইবাদত আল্লাহর কাছে ততটা মূল্যবান নয়, যতটা একজন মুজাহিদের প্রশিক্ষণের জন্য খেলাধুলা করাটা আল্লাহর কাছে মূল্যবান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتَهُ أَهْلَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ

"মুসলিম ব্যক্তির সকল ক্রীড়া-কৌতুকই বৃথা। তবে তীর নিক্ষেপ, ঘোড়ার প্রশিক্ষণ এবং নিজ স্ত্রীর সাথে ক্রীড়া-কৌতুক বৃথা নয়। (কারণ) এগুলো হল উপকারী ও বিধি সম্মত।" (ইবনু মাজাহ-২৮১১; জামে' আত-তিরমিজি- ১৬৩৭, নাসাঈ, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ, দারিমী)

হযরত মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লহু আনহুকে এক কাপড় পরিহিত অবস্থায় দুটি লক্ষ্যবস্তুর মাঝে দৌড় প্রশিক্ষণ নিতে দেখেছি।

হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি এক কাপড় পরিহিত অবস্থায় দুটি লক্ষ্যবস্তুর মাঝে দৌড় প্রশিক্ষণ নিতেন। (তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ৩৯৩)

❖ *ওহে যার যৌবনরস ফুরিয়ে গেছে! যার শৌর্য-বীর্য শুকিয়ে গেছে!*

প্রিয় বন্ধু আমার! আমাদের আছে ইযযতের যিন্দেগী আর তোমাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা!

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ".

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "ঘোড়ার কপালে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত কল্যাণ বেঁধে দেয়া হয়েছে।" (বুখারী-২৮৪৯, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ, দারিমী।)

حَدَّثَنَا عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ ".

উরওয়াহ বারিকী (রাঃ) থেকে বর্ণিত: নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশ গুচ্ছে কল্যাণ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত। অর্থাৎ (আখিরাতের) পুরষ্কার (জান্নাত) এবং গনীমতের মাল। (বুখারী, হাদিস নং ২৮৫২)

অপর এক হাদীসে এসেছে,

العزّ فى نواصى الخيل، والذّل فى أذناب البقر

"ঘোড়ার ললাটে ইয্যত রয়েছে। আর অন্যদিকে, গরুর লেজে রয়েছে লাঞ্ছনা।" (তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ৩৯৩)

عَنْ اِبْنِ عُمَر قَالَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْل، اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتىّٰ تَرْجِعُوْا اِلىٰ دِيْنِكُمْ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রদিয়াল্লহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ -ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, "যখন তোমরা 'ঈনাহ' (এক ধরণের সুদভিত্তিক ব্যবসা) পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয় এবং ব্যবসা বাণিজ্যে পুরাপুরি মশগুল হয়ে যাবে এবং গরুর লেজ ধরে খেত খামারে মগ্ন হয়ে যাবে আর জিহাদ করা ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দিবেন, যা ততক্ষণ পর্যন্ত দূর হবে না যতক্ষণ না তোমরা আপন দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে।" (আবু দাউদ)

অর্থাৎ মানুষ যখন জিহাদে লিপ্ত হবে, তখন তাতে ইসলাম ও মুসলমানদের ইয্যত ও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে তারা সমাসীন থাকবে। আর যখন জিহাদ পরিত্যাগ করে গরুর লেজের অনুসরণ করবে, লাঙ্গল-জোয়াল নিয়ে ক্ষেত-খামারে লিপ্ত হবে, তখন মুসলমান জাতি হবে লাঞ্ছিত, অপদস্থ। (যেমনটি হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে, পৃথিবীর প্রতিটি আনাচে কানাচে।)

❖ *বন্ধু হে! তুমি কি তোমার নিজের অস্তিত্বকে ভালোবাস না?*

একজন মানুষ স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করলে মাটি তার দেহকে শেষ করে ফেলবে, তার সুন্দর চেহারা, শুভ্র ত্বক, কাজল কালো চোখ, সুউচ্চ নাসিকা, বলিষ্ঠ দেহ, এগুলো তো হবে কীট আর পোকা-মাকড়ের আহার্য?

কিন্তু শহীদ? আমাদের দয়াবান প্রভু শহীদের দেহকে কবরের মাটি আর পোকা-মাকড়ের জন্য হারাম করেছেন। একটি পশমও তারা স্পর্শ করবে না। তাছাড়া তারা কবরে অনন্ত জীবন লাভ করবে, সাধারণভাবে মৃত্যুবরণকারীর দেহ কি মৃত্যুর সাথে সাথে পঁচে-গলে ধ্বংস হয়ে যাবে না?

ওহে বন্ধু! শুনে রাখ! স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারীর লাশগুলো পঁচে যায়, দুর্গন্ধময় হয়ে যায়, আর শহীদের রক্ত থেকে মেশক-আম্বরের নয়, বরং এক অপার্থিব সুবাস বেরিয়ে আসে।

তাছাড়া, ইনশাআল্লাহ, একজন শহীদ শাহাদাত লাভের সাথে সাথেই হূরে ঈনের সাক্ষাৎ লাভ করে; জান্নাতে চলে যায়; সবুজ পাখি হয়ে জান্নাতে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ায়, জান্নাতের ফলমূল আহার করবে; মৃত্যুর কষ্ট নেই; কবরের আযাব নেই; হিসাব-নিকাশের ভয় নেই; কিয়ামতের ময়দানে কোনো পেরেশানী নেই; থাকবে সর্বোচ্চ জান্নাতে-জান্নাতুল ফিরদাউসে, আল্লাহ পাকের আরশের ঠিক নিচে, মাওলার প্রতিবেশি হয়ে।

বলতো বন্ধু! ঘরে বসে আমরা কোন্ আমলের প্রতিদানে এগুলোর কোনো একটির আশা করতে পারি??

❖ *বন্ধু হে! তুমি কি তোমার পরিবার-পরিজনকে ভালোবাস না?*

বন্ধু! তোমরা তো পিতা-মাতা আর স্ত্রী-সন্তানের হক আদায় কর মোবাইলে একটু খোঁজ-খবর নিয়ে, বছরে দুয়েকবার দুয়েক সেট কাপড় দিয়ে, কিছু ভরন-পোষণ করে, দুয়েক লিটার দুধ, কিছু ফল-মূল, আমের মৌসুমে দুয়েক কেজি আম, কাঁঠালের মৌসুমে দুয়েকটা কাঁঠাল খাইয়ে, একটু আদর-যত্ন, সোহাগ-ভালোবাসা দিয়ে।

অন্যদিকে, আমরা দূরে ময়দানে থেকে আমাদের পরিবার-পরিজনদের তোমাদের মতো হয়ত খোঁজ-খবর নিতে পারি না, আমাদের চক্ষুগুলো তাদের বিরহে অশ্রুপাত করে, জানি, তারাও আমাদের বিরহে ছটফট করে, তাদের মুখে হাসি ফুটাতে পারি না; তবুও আমরা আমাদের রবের ফরয বিধান আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছি, আমরা আশা করি, দুনিয়াতে যদি তাদের সাথে দেখা নাও হয়, আল্লাহ্‌র আরশের ছায়াতলে-জান্নাতে একদিন আমরা অবশ্যই একত্রিত হবো, ইনশাআল্লাহ। কেননা, আমাদের রবের ওয়াদা সত্য।

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَمَآ أَلَتۡنَٰهُم مِّنۡ عَمَلِهِم مِّن شَيۡءٍۚ

"যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তানরা ঈমানে যাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষের সাথে মিলিত করে দিব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করবো না। (৫২ সূরা তূর: ২১)

বন্ধু! একটু চিন্তা করতো, তখন আমাদের পরিবার পরিজনরা কোন জান্নাতে থাকবে? তারা তখন মুজাহিদের জান্নাতে থাকবে। তারা তখন শহীদের জান্নাতে থাকবে। আমাদের স্ত্রী-সন্তানরা, তারা তো যুদ্ধ না করেও শুধুমাত্র আমাদের বিরহে সবর করার কারণে, মুজাহিদ ও শহীদের জান্নাতে আমাদের সাথে ইনশাআল্লাহ একত্রে থাকবে।

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

মিকদাব ইবনু মা'দীকারিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "শহীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ছয়টি পুরস্কার বা সুযোগ আছে। তাঁর প্রথম রক্তবিন্দু পড়ার সাথে সাথে তাঁকে ক্ষমা করা হয়, তাঁকে তাঁর জান্নাতের বাসস্থান দেখানো হয়, কবরের আযাব হতে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়, সে কঠিন ভীতি হতে নিরাপদ থাকবে, তাঁর মাথায় মর্মর পাথর খচিত মর্যাদার টুপি পরিয়ে দেওয়া হবে। এর এক একটি পাথর দুনিয়া ও তাঁর মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম। তার সাথে টানা টানা আয়তলোচনা বাহাত্তরজন জান্নাতী হূরকে বিয়ে দেওয়া হবে এবং তাঁর সত্তরজন নিকটাত্মীয়ের জন্য তাঁর সুপারিশ কবুল করা হবে।" (জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৬৬৩)

عَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: يُشَفَّعُ الشَّهِيْدُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ - ابو داود كتاب الجهاد باب في الشهيد يشفع، البيهقى كتاب السير باب الشهيد يشفع، مشارع الاشواق

হযরত আবূ দারদা রাদি. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "শহীদ নিজ পরিবারভূক্ত সত্তরজনের জন্য সুপারিশ করবে।" (আবু দাউদ, বাইহাক্বী, মাশারিউল আশওয়াক্ব)

সুব্হানাল্লাহ!

একটু ভাব তো বন্ধু! নিজের পরিবার পরিজন আর মা বাবাকে বছরে দুয়েক সেট কাপড় আর দুয়েক কেজি আম খাওয়ানোর তুলনায় কত উত্তম হক আদায় করা এটি!! তাই না!

❖ *ওহে! তুমি কি মনে করছো, এখনতো আমরা দুর্বল, শারীরিক সক্ষমতা নেই, অর্থ সম্পদ নেই, অস্ত্র-শস্ত্র নেই, জিহাদ করবো কিভাবে?*

আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি যে,

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴿٤١﴾

"তোমরা বের হয়ে পড়, হালকা বা ভারী সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।" (০৯ সূরা তাওবা: ৪১)

ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ 'হালকা বা ভারী' এর দশটি অর্থ করেছেন। ১. দলবদ্ধভাবে সারিয়্যা হিসেবে (হালকা) বা পৃথকভাবে (ভারী)।
২. যুবক হও (হালকা) কিংবা বৃদ্ধ (ভারী)।
৩. আগ্রহ থাকুক (হালকা) বা না থাকুক (ভারী)।
৪. ধনী হও (হালকা) কিংবা গরীব (ভারী)।
৫. ব্যস্ত হও (ভারী) কিংবা অবসরে থাক (হালকা)।
৬. এমন সম্পত্তি থাকা যা ছাড়তে ইচ্ছা হয় না (ভারী), বা না থাকা (হালকা)
৭. পরিবার-পরিজন থাকুক (ভারী) বা না থাকুক (হালকা)।
৮. পদাতিক (ভারী) কিংবা অশ্বারোহী (হালকা)।
৯. যুদ্ধের অগ্রগামী বাহিনীতে থাক (ভারী) কিংবা পুরো বাহিনীর সাথে থাক (হালকা)।
১০. সাহসী বীরপুরুষ হও (হালকা) কিংবা ভীরু কাপুরুষ (ভারী)।

ওহে বন্ধু! তুমি এগুলোর বাহিরে কোন্ দলে আছ? তোমার পালানোর কোনো সুযোগ আছে কি?

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَٰتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَۖ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًاۖ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُۖ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

"১৬। গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিন: আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহুত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দিবেন। আর যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর যেমন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছ, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন। ১৭। (কেবল) অন্ধের জন্যে, খঞ্জের জন্যে ও রুগ্নের জন্যে (জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের না হলে) কোনো অপরাধ নেই, এবং যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তাকে তিনি জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন।" (৪৮ সূরা ফাত্‌হ :১৬-১৭)

❖ ওহে বন্ধু! জিহাদের জন্য তোমার প্রস্তুতি কোথায়?

বন্ধু, তুমি হয়ত বলবে, আমি তো জিহাদকে সমর্থন করি, জিহাদ করাকে আমিও ভালোবাসি। সুযোগ পেলে আমিও তো জিহাদ করতে চাই।

ভালো কথা, বন্ধু! তোমার দাবী যদি সত্যি হয়, তাহলে জিহাদের জন্য তোমার প্রস্তুতি কোথায়?

আল্লাহ তা'আলার হুকুম-

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

"আর তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুত রাখ শক্তি ও অশ্ব বাহিনী, তা দিয়ে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন। আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। (সূরা আল আনফাল ৮:৬০)

বন্ধু, তুমি যে জিহাদ করতে চাও, তাহলে আল্লাহ্ পাকের এই হুকুমের বাস্তবায়ন তোমার জীবনের কোথায় আছে??

তুমি কি অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিয়েছ?

অস্ত্র ক্রয়ের জন্য কি তুমি অর্থ সঞ্চয় করেছ?

মানসিক ভাবে তুমি কি এখনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত?

জিহাদের জন্য কি তুমি মাঠ প্রস্তুত করছ?

দাওয়াহ্ ও ই'দাদ- এর মেহনত কতটুকু করছ তুমি??

জিহাদ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় ইলম হাছিল করেছ কি তুমি??

জিহাদী কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছ কি তুমি??

(কিভাবে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত হব ও প্রস্তুতি গ্রহণ করব এ সম্পর্কে বিস্তারিত পড়ুন– কিতাবুত তাহ্‌রীদ্ দ্বিতীয় পর্ব: তাওহীদ ও জিহাদ, লিংক- https://bit.ly/tahrid2)

বন্ধু! কমপক্ষে, আর কিছু না থাকুক, তুমি কি জিহাদের জন্য শারীরিক ভাবে উপযুক্ত? তুমি কি নিয়মিত শরীরচর্চা দ্বারা নিজেকে যুদ্ধের উপযুক্ত রাখছ? না হলে তো তুমি জিহাদের ময়দানে এসেও লেজ গুটিয়ে পালাবে!

আল্লাহ্ পাক আমাদের হেফাযত করুন। আমীন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত- অন্যরা আল্লাহ্‌র গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুতঃ সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান।" (০৮ সূরা আল আনফাল: ১৫-১৬)

বন্ধু! যেখানে তুমি দুই কিলোমিটার হাঁটতে পার না, সেখানে তুমি দশ কিলোমিটার দৌঁড়াবে কি করে? যেখানে তুমি দু'তলা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারনা, সেখানে তুমি পাহাড়-পর্বতের উপর আরোহন করার আশা কর কী করে? খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি বানিয়ে জিহাদ করার আশা করা দিবা স্বপ্ন নয় কি বন্ধু? (জিহাদ লাগলে/ জিহাদের ডাক আসলে জুড়ে যাব!) এটা কি নিজেকে মিথ্যা আশা দেয়া নয়?

শুনে রাখ! এরূপ মৌখিক জিহাদের স্পৃহা আল্লাহর রাসূলের যামানার মুনাফেকরাও দেখাত! (আল্লাহই ভালো জানেন আমাদের দিলের অবস্থা!)

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ,

۞وَلَوْ أَرَادُوا۟ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا۟ لَهُۥ عُدَّةً وَلَـٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُوا۟ مَعَ ٱلْقَـٰعِدِينَ ﴿٤٦﴾

"আর যদি তাদের যুদ্ধের জন্য বের হবার (প্রকৃত) ইচ্ছা (এরাদা) থাকত, তবে অবশ্যই কিছু না কিছু সরঞ্জাম ব্যবস্থা করত (প্রস্তুতি নিত), (যেহেতু তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়, অন্তরে নেফাক তাই) আল্লাহ তাদের বের হওয়াকে পছন্দ করেননি, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ করা হল, (ঘরে) বসা লোকদের (নারী, শিশু, বৃদ্ধ, শারীরিকভাবে অক্ষম ও অন্যান্য মুনাফেকদের) সাথে বসে থাক।" (০৯ সূরা তাওবাহ: ৪৬)

বন্ধু! 'তামান্না ও এরাদা'র মধ্যে পার্থক্যটা বুঝে নাও। তামান্না (ইচ্ছা) হলো ঐ আকাঙ্ক্ষার নাম, যাতে কেবল কোনো একটি কাজের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা হয়, কিন্তু সে কাজটি আঞ্জাম দেয়ার জন্য কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ কিংবা কদম দেয়া হয় না। জিহাদের ক্ষেত্রে কেবল (জিহাদী/শহীদী তামান্না-ই গ্রহণযোগ্য নয়; জিহাদের জন্য চাই 'এরাদা'। কোনো একটি কাজের ক্ষেত্রে এরাদা হলো সেই ঐকান্তিক ইচ্ছার নাম যার সাথে কাজটি সম্পাদন করার জন্য যথোপযুক্ত ও সাধ্যমত প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টা বর্তমান থাকে।

প্রিয় ভাই! আল্লাহ্‌র রাসূলের যামানার মুনাফিকরাও জিহাদের জন্য তামান্না প্রদর্শন করতো, কিন্তু তাদের কোনো এরাদা ছিল না, যেমনটি আমরা পূর্বের আয়াতে জেনেছি।

আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন-

وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ قَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا۟ ۖ قَالُوا۟ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّٱتَّبَعْنَـٰكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَـٰنِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَٰهِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾

"আর তাদেরকে বলা হল এসো, আল্লাহর রাহে লড়াই কর কিংবা শত্রুদেরকে প্রতিহত কর। তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম, লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম (এবং যুদ্ধ করতাম)। সেদিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে; বস্তুতঃ আল্লাহ ভালভাবে জানেন, যা তারা গোপন করে থাকে।" (০৩ সূরা আলে ইমরান: ১৬৭)

সুতরাং বন্ধু! তুমি কি ভয় করছ না, এখনও আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কেন জিহাদের জন্য কবুল করছেন না!!!!

❖ ওহে বন্ধু আমার! তুমি কি তোমার নিজের ব্যাপারে 'নিফাকের' ভয় কর না??

যাদের অন্তরে কুফুরী, যারা অন্তর থেকে ইসলাম ও আল্লাহ্‌র হুকুমকে কবুল করেনি কিন্তু নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়, তাদেরকে "মুনাফিক" বলা হয়।

হযরত ইবনে আবি মুলাইকা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি ত্রিশজন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম আযমাঈনদের সহিত সাক্ষাৎ করেছি। তাঁরা প্রত্যেকে নিজের সম্পর্কে মুনাফিক হওয়ার ভয় করছিলেন।" (বুখারী)

অর্থাৎ তাঁরা মনে করতেন, আমাদের বাহ্যিক অবস্থা যেমন উত্তম, উহার ভিতরগত অবস্থা তেমন উত্তম নয়। এই কারণে তাঁরা নিজের মধ্যে নেফাকের ভয় করতেন।

আমরা গুনাহকে যেই পরিমাণ ভয় করি না, সাহাবায়ে কেরাম তো তাঁদের নেক আমল কবুল না হওয়াকে তার থেকে অনেক বেশি ভয় করতেন। হায়! আমাদের অন্তরে নিফাক থাকা সত্ত্বেও আমরা নিজেদেরকে পাক্কা ঈমানদার মনে করি। আর তাঁদের ঈমানকে স্বয়ং আল্লাহ পাক মানদণ্ড ঘোষণা করার পরও তারা নিজেদের ব্যাপারে 'মুনাফিক' হয়ে যাওয়ার ভয় করতেন।

আহ! তাঁরা আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে কতুটুকু সতর্ক ছিলেন!

বন্ধু, তোমার তো মনে আছে নিশ্চয়ই!

নবুয়তের যামানায় সর্বপ্রথম যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তা'আলা মুনাফেকদের মুখোশ উন্মোচন করেন তা হলো ওহুদের যুদ্ধ। মুনাফেকদের সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার অনুসারী প্রায় ৩০০ জন মূল বাহিনী থেকে পেছনে সরে যায়। বাকী ৭০০ জন সাহাবী ৩০০০ কাফেরের বিরুদ্ধে ওহুদের ময়দানে যুদ্ধ করেন। এ থেকে বুঝা গেল, সাহাবায়ে কেরামের জামাতে ঘাপটি মেরে বসেছিল এমন মুনাফেকের সংখ্যা প্রায় ৩০%।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এই মুনাফিকরা সকল আমলই করত। তারা নামায পড়ত, রোযা রাখত, যাকাত দিত, দান-খয়রাত করত, হজ্জ করত, সবই করত। করতো না শুধু একটি আমল, যেই আমল থেকে এরা সর্বদা পিছিয়ে থাকত। যেহেতু জিহাদের ময়দানে গেলে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে, তাই এরা মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ থেকে পালাত।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٠﴾ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾

"(২০) যারা মুমিন তারা বলে: একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে সশস্ত্র জিহাদের (কিতাল/যুদ্ধের) উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে (মুনাফেকীর) রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মুর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য। (২১) তাদের আনুগত্য আর মিষ্ট বাক্য জানা আছে। অতএব, জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অংগীকার পূর্ণ করে (যুদ্ধে শরীক হয়), তবে তাদের জন্য তা মঙ্গলজনক হবে।" (৪৭ সূরা মুহাম্মাদ: ২০-২১)

প্রিয় বন্ধু! এই লোকগুলো জিহাদে না জুড়ার কারণে সকল আমলে জুড়া সত্ত্বেও মুনাফেকদের কাতারে শামিল হতো। তাবুকের যুদ্ধের সময়ও এরা ফসল কাটা কিংবা গরমের অজুহাত দেখিয়ে জিহাদ থেকে অব্যাহতি চায়। এরা তো প্রকাশ্য মুনাফেক। এমনকি যারা খাঁটি মুমিন ছিলেন, এবং কোনো কারণ ছাড়াই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, তাদেরকেও

তাওবা কবুল করানোর জন্য পরবর্তীতে অনেক কাঠ-কয়লা পুড়াতে হয়েছিল। সে কাহিনী নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়!!

বুঝা গেল, কেউ জিহাদ পরিত্যাগ করলে, তার আল্লাহ্ পাকের দরবারে মুনাফিক সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ)

আর এজন্য মুনাফিক হয়ে যাওয়ার ভয়ে সাহাবায়ে কেরাম কখনো কোনোদিন জিহাদ পরিত্যাগ করেননি।

সাহাবায়ে কেরামের কাছে "ঈমান মানেই জিহাদ, আর জিহাদ না করা মানেই নিফাক"। আর ইসলামের বিধান সব যুগের জন্য একই। ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। তাতে আর কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন হবে না। তাই এই ব্যাপারে আমাদের খুব ভয় করা উচিত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,"যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে সে যুদ্ধ করেনি, কিংবা মনে মনে যুদ্ধ করার ইচ্ছাও পোষণ করেনি, সে মুনাফেকির একটি অংশ নিয়ে মারা গেল।" (সহীহ মুসলিম-৫০৪০)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ لَقِيَ اللهَ بِغَيْرِ أَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ، لَقِيَ اللهَ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ

তিনি ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি জিহাদের কোনো চিহ্ন ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হাজির হবে, সে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার দ্বীন ত্রুটিযুক্ত হবে।" (তিরমিযি- ১৬৬৬)

তাই, জিহাদ না করে ঘরে বসে থেকে আমরা নিজেদের ব্যাপারে কিভাবে এতটা নিশ্চিত হতে পারি যে, আমাদের অন্তরে নেফাক নেই? এটাতো সহজ কথা যে, যে আল্লাহ কে চাওয়ার ব্যাপারে সত্যবাদী, আল্লাহ্র হুকুম পুরা করার ব্যাপারে সত্যবাদী, সে যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ-তে বিশ্বাসী হয়, তাহলে তার কাছে জিহাদের হুকুম আসার পরও সে কিভাবে ঘরে বসে থাকতে পারে? সে কিভাবে জিহাদ বাদ দিয়ে অন্য ফিকির নিয়ে ঘুরতে পারে?

প্রিয় ভাই, আমরা কিভাবে বসে থাকতে পারি, আমাদের জীবনের দাম কি আল্লাহ্র রাসূলের জীবনের চেয়েও বেশি হয়ে গেল??? (নাউযুবিল্লাহ!) অথচ তাঁকে এই দ্বীনের জন্য কত কষ্ট করতে হয়েছে! জীবনকে বাজি ধরতে হয়েছে! ছোট-বড়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৭৩ টি যুদ্ধ করতে হয়েছে! আহত হতে হয়েছে! দন্ত মোবারক শহীদ করতে হয়েছে! রক্তাক্ত হতে হয়েছে!!

কোথায় ভাই? আমাদের যিন্দেগীতে যুদ্ধ-জিহাদ কোথায়?? আমাদের যিন্দেগীতে কোথায় রয়েছে সে রক্তাক্ত দাস্তান? কোথায় আমাদের জীবনে দ্বীনের জন্য বিপদাপদের পরীক্ষা? কোথায় সবর ও ধৈর্যের মারহালা?

আমরা কি ভাই তাহলে আল্লাহর রাসূলের যামানার মুনাফিকদের মতো পিছনে পড়ে থেকে, দুনিয়ার যিন্দেগী নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকব; অথচ সারা দুনিয়ার কাফির-মুশরিকরা আমাদের দ্বীনকে মিটিয়ে দিতে আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করেই যাচ্ছে?? আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

رَضُوا۟ بِأَن يَكُونُوا۟ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾

"তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে এবং মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে তাদের অন্তর সমূহের উপর। বস্তুতঃ তারা বোঝে না।" (সূরা আত্ তাওবাহ্ ০৯:৮৭)

(আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।)

না, ভাই, না, আমাদের কখনোই এটা উচিত নয় যে, আমরা আমাদের হায়াতকে আল্লাহ্র রাসূলের হায়াত, তাঁর সম্মান ইজ্জত এবং তাঁর আনীত শরীয়তের চেয়ে বেশি প্রিয় ও আপন মনে করব!! আমাদের কি হল ভাই, আমাদের

চোখের সামনে বাতিল ও তাগুত আমাদের দ্বীনকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে, অথচ আমরা চুপচাপ বসে আছি?? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শানে গোস্তাকী করা হচ্ছে, অথচ আমরা এখনো বেঁচে আছি?? আমাদের মায়েদের বুক খালি হোক, যদি আমরা এসব হারামীদেরকে দুনিয়া থেকে বিদায় করতে না পারি!! আমাদের পিতারা পুত্রহারা হোক, যদি আমরা এই শয়তানদেরকে জাহান্নামে পাঠাতে না পারি!!!

আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-

مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ صَٰلِحٌۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾

"মদীনাবাসী ও পাশ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রাসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রাসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়-তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না।" (সূরা আত্ তাওবাহ্ ০৯: ১২০)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক পথ দেখান ও নেফাক থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

❖ *বন্ধু হে! তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে সত্যবাদী???*

বন্ধু, আমরা সকলেই তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসার দাবী করি, তাইনা!

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা (ক্ষতি বা) বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর, এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লার বিধান আসা পর্যন্ত (দেখ, তোমাদের পরিণতি কি হতে যাচ্ছে), আর আল্লাহ তা'আলা ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" (০৯ সূরা তাওবাহ: ২৪)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন,

ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْۖ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْۗ ﴿٦﴾

"নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের প্রাণের চেয়েও ঘনিষ্টতর এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা।" (সূরা আহযাব ৩৩:৬)

নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন,

لا يُؤْمِنُ أحدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن وَلَدِه، ووالِدِه، والناس أجمعين

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পুত্র, তার পিতা এবং অপরাপর সকল মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হব।" (বুখারী ও মুসলিম)

এখন প্রশ্ন হলো, আমার হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের মহব্বত সকল কিছুর চেয়ে বেশি, এমনকি আমার নিজের জীবনের চেয়েও বেশি আছে কিনা, বুঝব কিভাবে? এটি পরীক্ষা করার জন্য কোনো 'কষ্টিপাথর' আছে কি?

আমি অনেক আমল করতে পারি, সারারাত তাহাজ্জুদ, সারা বছর রোযা রাখতে পারি, আমি অনেক বড় আবেদ বা নাম-যশওয়ালা আলেম, আমার অনেক মুরীদান, এটাই কি মহব্বত বেশি হওয়ার আলামত? এটাই কি আল্লাহ্র ভয় থাকা, প্রকৃত মুত্তাকী হওয়ার দলীল?

না বন্ধু, কক্ষনো তা নয়।

"নিজের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসার" অর্থই হচ্ছে "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যখনই আমার জীবন চাইবেন, তখনই আমি আমার জীবন দিতে প্রস্তুত আছি।"

সুতরাং এই ভালোবাসা প্রমাণের একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে, "আমি আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূলের ﷺ জন্য এখনি এই মুহূর্তে জীবন দিতে তৈয়ার আছি কিনা! আল্লাহ ﷻ ও তাঁর হাবীবের ﷺ ভালোবাসায় আমার জীবনকে কুরবানি করতে সর্বদা প্রস্তুত আছি কিনা! আমার দেহের লোমকূপ সংখ্যক যদি জীবন থাকত, তার সবগুলোকেই আল্লাহ ﷻ, তাঁর রাসূল ﷺ ও তাঁর দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিতে পরিপূর্ণ প্রস্তুত কিনা! আমার মাঝে আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যু তথা শাহাদাতের সত্য তামান্না আছে কিনা! আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূলের জন্য এই মুহূর্তে আমার আপনজন, দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছু ছাড়তে রাজী আছি কিনা! ঘরে আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল -ﷺ কে রেখে আমার সবকিছু আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করতে প্রস্তুত আছি কিনা! জিহাদের জন্য আমি সত্যিকার অর্থে প্রস্তুতি নিচ্ছি কিনা! 'কাবার রবের কসম! যতক্ষণ পযর্ন্ত না আমার দেহের রক্ত আল্লাহর জন্য প্রবাহিত হচ্ছে, ততক্ষণ পযর্ন্ত আমি সফল হবনা!' 'দ্বীন মিটে যাবে আর আমি জীবিত থাকব, তা হবে না!'- এ ধরনের মানসিকতা আমার মাঝে আছে কিনা"???!!!

যদি আমার মাঝে এ মানসিকতা ও এসব প্রস্তুতি না থাকে, তাহলে আমি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে সবচেয়ে বেশি মহব্বতকারী নই।

আচ্ছা বন্ধু ধর, আমি তোমাকে বললাম, "আমি তোমাকে আমার জীবনের চেয়েও ভালোবাসি কিন্তু তোমার জন্য আমার জীবন দিতে পারবো না।" একটু চিন্তা করে দেখতো, একথাটি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? কথাটি কতটুকু হাস্যকর?? হা হা হা!
বন্ধু, তুমি কি আমাকে তাহলে মিথ্যুক বলবে না??? জীবনই যদি না দিতে পারি তাহলে জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসা হলো কী করে? এই ভালোবাসার অর্থ কী?
তাই- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত খোদাপ্রেম কিংবা নবীপ্রেম প্রকাশের আর কোনো চূড়ান্ত জায়গা নেই। প্রেমের এই চূড়ান্ত পরীক্ষা পাশ না করা পর্যন্ত প্রকৃত আশেকের সার্টিফিকেট কক্ষনো মিলবে না, কস্মিনকালেও না।

বুঝলে তো বন্ধু, মুজাহিদীনে ইসলামের উপরে 'আশেকে রাসূল' কিংবা 'মাশুকে ইলাহী' আর কেউ হতে পারবে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসার ক্ষেত্রে মুজাহিদ ভাইয়েরাই সর্বাধিক সত্যবাদী, তারাই সবচেয়ে এগিয়ে। আর এটা আমার বানানো কোনো কথা নয়। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ-

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

"তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যবাদী।" (৪৯ সূরা হুজুরাত: ১৫)

❖ *প্রিয় বন্ধু আমার! আমি তোমার কাছে যাব না, বরং তুমিই আমার নিকট চলে আস!*

বন্ধু, তোমাকে একটা কাহিনী শুনাই!

তাবুক যুদ্ধে বিশেষ কোনো কারণ ছাড়াই পিছনে পড়ে গিয়েছিলেন (যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি) কা'আব ইবনে মালেক, মুরারা ইবনে রবি এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম আযমাঈন; তিনজনই ছিলেন বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধাভাজন আনসার সাহাবী। তাই তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা অনুযায়ী সামাজিক ভাবে 'অনির্দিষ্টকালের' জন্য বয়কট করা হয়, তাদের সাথে কথা বার্তা, সালাম বিনিময় নিষিদ্ধ করা হয়, চেনা মানুষগুলো অচেনা হয়ে গেল, তাদেরকে তাদের স্ত্রীদের থেকে পৃথক করে দেয়া হল, যমীন তাদের জন্য ভয়ানক হয়ে উঠল। অথচ তারা বায়'আতে আকাবা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর সাথে অন্যান্য যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মুরারা ইবনে রবি এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বদরী সাহাবী ছিলেন। হেলাল ইবনে উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন বয়োবৃদ্ধ, দুর্বল সাহাবী।

সুবহানাল্লাহ! বন্ধু, একটু চিন্তা করতো, তবুও এই প্রখ্যাত সাহাবীগণের উপর কেন 'সামাজিক বয়কট' আরোপ করা হল? তাদের জন্য পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, অনিশ্চিত পরিণতির চিন্তায় তাদের ক্রন্দন করা ছাড়া আর কিছুই তো করার ছিল না।

বলতো, তাঁদের এহেন পরিস্থিতির কারণ কি ছিল? জিহাদে অংশগ্রহণ না করা, জিহাদ হতে পিছিয়ে পড়া; অথচ ত্ববুক যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল ﷺ তো কেবল যুদ্ধ করার নিয়তে বের হয়েছিলেন কিন্তু কোন যুদ্ধ সংগঠিত হয়নি।

পঞ্চাশ দিন পর আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা করার ঘোষণা দেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا۟ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

"এবং অপর তিনজনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই-অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি, যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময়, করুণাশীল।" (০৯ সূরা তাওবাহ: ১১৮)

বলতো বন্ধু! ক্ষমা করার পর আল্লাহ তা'আলা ঐ তিন সাহাবীকে কী কী উপদেশ দিলেন, কী কী নসীহাহ্ করলেন? পরের আয়াত শুন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।"

(০৯ সূরা তাওবাহ: ১১৯)

এই সত্যবাদী কারা? এ সম্পর্কে তো তোমাকে আগেই বলেছি।

বন্ধু! এরপরে আল্লাহ পাক আর কী কী নসীহত করলেন জান কি?

مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ صَٰلِحٌۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾

“মদীনাবাসী এবং পাশ্ববর্তী এলাকাবাসীদের উচিত নয় রাসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গ ত্যাগ করা, (জিহাদ ত্যাগ করে) পিছনে থেকে যাওয়া এবং নিজেদের জীবনকে রাসূলের প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহ্‌র পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করবে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়- তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক বিনষ্ট করেন না।” (০৯ সূরা তাওবাহ: ১২০)

এই আয়াতগুলো থেকে একথা স্পষ্ট যে-

১. আল্লাহ পাকের নির্দেশ, 'তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাক' আয়াতে সত্যবাদী বলতে 'মুজাহিদীনে ইসলাম' উদ্দেশ্য।
২. কেননা, মুজাহিদগণই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে নিজের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসে, আর এটি তারা প্রমাণ করে নিজের জীবন দিয়ে।
৩. যারা জিহাদ থেকে পিছনে পড়ে থাকে, তারা নিজেদের ঈমানের দাবীতে প্রকৃতপক্ষে সত্যবাদী নয়। তাদের মধ্যে নিফাকের ব্যাধি গুপ্ত আছে। তাই এদের সাথে থেক না। তাহলে তোমার মধ্যেও এই ব্যাধি সংক্রমিত হবে!
৪. আফসোস! এই আয়াতটিকে ('তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাক') এখন মুসলমানদের মধ্যে জিহাদ পরিত্যাগকারী বিভিন্ন দল নিজের জন্য, নিজেকে সত্যবাদী হিসেবে প্রকাশের জন্য দলীল হিসেবে, নিজেদের দল ভারী করার জন্য ব্যবহার করে থাকে। এতে উম্মাহ্ বিভ্রান্তিতে পতিত হচ্ছে। আল্লাহ হেফাযত করুন। আমীন।

উপরের আয়াতের বর্ণনার পূর্বাপর, বিভিন্ন মুফাস্‌সিরে কেরামের ব্যাখ্যায় বুঝে আসে 'সাদেকীন' দ্বারা উদ্দেশ্য জিহাদে শরীক লোকেরাই। যদিও অর্থের ব্যাপকতায় দ্বীন ঈমানের ব্যাপারে সত্যবাদীদেরকেও বিভিন্ন তাফসিরে এই আয়াতে শামিল করা হয়েছে। তাই জিহাদ ফরযে কিফায়া অবস্থায় জিহাদ পরিত্যাগকারীগণ 'সাদেকীন' হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও, জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় জিহাদ পরিত্যাগকারীগণ 'সাদেকীন' না হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা, যিনি প্রকৃত বিশ্বাসী এবং যিনি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌র হুকুমের সামনে নিজের গর্দান সপে দিয়েছেন, তিনি কিভাবে একটি ফরয হুকুম পরিত্যাগ করে বসে থাকতে পারেন? একটি ফরযে আইন হুকুম বাদ দিয়েও কিভাবে তিনি সত্যিকারের আত্মসমর্পণকারী হতে পারেন? কিভাবে তিনি সাদেকীনদের কাতারে শামিল হতে পারেন? কিভাবে তিনি 'সত্যবাদী' হওয়ার দাবীদার হতে পারেন??

সুতরাং বন্ধু! আমি তোমার কাছে মসজিদুল হারামে বসে নির্জনে ইবাদত করবো না, বরং, তোমার প্রতি আল্লাহ পাকের নির্দেশ হচ্ছে, তুমি আমাদের (সত্যবাদী মুজাহিদীনে ইসলামের) সাথে জুড়ে যাও।

আরেকটি ঘটনা শুনাই তোমাকে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِشِعْبٍ فِيْهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٍ فَقَالَ لَواعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقِمْتُ فِيْ هذَا الشِّعْبِ؟ وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَا تَفْعَل فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهٖ سَبْعِيْنَ عَامًّا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنَّ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلُكُمُ الْجَنَّة؟ أُغْزُوْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

একদা রাসূল ﷺ এর একজন সাহাবী কোন এক গিরিপথ অতিক্রমকালে একটি মিষ্ট পানির ঝর্ণা দেখতে পেলেন। উক্ত ঝর্ণাটি তাকে খুবই মুগ্ধ করে ফেলল। এবং তিনি আনন্দে আপ্লুত হয়ে বলে ফেললেন, কতই না চমৎকার হতো যদি আমি লোকালয় পরিত্যাগ করে এ গিরিপথের পার্শ্বে অবস্থান করতে পারতাম! অতঃপর এক সময় তার এ আকাঙ্ক্ষার কথাটি রাসূল ﷺ এর কাছে আলোচনা করা হল। তখন তিনি ﷺ বললেন, "সাবধান! এরূপ (কামনা) করো না। কেননা, তোমাদের কারোও আল্লাহর পথে অবস্থিতি নিজ গৃহে সত্তর বৎসর নফল নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। তোমরা কি এ কথাটি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে মাফ করে দেন এবং পরিশেষে তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান। কাজেই (একাকী নিভৃতের/খালওয়াতের ইবাদত বাদ দিয়ে) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। কেননা, **যে ব্যক্তি সামান্য সময়ও (فواق ناقة) আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।**" [তিরমিযী-১৬৫০, মেশকাত, তা'লীকুর রাগীব (২/১৭৪)]

আলোচ্য হাদীসে -فواق ناقة শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে যার অর্থ হলো উটের দুধ দোহন করার মাঝে সামান্য বিরতি। কিছু সময় দুধ দোহনের পর বাচ্চাকে ছেড়ে দেয়া হয় সে স্তনের দুধ এনে দেয়ার পর পুনরায় তা দোহন করা হয়। মধ্যবর্তী এ সামান্য সময়কে فواق ناقة বলা হয়। কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম فواق ناقة এর ব্যাখ্যায় বলেন দুধ দোহনের সময় (দুই টানের মধ্যবর্তী যে সময় অর্থাৎ) একহাত পুনরায় ঐ স্থানে ধরার মধ্যবর্তী যে স্বল্প সময় তাকেই فواق ناقة বলা হয়।

এ সামান্যতম সময় যে ব্যক্তি দুশমনের মুকাবেলায় লড়াই করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। এ থেকে সুস্পষ্ট যে, সমস্ত আমল অপেক্ষা জিহাদ অতি উত্তম ইবাদত। সুবহানাল্লাহ!!!

সুতরাং বন্ধু, তুমি যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রকৃতঅর্থে ভালোবেসে থাক, মাগফিরাত কামনা কর, কম কষ্টে অধিক সওয়াব চাও, নিজের জন্য জাহান্নামকে হারাম করতে চাও, নিজের জন্য জান্নাতকে ওয়াজিব করে নিতে চাও, তবে হেরেম শরীফে এ.সি.-র হাওয়া উপভোগ করা আর নিভৃতে একাকী ইবাদত করা বাদ দিয়ে আমাদের কাছে তপ্ত ময়দানে চলে এস।

- *বন্ধু, আর কি বলব তোমায় বল! সবশেষে বলছি, তুমি ফরয বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে মগ্ন হয়ে আছো নাতো? এতো ইবাদতের পরও তুমি 'ফরয তরককারী' হয়ে যাচ্ছ নাতো? নিজের মনকে একটি বুঝ দিয়ে নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা খাচ্ছ নাতো?*

শয়তান বিভিন্ন সুরতে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে থাকে। সে আলেমকে ইলমের জালে, আবেদকে ইবাদতের জালে, জাহেলকে জাহেলিয়াতের জালে, গুনাহগারদের গুনাহের জালে, মেহনতের সাথীদেরকে মেহনতের ধোকায় এবং নেককারদেরকে নেক সুরতে ধোকায় ফেলে।

শয়তান জাহেলদের অন্তরে অজ্ঞতার মহব্বত পয়দা করে দেয়। ফলে দ্বীনের ইলম হাসিল করা তাদের নিকট অসম্ভব বিতৃষ্ণার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যার কারণে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইলম হাছিল করার জন্যও তার সময় হয়ে উঠে না। দুনিয়ার নানা ব্যস্ততা দেখিয়ে সে 'অন্ধ' থাকতেই পছন্দ করে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

শয়তান গুনাহগারদেরকে যে ধোঁকা দেয়া হয় তা তো স্পষ্ট, শয়তান মানুষের অন্তরে "অমুক গুনাহ কর্!" "তমুক গুনাহ কর্", "ঐ গুনাহটা মনে হয় আরো আনন্দদায়ক, উপভোগ্য", এই ধরণের ওস্ওয়াসা দিতেই থাকে। ফলে সে একটা গুনাহ করে কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারে না, বরং একটি গুনাহ করার পর আরো বড় গুনাহ করার প্রতি তার আগ্রহ ও লোভ পয়দা হয়। একটি গুনাহের কারণে অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। এভাবে গুনাহ করতে করতে তার দিল্ (অন্তর) অন্ধকার রাত্রির ন্যায় কালো হয়ে যায়। ফলে ইবাদত বন্দেগী তার কাছে 'হলাহল বিষ'তুল্য বোধ হয়। তাই তার কপালে তাওবা নসীব হয়না। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

কিন্তু যাদের ব্যাপারে শয়তান জানে যে, এই লোকগুলোকে দিয়ে কোনোভাবেই গুনাহের কাজ করানো সম্ভব নয়, যারা **পরহেযগার 'আবেদ'** শ্রেণি, তাদেরকে কী শয়তান হতাশ হয়ে ছেড়ে দেয়? কোনো অস্ওয়াসা দেয় না???.............

শয়তান জানে যে, এদেরকে যদি বলা হয়, জিনা (ব্যভিচার) কর্, এরা জীবন চলে যাবে কিন্তু জিনা করবে না, যদি বলা হয়, 'সুদ খা, ঘুষ খা', এরা না খেয়ে মরবে কিন্তু সুদ-ঘোষের ধারে কাছেও যাবে না। তাহলে এদের কী করা?

এদের ক্ষেত্রে শয়তানের পলিসি (কর্মপন্থা) হলো, "ইবাদত-ই যখন করবে, কম সওয়াবের ইবাদতে লিপ্ত থাক, অধিক দামী ইবাদত না করে কম সওয়াবের ইবাদতে লিপ্ত থেকে যিন্দেগী পার করে দাও।" কম সওয়াবের আমলের ফায়দা ও ফাযায়েল সম্বলিত হাদীসগুলোকে শয়তান তার সামনে 'দামী ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ'রূপে তুলে ধরে। ফলে অধিক ফাযায়েলের আমলগুলো থেকে সে গাফেল থাকে।

প্রিয় ভাই! এটি এমন একটি মারাত্মক রোগ, যার দ্বারা বর্তমান যামানার সকল দ্বীনদাররাই কম-বেশি আক্রান্ত। আমলের গুরুত্ব না বুঝে, যখন যেটা মনে চায়, যখন যেটা করতে ভালো লাগে, সেই আমলেই ঝাঁপ দেয়। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার চাহিদা অপেক্ষা নিজের দীলের চাহিদা ও ভালো লাগাটাই অধিক প্রাধান্য পায়। অথচ "এই মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার কী হুকুম, কী চাহিদা, সেটা পালন করাই" হচ্ছে প্রকৃত দ্বীন। ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজের খাহেশ পুরা করাটাই দ্বীন নয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বীনদার (আওয়াম কিংবা খাওয়াস)-দের অবস্থা হলো, আমরা নিজেরা দ্বীনের কোনো একটা শাখায় নিজেকে ব্যস্ত রাখি আর আত্মতুষ্টিতে ভুগি ও নিজের মনকে একটা বুঝ দেই, আলহামদুলিল্লাহ! আমি তো দ্বীনের মেহনতের সাথে লেগেই আছি। অনেক সওয়াব হাছিল করছি। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা শরীয়তের চাহিদা তথা "এই মুহূর্তে আমার উপর আল্লাহ পাকের হুকুম কী" তার কোনই তোয়াক্কা করি না।

আহ্! এই বিষয়টা আমরা কেন যে বুঝি না!

আপনাদেরকে ২০১৯ সালের সংবাদপত্রের একটি খবরের কথা বলব; খবরটি হল, এক ব্যক্তি তার জীবনে তিন হাজার বারের উপর উমরা পালন করেছেন।

একজন সাধারণ মানুষ তো শুনা মাত্রই বলতে শুরু করবে, সুব্হানাল্লাহ! লোকটার কী সৌভাগ্য! জীবনে এতবার উমরাহ করার সৌভাগ্য তার হয়েছে! কতবার আল্লাহর ঘরকে দেখার সৌভাগ্য তার হয়েছে! জীবনে কত হাজার বার

আল্লাহর ঘর তাওয়াফের সৌভাগ্য তার কপালে জুটেছে! আল্লাহ্র রাসূলের রওযা মুবারকে কতবার সে সালাম দিয়েছে!..........

আহ্! এই ব্যক্তির মতো সৌভাগ্যবান আরো কেউ কি দুনিয়াতে আছে!

একটু থামি ভাই!...........

নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান। যে কোনো ছোট্ট থেকে ছোট্ট একটি (মোস্তাহাব) আমলের তাওফীক পাওয়াটাও অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যাপারটা এখানে নয়। এই লোকটি তিন হাজার বার উমরাহ করেছে, কিন্তু কেন? কিসের আশায়? আমরা লোকটি সম্পর্কে নেক ধারণা পোষণ করছি, ধরে নিচ্ছি, তার মাঝে লোক দেখানোর কোনো প্রবণতা ছিল না, অর্থাৎ তিনি সওয়াবের নিয়তে, আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার মানসেই তিনি এতগুলো উমরাহ করেছেন!

এবার চিন্তা করুন, ঐ আবেদ লোকটি কী করেছেন? লোকটির যিন্দেগীতে একবার উমরাহ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ছিল, যা তিনি যখন জীবনের প্রথম বার উমরাহ করেছিলেন, তখনই আদায় হয়ে গিয়েছে। তাহলে বাকীগুলো হলো নফল উমরাহ।

আমরা নিশ্চয়ই জানি, এক ব্যক্তি সারা জীবনে যত সুন্নত ইবাদত করে, তার সবগুলিকে একত্রিত করলেও (গুরুত্ব ও সওয়াবের দিক থেকে) তার যিন্দেগীর ছোট্ট একটি ফরযের সমান হবে না!

এবার আপনি তিন হাজার উমরাহকে এক পাল্লায় রাখুন, আর ছোট্ট কোন একটি ফরযকে আরেক পাল্লায় রাখুন, কোনটা ভারী হবে? নিঃসন্দেহে ছোট্ট ফরযটি। বুঝতে পেরেছেন ভাই? এই লোকটি যদি বুদ্ধিমান হতেন, এত টাকা আর সময় ব্যয় না করে তিনি অবশ্যই এমন কোনো আমল খুঁজতেন যাতে অল্প সময়ে, অল্প খরচে অধিক সওয়াব লাভ হয়।

তাই যদি সওয়াবই উদ্দেশ্য হতো এবং তিনি আমলের গুরুত্ব বুঝতেন, তাহলে ঐ লোকটি তিন হাজার বার উমরাহ না করে এক সকাল বা এক বিকাল জিহাদের ময়দানে কাটিয়ে আসতেন।

তাছাড়া জিহাদ বর্তমানে ফরযে কিফায়া নয়, ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে। নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ, আলেম, জাহেল, দীনদার, দুনিয়াদার, নেককার, ফাসেক-ফুজ্জার, সকল তবকার মুসলমানের উপর ফরয হয়ে গিয়েছে। কেউই এই ফরয হুকুমের আওতার বহির্ভূত নয়। তাই এই একটি ফরয হুকুমের সামনে, কেয়ামত পর্যন্ত এক ব্যক্তি যদি প্রতিদিন একশ করে উমরাহ করে, কিংবা কেয়ামত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন কাবাঘরে ই'তিকাফ করে, কিংবা যিন্দেগীর সকল নামায হারামাইন শরীফাইনে আদায় করে (পৃথিবীর যে কোনো মসজিদে জামাতে নামায আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ হুকুম), কিংবা কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিবছর একটি করে হজ্জ করে (জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয, আর বাকীগুলো হবে নফল), যদি কোনো ব্যক্তি এমন থাকে যে একাই কিয়ামত পর্যন্ত সকল নফল, সুন্নত, ওয়াজিব আমল করতে সক্ষম, তার এত সওয়াব এক পাল্লায় রাখা হলো আর আল্লাহর রাহে একটি মুহুর্ত জিহাদের ময়দানে কাটানোর সওয়াব এক পাল্লায় রাখা হলো, বলুন এবার, কোন্ পাল্লা ভারী হবে?

তাছাড়া ঐ ব্যক্তির সকল আমলের সাথে কি সেই ছয়টি পুরস্কারের ওয়াদা রয়েছে, যা একজন শহীদ প্রাপ্ত হবে, একজন শহীদ কবরে রিযিক প্রাপ্ত হবে, সে ব্যক্তি কি তা প্রাপ্ত হবে, একজন শহীদের দেহ কবরের মাটির জন্য হারাম করা হয়েছে, সেই ব্যক্তি কি সেই মরতবা লাভ করবে, শহীদকে এমন প্রতিদান দেয়া হবে যে, সে দুনিয়াতে বারবার ফিরে

আসতে চাইবে এবং বারবার শহীদ হতে চাইবে, কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি জান্নাত লাভ করেনও তিনি কি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবেন?

প্রিয় ভাই! আমরা যদি আমলসমূহের তুলনামূলক গুরুত্ব বুঝে গিয়ে থাকি, তাহলে নিচের হাদীসগুলোকে আবারো স্মরণ করি ইনশাআল্লাহ।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامٍ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الحَجَرِ الْأَسْوَدِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "আল্লাহ্‌র পথে (সীমান্ত পাহারার/জিহাদের কাজে/যুদ্ধের ময়দানে) একটি মুহূর্ত অবস্থান করা কদরের রাতে হাজরে আসওয়াদকে সামনে নিয়ে ইবাদত করার চাইতে উত্তম।" (ইবনে হিব্বান ১৫৮৩, ইবনে আসাকির, বায়হাকী)

عَنْ اٰدَمَ بْنِ عَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ إِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: لَسَفَرَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلٌ مِنْ خَمْسِيْنَ حَجَّةٍ

হযরত আদাম বিন আলী (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন,"আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা পঞ্চাশবার হজ্ব করার চেয়ে উত্তম।" (সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর-৩/২/১৬৭-১৬৮, কিতাবুল জিহাদ, আব্দুলাহ ইবনে মুবারক)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ نَوْمَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِيْنَ حَجَّةً تَتْلُوْهَا سَبْعُوْنِ عُمْرَةً - (كشف الاستار كتاب الجهاد باب فضل الجهاد، مشارع اشواق)

হযরত সাঈদ বিন আব্দুল আজীজ (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রাহে মুজাহিদের ঘুম ওমরাসহ সত্তর বার হজ্ব করার চেয়েও উত্তম।

عَنْ أَنَسَ بِنْ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَزْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعْدَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ حَجَّةٍ. (كشف الاستار كتاب الجهاد باب فضل الجهاد، مشارع الاشواق الى مصارع العشاق: ٢٠٦/٢١٥)

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, "ফরয হজ্ব আদায় করার পর আল্লাহ্ তা'আলার রাহে কোনো একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা এক হাজার বার হজ্ব করার চেয়ে উত্তম।" (ইবনে আসাকীর)

সুবহানাল্লাহ!

আশাকরি, এতক্ষণের আলোচনার দ্বারা হাদীসগুলোর মর্ম আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

সুতরাং প্রিয় ভাই, আমরা কি বুঝতে পেরেছি, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ কেন তার প্রিয় বন্ধুকে বলেছিলেন, "ওহে হারামাইনের আবেদ ব্যক্তি! তুমি যদি আমাদেরকে জিহাদের ময়দানে দেখতে আর আমলের গুরুত্ব বুঝতে, তাহলে তুমি বুঝতে পারতে যে, তুমি আমলের নামে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সাথে তামাশা করছ! পিচ্চি বাচ্চারা যেভাবে অনর্থক খেলা করে, তুমিও আমলের নামে ক্রীড়া-কৌতুক করছ! নিজেকে সওয়াবের আশা দেখিয়ে নিজেকে নিজেই ধোঁকা দিচ্ছ! আল্লাহকে পাওয়া আর আল্লাহ তা'আলার হুকুম বাস্তবায়ন করাটাই যদি তোমার যিন্দেগীর মাক্সাদ হত, তাহলে তো তুমি ঘরে বসে থাকতে না, কিংবা হারামাইন শরীফে অবস্থান করতে না, আমাদের সাথে জিহাদের তপ্ত ময়দানে নিজের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে, শহীদের মর্যাদা লাভ করতে, যেমনটি আমরা লাভ করছি! আমরা তো আল্লাহর ওয়াদাকে বাস্তবায়িত হতে দেখছি, তাঁর গাইবী মদদ নুসরত দেখে আমাদের

ঈমান আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, তোমাদের ঈমানও আমাদের ঈমানের মতো হতে পারবে না; না, বন্ধু! কক্ষনো হবে না, কস্মিনকালেও না!

তাই বন্ধু, আর ঘরে বসে না থেকে চলে আস জিহাদের তপ্ত ময়দানে।......"?

প্রিয় ভাই!

আমরা অনেকেই আছি, যারা প্রায় প্রতি বছরই হজ্জ বা উমরা করি, কিংবা জিহাদ ব্যতীত অন্যান্য নেক আমল/মেহনত অনেক গুরুত্বের সাথে করে থাকি। আলহামদুলিল্লাহ! ঐগুলো তো ভাই অনেক সওয়াবের কাজ এবং অনেক সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু ভাই, আমাদের তো উচিত আরো অধিক ফযীলতের আমল তালাশ করা, তাইনা? যাতে করে আমরা আরো বেশি ফযীলত লাভ করতে পারি, যাতে আমাদের নেকীর পাল্লা আরো অনেক বেশি ভারী হয়ে যায়, যাতে আমরা আরো সহজে জান্নাতে যেতে পারি, যাতে আমাদের মহা-মহীয়ান প্রভু আমাদের প্রতি আরো বেশি সন্তুষ্ট হন, যাতে আমরা তাঁর সামনে আরো বেশি নেককার, মুত্তাকী ও সত্যবাদী হিসেবে দাঁড়াতে পারি! এটা কি আমরা চাইনা?

যেই আমলের প্রতি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন, যেই আমলের প্রতি তিনি নিজের ভালোবাসার ঘোষণা দিয়েছেন, ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন, যে আমলের মাঝে কল্যাণের ফয়সালা করেছেন, যেই আমলের বিনিময়ে নিশ্চিত জান্নাতের ওয়াদা করেছেন, আমরা কি সেই আমলের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিবনা, বেশি মনোযোগী হবো না??

নবীজী ﷺ-এর যিন্দেগীর দিকে তাকিয়ে দেখি, কোন আমল/মেহনতকে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, কোন আমল/মেহনতকে তিনি সর্বাপেক্ষা সওয়াব ও ফযীলতের বর্ণনা করেছেন? কোনটিকে তিনি ইসলামের চূড়া ঘোষণা দিয়েছেন? তিনি নিজে কোন্ আমল/মেহনত সবচেয়ে বেশি করেছেন? তিনি কি ২৭ টি গাযওয়া আর ৪৬ টি সারিয়্যার নেতৃত্ব দেননি? তিনি কি তরবারির নবী ছিলেন না? তিনি কি যুদ্ধের নবী ছিলেন না? তিনি কি আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েমের জন্য রক্তাক্ত হননি? দন্ত মোবারক শহীদ করেননি?

সাহাবায়ে কেরামের যিন্দেগীর দিকে তাকিয়ে দেখি! তাঁরা কোন্ আমল/মেহনতকে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে করেছেন? তাঁরা কোন আমলের সাথে আজীবন লেগে থাকার শপথ করেছিলেন? তাঁরা কি এই শপথ করেননি-

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا

عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

মুহাম্মদের সা. হাতে করেছি শপথ জিহাদের,

পিছু হটবনা কভূ পূর্বে মউতের।

সুতরাং ভাই, আমাদের কি উচিত নয়, আমরাও সাহাবায়ে কেরামের মত জিহাদকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসব, সবচেয়ে বেশি আপন করে নিব, নিজের যিন্দেগীর আসল কাজ বানাব, এই মেহনতের সাথে আজীবন লেগে থাকার শপথ করব, জিহাদ করতে গিয়ে যত কষ্ট ও পরীক্ষা আসবে তা হাসিমুখে মেনে নিব, অবশেষে শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে প্রেমময় প্রভুর সাথে মিলিত হবো??

❖ আল্লাহ তা'আলা হুকুম করেছেন কী, আর আমরা করছি কী!!!

প্রকৃতপক্ষে, জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার পরও অন্য কোনো আমল/মেহনতে লিপ্ত থাকা, জিহাদের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ না করা- আমলের নামে "আল্লাহর হুকুমের সাথে এক রকমের হঠকারিতা (!) করার নামান্তর। শুনতে খারাপ শুনা গেলেও এটাই কিন্তু ভাই বাস্তবতা!!

ধরুন! আপনি মরুভূমি দিয়ে যাচ্ছেন, আপনি অত্যন্ত পিপাসার্ত। পিপাসায় আপনার জীবন যাওয়ার উপক্রম। আপনি আমার কাছে একটু পানি চাইছেন। আমি আপনাকে পানি না দিয়ে এক বোতল গরম তেল এগিয়ে দিয়ে বললাম, নেন ভাই পান করুন। তাহলে আপনি আমাকে কী বলবেন, দূর হন আপনি! আমি মরছি; আর আপনি আমার সাথে মশকরা করছেন! আমি চাইলাম কী, আর আপনি দিলেন কী? ঠান্ডা পানি না দিয়ে গরম তেল দিচ্ছেন আমাকে পান করতে!

প্রিয় ভাই, বলুন তো, আমার এহেন আচরণের কারণে আপনি কী আমাকে ভালোবেসে কাছে টেনে নিবেন, নাকি দূরে সরিয়ে দিবেন?

তাহলে, ঠিক একইভাবে, আল্লাহ তা'আলা জিহাদকে ফরযে আইন করেছেন, এর অর্থ হল, আল্লাহ পাক এই মুহূর্তে আমাদেরকে হুকুম করছেন বা আমাদের কাছে চাচ্ছেন, আমরা যেন এখন জিহাদের মেহনত করি। আর বিপরীতে আমরা আল্লাহর সামনে বারবার অন্য কোনো আমল বা মেহনত পেশ করছি। জিহাদ বাদ দিয়ে অন্য কোনো আমল বা মেহনতে লিপ্ত থাকার অর্থই হচ্ছে, হে আল্লাহ! তুমি যতই বল, আমি কিন্তু জিহাদ করছি না। অমুক আমল করাটা কিংবা অমুক মেহনত করাটা আমার খুব ভালো লাগে, তাই এটিই বারবার করবো।

এর চেয়েও খারাপ কথা হলো, জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় জিহাদ না করার কারণে আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে "ফরয তরককারী" সাব্যস্ত হচ্ছি, যদিও আমরা হারামাইনে বসে মক্কা-মদীনা আবাদ করে থাকি। অথচ আমরা মনে করছি, আমরা তো অনেক ইবাদত করছি, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করছি।

প্রিয় ভাই! কষ্ট নিবেন না!

যদি আমাদের এতই নেকীর দরকার হয়, তাহলে আমরা ময়দানে আসি! মা-বোনের উপর ধর্ষণ আর নির্যাতনের ষ্টীম-রোলার স্ব-চক্ষে দেখে যাই, বাপ-ভাই আর সন্তানের মর্মান্তিক খুন এসে নিজের চোখে দেখে যাই। তাদের জন্য যদি নিজের গায়ের রক্তের ফোঁটা ঝরাতে না পারি, কমপক্ষে এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করে যাই। হারামাইন শরীফাইনের ফাইভ-স্টার হোটেলগুলোতে খাবারের নামে অপচয় না করে অনাহারী, দুর্ভিক্ষপীড়িত, মযলুম মুসলমানদের মুখে এক লোকমা খাবার তুলে দিয়ে যাই। এত অর্থ সম্পদ অপচয় করে মক্কা-মদীনার এ.সির বাতাস না খেয়ে, ময়দানের উত্তপ্ত লূ হাওয়া খেয়ে যাই। তাহলে আরশের অধিপতি আমাদের প্রতি বেশি খুশি হবেন, বেশি সওয়াব দিবেন, বেশি নৈকট্য দান করবেন।

হ্যাঁ ভাই, আমরা যদি জিহাদের পাশাপাশি অন্য কোন আমল বা মেহনত করতে পারি, তাহলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি কোনো অভিযোগ থাকবে না।

প্রিয় ভাই! আমরা প্রত্যেকেই যার যার অবস্থান থেকে চিন্তা করি, আমরা আসলে নিজেদেরকে শরীয়তের অনুগামী করে নিয়েছি, নাকি শরীয়তকে আমাদের চাহিদা ও নফসের অনুগামী করে রেখেছি। বুদ্ধিমানদের জন্য এতক্ষণ যা আলোচনা করা হলো তা-ই অনেক বেশি!! আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে জিহাদের গুরুত্ব বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

স্ত্রীর প্রতি বীর মুজাহিদ আনোয়ার পাশার চিঠি

❖ *জিহাদ প্রেমের এক অনুপম নিদর্শন:*

হযরত আনোয়ার পাশা রাহিমাহুল্লাহ ঐসব বীর মুজাহিদদের অন্তর্ভূক্ত, যারা গোটা যিন্দেগী ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে ব্যয় করেছেন এবং যাদের বুকের তাজা রক্তে রচিত হয়েছে যুগে যুগে ইসলামের রক্তিম ইতিহাস। অবশেষে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতের চির অমীয় সুধা পান করেন। তিনি জিহাদের উত্তপ্ত ময়দান হতে তাঁর প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী শাহ্জাদী নাজিয়া সুলতানার নামে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন, যা পরবর্তীতে তুর্কী পত্রিকাগুলোতে প্রকাশ করা হয়েছে। আর সেখান থেকে অনুবাদ হয়ে ২২ এপ্রিল, ১৯২৩ ঈসায়ী তারিখে হিন্দুস্তানী পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়। এই চিঠিটি বিপুল আলোড়ন সৃষ্টিকারী, কালজয়ী, আবেগময় ও শিক্ষণীয়, আর আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল ﷺ ও তাঁর পথে জিহাদ করাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই চিঠিটি হতে আমাদের প্রত্যেককেই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

প্রিয় নাজিয়া!
জীবনসঙ্গিনী আমার!
জীবন পথের একমাত্র পাথেয়, আনন্দ দানকারিনী প্রিয়া আমার!

সু-উচ্চ ও সু-মহান সত্ত্বা তোমার সংরক্ষক। তোমার শেষ পত্র আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। বিশ্বাস কর, তোমার এই পত্র সর্বদা বুকে জড়িয়ে রাখব। তোমার মায়ামাখা, প্রেমভরা স্নিগ্ধ অবয়ব আমি তো আর দেখতে পারব না, কিন্তু পত্রের ছত্রে ছত্রে, পরতে পরতে, অক্ষরসমূহে তোমার আঙ্গুলসমূহের নড়াচড়ার দৃশ্য যেন আমি দেখতে পাচ্ছি, যে আঙ্গুলিগুলো আমার চুল নিয়ে মাঝে মাঝে খেলা করত। তাবুর রশিগুলোতে মাঝে মাঝে তোমার চেহারার আলোকচ্ছটা ও প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে। তোমার অবয়বের ঝিলিক সর্বদা দৃষ্টিতে অনুভব করি।

আহ্! তুমি লিখেছ, আমি তোমাকে ভুলে গিয়েছি, আর তোমার অকৃত্রিম ভালোবাসা ও প্রেমের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ আমার নেই। তুমি লিখেছ, তোমার সোহাগ ও মহব্বতপূর্ণ হৃদয়কে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে এই দূর-দূরান্তে বিধ্বস্ত রণাঙ্গনে আগুন ও রক্ত নিয়ে আমি খেলা করছি। আর আমার এদিকে খেয়াল নেই যে, একজন নারী আমার বিচ্ছেদে সারারাত তন্দ্রাহীন নয়নে জেগে জেগে ছটফট করে আর তারকারাজি গণনা করতে থাকে।

তুমি লিখেছ যে, আমার জিহাদের সাথে মহব্বত আর তরবারির সাথে প্রেম। কিন্তু কথাগুলো লেখার সময় ঘুর্ণাক্ষরেও তোমার এ কথা চিন্তায় আসেনি, তোমার এই শব্দ সম্ভার, যা তুমি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও খাঁটি মহব্বতের গীতিতে লিখেছ, তা আমার হৃদয়ের রক্ত কিভাবে ঝরাবে, কিভাবে আমাকে হত্যা করবে?

ওগো প্রিয়া! আমি কিভাবে তোমাকে বিশ্বাস করাব, এই সুন্দর বসুন্ধরায় তোমার চেয়ে সুন্দর আর প্রিয় আমার কাছে আর কিছুই নেই। তুমিই আমার সকল ভালোবাসার শেষ পরিধি! আমার মন আমি কাউকে কোনো দিন দেই নি, কাউকে কোনো দিন ভালোবাসিনি, কিন্তু কেবল তুমিই এমন, যে আমার হৃদয়কে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ। ভাগ্যলিপি থেকে আমাকে তুমিই অপহরণ করে আমাকে তোমার দাস বানিয়েছ। বল, এরপর কিভাবে তোমার থেকে পৃথক হব, হে আমার প্রাণের প্রশান্তি? তোমার এমন প্রশ্ন যথাযোগ্য।

শোন! আমি তোমার থেকে এই জন্য পৃথক হই নি যে, আমি ধন-সম্পদের অন্বেষী, লোভী ব্যক্তি। এ জন্যও পৃথক হই নি যে, আমার জন্য শাহী সিংহাসন কায়েম করছি, যেমনটি আমার শত্রু পক্ষ প্রচার করছে। আমি তোমার থেকে কেবল এই জন্য পৃথক হয়েছি যে, আল্লাহ তা'আলার ফরয বিধান আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'-র চেয়ে বড় কোনো গুরু দায়িত্ব আর নেই। এটাই এমন ফরয কাজ, যার নিয়্যত করার দ্বারাই জান্নাতুল ফিরদাউস অবধারিত হয়ে যায়।

আলহামদুলিল্লাহ! আমি কেবল এই ফরযের নিয়্যত-ই করিনি; বরং তা বাস্তবে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছি। তোমার বিচ্ছেদ আমার অন্তরে সর্বদা এমন এক করাত চালনা করে, যা অবর্ণনীয় ব্যথা সৃষ্টিকারী, তবে এই বিরহে আমি অত্যন্ত খুশি। কেননা, তোমার অকৃত্রিম প্রেম ও ভালোবাসা এমন এক অমূল্য জিনিস, যা আমার দৃঢ় ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষা ও চ্যালেঞ্জ ছিল!

আল্লাহ তা'আলার হাজার শুকরিয়া যে, আমি এই পরীক্ষায় পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হয়েছি। আর আল্লাহর মহব্বত এবং তার হুকুমকে নিজের মহব্বত ও মনের চাহিদার উপর প্রাধান্য দিতে সক্ষম হয়েছি। তোমারও সন্তুষ্ট ও রাজি থাকা এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা করা উচিত যে, তোমার স্বামী এত মজবুত ঈমান রাখেন যে, সে নিজে তোমার মহব্বতকে আল্লাহর মহব্বতের উপর কুরবানী করেছে।

তোমার উপর তরবারীর দ্বারা জিহাদ করা ফরয নয়, কিন্তু তুমিও জিহাদের হুকুম থেকে বাহিরে বা মুক্ত নও। তোমার জিহাদ হলো, তুমিও নিজের মন ও ভালোবাসার উপর আল্লাহর চাহিদা ও ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিবে। স্বীয় স্বামীর সাথে প্রকৃত মহব্বতের আত্মীয়তাকে আরো মজবুত রাখবে।

লক্ষ্য কর, কখনো এই দুআ করবে না, তোমার স্বামী জিহাদের ময়দান থেকে যে কোনো ভাবেই হোক সুস্থ ও নিরাপদে তোমার প্রেমের কোলে ফিরে আসুক। এটা হবে নিজ স্বার্থ পূরণের দুআ। আর এটা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়ও নয়। অবশ্য তুমি এমন দুআ করতে থাকো, আল্লাহ যেন তোমার স্বামীর জিহাদকে কবুল করেন, তাকে কামিয়াবীর সাথে ফিরিয়ে আনেন, অন্যথায় শাহাদাতের অমীয় সুধা তাকে পান করান। তুমি জান, আমার মুখ কখনো শরাব দ্বারা নাপাক হয়নি; বরং সর্বদা কুরআন তিলাওয়াত ও যিকির দ্বারা তরতাজা ছিল।

ওগো প্রাণের প্রিয়া!

আহ্! সেই মুহূর্ত কতই না মুবারক হবে, যখন আল্লাহর রাহে এই মস্তক, যাকে তুমি খুব সুন্দর বলতে, শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে! সেই শরীর তোমার মহব্বতের দৃষ্টিতে সিপাহীদের শরীর নয়; বরং মাশুকদের নয়নসমূহের ন্যায় কোমল। আনোয়ারের সবচেয়ে বড় আশা ও আকাঙ্ক্ষা হলো, সে শহীদ হয়ে যাবে। আর বীর শ্রেষ্ঠ হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যেন তার হাশর নাশর হয়। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। মৃত্যু তো সুনিশ্চিত। তাহলে মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার কি অর্থ হতে পারে?

যখন মৃত্যু আসবেই, তাহলে মানুষ কেন বিছানায় পড়ে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুবরণ করবে? আল্লাহর রাহে শাহাদাতের মরণ তো মরণ নয়; বরং ওটাই প্রকৃত জীবন, অবিনশ্বর জীবন।

প্রিয় নাজিয়া! আমার অসীয়ত শুনে নাও।

যদি আমি শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমার ছোট ভাই স্বীয় দেবর নূরী পাশার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিবে। তোমার পরে আমার কাছে তারই স্থান। আমি চাই যে, আমার আখিরাতমুখী সফরের পরে সে সারা জীবন বিশ্বস্ততার সাথে আস্থা ভরে তোমার খেদমত করে যাবে।

আমার দ্বিতীয় অসীয়ত এই যে, তোমার যতজন সন্তান-ই হোক না কেন, সকলকে আমার জীবনীর কথা শুনাবে। আর সকলকে জিহাদের ময়দানে ইসলাম ও দেশের খেদমতে প্রেরণ করবে। যদি তুমি এমন না কর, তাহলে স্মরণ রেখ, আমি জান্নাতে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকব।

আচ্ছা! প্রিয়া নাজিয়া! বিদায়! জানি না, আমার অন্তর বলছে, এই পত্রের পর হয়তো তোমাকে আর কোনো পত্র লিখতে পারবো না। আজব কী, হতে পারে কালকেই শহীদ হয়ে যাবো। দেখ, তুমি ধৈর্য্য ধারণ করবে। তুমি আমার শাহাদাতে দুশ্চিন্তার পরিবর্তে আনন্দিত হবে যে, আল্লাহর রাহে আমি ব্যবহৃত হওয়া তোমার জন্য গৌরবের বিষয়।

সোনা আমার! এখন বিদায় নিচ্ছি। আমার কল্পনার জগতে তোমাকে শেষবারের মতো আরেকবার আলিঙ্গন করলাম।

ইনশাআল্লাহ, জান্নাতে দেখা হবে। এর পরে আর কোনো দিন তোমার-আমার বিচ্ছেদ হবে না। ইনশাআল্লাহ।
- তোমার আনোয়ার।

তুরকানে আহবার' থেকে সংকলিত
লেখক: আব্দুল মজীদ আতীক্বি, পৃ: ১২৭-১৩০

উল্লেখ্য, হযরত আনোয়ার পাশা রাহিমাহুল্লাহ চিঠিটি লিখার ঠিক পরের দিনই শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তার শাহাদাতকে কবুল করেন, জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চ মর্তবা দান করেন। আমাদেরকেও তাঁর সাথী হিসেবে শহীদী কাফেলার অন্তর্ভূক্ত করে নেন। আমীন।

স্ত্রী-সন্তানের প্রতি আব্দুল্লাহ্ আয্যাম রাহি. এর অন্তিম চিঠি

আল কায়েদার প্রতিষ্ঠাতা হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীর মুজ্তাহিদ ইমাম এবং বিংশ শতাব্দীর জিহাদের পুনর্জাগরণের রূপকার শাইখ ড. আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ আয্যাম রাহি.।
স্ত্রী-সন্তানের প্রতি শাইখের অন্তিম চিঠি:

সুপ্রিয়া! হে মোর সহধর্মিনী!!
১৯৬৯ এর সে কষ্টকর সময়ের কথা আমার আজও মনে পড়ে। আমাদের ঘরে ছিল দু'কিশোর ও এক শিশুসন্তান, কাঁচা ইটের তৈরী ছিল আমাদের আবাসঘর। ছিল না কোনো আলাদা রান্নাঘর। তোমার উপরই ন্যস্ত করেছিলাম পুরো সংসার।
একদিন সন্তানরা বড় হল, আমাদের পরিচিতিও বৃদ্ধি পেল, অতিথিতে সরগরম হয়ে উঠল আমাদের ঘর। আর তুমি ছিলে তখন সন্তান-সম্ভবা। তোমার কষ্ট ও পরিশ্রমের অন্ত ছিল না।
কিন্তু সবকিছুই তুমি হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলে। তোমার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি, লক্ষ্য ছিল আমার সহায়তা করা। আল্লাহ তোমাকে সর্বোত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। সত্যিই আল্লাহর দয়া ও তোমার ধৈর্য না হলে আমার একার পক্ষে এ বিরাট বোঝা উঠানো সম্ভব ছিল না।

হে প্রিয়া আমার!
এ জীবনে তোমাকে দেখেছি দুনিয়াবিমুখ, পার্থিব বস্তুর প্রতি ছিল না তোমার কোনো অনুরাগ, দারিদ্র্যতার প্রতি ছিল না তোমার কোনো অভিযোগ।
আর স্বচ্ছল সময়েও দেখিনি তোমাকে বিলাসিতায় ডুবে থাকতে। দুনিয়াকে সব সময় তুমি রেখেছিলে হাতের মুঠোয়, হৃদয়ে ছিল না দুনিয়ার কোনো স্থান।
মনে রাখবে, জিহাদী জীবনই আনন্দ ও সুখের জীবন। জীবনকে বিলাসিতার গড্ডালিকা- প্রবাহে ভাসিয়ে দেয়ায় কোনো সুখ নেই। কষ্ট-ক্লেশে ধৈর্য ধারণ করা মহত্ত্বের পরিচয়।

তাই দুনিয়ার মোহ বর্জন কর, আল্লাহর ভালবাসা পাবে। মানুষের সম্পদ দেখে লোভ করো না, তারা তোমায় ভালবাসবে।

আল-কুরআন মানব জীবনের সেরা সাথী ও সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়। রাত্রির নামায, নফল রোযা ও গভীর রজনীর ইস্তিগফার অন্তরলোকে আনে স্বচ্ছতা, সৃষ্টি করে ইবাদাতের অনুরাগ এবং পুণ্যবানদের সৎসঙ্গ, স্বল্প সম্পদ, দুনিয়াদারদের থেকে দূরে থাকা এবং ভনিতা থেকে বিরত থাকলে হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভূত হয়।

হে প্রিয়া!

আল্লাহর কাছে একান্ত কামনা, জান্নাতুল ফিরদাউসে পুনঃ আমাদের মিলন হোক, যেমনিভাবে দুনিয়াতে মিলিত হয়েছিলাম আমরা দু'টি প্রাণ!

হে আমার কলিজার টুকরা সন্তান-সন্ততি!

মন ভরে কোনো দিন তোমাদের সঙ্গ দিতে পারিনি। আমার শিক্ষা ও তারবিয়াত তোমাদের ভাগ্যে কমই জুটেছে। অধিকাংশ সময় আমি তোমাদের থেকে বহু দূরে থেকেছি, কিন্তু আমি ছিলাম নিরুপায়। তোমরা জান, মুসলমানদের উপর বিপদের কালো মেঘ ছেয়ে আছে, যার গর্জনে দুগ্ধদানকারী মায়ের কোল থেকে তার দুগ্ধপোষ্য শিশু ভয়ে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে।

উম্মতের সংকটের ব্যাপকতা চিন্তা করলে কিশোর ললাটেও ভেসে উঠে বার্ধক্যের বলিরেখা। মুরগীর ন্যায় তোমাদের নিয়ে আমি খাঁচায় বাস করিনি। মুসলমানদের অন্তর বেদনায় জ্বলবে আর আমি আরামে বিশ্রাম নিব, সংসারসুখ উপভোগ করব? দুর্দশায় মুসলমানদের হৃদয় বিদীর্ণ হবে, নির্যাতনে জ্ঞান বিলুপ্ত হবে আর আমি ঘরে বসে থাকব? তা আমার পছন্দ নয়। কোনোদিন আমি কামনা করিনি বিলাসী জীবন, সুস্বাদু ভুনা গোস্ত এবং স্ত্রী সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে সংসার-সুখ উপভোগ ।

তোমাদের প্রতি আমার অসিয়াতঃ

(ক) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা আঁকড়ে থাকবে।

(খ) নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করবে ও কুরআন হিফ্জ করার চেষ্টা করবে।

(গ) জিহ্বার হিফাযত করবে, সংযত কথা বলবে।

(ঘ) নিয়মিত সালাত ও সিয়াম পালনসহ সৎসঙ্গ গ্রহণ করবে।

(ঙ) জিহাদী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে। মনে রাখবে, কোনো নেতার অধিকার নেই তোমাকে জিহাদ থেকে বিরত রাখার। অথবা "দাওয়াত ও ইরশাদের" সাথে জড়িত রেখে তোমাকে ভীরু কাপুরুষ ও জিহাদবিমুখ করার। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ব্যাপারে কারও অনুমতির অপেক্ষা করবে না। হাতে অস্ত্র তুলে নাও। ঘোড়সওয়ার হও। তবে ঘোড়-সওয়ারীর চেয়ে তীরন্দাযী আমার অধিক প্রিয়।

(চ) শরীয়াতের উপকারী ইলম অর্জন করবে।

(ছ) তোমরা সদা তোমাদের বড় ভাই মুহাম্মদকে মান্য করবে, তাকে সম্মান করবে, পরস্পর পোষণ করবে গভীর প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক ভালবাসা।

(জ) তোমরা তোমাদের দাদা-দাদীর সাথে উত্তম আচরণ করবে, তোমাদের দু'ফুফু উম্মে ফইজ ও উম্মে মুহাম্মদকে শ্রদ্ধা করবে। আল্লাহর পরে তাদের অনুগ্রহ আমার উপর অনেক।

(ঝ) আমার রক্ত সম্পর্ক বজায় রাখবে। আমার পরিবারের সাথে নেক আচরণ করবে এবং আমার বন্ধু-বান্ধবদের হক আদায় করবে।

আবার দেখা হবে বেহেশতের পুষ্পকাননে।

-আব্দুল্লাহ আযযাম।

[وصية الشهيد عبد الله عزام- رحمه الله

লিংক: https://archive.org/details/20221009_202210]

১৯৮৯ সালের ২৪ নভেম্বর, শুক্রবার জুমার সালাতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে লুকানো বোমার বিস্ফোরনে স্বীয় দুই পুত্রসহ আব্দুল্লাহ্ আয্যাম রাহি. শহীদ হন। আল্লাহ তা'আলা তার শাহাদাতকে কবুল করুন, জান্নাতুল ফিরদাউসে উঁচু মাকাম দান করুন। আমাদেরকেও তাঁর সাথী হিসেবে শহীদী কাফেলার অন্তর্ভূক্ত করে নিন। আমীন।

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾
لِّيَجْزِىَ ٱللَّهُ ٱلصَّٰدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾

"মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ (শাহাদাত লাভের) প্রতীক্ষায় আছে। আর তারা (তাদের সংকল্প) মোটেই পরিবর্তন করেনি। এটা এজন্য যেন আল্লাহ, সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার কারণে প্রতিদান দেন এবং মুনাফেকদেরকে চাইলে শাস্তি দিবেন কিংবা ক্ষমা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৩৩ সূরা আহযাব: ২৩,২৪)

****

"কিতাবুত্ তাহ্রীদ 'আলাল ক্বিতাল"

তৃতীয় পর্ব: ভালোবাসি তোমায়, হে জিহাদ!

****

****জাযাকুমুল্লাহু খাইরান****

কিতাবুত তাহরীদ: দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হওয়ার পর **"দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্ ফোরাম"** এর মুহতারাম মুজাহিদ ভাইদের রিভিউ: নির্বাচিত কিছু স্ক্রীনশট্ (পোস্ট লিংক: https://bit.ly/tahrid3)

11-26-2022, 10:25 PM #13

আল্লাহ সকল মুসলিমের মনের ইচ্ছা পূরণ করুন । খুব সুন্দর একটি পোস্ট।

12-05-2022, 11:23 AM #14

জাযাকাল্লাহু খাইরান। অনেক সুন্দর হয়েছে। আল্লাহ তাআলা লেখকের কলমে ভরপুর বারাকা দান করুন। আমাদের সবাইকে ইখলাসের সাথে বাস্তবতা বুঝে জিহাদের রাস্তায় অটল রাখুন। আমাদেরকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমীন।

12-29-2022, 03:27 PM #16

মা শা আল্লাহ্! অনেক ভালো লাগলো ভাই কিতাবটি পড়ে। আল্লাহপাক মুহতারাম মুস'আব ইলদিরিম ভাইকে কবুল করুন। আমাদের সকলকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য কবুল করুন। আল্লাহ সুব. , তাঁর রাসূল সা. এবং তাঁর রাহে জিহাদ করাকে সকল কিছুর চেয়ে বেশি ভালো বাসার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কিতাবুত্ তাহ্রীদ্ ‘আলাল ক্বিতাল

তৃতীয় পর্ব

মুস‘আব ইলদিরিম

কিতাবুত্ তাহ্‌রীদ্ ‘আলাল ক্বিতাল

পর্ব ৪:

লেখকের কথা

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ!

মুহতারাম ভাইয়েরা!

আলহামদুলিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ!!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আজ আমরা আপনাদের সামনে **"কিতাবুত তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল"**কিতাবটির **"চতুর্থ পর্ব: তোমাকেই শুধু চাই, হে শাহাদাত!"**নিয়ে হাজির হয়েছি। ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ!!!

কিতাবুত তাহরীদ, চতুর্থ পর্ব নিয়ে কিছু কথা:

ইসলামী ইতিহাসে মুহাররাম, দ্বাদশ হিজরি-তে সংঘটিত যুদ্ধটি **'শিকলের যুদ্ধ' হিসেবে খ্যাত।** এ যুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. উবুল্লার গভর্নর ও শত্রুবাহিনীর প্রধান হরমুযকে ঐতিহাসিক এই চিঠিটি প্রেরণ করেছিলেন- "হামদ ও সালাতের পর, ইসলামগ্রহণ কর, তাহলে নিরাপদ থাকবে। অথবা নিজের ও আপন কওমের জন্য নিরাপত্তা-চুক্তি করে নাও এবং জিজিয়া প্রদান কর। দুটির একটিও গ্রহণ না করলে পরিণতির জন্য নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দায়ী করতে পারবে না। কারণ, আমি এমন একদল সৈন্য নিয়ে তোমাদের উদ্দেশ্যে এসেছি, যারা মৃত্যুকে ততটাই ভালোবাসে, যতটা তোমরা ভালোবাসো জীবনকে।"

সুবহানাল্লাহ!

প্রিয় ভাই! এটি শুধু কথার কথা নয়! এটি কেবলই সামরিক কোনো থ্রেট বা ধমকি নয়! এটি একটি চরম বাস্তবতা!! প্রিয় রাসূলের ﷺ হাতে গড়া সাহাবায়ে কেরাম এবং আমাদের পূর্ববর্তী সালাফগণ মৃত্যুকে ততটাই ভালোবাসতেন যতটা কুফ্ফারদের কাছে প্রিয় ছিল- নারী এবং মদ! মৃত্যু ও শাহাদাতকে তাঁরা খোঁজে বেড়িয়েছেন জিহাদের প্রতিটি পরতে পরতে! তাঁরা শাহাদাতের জন্য এতটাই পাগলপারা ছিলেন যে, অন্য কোনো জাতির ভাগ্যে এমন মৃত্যুন্বেষী বীর ও যুদ্ধপ্রেমী মহামনীষীদের আবির্ভাব ঘটে নি। সুবহানাল্লাহ!

হায়! অপরদিকে, আমরা?? আমরা কেন মৃত্যুকে ভয় পাই? কেন আমরা মৃত্যু থেকে প্রতিনিয়ত পলায়ন করি?? আমাদের কাছে কেন মৃত্যু এক অন্ধকারময় বিভীষিকা??? মৃত্যুর কথা শুনলেই আমাদের কেমন যেন পীলে চমকে যায়??.........

প্রিয় ভাই! আমরাও কি আমাদের সালাফদের অনুসারী হতে চাই? তাদের মত মৃত্যুর জন্য পাগলপারা হতে চাই? আমরাও কি সাহাবায়ে কেরামের মত জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে বেশি ভালোবাসতে চাই? আমরা কি চাই, মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা আমাদেরকেও নারী ও মদের নেশার চেয়েও বেশি আচ্ছন্ন করে রাখুক??? আমাদের অন্তরচক্ষুর সম্মুখ হতে মৃত্যুর ভীতিকর অমানিশা দূর হয়ে 'মৃত্যুর ভয়' কেটে যাক?? আমরা কি এও চাই যে, 'শাহাদাত প্রেমিক' হয়ে আল্লাহর রাস্তায় এই মুহূর্তেই নিজের জান কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে যাই???

তাহলে, ভাই...................

আমাদের জন্যই আজকের এই কিতাব **"তোমাকেই শুধু চাই, হে শাহাদাত!"**

আসুন না ভাই, কিতাবের আদ্যোপান্ত পড়ে নেই, আর দেখে নেই, মৃত্যু প্রেমের কী কী অতুলনীয় হাকীকত অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে?? জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

-মুস'আব ইল্দিরিম

সূচিপত্র

জান্নাতের স্বপ্নিল ভুবন

চলো বন্ধু! মুমিনের প্রতিশ্রুত ঠিকানা জান্নাতের গল্প শুনা যাক।..........

জান্নাত অবশ্যই মানব কল্পনার উর্ধ্বে। তার সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। সেই সৌন্দর্যের কল্পনা মানব চিন্তা শক্তির বহু উপরে। জান্নাতের একটি খড়কুটো রাখার পরিমাণ স্থান লাভ করাও দুনিয়া ও তন্মধ্যকার সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝١٧

"কেউই জানে না তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ।" (সূরা সাজদাহ ৩২:১৭)

বন্ধুরা! হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ্ পাক বলেছেন,

أعدت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرعلى قلب بشر

"আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন সব বস্তু প্রস্তুত রেখেছি, যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, কোনো কান কোনোদিন শুনেনি, যার কল্পনা কোনো মানব হৃদয়ে কোনোদিন উদিত হয়নি।" (বুখারী খন্ড ১, পৃ.৪৬০, মুসলিম খ. ২, পৃ. ৩৭৮)

সুবহানাল্লাহ!!!

জান্নাত লাভের প্রস্তুতি গ্রহণকারী কেউ কি নেই?..................

জান্নাত তো এমন স্থান, যাতে কোনো বিপদের আশংকা নেই।

কাবার প্রভুর শপথ! জান্নাতে রয়েছে প্রদীপ্ত জ্যোতি, প্রবহমান নদী, সুরভি বিচ্ছুরণকারী ফুল, পাকা ফল ও অপরূপা, সুদর্শনা, সুন্দরী রমণী, আছে বস্ত্র-সম্ভার, সবুজ শ্যামল নকশী চাদর, চিরস্থায়ী নিবাস, শান্তিময় ও নিরাপদ আবাস, সুরম্য মযবুত অট্টালিকা, আরো কতো নিয়ামতরাজি! জান্নাতের জন্য মর্যাদার বিষয় হলো, তা পেতে হলে 'জান্নাতের একমাত্র মালিক' আল্লাহর কাছেই হাত পাততে হয়। কত মর্যাদাবান ও মহিমান্বিত সে স্থান, যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাত মুবারক দ্বারা গাছ রোপণ করেছেন এবং যা তাঁর বন্ধুদের অবস্থানস্থল হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তাঁর রহমত, দয়া, করুণা ও সন্তুষ্টি দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছেন।

প্রিয় বন্ধু! জান্নাত লাভ করা অত্যন্ত কল্যাণ ও সৌভাগ্যের বিষয়। সুতরাং যদি তোমার জীবনে কোন কিছু চাওয়া-পাওয়ার থাকে, যদি তুমি কোন কিছুর জন্য সাধনা করতে চাও, যদি তুমি কোন কিছুর জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হও, যদি কোন কিছু তোমার চিন্তা-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে, যদি কোন কিছু তোমার নিদ্রাকে বিদূরিত করে দেয়, যদি কোন কিছু তোমার কল্পনা ও স্বপ্নের জগতকে সদা-সর্বদা আন্দোলিত করে, তা যেন হয় অনন্ত-অশেষ নেয়ামতরাজির জান্নাত।

সেখানে যে একবার প্রবেশ করবে অনন্তকালের জন্য, চিরদিনের জন্য প্রবেশ করবে। তার রাজত্ব হলো বিশাল রাজত্ব। সকল প্রকার কল্যাণ ও মঙ্গল তাতে গচ্ছিত রাখা হয়েছে এবং সকল প্রকার দোষ-ক্রুটি ও বিপদ-আপদ হতে তাকে পবিত্র রাখা হয়েছে।

বন্ধু! যদি তুমি তার মাটি সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার মাটি হবে কস্তুরির ও যাফরানের।

যদি তার ছাদ সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে রাখ, তার ছাদ হবে আল্লাহর আরশ।

যদি তুমি তার বিছানা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার বিছানা হল সুবাস ছড়ানো কস্তুরি।

যদি তার পাথর কণা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তা হলো মুক্তা।

যদি তার অট্টালিকা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার একটি ইট হবে স্বর্ণের, আরেকটি ইট হবে রৌপ্যের।

যদি তার তাঁবু ও গম্বুজ সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার তাঁবু হবে ষাট মাইল দীর্ঘ ফাঁপা, মুক্তা দ্বারা নির্মিত।

যদি তার গাছ সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার প্রত্যেকটি গাছের কাণ্ড হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের, কাঠের নয়।

যদি তার ফল সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার ফল হবে মটকার ন্যায় বৃহদাকারের ও পনীর অপেক্ষা অধিক কোমল এবং অমৃত অপেক্ষা অধিক মিষ্ট।

যদি তার পাতা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার পাতা হবে সূক্ষ্ম কাপড়ের জোড়া হতেও অত্যাধিক সুন্দর।

যদি প্রবাহিত মৃদু সমীরণের ফলে বৃক্ষের পল্লব হতে সৃষ্ট সুর সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তা হবে সুমিষ্ট সুরেলা আওয়ায, যা শ্রোতাদের বিমুগ্ধ ও আবিষ্ট করবে।

যদি তার গাছের ছায়া সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, সেখানে এমন সব গাছ রয়েছে, যার ছায়ায় দ্রুতগামী আরোহী একশত বছরে ভ্রমন করেও তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না।

যদি তার নদীসমূহ সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তাতে এমন দুধের নহর রয়েছে, যার স্বাদ কখনো বিকৃত হবেনা। এছাড়াও আছে মধুর নহর। এমন খাঁটি শরাবের নহর রয়েছে, যা পানে পানকারী পরিতৃপ্ত হয়, কখনো মাতাল হয়না। ও তাতে স্বচ্ছ অমৃতের নহর রয়েছে। তুমি যখন যেদিকে ইচ্ছা তাদেরকে প্রবহমান করতে পারবে।

যদি তার খাদ্য সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তা হবে জান্নাতীদের নিজস্ব পছন্দমত ফল ও তাদের রুচিসম্মত পাখির গোশত। সেখানে তোমাকে রান্না করতে হবে না। উড়ন্ত পাখি দেখে তোমার আহারের চাহিদা হলেই তা ভুনা হয়ে তোমার সামনে উপস্থিত হবে। সেখানে তোমার মলমূত্রের ঝামেলা নেই। একটি ঢেকুর তুললেই সব হজম হয়ে যাবে।

যদি তার পানীয় সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার পানীয় হবে অমৃত সুধা, আদ্রক ও কর্পূরের।

যদি তার বাসন পত্র সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তা হবে আরশির ন্যায় স্বচ্ছ স্বর্ণ-রৌপ্যের।

যদি তার দরজার প্রশস্ততা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার দরজার দু'কপাটের মধ্যে চল্লিশ বছরের দূরত্বসম ব্যবধান থাকবে। তবে এমন একদিন আসবে, যেদিন প্রচণ্ড ভীড়ের দরুন তাকে রুদ্ধ দ্বারের ন্যায় মনে হবে।

যদি তার প্রশস্ততা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার সর্বনিম্ন স্তরের ব্যক্তির লাভকৃত স্থানের পরিধিও দশ দুনিয়ার সমান হবে এবং তা এ পরিমাণ বিশাল হবে যে, তার রাজত্ব, সিংহাসন, প্রাসাদ ও উদ্যানে দ্রুতগামী আরোহী দু'হাজার বছর ভ্রমন করেও তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না।

যদি তার উচ্চতা সম্পর্কে জানতে চাও, তাহলে আকাশের প্রান্তে উদিত বা অস্তমিত নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি দাও, যা দৃষ্টিসীমার বহু উর্ধ্বে।

যদি তার অধিবাসীদের পোশাক সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তা হবে রেশম ও স্বর্ণ দ্বারা তৈরী।

যদি তার বিছানা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার বিছানার চাদর হবে পুরু রেশমের, যা উঁচু স্থানে বিছানো থাকবে।

যদি তার খাট সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার খাট হবে রাজকীয় খাট, তার উপর স্বর্ণের বোতাম বিশিষ্ট মশারি থাকবে। যাতে কোনো ছিদ্র থাকবে না।

সেখানে তোমার চেহারা কেমন হবে যদি সে সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তোমার মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মতো। তাছাড়া সেখানে একটি বাজার আছে, সেখানে অনেক সুন্দর, সুদর্শন চেহারার ছবি থাকবে, তুমি যেমনটি চাবে তোমার চেহারা তেমনি করে দেয়া হবে।

যদি তুমি সেখানে তোমার বয়স কেমন হবে সে সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, সেখানে তুমি হবে ৩৩ বছরের তরুণ এবং তোমার অবয়ব হবে আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের অবয়বের ন্যায়।

যদি তার সঙ্গীত সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, সেখানে হূরে ঈ'ন সংগীত গাবে। ফিরিশতা ও আম্বিয়ায়ে কিরামের সুর আরো সুমিষ্ট হবে আর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে যে সম্বোধন করবেন, তা পূর্বের সবকিছু অপেক্ষা অধিক সুমিষ্ট হবে।

যদি তুমি জান্নাতীদের বাহন সম্পর্কে জানতে চাও, যার উপর আরোহণ করে তারা পরস্পরে সাক্ষাৎ করবে, তবে জেনে নাও, তা হবে অত্যন্ত উন্নত জাতের অশ্ব। যেখানে তারা চাইবে সেগুলো তাদেরকে চোখের পলকে সেখানে নিয়ে যাবে।

যদি তাদের অলংকার সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তাদের অলংকার হবে মুক্তাখচিত স্বর্ণের কংকণ আর তাদের মাথায় মুকুট থাকবে।

যদি তাদের সেবার জন্য নিয়োজিত সেবকদের সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তাদের সেবক হবে বিক্ষিপ্ত মুক্তা সদৃশ চির কিশোর।

তুমি কি জান, জান্নাতে যে বাজার থাকবে সেখানে সকল জান্নাতীরা একে অন্যের সাথে সাক্ষাত করবে, কুশল বিনিময় করবে।

কেমন হবে সেদিন, যেদিন জান্নাতে প্রিয় হাবীব ﷺ-এর সাথে দেখা হবে, সাহাবায়ে কেরামের সাথে দেখা হবে, দেখা হবে অন্যান্য নবী-রাসূলগণের সাথে?

সেদিন কেমন লাগবে, যেদিন প্রিয় হাবীব ﷺ 'ইয়া উম্মাতী!' (হে আমার উম্মত!) সম্বোধন করে বুকে টেনে নিবেন?..............

সুবহানাল্লাহ!!!

(আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর শাফায়াত নসীব করুন। আমীন।)

[সূত্র: ইমাম কায়্যিম জাওযিয়্যাহ রহ. রচিত حادي الأرواح الى بلاد الأفراح কিতাব (বঙ্গানুবাদ: 'জান্নাতের স্বপ্নিল ভুবন') হতে সংকলিত https://bit.ly/zannatee]

হুরে ঈ'নের প্রেমিকরা কোথায়?

বন্ধুরা! আপনাদেরকে এখন নিয়ে যাবো জান্নাতের পরম রোমান্টিক এক জগতে। প্রত্যেক যুবকেরই যার আশা করা উচিত এবং এর জন্য জীবন দিয়ে হলেও প্রতিযোগিতায় নেমে পড়া উচিত।

তার আগে....................

প্রথমতঃ যে সত্তা আমাদেরকে এর সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁর বড়ত্ব, মহত্ত্ব, সত্যবাদিতার ব্যাপারে চিন্তা করে দেখুন।.........

তিনি তো এমন এক সত্তা, যার স্তুতগীতি লিখতে গিয়ে সমুদ্রের কালি শেষ হয়ে গিয়েছে, তবুও তার স্তুতি-গান লিখা শেষ হয়নি। তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে আকল ও বুদ্ধি হয়রান হয়ে গিয়েছে, কোনো কূল-কিনারা পায়নি। তাঁর মাহাত্ম্য ভাবতে গিয়ে জ্ঞানীরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে, কোনো সীমাপরিসীমা পায়নি। অনন্তকাল যাবৎ যদি তাঁর প্রশংসা করা হয়, তবুও তা হবে তাঁর শানে নিতান্তই অপ্রতুল, নেহায়েত কম। সেই মহান রব্বে কারীম, জান্নাতের মালিক আল্লাহ তা'আলার চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কেউ আছে কি? তাঁর চেয়ে অধিক ওয়াদা রক্ষাকারী আর কেউ আছে কি? তাঁর সত্যবাদিতার সাক্ষ্য তিনি নিজেই দিচ্ছেন-

وَعْدَ اللَّهِ حَقاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً

"আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কে আছে আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী?" (সূরা নিসা ৪:১২২)

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

"আর কথায় আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে?" (সূরা নিসা ৪:৮৭)

وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ

"আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে?" (সূরা তাওবাহ ৯:১১১)

সুবহানাল্লাহ!!!

প্রিয় ভাই!

এমনিভাবে **দ্বিতীয়তঃ** সে সত্যবাদী সত্তার কথাও চিন্তা করুন, যাকে আমাদের নিকট এ সুসংবাদ দিয়ে প্রেরণ করেছেন।........

সবর্শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তিনি! সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী তিনি! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি তিনি! তিনিই জগদ্বাসীর জন্য সর্বশেষ আসমানী পয়গামকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর সীরাত লিখতে লিখতে কলম ক্লান্ত হয়ে

গেছে। কলম যা লিখেছে তা অত্যন্ত মুগ্ধকর। কিন্তু বাস্তবতার সমুদ্রে তা এক ফোঁটার বেশি নয়। নবীজী ﷺ-এর প্রশংসা করে ইতিহাস তাঁকে ধন্য করেনি, বরং তাঁর আলোচনায় ইতিহাস ধন্য হয়েছে।

মানুষের মাঝে সবচেয়ে উত্তম তিনি। বিভিন্ন উম্মতের মাঝে যে রাসূল প্রেরিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম; যারা ইনসাফ করেছেন; তাঁদের মধ্যেও তিনি উত্তম। কঙ্কর তাঁর পবিত্র হাতে তাসবীহ পাঠ করেছে। পাথর তাঁকে সালাম জানিয়েছে। উট তাঁর কাছে অভিযোগ করেছে। বকরি তাঁর বিচ্ছেদে কেঁদেছে। তাঁর আঙুল থেকে পানি প্রবাহিত হয়েছে। বাঘ তাঁর রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছে। তাঁর বরকতে খাবার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিষমাখা বকরির গোশত তাঁকে বিষের ব্যাপারে সতর্ক করেছে। মেঘ তাঁকে ছায়া দিয়েছে। পাখিরা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে। দোলনায় চাঁদ তাঁর সাথে খেলেছে। তাঁর আঙুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। তিনিই পৃথিবীর একমাত্র মানব যিনি এক রাতে সাত আসমান পরিভ্রমণ করেছেন, জান্নাত-জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করেছেন, পরম বন্ধু আল্লাহ তা'আলার মেহমান হয়ে আরশে আযীমে গমন করেছেন। তিনি তো সেরাদের সেরা, অভাবী ও দরিদ্রদের বন্ধু, আল্লাহ তাঁর বক্ষ উন্মুক্ত করেছেন। তাঁর আলোচনা সমুন্নত করেছেন। তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। তিনিতো নবীদের ইমাম। শ্রেষ্ঠতম দানশীল। সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী।

واكرم منك لم ترقط عينى ۔ واجمل منك لم تلد النساء
خلقت مبراً من كل عيب ۔ كأنك قد خلقت كما تشاء

"আমার চোখ কখনো আপনার মতো সম্ভ্রান্ত কাউকে দেখেনি
কোনো মা আপনার চাইতে সুন্দর কোনো সন্তান জন্ম দেয়নি
আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সব ধরণের দোষ থেকে মুক্ত করে
যেন আপনি সৃষ্টি হয়েছেন আপনারই ইচ্ছানুসারে।"

স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর মন-মস্তিষ্কের প্রশংসা করেছেন-

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى

"তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি।" (৫৩ সূরা নাজম:২)

তার যবানের সত্যবাদিতার প্রশংসা করেছেন-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى

"তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না।" (৫৩ সূরা নজম:৩)

তাঁর অন্তরের সত্যবাদিতার প্রশংসা করেছেন-

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأٰى

"রাসূল যা দেখেছেন সে ব্যাপারে তাঁর অন্তর মিথ্যা বলেনি।" (৫৩ সূরা নজম: ১১)

তাঁর দৃষ্টির সত্যবাদিতার প্রশংসা করেছেন-

مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغٰى

"তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং সীমালঙ্ঘনও করেনি।" (৫৩ সূরা নজম: ১৭)

তাঁর বক্ষের প্রশংসা করেছেন-

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

"আমি কি আপনার সিনাকে প্রশস্ত করে দেই নি?" (৯৪ সূরা ইনশিরাহ:১)

তাঁর সবকিছুরই প্রশংসা করেছেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

"নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।" (৬৮ সূরা কলম: ৪)

রাসূল ﷺ-এর মাঝে সমাবেশ ঘটেছিল সব নবী-রাসূলের গুণাবলি।

তাঁর সবকিছু ছিল সর্বোত্তম এবং তাঁর সাথে সম্পর্কিত সবকিছুই সর্বোত্তম।

তিনিই হচ্ছেন দু'জাহানের সরদার। সাইয়্যেদুল কাউনাইন। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব আল-হাশেমী ﷺ। আমাদের প্রাণপ্রিয় নবীজী ﷺ। তাঁর শানে লাখো কোটি দরূদ ও সালাম।

তাঁর জন্য আমাদের জীবন, আমাদের পিতা-মাতা, আমাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি- দুনিয়ার সকল কিছু কুরবান হোক!!!

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে যে বস্তুর সংবাদ দিয়েছেন তার পরিমাণের ব্যাপারেও চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ তা'আলা সামান্য বস্তুর বিনিময়েই আমাদের জন্য এ মহান নিয়ামত লাভের ব্যবস্থা করেছেন। কে আছে তাঁর নেয়ামতসমূহ গণনা করবে? কে আছে তাঁর দয়া ও উদারতা পরিমাপ করবে?

চতুর্থতঃ আরো একটু চিন্তা করুন! জান্নাত ও তার নেয়ামতরাজির এই সুসংবাদ কোথায় দেয়া হয়েছে? কুরআন কারীমে। আর কুরআন কারীমের সত্যতার উপর কারো কোনো সন্দেহ থাকতে পারে কি?

আল-কুরআন: মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ

যেই চ্যালেঞ্জ মানবজাতিকে ছুড়ে দেয়া হয়েছিল ১৪০০ বছর পূর্বে-

قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

"(হে মুহাম্মাদ) বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে মানবকুল ও জ্বীন জাতি সমবেত হয় পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতায়, তবুও তারা তা সম্ভব করতে পারবে না।" (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল :৮৮)

قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

"বল, আমার প্রভুর বাণীসমূহ লিখার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবুও আমার প্রভুর বাণীসমূহ শেষ হওয়ার পূর্বে সমুদ্র শেষ হয়ে যাবে, যদিও অনুরূপ আরো অন্যান্য সমুদ্রকে সাহায্যের জন্য আনয়ন করা হয়।" (১৮ সূরা কাহাফ: ১০৯)

وَلَوْ أَنَّمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَٰمٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমদ্র যুক্ত হয়ে যদি কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (৩১ সূরা লোকমান: ২৭)

যদি কুরআনের অনুরূপ একটি কিতাব আনয়ন করতে না পার, তবে চ্যালেঞ্জকে তোমাদের জন্য সহজ করে দেয়া হল-

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَٰتٍ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٣﴾

"(হে মুহাম্মাদ!) তারা কী বলে? এ কুরআন তুমি রচনা করেছ? তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ্ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে।" (১১ সূরা হূদ:১৩)

তাও যদি না পার, তবে আরো সহজ করে দেয়া হল-

وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ وَلَن تَفْعَلُوا۟ فَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٤﴾

"২৩. এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার (মুহাম্মাদ ﷺ) প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও- এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকে। ২৪. আর যদি তা না পার- অবশ্য তা তোমরা কখনোও পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।" (০২ সূরা বাকারা :২৩-২৪)

এ তো এক উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ! এতে না আছে কোন অস্পষ্টতা আর না আছে কোন বক্রতা! কে আছে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবে? কে আছে কোরআনের এ বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে? জ্বীন-ইনসানের কেউ কি পেরেছে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে? কেয়ামত পর্যন্ত কেউ কি পারবে? পারবে কি কুরআনের সবচেয়ে ছোট্ট সূরার সমপরিমান তিনটি আয়াত রচনা করতে?

কুরআন কারীমের উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ: আসমান যমীনের এমন কে আছে, যে এই ছোট্ট তিনটি আয়াতের অনুরূপ তিনটি বাক্য রচনা করে নিয়ে আসতে পারে?

কোথায় বে-দ্বীনরা? কোথায় হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-আর ইহুদীরা? কোথায় তাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা, কোথায় বাতিল রবেরা? কোথায় রাম-রাজত্বের স্বপ্নদ্রষ্টারা? কোথায় নাস্তিক-মুরতাদ আর ইসলাম বিদ্বেষীরা? কোথায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দুশমনরা? কেন তারা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে না???

কোরআন তো অহর্নিশি তাদেরকে আহ্বান করেই যাচ্ছে? কেন তাদের নীরবতা? কেন তারা কোরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করে না? কেন তারা নিজেদেরকে সত্যবাদী প্রমাণ করে না? কোথায় সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা? কোথায় তাদের সুপার কম্পিউটারগুলো? কোথায় সারা বিশ্বের কবি-সাহিত্যিকরা? কোথায় বুদ্ধিজীবীরা? কোথায় চেতনার ফেরিওয়ালারা? তাদের বুদ্ধি কি আজ অকেজো প্রমাণিত হয়নি? তাদের জ্ঞান কি আজ ভোঁতা হয়ে যায়নি? পেরেছে কি তারা কুরআন কারীমের চ্যালেঞ্জের সামনে টিকতে?

তাহলে, কেন তারা এ কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না? কেন তারা ঈমান আনছে না? জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে না? তারা কি দেখে না, নাকি তাদের অন্তরসমূহ তালাবদ্ধ হয়ে গেছে?.........

প্রকৃতপক্ষে, একমাত্র সেই এই কুরআনকে অস্বীকার করতে পারে যে একগুঁয়ে, গোয়ার ও হঠকারী; যে জেনে-শুনে সত্যকে অস্বীকার করে, অহংকারী ও যে আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত; উপরন্তু যে মানসিক বৈকল্য ও কলুষতার অধিকারী।

হুরে ঈ'ন এর বর্ণনা

বন্ধুরা! পূর্বের আলোচনায় ফিরে যাওয়া যাক!

আসমানী এই কিতাবে, আমাদের সত্য প্রভুর সত্য কিতাবে মুমিনদের জন্য রব্বে কারীমের সুসংবাদ শুন-

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا۟ هَٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَٰبِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٥﴾

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদেরকে ফলমূল খেতে দেয়া হবে, তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকা রূপে যা দেওয়া হতো এ তো তাই; তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেয়া হবে। সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী থাকবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।" (সূরা বাকারা ২:২৫)

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾

"মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে। তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই ঘটবে; আমি তাদেরকে সঙ্গিনী দান করব আয়তলোচনা হূর।" (সূরা দুখান ৪৪:৫১-৫৪)

فِيهِنَّ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴿٥٧﴾ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾

"(জান্নাতের নেয়ামতরাজির মধ্যে) রয়েছে বহু আনত নয়না হুর, যাদেরকে পূর্বে কোনো মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে। প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ।" (সূরা আর রহমান ৫৫: ৫৬-৫৮)

وَحُورٌ عِينٌ ۝ كَأَمْثَـٰلِ ٱللُّؤْلُوِ ٱلْمَكْنُونِ ۝

"তথায় (জান্নাতে) থাকবে আনতনয়না হুরগণ, আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়।" (সূরা ওয়াকিয়াহ ৫৬: ২২-২৩)

وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ۝ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ۝

"তাদের কাছে থাকবে নত, আয়তলোচনা তরুণীগণ। যেন তারা সুরক্ষিত ডিম।" (সূরা আস্সাফ্ফাত ৩৭:৪৮-৪৯)

فِيهِنَّ خَيْرَٰتٌ حِسَانٌ ۝........ حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ فِى ٱلْخِيَامِ ۝

"সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ।...তাবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ।" (সূরা আর রহমান ৫৫: ৭০,৭২)

إِنَّآ أَنشَأْنَـٰهُنَّ إِنشَآءً ۝ فَجَعَلْنَـٰهُنَّ أَبْكَارًا ۝ عُرُبًا أَتْرَابًا ۝

"আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী। কামিনী, সমবয়স্কা।" (সূরা ওয়াকিয়াহ ৫৬: ৩৫-৩৭)

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝ حَدَآئِقَ وَأَعْنَـٰبًا ۝ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۝

"পরহেযগারদের জন্য রয়েছে সাফল্য, উদ্যান, আঙ্গুর; স্ফীত বক্ষ বিশিষ্ট, পূর্ণযৌবনা তরুণী।" (সূরা নাবা ৭৮: ৩১-৩২)

يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ۝ خِتَـٰمُهُۥ مِسْكٌ ۚ وَفِى إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ۝ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ۝ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ۝ ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَـٰفِسُونَ ۝

"নিশ্চয় নেককাররাই থাকবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে। সুসজ্জিত আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে। তুমি তাদের চেহারাসমূহে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লাবণ্যতা দেখতে পাবে। তাদেরকে সীলমোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় থেকে পান করানো হবে। তার মোহর হবে মিসক। আর প্রতিযোগিতাকারীদের উচিৎ এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা।" (সূরাতুল মুত্বাফ্ফিফীন ৮৩: ২২-২৬)

তাহলে, চল বন্ধু! কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াত, অসংখ্য হাদীস এর উদ্ধৃতি হতে হূরের যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায়, সেগুলো নিয়ে এখন আলোচনা করা যাক-

বন্ধু! তুমি কি হূরে ঈ'ন সম্পর্কে জানতে চাও?

- "হুরে ঈ'ন" বলা হয় সেই সকল সমবয়স্কা জান্নাতী স্ত্রীদের, যারা হবে সুন্দরী, রূপবতী, শুভ্র মুখাবয়ব বিশিষ্টা, কাজল কালো ডাগর ডাগর চক্ষুওয়ালা, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা মুমিন পুরুষদের জন্য যাফরান দ্বারা বিশেষভাবে জান্নাতের অভ্যন্তরেই সৃষ্টি করেছেন।
- জান্নাতে তাদের সাথে তোমাকে বিবাহ দেয়া হবে, যাদেরকে দেখলে দৃষ্টি স্তম্ভিত হয়ে পড়ে, যার মুখমণ্ডলের আলোক, ঔজ্জ্বল্য ও বিভার দরুন তাদের চেহারার প্রতি (পার্থিব চক্ষু দ্বারা) দৃষ্টি দেওয়া যাবে না। যাদের চোখের সাদা অংশ পূর্ণরূপে সাদা এবং কালো অংশ পূর্ণরূপে কালো থাকবে। তাদের স্বচ্ছতা হবে শঙ্খের খোলসে অবস্থিত মুক্তার মত, যাকে কেউ স্পর্শ করেনি। তাদের শরীরের বর্ণ হবে পদ্মরাগ মণি ও প্রবাল সাদৃশ্য।

- তুমি যখন ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় তাদের চেহারার দিকে দৃষ্টি দিবে দেখবে তাদের মুখ আয়না হতেও অধিক স্বচ্ছ। তাদের শরীরে যেসব অলংকার থাকবে তার ভিতর সবচেয়ে কম মানের রত্নটিও পূর্ব পশ্চিম আলোকিত করতে সক্ষম।
- তাদের গায়ের সত্তর জোড়া রেশমী পোশাকের অভ্যন্তর হতেও তাদের পায়ের গোড়ালির মজ্জা পরিলক্ষিত হবে।
- তারা হবে গোলাকৃতির ফুলে উঠা, স্ফীত বক্ষবিশিষ্ট তরুনী, তাদের স্তন পুষ্ট আনারের ন্যায় উদ্ভিন্ন থাকবে, নিজের দিকে ঝুলন্ত থাকবে না।
- তাদের কোমল ত্বক ও রূপ-লাবণ্যের দরুন দৃষ্টি মুগ্ধ ও আবিষ্ট হয়ে পড়বে। তুমি যখন তাদের দিকে তাকাবে তখন তাদের হৃদয়ে তোমার আপন ছবিই দেখতে পাবে, যেমনিভাবে আয়নায় দেখতে পাও। তুমি তার গণ্ডদেশে তাকালে তাতে নিজ মুখমণ্ডল আয়নার চেয়েও পরিষ্কার দেখতে পাবে।
- জান্নাতী নারীরা হবে ডিমের খোসার নিচে যে পাতলা পর্দা থাকে সেই পর্দার মত কমল ও নমনীয়।
- তারা হবে উত্তম গুণাবলিসম্পন্না, উন্নত চরিত্রওয়ালী, সুশীলা এবং কমনীয়া নারী, যারা একমাত্র তোমার দিকেই আপন দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখবে। তারা তাদের হৃদয়ের মনিকোঠায় একমাত্র তোমার জন্য আসন নির্ধারিত করে রাখবে, তোমার জন্যই সংরক্ষিতা থাকবে, তারা তোমাকে ছাড়া অন্য কারো প্রত্যাশা করবে না এবং তুমি ব্যতিত অন্য কারো প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না।
- তারা যখন এক প্রাসাদ হতে আরেক প্রাসাদে স্থানান্তরিত হবে, তখন মনে হবে, এক রবি আকাশের কক্ষপথে স্থানান্তরিত হচ্ছে।
- যদি কোনো জান্নাতী হূর পৃথিবীর দিকে ঝুঁকে দেখত কিংবা আকাশের নিচে তার হাত প্রসারিত করতো, তবে সমগ্র দুনিয়া সুগন্ধিতে সুরভিত হয়ে যেত, সমগ্র পৃথিবী আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যেত এবং সকল মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলত। সূর্য তার আভার সামনে ঠিক তেমনি মনে হতো যেমনিভাবে সূর্যের কিরণের সামনে চেরাগ/কুপিবাতি হয়। তার মাথায় ব্যবহৃত ওড়না দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল বস্তু হতে উত্তম।
- জান্নাতের হুর যদি সাত সমুদ্রেও একবার থুথু নিক্ষেপ করে, তবে তার মুখের মধুরতায় সমগ্র সমুদ্রের পানি মিষ্ট হয়ে যাবে।
- জান্নাতে এক প্রলম্বিত আলোকরশ্মি উদ্ভাসিত হলে জান্নাতীগণ মাথা উঠিয়ে দেখবে, তখন অনুসন্ধান করে তারা জানতে পারবে, এ হচ্ছে সে হূরের দাঁতের আলোকরশ্মি, যে আপন স্বামীর সাথে হাসছে।
- মহান আল্লাহ তা'আলা জান্নাতুল আদন তৈরি করার পর সাইয়্যিদুল মালায়িকা হযরত জিবরাঈল আ.-কে ডেকে বললেন, আমি আমার বান্দাদের জন্য যেসব নেয়ামত সৃষ্টি করেছি সেগুলো একবার দেখে এস। তখন তিনি মহন আল্লাহর নির্দেশে সমস্ত বেহেশতের বিভিন্ন স্থান ঘুরে ফিরে দেখছিলেন। এরইমধ্যে হঠাৎ এক স্বর্গীয় অপ্সরী তাঁকে দেখে হেসে ওঠে। তার পরিচ্ছন্ন দন্তপাটির ঝলকানিতে সমগ্র জান্নাতুল আদন আলোকিত হয়ে গেল। তার এই ঈষৎ মুচকি হাসির দরুন পরিপাটি দন্তের দ্যুতিতে হযরত জিবরাঈল আ. আল্লাহর নূর মনে করে তাৎক্ষণিক এ ধারণা করে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন যে, এটি হয়ত মহান আল্লাহর (তাজাল্লি) নূর।

  পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে হূরটি উচ্চঃস্বরে বলল, হে আমিনুল্লাহ (জিবরাঈল আ.)! মাথা উত্তোলন করে দেখুন। অতঃপর তিনি মাথা উত্তোলন করে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, সুবহানাল্লাহ! অর্থাৎ যিনি তোমাকে এরূপ

অপরূপা সৌন্দর্যমণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন আমি সে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। জান্নাতী হূর পুনরায় বলল, আমিনুল্লাহ (আল্লাহর বিশ্বস্ত জিবরাঈল আ.!) আপনি জানেন কি, আল্লাহ তা'আলা আমাকে কার জন্য সৃষ্টি করেছেন? তদুত্তরে জিবরাঈল বললেন, না। অতঃপর সে হূরটি বলল, আমাকে সে ব্যক্তির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে নিজের যাবতীয় ইচ্ছা ও কামনা-বাসনার ওপর আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়। (দাকায়েকুল হাকায়েক-ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী রহ.)

- হূরে 'ঈনদেরকে জীন ও মানুষের কেউ কখনো ইতোপূর্বে সম্ভোগ করেনি।
- তারা মুক্তামালার তাঁবুতে অবস্থান করবে। তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন তাঁবু থাকবে। প্রত্যেক তাঁবুর চারটি দরজা থাকবে। প্রত্যহ প্রত্যেক দরযা দিয়ে ফিরিশতাগণ এমন সব উপহার ও সম্মাননা নিয়ে প্রবেশ করবে যা সে ইতোপূর্বে লাভ করেনি।

বলতো বন্ধু! একটি মেয়েকে কখন বেশি সুন্দর লাগে?

জান্নাতের হুরদের মাঝে সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা শতভাগ বিদ্যমান থাকবে। যেমন:

ক. নারীদের চারটি অঙ্গের সংকীর্ণতা পছন্দনীয়: মুখ, নাকের ছিদ্র, কানের ছিদ্র ও লজ্জাস্থান।

খ. আর চারটি অঙ্গের প্রশস্ততা পছন্দনীয়: মুখমণ্ডল, বক্ষস্থল, উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থল ও কপাল।

গ. আর চারটি অঙ্গের শুভ্রতা পছন্দনীয়: বর্ণ, মাথার সিঁথি, দন্ত এবং চোখের সাদা অংশ অত্যন্ত সাদা হওয়া।

ঘ. আর চারটি অঙ্গের কৃষ্ণতা পছন্দনীয়: চোখের কালো অংশ অত্যন্ত কালো হওয়া, চোখের ভ্রু, চোখের পলক ও চুল।

ঙ. আর চারটি অঙ্গের দীর্ঘতা পছন্দীয়: দেহের উচ্চতা, ঘাড়ের দীর্ঘতা, চুলের দীর্ঘতা এবং আঙ্গুলের দীর্ঘতা।

চ. আর চারটি অঙ্গের ন্যূনতা অর্থাৎ ছোট হওয়া পছন্দীয় (এটা বাহ্যিকতার দিক থেকে নয়, বরং তাৎপযর্তার দিক হতে): যবান (স্বল্পভাষী হওয়া), হাত (স্বামীর অপছন্দীয় বস্তু না স্পর্শ করা), পা (ঘর হতে বাহির না হওয়া/পর্দা করা) ও চোখ (কোনো কিছুর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি না দেয়া/ অল্পেতুষ্টি)।

ছ. আর চারটি অঙ্গের ক্ষীণতা (চিকন হওয়া) পছন্দনীয়: কোমর, মাথার সিঁথি, ভ্রু এবং নাসিকা।

বলতো বন্ধু! সৌন্দর্যের এই পূর্ণতা পৃথিবীর কোনো নারীর মাঝে পাওয়া যাবে কি? সুতরাং এই সৌন্দর্য কোনো পার্থিব নারীর মাঝে তালাশ করা নিরর্থক ও বোকামী নয় কি?

বন্ধু, তুমি কি জান, হূরে ঈ'নগণ হবে সকল অপবিত্রতা হতে মুক্ত?

- সে সকল রমণীরা কখনো অস্থির ও চিন্তাক্লিষ্ট হবে না। (যেন তুমি তাদেরকে দেখে চিন্তা ক্লিষ্ট ও অস্থির না হয়ে পড়ে।) তাদের দীর্ঘ কথা বিরক্তিকর হবেনা, তুমি তাদের কথা সংক্ষিপ্ত করতে বলবেনা। বরং এমন স্বাদ ও তৃপ্তিময় কথা, গীত-সংগীত তুমি শুধু শুনতেই চাইবে। তাদের শরীর কখনো দুর্গন্ধযুক্ত হবে না এবং তাদের মুখ হতেও দুর্গন্ধ বের হবে না। তারা মাসিক ঋতুস্রাব, প্রসূতি পরবর্তী রক্তস্রাব, প্রস্রাব-পায়খানা, নাকের শ্লেষ্মা, থুথু ইত্যাদি সকল প্রকার ময়লা থেকে পবিত্র হবে এবং যাবতীয় মেয়েলী দোষ-ত্রুটি, কুস্বভাবসমূহ থেকে মুক্ত হবে। তাদের বীর্য স্খলিত হবে না, মযীও বের হবে না। তারা সন্তানও জন্ম দিবে না। এক কথায় তারা হবে অনিন্দ্য সুন্দরী ও গুণবতী জান্নাতী স্ত্রী। তাদের পোশাক কখনো মলিন হবে না, তাদের রূপ-লাবণ্য কখনো হ্রাস পাবেনা।

তাদের রূপে জান্নাতের প্রাসাদসমূহও আলোকোজ্জ্বল হয়ে যাবে। তাদের রূপ-সৌন্দর্য কখনো মলীন বা ম্লান হবে না, বরং উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

বন্ধু! তুমি কি হূরে ঈ'ন অপেক্ষা সুন্দরী হূর চাও?

- জান্নাতে লূ'বা নামের কিছু হূর রয়েছে, যাদের সৌন্দর্যতা ও কমনীয়তা দেখে জান্নাতের অন্য সকল হূর বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে। তার রূপসৌন্দর্য নিয়ে অন্যান্য জান্নাতবাসী গৌরব করে থাকে। যদি জান্নাতবাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার এমন ফয়সালা না হত যে, তারা কখনো মৃত্যুবরণ করবে না, তবে তার সৌন্দর্যের ঔজ্জ্বল্য সহ্য করতে না পেরে অন্যরা মৃত্যুমুখে পতিত হতো।
- তাছাড়া হূরে মার্জিয়া নামের আরেক ধরনের অনিন্দ্য সুন্দরী হুর রয়েছে।

বন্ধু! হূরে ঈ'নগণতো আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছে....

হূর জান্নাতের দ্বারে স্বীয় স্বামীদের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং বলবে, বহুকাল অতিবাহিত হয়ে গেল আমরা তোমার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলাম। আমরা সর্বদাই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকব, কখনো অসন্তুষ্ট হবো না। এবং সর্বদা এখানে অবস্থান করবো, কখনো এখান হতে অন্য কোথায়ও যাবো না এবং আমরা চিরকাল থাকব, কখনো মৃত্যুবরণ করবো না। তোমরা যত প্রকার স্বর শুনেছ তাদের স্বর তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা মিষ্ট হবে। সে বলবে, তুমি আমার প্রিয় আর আমি তোমার প্রেয়সী।

তুমি কি জান্নাতী রমণীদের গান-বাদ্য ও নৃত্য উপভোগ করতে চাও না?

- দুনিয়ার যেসব নারীরা জান্নাতে যাবে, তাদের মযার্দা ও সৌন্দর্য হবে জান্নাতের হুরদের চেয়ে বেশি। যেমনিভাবে আবরণী বস্ত্র অপেক্ষা আবরণীর বস্তুগুলো উত্তম। কেননা, দুনিয়াতে তারা নামায, রোযা, পর্দা, স্বামীর খেদমত করেছে, আপন গর্ভে স্বামীর সন্তানকে ধারণ করেছে, প্রসব বেদনা সহ্য করেছে, সন্তান পরিচর্যা ও পরিবারের জন্য মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কষ্ট ভোগ করেছে, স্বামী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য বের হলে ধৈর্য ধারণ করেছে। জান্নাতে তাদের শরীরের বর্ণ হবে শুভ্র, রেশমী পোশাক হবে সবুজ, অলংকার হবে হলদে, সুগন্ধিময় ধোঁয়া নির্গত হবে (কাঠের পরিবর্তে) মুক্তা হতে এবং তাদের কাঁকন হবে স্বর্ণের। তারা এবং অন্যান্য হূরেরা গাইতে থাকবে-

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيْدُ
وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ
وَنَحْنُ الرَّاضِيَاُت فَلَا نَسْخَطُ
طُوْبٰى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ

"আমরা চিরস্থায়ী; আমরা মৃত্যুবরণ করবো না।
আমরা ঐশ্বর্যশালী; আমরা কখনো দুরবস্থা ও দুঃখ দুদর্শার শিকার হবো না।
আমরা সদা অবস্থান কারিনী; কখনো আমরা স্থানান্তরিত হবো না।
আমরা সদা উৎফুল্ল ও সন্তুষ্ট থাকব, কখনো বিমর্ষ ও অসন্তুষ্ট হবো না।
সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যার জন্য আমরা হবো আর যে হবে আমাদের জন্যে।" (তিরমিযী)

- জান্নাতে একটি দীর্ঘ নদী রয়েছে, যার উভয় পার্শ্বে কুমারী মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকবে। তারা সুরেলা কণ্ঠে গীত গাইবে। মানুষ যখন শুনবে, তারা তখন তাতে এমন স্বাদ ও তৃপ্তি পাবে, যা তারা জান্নাতের অন্য কোনো বস্তুতে পায়নি।

হূরে ঈ'নদের সাথে মিলনের মুহূর্তটি কেমন হবে বলতো বন্ধু?

- তারা হবে স্বামী সোহাগিনী, সহবাসের সময় স্বামীর সামনে উত্তম ভঙ্গিতে শয়নকারিনী ও নম্রতা প্রদর্শনকারিনী। প্রত্যেক স্ত্রীর যোনি হবে অত্যন্ত কামোত্তেজনাপূর্ণ। তারা হবে স্বামীর প্রতি আসক্ত, অনুরক্ত, আদরিনী, চিত্তমুগ্ধকারিনী, মিষ্টভাষী, সাজ-সজ্জাকারিনী, তারা হবে মনমোহিনী, অত্যন্ত কামোদ্দীপ্ত ও কামিনী। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যৌনরস ধাবমান থাকবে। যখন সে আলিঙ্গন করবে তখন সে দৃশ্য কতই না চমৎকার হবে; যখন সে চুম্বন করবে, তখন তাদের কাছে সে চুম্বন অপেক্ষা তৃপ্তিদায়ক ও উপভোগ্য আর কিছুই হবে না।
- জান্নাতী ব্যক্তির অন্যতম মধুরতম প্রত্যাশা হবে সে সকল রমণীদের মিলন। তারা কুমারী হুরদের সাথে স্ত্রী-সহবাস করবে এবং ধাক্কা দেওয়ার ন্যায় লাফিয়ে লাফিয়ে, পশ্চাতে সরে সরে পূর্ণ শক্তিতে সহবাস করবে। সে ব্যক্তি যখন হূরের নিকট হতে চলে আসবে তখন সে হূর পূর্বের ন্যায় পবিত্র ও কুমারী হয়ে যাবে। জান্নাতী পুরুষরা এমন পুরুষাঙ্গ দ্বারা সহবাস করবে যাতে কোনো প্রকার নিস্তেজভাব থাকবে না এবং ক্লান্তি আসবে না এবং কামভাব এমন হবে যা কখনো দমে যাবে না, শেষ হবে না। স্বামী ও স্ত্রী কারোরই বীর্যপাত হবে না। ফলে তাদের গোসল ও পবিত্রতার প্রয়োজন হবে না। কামোত্তেজনা তাদের শরীরে সত্তর বছর পর্যন্ত ঘূর্ণন করবে এবং এর দ্বারা সে তৃপ্তি উপভোগ করবে। একেকজন হূরের সাথে সে সত্তর বছর শয়ন করে থাকবে ও সঙ্গম উপভোগ করবে। সঙ্গম তার একমাত্র স্বাদ ও তৃপ্তি লাভের জন্যই হবে। এটি এমন এক নিয়ামত, যাতে কখনো বিপদ আসবে না। আল্লাহ পাক এই নেয়ামত তার জন্যই রেখেছেন যে মানুষের মধ্যে সফলকাম এবং পুণ্যবান, যে এ পার্থিব জগতে নিজেকে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে, নিচের চোখের হেফাযত করবে, গুনাহ করবে না, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যা হালাল করেছে তা নিয়ে সে সন্তুষ্ট থাকবে।
- প্রত্যেক পুরুষকে একশজন পুরুষের যৌনশক্তি দেয়া হবে, তার পুরুষাঙ্গ নিস্তেজহীন অবিরাম শক্তিধর হবে। ফলে একজন জান্নাতী দিনে কমপক্ষে একশতবার কুমারী সহবাস করতে পারবে। প্রতিবার সহবাসের পর পরই স্ত্রীর যোনি কুমারীর ন্যায় হয়ে যাবে।

তুমি কতজন হূর চাও বন্ধু?

- প্রত্যেক জান্নাতীকে দুই থেকে বাহাত্তর বা তদোর্ধ্ব সংখ্যক হুর দেয়া হবে। এদের মধ্যে দুই জন হবেন দুনিয়ার স্ত্রীলোক, বাকীরা হবেন জান্নাতী হুর। এক হাদীসে এসেছে, প্রত্যেক জান্নাতী চার হাজার কুমারী, আট হাজার বিধবা ও এক শত হূরে-ঈ'ন বিবাহ করবে। (সুব্হানাল্লাহ্)
- একটি মেঘমালা জান্নাতীদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে এবং জান্নাতীদের লক্ষ্য করে বলবে, তোমরা কে কোন্ বস্তুর বৃষ্টি চাও? তখন তারা যে বস্তুর বৃষ্টি প্রত্যাশা করবে সে বস্তুর বৃষ্টিই বর্ষিত হবে। তখন অনেক জান্নাতী মেঘমালাকে সুদর্শনা, সুসজ্জিতা, কমনীয়া কুমারী বর্ষণ করতে বলবে।
- জান্নাতে 'বাইদাখ' নামক এক নদী আছে। তার উপরে পদ্মরাগমণির গম্বুজ রয়েছে এবং তার তলদেশের মৃত্তিকা হতে হূর সৃষ্টি করা হয়। জান্নাতীগণ বলবে, আমাদেরকে বাইদাখ নদীর কাছে নিয়ে চল। তখন তারা সেখানে

এসে সে সকল কুমারীর প্রতি অত্যন্ত গভীর দৃষ্টি দিবে। তাদের কারো সে কুমারীদের কাউকে পছন্দ হলে তার হাতের কব্জি স্পর্শ করলেই তার পেছনে পেছনে চলে আসবে।

[সূত্র: ইমাম কায়্যিম জাওযিয়্যাহ রহ. রচিত حادي الأرواح الى بلاد الأفراح কিতাব (বঙ্গানুবাদ: 'জান্নাতের স্বপ্নিল ভুবন') হতে সংকলিত। লিংক- https://bit.ly/hadiarwah]

(বি.দ্র: যারা হুরে ঈ'নের বর্ণনা আরো বিস্তৃতভাবে দলীলভিত্তিক পেতে চান, তারা নিচের কিতাবটি পড়তে পারেন, ইনশাআল্লাহ- "কারা জান্নাতী কুমারীদেরকে ভালোবাসে?"- ড. আব্দুল্লাহ আয্যাম রাহি.

লিংক ০১- https://bit.ly/hoor2)

কোথায় আমার মুসলিম যুবক ভাইয়েরা???

'মুসলিম যুবশক্তি' ইসলামের একটি বড় শক্তি, বিশাল বাহুবল। মুসলিম যুবসমাজ যতদিন আল্লাহ তা'আলাকে চিনেছে, দুনিয়াকে চিনেছে, জীবন- মৃত্যুর হাকীকত অনুধাবন করেছে, আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্টি করতে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে হূরে ঈ'নের আশেক হয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, নিজের বুকের তাজা রক্ত আল্লাহর রাহে ঢেলে দিয়েছে, ততোদিন পর্যন্ত ইসলাম পৃথিবীতে কর্তৃত্ব করেছে। মুসলমানদের দিকে কেউ কখনো চোখ তুলে তাকাতে সাহস পায়নি। বাতিল বারবার হতাশ হয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছে। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল, একজন মুসলিম নারীকে উত্যক্ত করার ফলাফল দাঁড়াবে, লাখো মুহাম্মাদ বিন কাসিমের আবির্ভাব!!! একজন মুসলিমের দিকে চোখ তুলে তাকাবার জবাবে কুফ্ফারের চোখ উপড়িয়ে ফেলা হবে! একজন মুসলিমকে কটুক্তি করার জবাবে ওদের সবকটি দাঁত উপড়ে ফেলা হবে!

ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান একজন মুসলিম নওজোয়ান বাতিলের কাছে পারমানবিক বোমার চেয়েও ভয়ানক; কেননা সে মৃত্যুকে ভালোবাসে, সে শাহাদাত পিয়াসী, সে আল্লাহর রাস্তায় জীবন দেয়াকে তদপেক্ষা ভালোবাসে যতটা ভালোবাসা একজন কাফের কোন এক রমনী কিংবা মদপানকে ভালোবাসে।

একটি পারমানবিক বোমা হয়ত একটি মাত্র শহর হিরোশিমাকে ধ্বংস করতে পারে, কিন্তু একটি সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে পারে না। অথচ একজন আব্দুল্লাহ আয্যামের (রহ.) অভ্যুদয়, রাশিয়া নামক সুপার পাওয়ারের ধ্বংসের কারণ হতে পারে!

একটি পারমানবিক বোমা হয়ত কেবল নাগাসাকিকে ধ্বংস করতে পারে, কিন্তু একটি সভ্যতাকে ধ্বংস করতে পারে না। অথচ একজন মাত্র ওসামা বিন লাদেনের (রহ.) আবির্ভাব, আমেরিকা নামক বিশ্ব মোড়লের পতনের উসীলা হতে পারে!!

একই ভাবে, একটি পারমানবিক বোমা কখনোই একসাথে একটি দেশের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করতে পারে না, কিন্তু একজন সালাহ উদ্দিন আউয়ুবীর (রহ.) দ্বারা আল্লাহ পাক গোটা ইউরোপের সমন্বিত ক্রুসেডার শক্তিকে ধ্বংস

করেছেন, একজন মাত্র সাইফুদ্দিন কুত্য (রহ.) দ্বারা অপরাজেয় শক্তি তাতারীদের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন, বাতিলের অহংকারকে চিরদিনের জন্য দাফন করে দিয়েছেন !!!

এই হল মুসলিম উম্মাহর যৌবনের শক্তি! এই হল মুসলিম উম্মাহর একজন যুবকের ঈমানী শক্তি!! এই হল মুসলিম তারুণ্যের নেতৃত্বের শক্তি!!!

কিন্তু হায়! আজ মুসলিম যুবকরা কোথায়? আজ কোথায় মুহাম্মাদ আল ফাতিহ্ আর মুহাম্মাদ বিন কাসিম?? কোথায় তারিক বিন যিয়াদ আর ইউসুফ বিন তাশফিন??

কোথায় আমার মুসলিম যুবক ভাইয়েরা?? তারা আজ কোথায় হারিয়ে গেলো? তাদের ঈমানী চেতনা আজ কোথায়? কোন্ জিনিস তাদেরকে গলা টিপে হত্যা করেছে? কোন্ জিনিস তাদেরকে নারীর চেয়েও কাপুরুষ বানিয়ে ফেলেছে? কোন্ জিনিসের পিছনে সে তার জীবন, যৌবন আর মূল্যবান সময় ও অর্থ নষ্ট করছে? কোন্ জিনিসের কারণে সে আজ শাহাদাতের পরিবর্তে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে? কোন্ জিনিস তাকে কূপমুণ্ডুক আর অপদার্থ বানিয়ে কুফ্ফারদের মানসিক দাসে পরিণত করেছে?

কেন সে রব্বে কারীমের ইবাদত বাদ দিয়ে খেলাধুলা আর গান-বাজনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত? কেন আজ মুসলিম যুবকরা মাদকের নেশায় বুদ হয়ে পড়ে থাকে? কেন সে সারারাত জেগে মোবাইলে নিমগ্ন থাকে? ফেইসবুক, ব্লু-ফিল্ম আর পর্ণগ্রাফী দেখে? কোন্ জিনিসের কারণে জান্নাতী হূরদের চিন্তা ছেড়ে পশ্চিমা নাপাক নগ্ন নারীদের দেখে তৃপ্তি লাভ করছে? কিসের কারণে তারা প্রেম ও ভালোবাসার নামে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে যাচ্ছে? কেন তারা নিজের ঘরে স্ত্রী রেখে পরকীয়া প্রেমে লিপ্ত হচ্ছে? কিসের কারণে তারা আজ অসীম নিয়ামতের জান্নাত থেকে দূরে সরে গিয়ে জাহান্নামের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে???

কারণ একটাই। নারীর ফেতনা!

বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের কর্তৃত্ব ধ্বংস করতে ত্বগুতী শক্তি সুকৌশলে সর্বপ্রথম যে হাতিয়ার গ্রহণ করে তা আর কিছুই নয়, এই "নারীর ফেতনা"! ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়া এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে। তাই আজ সময় এসেছে, মুসলমান যুবকদেরকে দুনিয়ার গান্ধা-পঁচা পশ্চিমা পতিতাদের হাত হতে উদ্ধার করে চিরস্থায়ী জান্নাতী হূরদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার।

হে মুসলিম যুবক ভাইয়েরা! না, তোমরা এমন কাজ করো না, যার কারণে তোমাদেরকে জান্নাতী হূরদের হারাতে হয়। তারা আমাদের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে আর আমরা নাকি..............!!!!

প্রিয় ভাই আমার!

আল্লাহকে ভয় কর! আল্লাহকে ভয় কর!! আল্লাহকে ভয় কর!!!

আল্লাহর কসম, কুরআন সত্য, কুরআনের প্রতিটি আয়াত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, হূর সত্য, হূরের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে? আল্লাহর চেয়ে অধিক ওয়াদা পালনকারী আর কে? আল্লাহর রাসূলের চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে? কুরআনের চেয়ে অধিক সত্য বাণী আর কী আছে?

তাই স্মার্ট-ফোন ছাড়, কুরআন ধর, বাতিলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর, শাহাদাতের অমীয় সুধা পান কর। তোমার জন্যে, হ্যাঁ, শুধু তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছে হূরে ঈ'ন, হূরে লু'বা, হূরে মার্জিয়া! তোমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে জান্নাতের দ্বারে অপেক্ষমান রয়েছে তারা! তাই আর চোখের গুনাহ নয়, মনের অশ্লীল কল্পনা নয়, যৌনাঙ্গের হেফাযত করে চলো সবাই শাহাদাতের তামান্না নিয়ে ময়দানে।

লিল্লাহি তাকবীর! আল্লাহু আকবার!

জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত

বন্ধু! তুমি কি জান, জান্নাতের সবচেয়ে বড় ও মহান নিয়ামতটি কি? সবচেয়ে উপভোগ্য ও আনন্দের বিষয়টি কি? হ্যাঁ, সেটি হলো আমাদের মহান প্রভু আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দীদার (দর্শন)। জান্নাত প্রত্যাশীদের এটিই চূড়ান্ত লক্ষ্য। জান্নাত প্রত্যাশাকারীদের এটিই প্রত্যাশা করা উচিত। অগ্রগামীদের এরই প্রতি অগ্রগামী হওয়া উচিত। আমলকারীদের এ উদ্দেশ্যেই আমল করা চাই। মহান প্রভুর দীদারের আনন্দ ও মজার সামনে জান্নাতের অপরাপর নিয়ামতের কোনো তুলনাই চলে না। এ নিআমত থেকে বঞ্চিত হওয়াই জাহান্নামীদের সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি। জান্নাতীরা এ নিআমত লাভ করার পর জান্নাতের অন্য সকল নিআমতের কথা বিলকুল ভুলেই যাবে। সুব্হানাল্লাহি আল্লাহু আকবার!!!

که گر آفتاب است یک ذره نیست
وگر هفت دریاست یک قطره نیست
چو سلطان عزت علم بر کشد
جهان سر به جیب عدم درکشد

"যখন সূর্য উদিত হয়, তখন এক কণা (ছোট প্রদীপের) কোন দাম থাকে না;

আর যখন সমুদ্র থাকে তখন এক ফোটা পানির দিকে দৃষ্টি দেয়া হয় না। যখন সম্মান ও ইয়্যতের বাদশাহ (আল্লাহ তা'আলা) প্রকাশিত হন,

তখন সারা বিশ্বজাহান বিলীন হয়ে যায়।"

(বোস্তা-শেখ সাদী রহঃ)

বন্ধু! একটু চিন্তা কর তো, সেদিন কার দীদার হবে?

সেদিন দীদার হবে, আমাদের রব, আমাদের মালিক, বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, আমাদের রিযিকদাতা, বিধানদাতা, আমাদের মহান প্রভু, আল্লাহ তা'আলার। তিনিই প্রেমময়, অনন্ত, অসীম সৌন্দর্য ও গুণের অধিকারী, সর্বশক্তিমান আল্লাহ। যার এক হুকুমে আসমান যমীন সৃষ্টি হয়েছে, যিনিই প্রথম, যিনিই শেষ, যিনি আমার হায়াত দাতা, তিনিই আমার মওত দাতা; যিনি আমাকে প্রথমবার শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন সর্বোত্তম সুরতে, পুনরায় মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত করবেন। তিনি আমাকে মহাদৌলত ঈমান দিয়েছেন, ইসলাম দিয়েছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কুরআন দিয়েছেন, আর বানিয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত; আমাদেরকে বানিয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত- জান্নাতুল

ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী। আমার জীবন, আমার মরণ, আমার নামায, আমার কুরবানী- সব কিছুই তার জন্য নিবেদিত।

সেদিন তাঁর দীদার হবে, যিনি আমাদের মাওলা। যার মাওলা আছে তার তো সব আছে। আমার তো মালিক আছে, অভিভাবক আছে; অশ্রু ফেলার জায়গা আছে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্র আছে।

তিনি তো এমন একজন, যাঁকে নিবেদন করা যায় সর্বোচ্চ ভক্তি, মনের সবটুকু ভালোবাসা ও চ‚ড়ান্ত আনুগত্য। সুখে-দুঃখে যাঁকে সর্বাবস্থায় ডাকা যায়, যাঁর নাম দিবানিশি জপা যায়, যাকে সিজদা করা যায়, যাঁর জন্য জীবনের বাজি লাগানো যায়; অশ্রু ও ঘাম, রক্ত ও প্রাণ বিসর্জন দেয়া যায়। যাকে পাবার জন্য কামান আর বোমার সামনে বুক টান করে দাঁড়ানো যায়।

এমন মাওলা যার আছে তার তো সব আছে। আর যার নেই- হায়! তার তো কিছুই নেই। তার তো জীবনজুড়ে এক সর্বব্যাপী শূন্যতার হাহাকার! সে কোথায় যাবে? কার কাছে যাবে? কী করবে? কেন করবে? কেন তার জীবন? আর কেনই বা মৃত্যু? জীবনের অথৈ সাগরে তার অবলম্বনহীন যাত্রা!

সেদিন তাঁর দীদার হবে, দুনিয়াতে যিনি আমার পরম সাথী, যিনি এক মুহূর্তের জন্যও আমা হতে পৃথক হন না, আমাকে কখনো ভুলে যান না, আমার গ্রীবাস্থিত ধমনীরও যিনি আমার নিকটবর্তী; মৃত্যুর পর কবরে যিনি আমার একমাত্র সাথী, হাশরের কঠিন মুসিবতে যিনি আমার একমাত্র ভরসা, পুলসিরাত পেরিয়ে যে জান্নাতে যেতে চাই তার একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও মালিক; মহান আরশের অধিপতি আমাদের আল্লাহ তা'আলা।

দুনিয়াতে যতদিন বেঁচে আছি, তিনিই আমার সবচেয়ে পরম বন্ধু; কেননা সুখে-দুঃখে আমি তাঁকেই কাছে পাই। তাঁর কাছেই আমার মনের আকুতি জানাই। কে আছে আমার আনন্দ ও গৌরব পরিমাপ করে? আমি তো 'ছুরাইয়া' তারকাকেও ভেদ করে উঠে যেতে চাই! ওগো আল্লাহ! তুমি যে ডেকেছ "ইয়া 'আব্দী" (হে আমার বান্দা!) বলে! আর আমিও যে ডাকতে পারি "ইয়া রাব্বী" (ওগো আমার রব!)!

আমার মতো তৃপ্তি কার আছে এ ধরার বুকে! কে আছে আমার মতো এতো সুখী! সুখে-সংকটে যার অনুভব জুড়ে তিনি, যার অন্তরে তাঁর সান্নিধ্যের অনুভূতি, তার মতো নির্ভার এই পৃথিবীতে আর কে আছে?

প্রিয় বন্ধু! সেদিন কেমন হবে, যেদিন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীরা! তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে দর্শন দিবেন, সুতরাং তোমরা তার দর্শন লাভে এসো। তারা বলবে, আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। তারা ক্ষিপ্রগতিতে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের জন্য প্রস্তুত হবে। তারা অত্যন্ত দ্রুত গতিসম্পন্ন ঘোড়ায় চড়ে 'আফীহ' প্রান্তরে পৌঁছবে আর সেখানেই তারা সকলে সমবেত হবে। আল্লাহ তা'আলা তখন কুরসী রাখার নির্দেশ দিবেন। তা তখন সেখানে রাখা হবে। জান্নাতীদের জন্য সেখানে নূরের মুক্তার পোখরাজ ও স্বর্ণের মিম্বর স্থাপন করা হবে। সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী ব্যক্তিও সেদিন কস্তুরির টিলায় বসবে। সে অন্যদেরকে নিজের তুলনায় অধিক নেআমত লাভকারী মনে করবে না; স্বস্তির সাথে বসবে।

তারা সে হালতে থাকা অবস্থায়ই একটি নূর প্রলম্বিত হতে দেখবে। তখন তারা মাথা উঠিয়ে দেখবে, আল্লাহ তা'আলা উপর থেকে জান্নাতীদেরকে ঝুঁকে দেখছেন (তাঁর শান মোতাবেক)। সুব্হানাল্লাহি আল্লাহু আকবার!!

এরপর বলবেন, হে জান্নাতীরা! তোমাদের প্রতি শান্তি! জান্নাতীরাও এমন ভাষায় জবাব দিবে, যার চেয়ে সুন্দর আর জবাব হতে পারে না-

اللهم انت السلام و منك السلام- تباركت ذا الجلال والإكرام

"হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, শান্তি আপনার পক্ষ হতেই। হে মহৎ ও মহান! তোমার সত্তা কতইনা মহান।"

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বড়ত্বের পর্দা সরিয়ে তাদের সামনে হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় দৃশ্যমান হবেন। আজ হলো ইয়াওমুল মাযীদ (অতিরিক্ত প্রতিদান প্রাপ্তির দিন)। সেদিন আল্লাহ তা'আলার নূর জান্নাতীদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। যদি তাদেরকে ভস্মীভূত না করার ফয়সালা হত, তবে সকলে ভস্মীভূত হয়ে যেত। আহ্! সেদিন কী শ্রুতিমধুর বাক্যালাপ ও মধুময় আলোচনা হবে আমার রবের সাথে! মহান প্রভুর দীদার আর তাঁর সাথে কথোপকথনে তনু-মনে সে কী আলোড়ন সৃষ্টি হবে! আফসোস সে সকল লোকদের জন্য, যারা লাঞ্ছনাময় ক্ষতিগ্রস্ততার সওদা নিয়ে প্রভু মহানের দরবারে উপস্থিত হবে।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾

"সেদিন কিছু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর কিছু মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে পড়বে, আশংকা করবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে।" (সূরা কিয়ামাহ: ২২-২৫)

এসো হে বন্ধু! এসো তুমি চিরস্থায়ী উদ্যানে, এটাই তোমার উত্তম গন্তব্য, তাতে রয়েছে তোমার প্রভুর দীদার আর তাঁবুতে অপেক্ষমান সুরক্ষিতা হূর। কিন্তু আমরা তো হলাম শত্রুর বন্দিশালায় আবদ্ধ, তবে কি তুমি মনে কর, আমরা শয়তানের কারাগার হতে মুক্ত হয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবো?

কবে হবে মিলন আমাদের প্রিয়তমদের সাথে? কিছু হতাশা!!!

কঠিন এক প্রশ্ন করেছ বন্ধু!!

এটি তো কারো কারো জন্য বহু দূরের এবং কঠিন বিষয় হবে! কেননা, মৃত্যু থেকে শুরু করে জান্নাত পর্যন্ত অনেক স্তর পার হতে হবে আর প্রতিটি স্তরেই একদিন, দুই দিন নয়, হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর পর হতে পুনরুত্থান পর্যন্ত দীর্ঘ সময় বরযখে থাকতে হবে। এরপর হাশরের ময়দানে হাজার হাজার বছর অতিবাহিত করতে হবে। অতঃপর পুলসিরাত পার হতে কত সময় লাগবে তাও তার আমলের উপর নির্ভর করবে! এরপর হয় জান্নাত, না হয় জাহান্নাম। যদি গোনাহের কারণে জাহান্নামে যেতে হয়, সেখান হতে মুক্তি যে কবে মিলবে তা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। এরপর যদি মুক্তি মিলে তাহলে জান্নাতে যাওয়া হবে, হূরে ঈ'নদের দেখা মিলবে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ হবে, আর জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত রব্বে কারীম আল্লাহ তা'আলার দীদার নসীব হবে। তাই না??

প্রিয় ভাই, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, জান্নাতে যেতে কার কতদিন লাগবে তা ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হবে। কার জন্য কতদিন লাগবে সেটা আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন। তবে কুরআন হাদীসের স্বাভাবিক আলোচনা থেকে যেমনটি বুঝে আসে, তেমন কিছু আলোচনা তুলে ধরা হল। বাকী, আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বজ্ঞাত।

বরযখে আমাদেরকে কতদিন থাকতে হবে?

ইসরাফীল (আঃ) এর প্রথম শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার মাধ্যমে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। কোন মানুষতো দূরে থাক আসমান জমিনও থাকবে না, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। এভাবে চলবে ৪০ বছর। সেই হিসেবে কিয়ামতের আগে মৃত্যুবরণ কারী ব্যক্তি কমপক্ষে ৪০ বছর কবরে থাকবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ :أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ :أَبَيْتُ، قَالَ :ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، لَيْسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى، إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

হযরত আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, দুই ফুৎকারের মাঝে বিরতিকাল চল্লিশ। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু হুরায়রা! চল্লিশ দিন? তিনি বললেন, আমি সন্দিহান। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, চল্লিশ মাস? তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমি সন্দিগ্ধ। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, আমি সন্দিহান। কোনটাই নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না'। তারপর আসমান থেকে বৃষ্টিপাত হবে পরক্ষণেই মানুষ যমিন ভেদ করে এভাবে উঠতে থাকবে যেরূপ উদ্ভিদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তিনি আরো বলেন, সাধারণ মানুষের মাঝে এমন কোন মানুষ নেই পঁচে বিনষ্ট হবে না। সবই মিশে যাবে কেবল একটা হাড় যা নিতম্বের প্রান্তে থাকে, তা মিশে যাবে না। কিয়ামতের দিন তা থেকে মানুষের বাকি অংশগুলো জোড়া হবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৪৯৩৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৯৫৫)

وقد روي ابن المبارك عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين النفختين أربعون سنة- الأولى: يميت الله تعالى بها كل حي. والأخرى: يحيى الله بها كل ميت

ইবনুল মুবরাক রহঃ বর্ণনা করেন, "হাসান বসরী রহঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, দুই ফুৎকারের মাঝে বিরতিকাল হল চল্লিশ বছর। প্রথম ফুৎকারের সময় আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জীবিতকে মৃত্যু দান করবেন। আর দ্বিতীয় ফুৎকারের সময় প্রতিটি মৃতকে জীবন দান করবেন।

আল্লামা হালীমী বলেন বর্ণনাগুলো এ বিষয়ে ঐক্যমত্ব যে, দুই ফুৎকারের মাঝে সময়সীমা হল চল্লিশ বছর। (আততাযকিরাহ লিলকুরতুবী-১৬৫)

কিন্তু, এ চল্লিশ বছর হবে আখিরাতের চল্লিশ বছর, দুনিয়ার নয়। আর আখিরাতের এক দিন সার্বক্ষণিকভাবে দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হওয়ার পক্ষে কুরআন ও হাদীসে কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন: পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥٓ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝٥

'তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন, অতঃপর তা তাঁর কাছে পৌঁছবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান।' (৩২ সুরা সাজদা: ৫)।

আরও বর্ণিত হয়েছে,

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝٤٧

'অবিশ্বাসীরা আপনাকে আজাব ত্বরান্বিত করতে বলে। অথচ আল্লাহ কখনও তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। তোমার প্রভুর কাছে এক দিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান।' (সূরা হজ্ব ২২: ৪৭)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ نِصْفِ يَوْمٍ"

আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেন, 'দরিদ্র মুসলমানরা ধনীদের থেকে অর্ধেক দিন অর্থাৎ ৫০০ বছর আগে জান্নাতে যাবে।' (তিরমিজি : ২৩৫৩)

আয়াত ও হাদিস থেকে বুঝে আসে, 'পৃথিবীতে আমাদের হিসাবে এক হাজার বছর সমান পরকালের এক দিন।' (তাফসিরে ইবনে কাসির : সুরা হজ ৪৭ আয়াতের তাফসির)

সুতরাং বুঝা যায়, কেয়ামতের পর থেকে হাশর কায়েম হওয়া পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ হাজার বছর মানুষ কবরের অন্ধকার জগতে অতিবাহিত করবে। (এই বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।)

হাশরের ময়দানে আমাদেরকে কতদিন অবস্থান করতে হবে?

প্রিয় ভাই! হাশরের ময়দানে আমাদেরকে দুনিয়ার বছর অনুপাতে পঞ্চাশ হাজার বছর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

"ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ তা'আলার দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন এক দিনে, যার পরিমাণ (তোমাদের গণনায়) পঞ্চাশ হাজার বছর।" (সূরা মা'আরিজ-৪)

(এহইয়াউ উলুমিদ্দীন খন্ড ৫, পৃ: ৩২৮, https://bit.ly/ehya5 ; মরণের আগে ও পরে -ইমাম গায্যালী রহ. পৃ. ২১০ লিংক: https://bit.ly/moron13 ; মাওলানা আশেক ইলাহী বুলন্দশহরী লিখিত "মরণের পরে কী হবে?" পৃ.-৯৮)

পুলসিরাত পার হতে আমাদের কতদিন সময় লাগবে?

পুলসিরাত পার হতে কার কতদিন সময় লাগবে সেটি তার ঈমান ও আমলের উপর নির্ভরশীল হবে। পুলসিরাতটি হবে জাহান্নামের উপর। নেককারগণ এক নিমিষে তা পার হয়ে যাবেন। কিছু ব্যক্তি বিদ্যুৎ গতিতে তা অতিক্রম করবেন। কিছু ব্যক্তি বাতাসের গতিতে অতিক্রম করবেন। কিছু ব্যক্তি পাখির উড়ার গতিতে অতিক্রম করবে। কিছু ব্যক্তি উত্তম ঘোড়ার দৌঁড়ের গতিতে অতিক্রম হবে। কেউবা হেটে, কেউবা দৌঁড়ে, কেউবা হোঁচট খেতে খেতে। কেউবা বুক দিয়ে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে। প্রতিটি ব্যক্তি তার ঈমান ও আমল হিসেবে পুলটি অতিক্রম করবে। আর জাহান্নামীরা পুলসিরাতের তীক্ষ্ণ শলাকায় ফেঁসে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (নাউযুবিল্লাহ্)

এখন চিন্তার বিষয় হল-

হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন ফযীলত অর্জন ব্যতীত মৃত্যুবরণকারীর জন্য বরযখের যিন্দেগীটা অনেক দীর্ঘ ও কষ্টকর হবে। হায়! তাহলে আমার কী হবে? আমি বরযখে কতকাল থাকব? হাশরে পঞ্চাশ হাজার বছর আমাকে অবস্থান করতে হবে, আর পুলসিরাত পার হতে আমার যে কত সময় লেগে যাবে!! আল্লাহ্ না করুন, আল্লাহ্ না করুন, যদি আমার কোনো গুনাহের দরুন জাহান্নামে যেতে হয়, তাহলে সেখানে যে কত বছর জাহান্নামে থাকতে হবে? (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিক!) এর পর জান্নাত মিললেও তা কতকাল পর মিলবে???

আহ্! কেম্নে কী? এত দীর্ঘ সময় পর প্রিয়তমদের সাথে সাক্ষাৎ মিলবে, তা কিভাবে মানা যায়? মন যে আর মানছে না? মন যে তাদের সাথে মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে! কিভাবে এতকাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব? শুধুই কি

সময়ের দীর্ঘতা, আবার প্রতিটি স্তরেই রয়েছে ভয়াবহ সব বিপদ আর মুসীবত! এতো বিপদাপদ পেরিয়ে প্রিয়তমদের সাথে সাক্ষাৎ লাভ কি আদৌ সম্ভব হবে আমার পক্ষে???

মৃত্যুর ভয়াবহতা/মৃত্যু কষ্ট, কবরের ভয়াবহতা/কবরের আযাব, হাশরের ময়দানের বিভীষিকা ও দীর্ঘতা, পুলসিরাতের ভয়াবহতা, সবশেষে যে পরিমাণ গুনাহ করেছি জীবনে (যেখানে একটি কবীরা গুনাহ্‌ই জাহান্নামে নেয়ার জন্য যথেষ্ট সেখানে) আমার গুনাহের তো কোন হিসেবই নেই; গুনাহের দিকে তাকালে জাহান্নামের আগুন ছাড়াতো কিছুই চোখে পড়েনা; এত বিশাল, ভয়াল আর বিপদসঙ্কুল রাস্তা পেরিয়ে প্রিয়তমদের সাথে সাক্ষাৎ!!! সেটা আমার দ্বারা কিভাবে সম্ভব??

আহ! আমার মালিকের সামনে, জান্নাতের অধিপতির সামনে কত নাফরমানী করেছি, তাঁর দেয়া নেয়ামতের (চোখ, কান ইত্যাদির) কত যে খেয়ানত করেছি, কিভাবে আমি আশা করব যে আমি সবচেয়ে বড় জান্নাত, জান্নাতুল ফেরদৌসের অধিকারী হব? কিভাবে আমি হূরদের স্বামী হব? কিভাবে আমি আমার প্রতিপালকের প্রতিবেশী হব? কিভাবে আমি তাঁর সামনে দাঁড়াব? কিভাবে আমি তাঁর দীদারে আমার দু'চক্ষু শীতল করব? কিভাবে??

আহ্! আরো গভীরভাবে চিন্তা করলে তো আমার সামনে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখি না!

হায়! আমার সামনে আছে মৃত্যু!! মৃত্যু একটি ভয়াবহ মসীবতের নাম। মৃত্যুর কষ্ট (সাকরাতুল মাওত) তো অবশ্যই আসবে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺমৃত্যু-যন্ত্রনা হইতে পানাহ চাইতেন। কেমন হবে একজন মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণা? তা হবে তরবারির তিনশত আঘাতের যন্ত্রনার সমতুল্য। যদি জীবন্ত কোন মোরগকে চামড়া খসিয়ে পা বেঁধে তপ্ত কড়াই এর মধ্যে ভাজা হয়, আর সে উড়ে পালাতে পারছে না, প্রাণও বাহির হচ্ছে না যে, যন্ত্রণার হাত হতে অব্যাহতি পেতে পারে, মৃত্যুর কষ্টও ঠিক তদ্রুপ, বরং তার চেয়েও ভয়াবহ। আহ্! কিভাবে আমি মৃত্যুর কষ্ট সহ্য করব!!!

মৃত্যুর পর আমাকে অন্ধকার কবরে রাখা হবে! কবরের আযাব অবশ্যই সত্য, কোনো সন্দেহ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই নামায পড়তেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট কবরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

কবরে পৌঁছার সাথে সাথে প্রথম বিপদ হলো কবরে তিনটি প্রশ্ন করার জন্য মুনকার নাকীর ফেরেশতার আগমন। উক্ত ফেরেশতাদ্বয় হবেন ভীষণাকৃতির, তাদের আওয়ায হবে শত বজ্রকঠোর, ভয়ঙ্কর, চোখ দুটি হবে বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় ভীষণোজ্জ্বল। তাদের ঘন কালো ও রুক্ষ চুল মাটি পর্যন্ত আলুলায়িত, লম্বা লম্বা তীক্ষ্ণধার দাঁত দ্বারা কবরের মাটি ওলট-পালট করতে করতে আগমন করে হাত দ্বারা নাড়াচাড়া করে আমাকে নানা প্রশ্ন করবে। আমি কি সেদিন তাদের প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক দিতে পারব?

কবরের দ্বিতীয় বিপদ হলো, মৃত ব্যক্তিকে কবরের মাটি চাপ; আর চাপ এমন হবে যে, এক দিকের পাঁজরের হাড় অন্যদিকের পাঁজরের হাড়ের মাঝে ঢুকে যাবে। হায়! আমাকে যদি এমন চাপ দেয়া হয় তাহলে এই ব্যথা আমি সইব কিভাবে!!!

এছাড়াও গোনাহগারদের শাস্তি দেয়ার জন্য কবরে নিয়োজিত থাকবে নিরানব্বইটি অজগর সাপ। কিয়ামত পর্যন্ত এরা তাকে দংশন করতে থাকবে। সেগুলো এতই বিষাক্ত যে, তাদের একটিও যদি একবার পৃথিবীর দিকে ফোঁস করে, তাহলে তার বিষক্রিয়ায় পৃথিবীতে আর একটি ঘাসও জন্মাবে না। গুণাহগার ব্যক্তির নীচে আগুনের বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবে, আগুনের তৈরি পোশাক পরিয়ে দেয়া হবে এবং দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হবে। এর মাধ্যমে দোযখের তাপ এবং প্রচণ্ড উত্তপ্ত বায়ু তার কবরে আসতে থাকবে। তাছাড়া কবরবাসীদের শাস্তির জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতা নিয়োজিত করে দেয়া হবে (যেন যাকে শাস্তি দেয়া হবে তার চিৎকার ও আর্তনাদ

শুনে, তার অবস্থা দেখে ফেরেশতার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক না হয়)। তার হাতে লোহার গুর্য বা মুগুর থাকবে, যদি তা দ্বারা কোনো পাহাড়ে আঘাত করা হয়, পাহাড়টি মুহূর্তের মাঝে মাটির সাথে মিশে যাবে। ফিরিশতা একবার সেই মুগুর দ্বারা লোকটিকে আঘাত করলে লোকটি মাটির সাথে মিশে যাবে, যার আওয়ায মানুষ ছাড়া সকল মাখলূক শুনতে পাবে। এরপর পুনরায় তাকে পূর্বের ন্যায় জীবিত করে দেয়া হবে। হায়! এগুলোর কোন একটি দ্বারা যদি আমি গ্রেপ্তার হই, তাহলে আমার অবস্থা কী হবে!!!

এরপর যেদিন কেয়ামত হবে, যেদিন আমি পুনরুত্থিত হব, সেদিন আমি কী অবস্থায় পুনর্জীবিত হব??? আল্লাহ তা'আলা যে বলেছেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ ۝١ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَـٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَـٰرَىٰ وَلَـٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ۝٢

"হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। সেদিন তোমরা দেখবে প্রত্যেক দুগ্ধদানকারী মাতা তার স্তন্যপায়ী শিশুকে ভুলে যাবে এবং গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। মানুষকে দেখবে মাতালের ন্যায়; আসলে তারা মাতাল নয়। বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠিন।" (২২ সূরা হজ্জ: ১-২)

فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ۝٧

যখন দৃষ্টি চমকে যাবে, (সূরা ক্বিয়ামাহ্ ৭৫:৭)

يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَٰنَ شِيبًا ۝١٧ ....

সেদিনের ভয়াবহতা কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করে দিবে, (সূরা মুয্যাম্মিল ৭৩:১৭)

......مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً

তারা কেবল একটি ভয়ংকর শব্দের অপেক্ষা করছে.....(সূরা ইয়াসীন ৩৬:৪৯),

....فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ

যেদিন শিঙায় ফুৎকার দেয়া হবে....., (সূরা হাক্কাহ্ ৬৯:১৩)

(ফলে ভয়ংকর শব্দ হবে-)

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۝١٥

সেদিন কেয়ামত সংগঠিত হবে- (সূরা হাক্কাহ্ ৬৯:১৫)

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ۝١ وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ ۝٢

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে (মাথার উপর আকাশ ঘুরতে ঘুরতে ফেটে পড়বে) এবং নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে। (সূরা ইনফিত্বার ৮২:১-২)

وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ۝٨ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۝٩

যেদিন চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। (সূরা কিয়ামাহ ৭৫:৭-৮)

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۝٢

যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, নক্ষত্রসমূহ যখন মলীন হয়ে যাবে। (সূরা তাকভীর ৮১:১-২)

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١

যখন পৃথিবী প্রচণ্ড কম্পনে প্রকম্পিত হবে, (সূরা যিলযাল ৯৯:১)

وَأَخرَجَتِ الأَرضُ أَثقالَها

আর যমিন তার বোঝা বের করে দিবে, (সূরা যিলযাল ৯৯:২)

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝٤

সেদিন যমিন তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, (সূরা যিলযাল ৯৯:৪)

يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۝١٤

যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতমালা হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তূপ। (সূরা মুয্যাম্মিল ৭৩:১৪)

وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ۝٥

পাহাড়গুলো হয়ে যাবে ধুনিত রঙ্গীন পশমের মতো। (সূরাতুল ক্বারিয়াহ ১০১:৫)

وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦

যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে দেয়া হবে, (সূরা তাকভীর ৮১:৬, সূরা ইনফিত্বার ৮২:৩)

وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝٥

যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে, (সূরা তাকভীর ৮১:৫)

وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝٤

এবং যখন কবরসমূহকে উন্মোচিত করা হবে, (সূরা ইনফিত্বার ৮২:৪)

يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ۝٤

সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত।" (সূরা কারিয়াহ ১০১:০৪)

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ۝١٨

"সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোনো কিছু গোপন থাকবে না।" (সূরা হাক্কাহ ৬৯:১৮)

يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِى صَخْرَةٍ أَوْ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوْ فِى ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝١٦

"হে বৎস! কোনো বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে, তবে আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ গোপন ভেদ জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।" (সূরা লোকমান ৩১: ১৬)

(আর, সেদিন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করবেন,)

لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ ۝١٦

"আজ রাজত্ব কার? (সেদিন রাজত্ব ও ক্ষমতা হবে) এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর (ওয়াহিদুল কাহহার)!" (সূরা মু'মিন ৪০:১৬)

হায়! কিয়ামতের এই বিভীষিকা মানুষকে উপভোগ করতেই হবে! হায়! সেদিন আমি কোথায় থাকব? কী হবে আমার অবস্থা??

এরপর হাশরের ময়দান কায়েম হবে। সেখানে ফেরেশতা, জিন, মানব, শয়তান, বন্য জন্তু সকলেই সমবেত হবে। এত ভিড় হবে যে, মানুষ পায়ের আঙুলের উপর ভর করে দাঁড়াবে, একজনের কাঁধ অন্য জনের কাঁধের সাথে মিলে যাবে। মানুষকে খালি পায়ে, খালি গায়ে, খতনা বিহীন, উলঙ্গ অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে। তা সত্ত্বেও ময়দানের ভয়াবহতা এরূপ হবে যে, একজন আরেকজনের দিকে তাকানোর সময় পাবে না, কুচিন্তার ফুরসত পাবে না। সে ময়দান হবে সমতল, যাতে লুকানোর মত কোন উঁচু টিলা ও নিচু গর্ত থাকবে না। সেদিন সূর্য মানুষের মাথা থেকে মাত্র দু'ধনুক দূরে থাকবে এবং প্রচণ্ড তাপ বিকিরণ করতে থাকবে। আল্লাহ পাকের আরশের ছায়া ব্যতীত সেদিন আর কোনো ছায়া থাকবে না এবং নৈকট্যশীলরা (নবী-রাসূল, সিদ্দিক, শহীদ, আউলিয়া, নেককার আলেম ও আবেদগণ) ব্যতীত অন্য কেউ তাতে স্থান পাবেনা। হায়! সেদিন কি আমি আল্লাহ পাকের আরশে আযীমের নিচে একটুখানি ঠাঁই পাব??

সূর্যের উত্তাপ, শ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তাপ আর নিজের কৃতকর্মের জন্য অন্তর্জ্বালা এক ভয়াবহ মসীবত সৃষ্টি করবে। ঘামের দরুন মানুষের কষ্ট আরো বেড়ে যাবে। মানুষের বদ আমল অনুপাতে মানুষ ঘামে নিমজ্জিত হবে। সে হিসেবে কেউ কেউ ঘামে উরু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত, কারো কান পর্যন্ত ডুবে যাবে, কারো ঘাম হবে গলার লাগাম এবং কেউ কেউ সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয়ে যাবে।

সুতরাং হে নিঃস্ব! হাশরবাসীদের দুঃখ-দুর্দশার কথা চিন্তা কর। এ কষ্টে পড়ে অনেকেই আরয করবে, প্রভু! আমাদেরকে হাশরের ময়দানের ভোগান্তি ও অপেক্ষার কষ্ট থেকে নাজাত দিন যদিও আমরা জাহান্নামে যাই। আর সেটি হবে হিসাব নিকাশ ও আযাবের আগের কষ্ট। এরকম পরিস্থিতিতে মানুষের উপর দিয়ে পঞ্চাশ হাজার বছর অতিবাহিত হবে, তথাপি আল্লাহ তা'আলা মানুষের দিকে তাকাবেন না। হিসাব নিকাশ শুরু করবেন না। বন্ধু হে! তুমি সেদিনের কথা স্মরণ কর, যেদিন অবশ্যই আসবে, যেদিন মানুষ পায়ের উপর ৫০,০০০ বছর দণ্ডায়মান থাকবে। এ সময়ে তারা কোনো খাদ্য পাবেনা এবং এক ঢোক পানিও পান করতে পারবেনা। হায়! সেদিন হাশরের কোন স্থানে আমি দাঁড়াব? কোথায় আমার জায়গা হবে? আমার অবস্থা কেমন হবে???

কেমন হবে আমার সেদিনের ক্ষুধা ও তৃষ্ণার যন্ত্রণা! চিন্তা করা যায় কি? অথচ এমনই ঘটবে, এমনই ঘটতে যাচ্ছে।

সেদিন সকল মানুষ এমনকি সকল নবী-রাসূলগণও 'ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী' বলতে থাকবে। সেদিন কেউ আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়াবার সাহস করবেন না। কেবল আমাদের প্রিয় নবীজী ﷺ। তিনি তাঁর গুনাহগার উম্মতের জন্য শাফায়াত করবেন। বিচার কাজ শুরু হলে একদল লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে দেয়া হবে, আর সকল কাফের, মুশরিক, বেঈমান, নাস্তিক, মুরতাদ, ইহুদী, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকলকে একযোগে বিনা হিসেবে জাহান্নামের আগুনে চিরদিনের জন্য নিক্ষেপ করা হবে। তাদের কোনো হিসাব নেই। হিসাব হবে কেবল গুনাহগার মুসলমানদের। মীযানের পাল্লায় একপাশে নেক আমল, অপরপাশে বদ আমল তুলে ওজন করা হবে। অণু পরিমাণ নেক কিংবা বদীও সেদিন বাদ পড়বে না। নেকীর পাল্লা ভারী হলে আমলনামা ডানহাতে সামনের দিক হতে দেয়া হবে, এরাই হবে জান্নাতী। আর বদীর পাল্লা ভারী হলে পিছন দিক হতে বাম হাতে দেয়া হবে, এরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, এরাই হবে জাহান্নামী। যাদের ব্যাপারে জাহান্নামের ফয়সালা হবে, আমাদের দয়াল নবী রাসূলুল্লাহ ﷺতাদের মুক্তির জন্য শাফায়াত (সুপারিশ) করবেন। হায়! জানি না, সেদিন আমার গোনাহের পাল্লা না ভারী হয়ে যায়! হায়! আমি কি সেদিন আমার প্রিয়

হাবীবের ﷺশাফায়াত লাভ করব?? সেদিন কি আমি আমার হাবীবের ﷺ হাতে হাউজে কাউসারের পানি পান করতে পারবো?

কিয়ামতের দিন আমাদের সামনে জাহান্নামকে টেনে উপস্থিত করা হবে। তার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে এবং প্রত্যেক লাগামের জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে। জাহান্নামের উপর পুলসিরাত কায়েম করা হবে। যা হবে চুলের চেয়েও চিকন, তরবারির চেয়েও ধারালো। যা ত্রিশ হাজার বছরের রাস্তা। এটি পেরিয়ে আমাকে জান্নাতে যেতে হবে। নেককারগণ বিদ্যুতের গতিতে পার হয়ে যাবে। পুলসিরাত পেরিয়ে এ উম্মত সবর্প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতের চাবি থাকবে আমাদের প্রিয়নবী ﷺ এর হাতে। তিনিই জান্নাতে তাঁর উম্মতকে নিয়ে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবেন। অন্যদিকে, সেদিন পুলসিরাতের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় গুনাহগারদের শরীর দু' টুকরা হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। হায়! আমি জানি না, আমি কি পুলসিরাত পার হতে পারবো, নাকি দু'টুকরা হয়ে জাহান্নামের অতল গহীনে আগুনের মাঝে পড়ে যাবো!!! (আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।)

জাহান্নামের গভীরতার কোনো সীমা নেই। যদি একটি পাথর দোযখে নিক্ষেপ করা হয় তবে পাথরটি দোযখের তলদেশে পৌঁছতে সত্তর বছর সময় লাগবে। জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে। দোযখ চারটি দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং তার প্রতিটি দেয়ালের পুরুত্ব এত বেশি যে, তা অতিক্রম করতে চল্লিশ বছর সময় লেগে যাবে। দোযখের ভিতর কোনো আলো নেই, সেখানকার আগুনও কালো। সে আগুনের তেজ দুনিয়ার আগুনের তুলনায় সত্তর গুণ বেশি। যদি কোনো দোযখীকে দুনিয়ার আগুনে এনে পুড়ানো হয়, তাহলে সে ঘুমিয়ে পড়বে। তার কাছে দুনিয়ার আগুন অনেক আরামদায়ক লাগবে। সেখানে সবচেয়ে কম যে শাস্তি দেয়া হবে, তা হলো দোযখীকে এক জোড়া আগুনের জুতা পরিয়ে দেয়া হবে, যার উত্তাপে পাতিলের ফুটন্ত পানির ন্যায় তার মগজ টগবগ করতে থাকবে। কিন্তু সে মনে করবে তাকেই বুঝি সবচেয়ে বেশি শাস্তি দেয়া হচ্ছে। দোযখের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। দোযখের আগুন এতটাই ভয়াবহ যে, তা মানুষের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে এবং তাকেও গ্রাস করে ফেলবে। সেখানে মৃত্যু নেই, যতই শাস্তি দেয়া হোক মরবে না। দোযখের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের উনিশজন ফিরিশতা (যদিও সকল মানব ও জিনদের শাস্তি দেয়ার জন্য একজনই যথেষ্ট ছিল); তাঁরা আল্লাহর আদেশ অমান্য করেন না এবং যা আদেশ করা হয় তাই করেন। মানুষদেরকে যখন টেনে হিচড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, দূর থেকে জাহান্নামের আগুন তাদের দেখে ফেলবে এবং ক্রুদ্ধ হয়ে গর্জন ও চিৎকার শুরু করে দিবে। গুনাহগারদের সেখানে শৃংখলাবদ্ধ করে, (যদিও দোযখ প্রশস্ত জায়গা, তথাপি শাস্তি দেওয়ার জন্য) দোযখের সংকীর্ণ, অন্ধকারময় কোনো স্থানে নিক্ষেপ করে অনন্ত/সুদীর্ঘকাল পুড়ানো হবে। সেখানে ধৈর্য ধারণ করা আর না করা উভয়েই সমান। দোযখীদের পোশাক হবে গন্ধকের, যেন দ্রুত আগুন লেগে যায়।

দোযখীদের বিশাল দেহ দেয়া হবে যেন ভালোভাবে শাস্তি দেয়া যায়। তাদের জিহ্বা হবে দুই মাইল সমান। দুই কাঁধের স্থান দ্রুতগামী অশ্বারোহীর দুই দিনের পথের সমান দীর্ঘ হবে। চোয়াল হবে ওহুদ পাহাড়ের ন্যায় এবং তাদের চামড়া তিনদিনের পথের সমান মোটা ও পুরু হবে। কোন কোন দোযখীদের এত বড় দেহ দেয়া হবে যে, তাদের কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত সত্তর বছরের রাস্তা হবে। তাতে রক্ত ও পুঁজের নালা প্রবাহিত হবে। দোযখীদের দংশন করার জন্য উটের ন্যায় ঘাড় বিশিষ্ট ভয়াবহ সাপ এবং মালপত্র বোঝাই করা খচ্চরের ন্যায় উঁচু বিচ্ছু থাকবে। তারা একবার দংশন করলে চল্লিশ বছর তার ব্যথা অনুভূত হবে। ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য কণ্টকময় বৃক্ষ ছাড়া তাদের আর কোনো খাবার থাকবে না, যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না, উপরন্তু তা

তাদের গলায় আটকে যাবে। ফলে তারা পানি চাইবে। তাদেরকে অত্যন্ত গরম ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের নাঁড়িভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে দিবে। সেদিন সেখানে তাদের কোন সুহৃদ ও বন্ধু থাকবে না; সকলেই হারিয়ে যাবে। সেদিন তারা এতই ক্ষুধার্ত থাকবে যে, তাদেরকে অন্য কোনো শাস্তি না দেয়া হলেও ক্ষুধার কষ্টই শাস্তি হিসেবে যথেষ্ট হবে। তাদেরকে খেতে দেয়া হবে দোযখীদের ক্ষত নিঃসৃত পূঁজ (গাস্সাক)। এটি এতই দুর্গন্ধময় যে, এক বালতি গাস্সাক তথা পূঁজ যদি দুনিয়ায় নিক্ষেপ করা হতো তাহলে সমস্ত পৃথিবী পঁচে গলে যেতো। আরো খাদ্য হবে যাক্কুম বৃক্ষ, যা তারা তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায় গিলতে থাকবে, কিন্তু সেই খাদ্য গলিত তামার ন্যায় ফুটন্ত পানির মতো দোযখীদের পেটে ফুটতে থাকবে। এছাড়াও তাদের মাথার উপর ঢালা হবে ফুটন্ত পানি, ফলে তাদের চামড়া বিগলিত হয়ে যাবে। পুড়ে যাওয়া কিংবা বিগলিত হওয়া চামড়াকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে, যেন শাস্তি পুরোপুরি ভোগ করতে পারে। আরো আছে আগুনের শিকল, লোহার মুগুর, জাহান্নামের যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়ে বের হতে চাইলে তাদেরকে মুগুর মেরে ফেরত পাঠানো হবে। আর এই মুগুর কেমন ভারী হবে? সমস্ত মানব ও জিন জাতি যদি তা উঠাতে চেষ্টা করে তাহলেও তা উঠাতে সক্ষম হবে না। এসব ছাড়াও আছে আগুনের বেড়ী। যে মুনাফেকী করবে, বুকে বে-ঈমানী, মুখে ঈমানের কথা বলবে, উম্মতের সাথে গাদ্দারী করবে, উম্মতের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করে, তাদেরকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। এদের শাস্তি হবে সবচেয়ে মর্মান্তিক। তাদেরকে পাঠানো হবে "যুব্বুল হুযন" (চিন্তার কূপ) নামক স্থানে। এটি এমনই ভয়ংকর যে, খোদ জাহান্নামই এর মসীবত থেকে আল্লাহর কাছে দিনে শতবার পানাহ চায়। সুতরাং উম্মতের গাদ্দাররা সাবধান!

সন্দেহ নেই! জাহান্নাম এমনই হবে। সন্দেহ নেই, কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'আলার জন্য এটি সহজ, খুব সহজ।

হায়! জাহান্নামে তো আমার মতো রক্ত-মাংসে গড়া মানুষেরাই যাবে। হায়! আমিও যদি তাদের মত এরকম আযাবে গ্রেপ্তার হয়ে যাই! সেদিন আমার কী হবে? আমি কোথায় যাব? আমায় কে রক্ষা করবে? এমন হলে তো আমি ধ্বংস হয়ে যাব?

হায়!.................

প্রিয়তমদের সাথে মিলিত হওয়ার সহজ উপায়; আর নয় হতাশা!!!

প্রিয় ভাই!

উপরের আলোচনা হতে আমরা বুঝতে পারলাম, আমাদের সামনে কী পরিমাণ কঠিন পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে, আমরা এ সম্পর্কে চরম পর্যায়ের গাফেল (অমনোযোগী)। আমাদের অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, আমাদের মৃত্যু নেই, কবরের আযাব, হাশর, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম এগুলো রূপকথার গাল-গল্প বৈ নয়! নবী রাসূলগণ এগুলো এমনি এমনি (বানিয়ে) বলেছেন! আমাদের ভাবখানা এমন, দুনিয়াতে নগদে যত পারি মাস্তি করি, মৃত্যুর পর যা হবার হবে, কুচ্ পরোয়া নেহি! আল্লাহ, পরকাল থাকলে ভালো; না থাকলে আরো ভালো! এসব নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই। এসব চিন্তা প্রগতি ও আধুনিকতা বিরোধী! আর আমরা যারা মুমিন তথা বিশ্বাসী, তাদেরও বিশ্বাস 'দৃঢ় বিশ্বাস' এ রূপ নেয় না, আমাদের 'ঈমান' তো 'একীন' এ পরিণত হচ্ছে না!!

কিন্তু হায়! এগুলো এমনই চিরসত্য, যা ঘটবেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলার চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে? আল্লাহ তা'আলার চেয়ে অধিক ওয়াদা বাস্তবায়নকারী আর কে? তিনি কি আসমান যমীন 'কুন ফায়াকুন' এর দ্বারা মুহূর্তের মাঝেই সৃষ্টি করেননি? তিনি কি পুনরায় এগুলো ধ্বংস করে আবার সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? লক্ষাধিক নবী-রাসূলগণ কি ভুল বলে গিয়েছেন? কুরআন কারীম কি আমাদেরকে পরকালের এই সকল মহা বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেনি??

বন্ধু হে! আবারো বলছি, মৃত্যুর কষ্ট সত্য, কবরের আযাব সত্য, পুনরুত্থান সত্য, হাশরের বিভীষিকা সত্য, পুলসিরাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, জান্নাত সত্য, আল্লাহ তা'আলার দীদার সত্য, হূরে ঈন, হূরে লূ'বা প্রাপ্তি সত্য।

প্রিয় ভাই!

যেহেতু এগুলো ঘটবেই, তাই জান্নাত প্রাপ্তি আর জাহান্নাম হতে বাঁচার চেষ্টা করাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?

দুনিয়ার গোলামীতে লিপ্ত থাকাটাই কি চরম বোকামী নয়??

আখিরাতকে ভুলে দুনিয়ার মোহে পড়ে সংক্ষিপ্ত এই যিন্দেগীকে বরবাদ করাটা কি মূর্খতা নয়?

সেই কি বুদ্ধিমান নয়, যে মৃত্যুর আগে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয়?

সেই কি প্রকৃত টেলেন্ট নয়, যে সময় থাকতে তাওবা করে তাঁর রবের দিকে ফিরে আসে?

সেই কি আসল বিচক্ষণ নয়, যে পরকালে তার হিসাব নেয়ার আগে দুনিয়াতে নিজেই নিজের হিসাব নেয়?

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ

"যারা মুমিন, তাদের জন্য এখনো কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? (৫৭ সূরা হাদীদ: ১৬)

প্রিয় ভাই! এখনো কি আমাদের সময় আসেনি, আমাদের মহান রবের দিকে রাস্তা খোঁজার?

আমাদের কি এখনো সময় আসেনি, গান শুনা আর নীল ম্যুভি দেখা ছেড়ে দেয়ার?

আমাদের কি এখনো সময় আসেনি, দুনিয়ার পঁচা-গান্ধা হারাম রিলেশনগুলোকে বাদ দিয়ে চিরস্থায়ী জান্নাতী সঙ্গিনীদের খোঁজে বের হবার?

আমাদের কি এখনো সময় আসেনি, নিজের যিন্দেগীকে ইসলামের রঙে রাঙিয়ে তোলার?

আমাদের কি এখনো সময় আসেনি, পরম করুণাময়ের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার?

আমাদের কি এখনো সময় আসেনি, আযরাঈলের (আ.) সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই নিজেকে সংশোধন করে নেয়ার?

বলুন, ভাই!

সেই কি প্রকৃত সৌভাগ্যবান নয়, যার মৃত্যুর সময় কোন কষ্টই হবে না? মৃত্যুর পর কোন হিসাব হবে না? কিয়ামতের বিভীষিকা হতে যাকে দূরে রাখা হবে? হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলার মেহমান হয়ে আরশের ডান দিকে অবস্থান করবে? আর যাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে চিরকালের জন্য সবচেয়ে বড় ও উঁচু জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে? সবচেয়ে সুন্দরী ও সর্বাধিক সংখ্যক হূর দেয়া হবে?

প্রিয় ভাই!

উপরের আলোচনা হতে বুঝা যায়, যদিও জান্নাত প্রাপ্তি, আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ, প্রিয় নবীজীর সাক্ষাৎ, হূরে ঈনের সাথে মিলন সত্য, কিন্তু তা কতকাল পর ঘটবে কারোরই জানা নেই। (যার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলারই আছে)। আমলের তারতম্য ও মর্তবার পার্থক্যের দরুন একেকজন মুমিনের জন্য একেক রকম সময় লাগবে। তথাপি প্রতি পদে পদে ভয়াবহতা ও বিভীষিকায় শিকার হওয়ার সম্ভাবনা! সাকরাতুল মাওত তথা মৃত্যুর কষ্টের ভয়, কবরের চাপের ভয়, কবরে হিসাব নিকাশের ভয়, কিয়ামতের বিভীষিকা, হাশরের ময়দানে পঞ্চাশ হাজার বছর হিসাবের জন্য অপেক্ষা, মীযানের পাল্লায় আমলনামা উঠানো, নেকীর পাল্লা হালকা হওয়া ও বদীর পাল্লা ভারী হওয়ার ভয়, পুলসিরাতের উপর দিয়ে পার হওয়া ও জাহান্নামে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা, এরপর জান্নাত কিংবা জাহান্নাম!! অনেক বেশি নেক আমল বা নেকী না থাকলে বড় জান্নাত পাওয়া যাবে না, অধিক নায-নেয়ামত মিলবে না, আল্লাহ তা'আলার দীদারও কম সময় হবে। যদিও এগুলো পাওয়া যায়, তা কত দীর্ঘ সময় পর মিলবে একমাত্র আল্লাহ্ পাকই ভালো জানেন!!!

প্রিয় ভাই! একটু ভেবে বলুনতো-

কেমন হবে ব্যাপারটি- যদি মৃত্যুর সময় আমাদের কোনো কষ্টই না হয়! কবরের হিসাব কিংবা আযাব, কিয়ামত, হাশর, মীযান, পুলসিরাত সবকিছুকে পাশ কাটিয়ে (বাইপাস করে) মৃত্যুর সাথে সাথেই সরাসরি জান্নাতে চলে যাই!! মৃত্যুর পরও দুনিয়ার মত রিযিক পেয়ে যাই!! দুনিয়ায় যেমন জীবিত আছি, মৃত্যুর পরও তেমনি জীবিতই থাকতে পাই!! যদি মৃত্যুর সাথে সাথেই আমাদের প্রিয়তমা হূরে 'ঈনদের সাথে মিলিত হয়ে যাই!! মৃত্যুর দিনই আমার প্রিয় রফীকে আ'লা রব্বে কারীমের দরবারে যেতে চাই!! তাহলে আমাকে কী করতে হবে???

অতি সহজ ও সংক্ষিপ্ত কোনো রাস্তা আছে কি?............

[......জলদি বলুন ভাই, আর যে দেরী সইছে না; আর যে মন মানছে না; একটি খেঁজুর কিংবা এক টুকরা গোশত খাওয়ার সময়টুকুও যেন অনেক দীর্ঘ মনে হচ্ছে!!..........]

তাহলে শুনুন ভাই- শাহাদাত, হ্যাঁ ভাই, আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত-ই এর সর্বোত্তম সমাধান। জান্নাতে যাবার জন্য এটি অতি সংক্ষিপ্ত ও সহজ রাস্তা। মৃত্যুর কষ্ট থেকে বাঁচার, কবরের আযাব থেকে বাঁচার, কিয়ামতের বিভীষিকা থেকে রক্ষা পাবার এটিই সর্বোত্তম রাস্তা; মৃত্যুর সাথে সাথে প্রিয়তমা হূরে 'ঈন, হূরে লু'বা, হূরে মার্জিয়াদের সাথে সাক্ষাতের অতি সংক্ষিপ্ত পথ শাহাদাত ফী সাবীলিল্লাহ!! দুনিয়া ত্যাগ করার দিনই মাওলায়ে পাকের দরবারে গমন করার অতি সহজ রাস্তা শাহাদাত ফী সাবীলিল্লাহ!!!

প্রিয় ভাই! এ পর্যায়ে, চলুন, এ সম্পর্কে আমাদের প্রাণপ্রিয়, সত্যবাদী রাসূল ﷺ-এর মুখনিঃসৃত কিছু হাদীস শুনে দীল ও মন ঠান্ডা করি!

শহীদদের মৃত্যুকষ্টের ভয় নেই:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّهِيدُ لَا يَجِدُ مَسَّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمُ الْقَرْصَةَ يُقْرَصُهَا

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "একজন শহীদের নিহত হওয়ার কষ্ট তোমাদের কেউ পিপীলিকার কামড়ের কষ্টের চাইতে বেশি অনুভব করবে না।" (সহীহ, মিশকাত, সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৬১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ "

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "একজন শহীদ মৃত্যুর কষ্ট শুধু ততটকুই অনুভব করে, তোমাদের কাউকে একবার চিমটি কাটলে সে যতটুকু কষ্ট অনুভব করে।" (হাসান সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৮০২), জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৬৬৮)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا الْتَقى لزَّحْفَانِ وَنَزَلَ الصَّبْرِ، كَانَ الْقَتْلُ أَهْوَنُ عَلى الشَّهِيْدِ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ فِيْ الْيَوْمِ الصَّائِفِ - شفء الصدور، مشارع الاشواق

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় আসমান থেকে সাকীনা নাযিল হতে থাকে, তখন মুজাহিদগণের শাহাদাত নসীব হওয়া প্রচণ্ড গরমের দিন ঠাণ্ডা পানি পান করার চেয়েও অধিক সহজ হয়ে যায়।" (শিফাউস্ ছুদুর, মাশারিউল আশওয়াক্ব)

শহীদের সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে:

عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : اِنَّ اَوَّلَ مَا يُهْرَاقُ مِنْ دَمِ الشَّهِيْدِ تُغْفَرُ لَهُ ذُنُوْبُهُ - (السنن الكبرى للبيهقى كتاب السير باب فضل الشهادة في سبيل الله، مشارع الاشواق)১১৫২-৭৪১

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "শহীদগণের রক্তের প্রথম ফোটা যমীনে পড়ার পূর্বেই তার সমস্ত গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (সুনানুল কুবরা লিল বাইহাক্বী, মাশারিউল আশ্ওয়াক্ব)

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيئَةٍ " . فَقَالَ جِبْرِيلُ إِلاَّ الدَّيْنَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِلاَّ الدَّيْنَ " .

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলার পথে মৃত্যুবরণ করা সকল পাপের কাফফারা হয়ে যায়।" তখন জিবরাঈল (আঃ) বললেন, ঋণ ব্যতীত (তা ক্ষমা করা হয় না)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঋণ ব্যতীত। (সহীহ্, জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৬৪০)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَبْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ الْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "ঋণ ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা শহীদের সব কিছু (পাপ) মাফ করে দিবেন।" অন্য রেওয়ায়েতে আছে, "আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হলে সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়।" (মুসলিম- ১৮৮৬)

শাহাদাতের সাথে সাথেই হুরে ঈনের সাথে সাক্ষাত মিলবে:

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ فَقَالَ: لَا تَجُفُّ الْأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيْدِ حَتّٰى تَبْتَدِرُهُ زَوْجَتَاهُ كَأَنَّهُمَا ظَئْرَنِ اَضَلَّتَا فَصِيْلَيْهِمَا فِيْ بَرَاحٍ مِّنَ الْأَرْضِ، وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدةٍ مِّنْهَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنيَا وَمَا فِيْهَا -مصنف عبد الرزاق، مشارع الأشواق ٧٤٦-١١٥٦

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুলাহ ﷺ-এর সম্মুখে শহীদদের আলোচনা করা হল, তখন রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, "যমীনে শহীদের রক্ত শুকানোর পূর্বেই তার দু' জন স্ত্রী (হুরে ঈন) তার প্রতি এমনভাবে দৌড়িয়ে আগমন করে যেমন চাটিয়াল ময়দানে দুধ ওয়ালী উটনি তার বাচ্চার

প্রতি দৌঁড়িয়ে যায় এবং তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে এমন জোড়া থাকবে যা দুনিয়া ও তার মাঝে থাকা সমস্ত বস্তু অপেক্ষা উত্তম।" (ইবনে মাজাহ)

وعن بعض الصحابه رضى الله تعالى عنهم أنه قال: السيوف مفاتيح الجنة .قال: وإذا التقى الصفان في سبيل الله تزين الحور العين فاطّلعن، فإذا أقبل الرجل قلن: اللهم انصره اللهم ثبّته، اللهم.... ، فإذا أدبر احتجبن عنه ، وقلن: اللهم اغفر له وإذا قتل غفر الله له بأول قطرة تخرج من دمه كل ذنب هو له، وتنزل عليه اثنتان من الحور العين تمسحان الغبار عن وجهه.

জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "তরবারি হল জান্নাতের চাবি।" তিনি আরো বলেন, "যখন মুজাহিদ বাহিনী শত্রু বাহিনীর মুখোমুখি হয়, তখন ডাগরনয়না হূররা সুসজ্জিত হয়ে উঁকি মেরে দেখতে থাকে। যখন কোনো মুজাহিদ সামনে অগ্রসর হয়, তখন বলে, হে আল্লাহ! তাকে সাহায্য কর। তাকে সহায়তা কর। আর যখন পশ্চাতে ফিরে আসে, তখন আত্মগোপন করে বলে, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর। আর যখন নিহত হয়, তখন তার রক্তের প্রথম ফোঁটা ঝরার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। তার নিকট দুটি ডাগরনয়না হূর নেমে আসে এবং তার চেহারা থেকে ধূলি মুছে দেয়।" (তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ: ৩৮৯)

অন্য হাদীসের বর্ণনা মতে, শহীদ মাটিতে পড়ার সাথে সাথে জান্নাত হতে দুইজন হূরে ঈ'ন আগমন করেন, তার শরীর মুছে দেন এবং তাকে জান্নাতী খুশবু লাগিয়ে দেন ও পোশাক পরিধান করিয়ে দেন।

শাহাদাতের দিনই মাওলায়ে পাকের দরবারে যাওয়া হবে এবং জান্নাত মিলবে:

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا قُتِلَ الْعَبْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَأَوَّلُ قَطْرَةٍ تَقَعُ عَلٰى الْأَرْضِ مِنْ دَمِهِ يَغْفِرُ اللهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ كُلَّهَا، ثُمَّ يُرْسِلُ اِلَيْهِ بَرِيْطَةً مِنَ الْجَنَّةِ فَتُقْبَضُ فِيْهَا نَفْسَهُ وَبِجَسَدٍ مِنَ الْجَنَّةِ حَتّٰى تُرْكَبُ فِيْهِ رُوْحِهِ، ثُمّ يَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ كَأَنَّهُ كَانَ مَعَهُمْ مَنْذُ خَلَقَهُ اللهُ حَتّٰى يُؤْتَ بِهِ إِلىٰ السَّمَاءِ فَلَا يَمُرُّ بِبَابٍ إِلا فُتِحَ لَهُ، وَلَا عَلىٰ مَلَكٍ إِلا صَلّٰى عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ، حَتّٰى يُؤْتٰى بِهِ الرَّحْمٰنُ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَسْجُدُ قَبْلَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ تَسْجُدُ الْمَلَائِكَةُ بَعْدَهُ، ثُمَّ يُغْفَرُ لَهُ وَيُطَهَّرُ ثُمَّ يُنْمَرُبِهِ إِلَى الشُّهَدَاءِ فَيَجِدُهُمْ فِيْ رِيَاضٍ خُضْرٍ وَقِبَابٍ مِنْ حَرِيْرٍ عِنْدَهُمْ حُوْتُ وَثَوْرٌ يَلْعَبَانِ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ لُعْبَةً لَمْ يَلْعَبَا بِهَا الْأَمْسَ....... يَنْظُرُوْنَ إِلىٰ مَنَازِلِهِمْ فِيْ الْجَنَّةِ يَدْعُوْنَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالىٰ بِقِيَامِ السَّاعَةِ ـ مجمع الزوائد، مشارع الاشواق ـ١١٥٥ـ٧٤٥

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাহে শাহাদাতবরণ করে তখন তার রক্তের প্রথম ফোটা যমীনে পড়ার পূর্বেই তার সমস্ত গুনাহকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। তার জন্য জান্নাত থেকে রুমাল প্রেরণ করা হয় এবং শহীদের রূহকে তার দ্বারা আবৃত করে একটি জীবন্ত দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয় অতঃপর সে ফিরিশতাদের সাথে তাদের মতই উপরের দিকে আরোহন করতে থাকে কেমন যেন তার জন্মই ফিরিশতাদের সাথে। অতঃপর তাকে আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আসমানের যে দরজা দিয়েই সে প্রবেশ করতে চাইবে সে দরজাই তার জন্য খুলে দেয়া হবে এবং যে ফিরিশতার নিকট দিয়ে গমন করবে সে ফিরিশতাই তার জন্য রহমতের দু'আ ও ইসতিগফার করতে থাকবে; এমতাবস্থায় সে আল্লাহ তা'আলার নিকট উপস্থিত হয়ে যাবে। শহীদ সেথায় পৌঁছে ফিরিশতাদের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদায় অবনত হবে, পরে ফিরিশতাগণও সিজদা করবে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পুনরায় তাকে ক্ষমা ও পবিত্রতার ঘোষণা প্রদান করা হবে। অতঃপর তাকে অন্যান্য শহীদগণের নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। ঐ সকল শহীদগণকে একটি তরুতাজা সবুজ শ্যামল বাগানের মাঝে সকলকে সবুজ পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখবে। ঐ সকল শহীদগণের নিকট একটি গাভী ও মসলী দেখতে পাবে যা নিয়ে তারা খেলা করছে, তাদেরকে প্রত্যেকদিনের খেলার জন্য নতুন নতুন বস্তু দেয়া

হবে। .... শহীদ তার আসল স্থানকে দেখতে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট কিয়ামত কায়েম করার জন্য অনুরোধ করতে থাকে। (মাজমুয়া জাওয়ায়েদ, মাশারিউল আশওয়াক)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "জেনে রাখ, জান্নাত তরবারির ছায়াতলে অবস্থিত।" (সহীহ বুখারী ২৮১৮)

শহীদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছয়টি পুরস্কার:

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ "

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তা'আলা শহীদকে ছয়টি পুরস্কার দান করবেন। ১. রক্তের প্রথম ফোটাটি মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং যে জান্নাত তার ঠিকানা, তা তাকে দেখিয়ে দেয়া হয়। ২. তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয়। ৩. (কিয়ামতের) প্রচণ্ড ভীতি থেকে সে নিরাপদ থাকবে। ৪. তার মাথায় মর্যাদার মুকুট পরানো হবে, যার এক একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও দুনিয়ার সমুদয় বস্তু হতে মূল্যবান। ৫. স্ত্রী রূপে তাকে বাহাত্তর জন ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হূর দেয়া হবে। ৬. তার সুপারিশে তার সত্তরজন আত্মীয়কে জান্নাত দান করা হবে। (তিরমিযী-১৬৬৩ ও ইবনে মাজাহ শরীফ)

عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: يُشَفَّعُ الشَّهِيْدُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ - ابو داود كتاب الجهاد باب في الشهيد يشفع، البيهقى كتاب السير باب الشهيد يشفع، مشارع الاشواق১১৪৮-৭৩৯

হযরত আবূ দারদা রাদি. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "শহীদ নিজ পরিবারভূক্ত সত্তরজনের জন্য সুপারিশ করবে।" (আবু দাউদ, বাইহাক্বী, মাশারিউল আশওয়াক্ব)

শহীদদের জন্য পরকালের আযাব মাফ:

عَنْ جَابِرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَتَلَ يَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ اللهُ - مجمع الزوائد، مشارع الاشواق ٧٢٤- ١١٣٠

হযরত যাবের রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য শাহাদাতবরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কোনো প্রকার আজাব প্রদান করবেন না।" (মাজমুয়া যাওয়ায়েদ, মাশারিউল আশওয়াক্ব)

শহীদরা মৃত নয়, জীবিত; তারা রিযিকপ্রাপ্ত হন:

যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হন, তারা তো মৃত নয়, বরং জীবিত। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ,

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَـٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

"যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়, তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।" (২ সূরা বাকারা: ১৫৪)

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًاۢ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়, তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তার জীবিকা প্রাপ্ত হন।" (৩ সূরা আলে ইমরান: ১৬৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীসের আলোকে শহীদদের পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা তাফসীরের কিতাবে পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্যগুলো হল:

১. শহীদদের রূহ আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতের মাধ্যমে কবজ করবেন, তাদের জান কবজের জন্য মালাকুল মাউত নির্ধারণ করেননি।

২. শহীদকে গোসল প্রদান করা হবে না এবং শহীদ দুনিয়ার কোন বস্তুর প্রতি মুহতাজ নয়।

৩. শহীদদেরকে কাফন দেয়া হবে না; তাদেরকে রক্তমাখা কাপড়সহই দাফন করা হবে।

৪. শহীদগণকে শাহাদাতের পর মৃত বলা যাবে না।

৫. শহীদগণ প্রতিদিন যে কোন ব্যক্তির জন্য শাফা'আত করতে পারবে।

(তাফসীরে কুরতুবী, সূরা আলে ইমরানের ১৭১ নং আয়াতের ব্যাখ্যাধীন)

শহীদরা জান্নাতে 'সবুজ পাখি' হয়ে উড়ে বেড়ায়:

عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ مِنْ ثَمَرَةِ الْجَنَّةِ أَوْ شَجَرِ الْجَنَّةِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "সবুজ পাখির মধ্যে শহীদদের রূহ্ অবস্থান করে। তারা জান্নাতের বৃক্ষসমূহের ফল ভক্ষণ করে।" (সহীহ্, ইবনু মাজাহ-৪২৭১, জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৬৪১)

عَنْ كَعْبِ بن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : اَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِيْ صُوَرِ طَيْرٍ خُضْرٍمُعَلَّقَةٌ فِيْ قَنَادِيْلَ حَتَّى يَرْجِعَهَا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - مصنف ابن عبد الرزاق كتاب الجهاد باب اجبالشهادة ، ترمذى كتاب فضائل الجهاد باب ماجاء في ثواب الشهداء مشارع الاشواق১৬৪১-৭২৯

হযরত কা'আব ইবনে মালেক রাদি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "শহীদগণের রূহকে সবুজ পাখির আকৃতি দান করা হবে এবং আশ্রয়স্থল হিসেবে জান্নাতে ঝুলন্ত স্বর্ণের কিন্দিলা (বাতি) প্রদান করা হবে। পরিশেষে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের ফিরিয়ে আনবেন।" (মুসান্নাফে ইবনে আব্দুর রাজ্জাক, তিরমিযি, মাশারিউল আশওয়াক)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا : مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلاَّ يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلاَ يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ . قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ { وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا } " . إِلَى آخِرِ الآيَةِ .

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ উহুদ যুদ্ধের দিন যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হন, মহান আল্লাহ্ তাদের রুহগুলোকে সবুজ রঙের পাখির মধ্যে স্থাপন করলেন। তারা জান্নাতের ঝর্ণা সমূহের উপর দিয়ে যাতায়াত করে, সেখানকার ফলমূল খায় এবং 'আরশের ছায়ায় ঝুলানো সোনার ফানুসে বসবাস করে।

তারা যখন নিজেদের মনঃপূত খাবার, পানীয় ও বাসস্থান পেলো, তখন বললো, কে আমাদের এ সংবাদ আমাদের ভাইদের নিকট পৌঁছে দিবে, আমরা জান্নাতে জীবিত আছি, এখানে আমাদেরকে নিয়মিত রিযিক দেয়া হচ্ছে! (এটা জানতে পারলে) তারা জিহাদে অমনোযোগী হবে না এবং যুদ্ধের ব্যাপারে অলসতা করবে না। অতঃপর মহান আল্লাহ্ বললেনঃ আমি তাদের নিকট তোমাদের এ সংবাদ পৌঁছে দিবো। বর্ণনাকারী বলেন, মহান আল্লাহ্ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেনঃ "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত, তারা তাদের রবের নিকট নিয়মিত রিযিক পাচ্ছে"। (সূরাঃ আল-ইমরানঃ ১৬৯) (হাসান, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৫২০)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ - رَأَيْتُ جَعْفَرَ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ مَلَكًا يَّطِيْرُ فِيْ الْجَنَّةِ ذَا جَنَاحَيْنِ يَطِيْرُ مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ، مَقْصُوْصَةٌ قَوَادِمُهُ بِالدِّمَاءِ- طبراني، الترغيب والترهيب، مشارع الأشواق ٧٢٧- ١١٣٧

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমি জা'ফর ইবনে আবী তালিবকে দুটি পাখার উপর ভর করা ফেরেশতাদের ন্যায় দেখেছি জান্নাতের যেথায় ইচ্ছা বিচরণ করছে এবং তার পাখার অগ্রভাগে রক্ত মিশ্রিত।" (তাবারানী, আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, মাশারিউল আশওয়াক্ব)

একমাত্র শহীদরাই পৃথিবীতে আবারো ফিরে আসতে চাইবে:

عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ، { وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} قَالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلاَعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا قَالُوا أَىَّ شَىْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى . فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا " .

মাসরূক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আমি 'আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'ঊদ) (রাঃ)-কে এ আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যাতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো তোমরা মৃত মনে করো না বরং তাঁরা জীবিত, তাঁদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত"- (সূরা আলে 'ইমরান ৩ : ১৬৯)। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি এ আয়াত সম্পর্কে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে) জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন তিনি বললেন, শহীদদের আত্মাসমূহ সবুজ বর্ণের পাখির আকৃতিতে রাখা হয়। আল্লাহ তা'আলার আরশের নীচে তাদের জন্য ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। জান্নাতের সর্বত্র তারা যেখানে চায় সেখানে বিচরণ করে। অবশেষে সে লণ্ঠনগুলোতে ফিরে আসে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার নিকট কিছু চাও কি? উত্তরে তারা বলে, আমরা জান্নাতের মধ্যে যেখানে খুশি ঘুরাফেরা করে বেড়াই, এর চেয়ে বেশি আর কি চাইতে পারি? আল্লাহ তা'আলা তিনবার এই প্রশ্ন করেন আর প্রতিবার তারা একই উত্তর প্রদান করে। অবশেষে যখন তারা বুঝতে পারে যে, আসলে কোনো কিছু না চাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করতেই থাকবেন তখন তারা বলবে, ইয়া আল্লাহ! আমাদের একটি মাত্র আরয, আমাদের রূহগুলো পুনরায় আমাদের দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দাও আমরা আবারও তোমার পথে লড়াই করে শহীদ হয়ে আসি! কিন্তু মৃত্যুর পর পুনরায় দুনিয়াতে আসা আল্লাহর নিয়মের পরিপন্থী বিধায় এই আবদার গ্রহণ করা হয় না। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৪৭৭৯)

অর্থাৎ শহীদদেরকে আল্লাহ পাক এই পরিমাণ নেয়ামত দান করবেন, যার জন্য তারা পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার এবং আবারো শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, যা অন্য কোনো জান্নাতী করবে না।

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلاَّ الشَّهِيدُ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى "

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সঞ্চিত সাওয়াবের অধিকারী যে কোন বান্দার মৃত্যুর পর তাকে পৃথিবী এবং এর সকল কিছু দিলেও সে আবার পৃথিবীতে চলে আসা পছন্দ করবে না। কিন্তু শহীদ ব্যতীত, যখন শহীদ শাহাদাত লাভের ফযিলত ও মর্যাদা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাবে তখন সে আবার দুনিয়াতে আসতে আগ্রহী হবে, যাতে সে আবার আল্লাহ তা'আলার পথে শহীদ হতে পারে।" (সহীহ্, বুখারী, হাদিস নং ২৭৯৫, নাসা-ঈ, জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৬৪৩)

عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا غَيْرُ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا يَقُولُ حَتَّى أُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا يَرَى مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْكَرَامَةِ "

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জান্নাতে বসবাসকারীদের মধ্যে শহীদ ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউই (মৃত্যুর ভয়াবহতার কারণে) পৃথিবীতে ফিরে আসার উৎসাহ বোধ করবে না। শহীদ ব্যক্তিই আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে (কেননা মৃত্যু থেকে শুরু করে জান্নাত পর্যন্ত শাহাদাতের মযার্দা অবলোকন করেছেন)। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যেসব নিয়ামত ও মর্যাদা দিবেন তা দেখে সে বলবে, আমি দশবার আল্লাহর রাস্তায় নিহত হব।" (সহীহ্, নাসা-ঈ, জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৬৬১)

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ، كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ خَيْرَ مَنْزِلٍ، فَيَقُولُ: سَلْ وَتَمَنَّ، فَيَقُولُ: أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا فَأُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ"

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "জান্নাতীদের মধ্যে হতে এক ব্যক্তিকে আনা হবে। মহান মহীয়ান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বলবেনঃ হে আদম সন্তান! তোমার বাসস্থান কেমন পেলে? সে বলবেঃ হে আমার প্রতিপালক! সর্বোত্তম স্থান। তিনি বলবেনঃ আরও কিছু চাও এবং আকাক্সক্ষা কর। তখন সে ব্যক্তি বলবেঃ 'হে আল্লাহ্! আমি চাই, আপনি আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন। আমি আপনার রাস্তায় দশবার শহীদ হই।' কেননা সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখতে পেয়েছে। (সহীহ, সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৬০)

শহীদদের লাশ কবরেও অক্ষত থাকে:

* এছাড়াও হাদীসে পাক হতে শহীদদের আরো কয়েকটি বিশেষ ফাযায়েল পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং শহীদগণ যেহেতু কবরে জীবিত, সেহেতু কবরের মাটির জন্য তাঁদের দেহ ভক্ষণ করা হারাম করে দেয়া হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِيْ صَعْصَعَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجَمُوْحِ وَعَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَّيْنِ ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا مِمَّا يَلِيْ السَّيْلُ، وَكَانَا فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ وَهُمَا مِمَّنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فَحُفِرَ عَنْهُمَا لِيُغَيِّرَ مِنْ مَكَانِهِمَا، فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرَا كَأَنَّهُمَا مَاتَا بِالْأَمْسِ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ، فَدُفِنَ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَأُمِيْطَتْ يَدُهُ عَنْ جُرْحِهِ، ثُمَّ أُرْسِلَتْ فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ، وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُمَا سِتٌّ وَأَرْبَعُوْنَ سَنَةً -المطأ مالك ، مشارع الأشواق : ١١١٣-٧٠١

হযরত ইবনে মালেক রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, হযরত আমর বিন জামূহ ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর কবর বন্যার তোড়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। উনারা দুজন ছিলেন উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী আনসারী সাহাবী। দু'জনকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিল। কবরটি ভেঙ্গে যাওয়ায় অন্যত্র তাদেরকে দাফন করার জন্য কবরটি ভালোভাবে খনন করতে গিয়ে দেখা গেল, তাঁদের দেহে লেশমাত্র পরিবর্তন আসেনি। মনে হলো যেন গতকালই শহীদ হয়েছেন মাত্র। ইহা উহুদ যুদ্ধের ৪৬ বৎসর পরের ঘটনা। (মুআত্তায়ে ইবনে মালেক রাহি., মাশারিউল আশওয়াক্ব)

عَنْ أَبِيْ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُجْرِيَ الْكَظَامَةَ قَالَ: قِيْلَ مَنْ كَانَ لَهُ قَتِيْلٌ فَلْيَأْتِ قَتِيْلَهُ يَعْنِيْ قَتْلَى أُحُدٍ قَالَ: فَأَخْرَجْنَاهُمْ رِطَابًا يَتَثَنَّوْنَ، قَالَ فَأَصَابَتِ الْمِسْحَاةُ أُصْبُعَ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَانْفَطَرَتْ دَمًا- كتاب الجهاد لإبن المبارك، مصنف عبد الرزاق، مشارع الأشواق ١١١٤-٧٠١

হযরত আবী যুবাইর (র.) বর্ণনা করেন, হযরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, যখন হযরত আমীরে মুআবীয়া (রা.) মদীনায় নহর ক্ষণন কাজের ইচ্ছা করলেন। তখন ঘোষণা করে দিলেন যে, যদি কারো কোন পরিচিত শহীদদের লাশ নজরে পড়ে তারা যেন তা বুঝে নেয়। অতঃপর কিছুসংখ্যক এমন শহীদের লাশ পাওয়া গেছে যা সম্পূর্ণই অক্ষত। লাশগুলো বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন হয়নি। এমনকি ক্ষণন কাজ সম্পাদনের সময় এক শহীদের পায়ে কোদালের আঘাতের সাথে সাথে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। (এই ঘটনাটি উহুদ যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পরের।) (কিতাবুল জিহাদ, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, মাশারিউল আশওয়াক্ব)

* শুহাদায়ে উহুদ ছাড়াও আকাবিরে উম্মত সম্পর্কে সীরাত ও ইতিহাসের বিভিন্ন কিতাবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, দাফন করার দীর্ঘ কয়েক বছর পরও তাদের দেহে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

বর্তমান যামানায়ও আফগানিস্তান, ইরাক ও সিরিয়ার যুদ্ধে এমন বহু নিদশর্ন পাওয়া যায়, সেখানে শহীদানের লাশ পঁচে না এবং লাশ হতে অপার্থিব খুশবু বের হয়। শাহাদাতের সময় শহীদকে জান্নাতে তার স্থান দেখানো হয়। ফলে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে এবং হাসতে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ! হযরত ড. আব্দুল্লাহ আয্যাম রচিত "আয়াতুর রহমান ফী জিহাদিল আফগান" (আফগানিস্তানে আমার দেখা আল্লাহর নিদর্শন) কিতাবটিতে এরকম বহু নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে।

কিতাবের লিংক:- https://archive.org/details/allahor-nidorshon

জিহাদ ও শাহাদাতের আরো ফাযায়েল জানতে 'ফাযায়েলে জিহাদ' কিতাবটি পড়ুন। কিতাবের লিংক: https://archive.org/details/fazael-e-jihad

নবীজী ﷺ -এর শহীদী তামান্না

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ ফরমান,

والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل

"সে সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জান! অবশ্যই আমি আশা করি: আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাব এবং এতে শহীদ হয়ে যাব, এরপর আবার জিহাদে যাব এবং আবার শহীদ হবো, এরপর আবার জিহাদে যাব এবং আবার শহীদ হয়ে যাবো।" (বুখারী-৩১২৩ এবং মুসলিম-১৮৭৬)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: وَلَوَدِدْتُ أَنِّيْ قُتِلْتُ فَيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيِيْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ـ البخاري، المشارع الأشواق ٦٦٥ـ ١٠٨٨

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুলাহ ﷺ ইরশাদ করেন- আমি পছন্দ করি যে, আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করে শহীদ হব। অতঃপর পুনরায় জীবিত করা হবে, আবার শহীদ হবো, আবার জীবিত করা হবে, আবার শহীদ হব, আবার জীবিত করা হবে আবার শহীদ হব। (সহীহ বুখারী, মাশারিউল আশওয়াক্ব)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ سَرِيَّةٍ، وَلَكِنْ لَا يَجِدُونَ حَمُولَةً، وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيِيتُ، ثُمَّ قُتِلْتُ، ثُمَّ أُحْيِيتُ، ثُمَّ قُتِلْتُ ثَلَاثًا

"যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য না হতো, তাহলে আমি কোন যুদ্ধে গমন হতে অনুপস্থিত থাকতাম না। তারা কোন বাহন পায় না, আর আমিও তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করতে পারি না। আর যদি আমার সঙ্গে যাওয়া হতে অনুপস্থিত থাকা তাদের জন্য কষ্টকর না হতো, তবে আমার বাসনা হয় যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হই, পুনরায় জীবিত হই, পুনরায় শহীদ হই, পুনরায় জীবিত হই, পুনরায় শহীদ হই। (তিনি) তিনবার (এরূপ বললেন)।" (সহীহ, সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৫১)

قَالَ ابْنُ أَبِي عَمِيرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَلَأَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي أَهْلُ الْوَبَرِ وَالْمَدَرِ

ইবনে আবূ আমীরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺইরশাদ করেন, "শহরবাসী এবং গ্রামবাসী (অর্থাৎ পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত যা আছে সব কিছু) আমার জন্য হোক, তা হতে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়।" (হাসান, সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৫৩)

জীবনের প্রকৃত সফলতা কী?

প্রিয় ভাই! সেই স্তরের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করুন, যার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যাশা করে গিয়েছেন।

সন্দেহ নেই, কোথায় জীবনের প্রকৃত সফলতা নিহিত, আসমান যমীনের প্রতিপালক প্রিয় নবী ﷺ-কে ওহি করে তা জানিয়েছেন!! আর এজন্যই তিনি ﷺ বারবার শহীদ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন।

সেই প্রকৃত সফলকাম হবে যাকে আল্লাহ সুব. শহীদ হিসেবে কবুল করবেন। তাই আমাদের জীবনের মূল আকাঙ্ক্ষা সেটাই হওয়া চাই, যার তামান্না স্বয়ং প্রিয় নবীজী ﷺ বারবার প্রকাশ করে গিয়েছেন। আর এটিই জীবনের প্রকৃত সফলতা।

প্রিয় ভাই!

জীবনের সফলতার অর্থ যদি টাকা-পয়সা উপার্জন করা হয়, তাহলে শহীদকে যে ধন-সম্পদ দেয়া হবে তার তুলনায় দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ মাছির পাখার সমানও নয়।

যদি সফলতা উন্নতমানের খাবার-দাবারের নাম হয়ে থাকে, তবে শহীদের মেহমানদারি জান্নাতের সর্বোন্নত মাছ দিয়ে করা হবে।

যদি সফলতা সুন্দর সুন্দর ঘর-বাড়ি বানানোর মধ্যে হয়ে থাকে, তাহলে ভাই শুনে নিন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ رَحْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ المُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ قَالَ :إِنَّ لِلشَّهِيدِ غُرْفَةٌ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْجَابِيَةِ، أَعْلَاهَا الدُّرُّ وَالْيَاقُوتُ، وَجَوْفُهَا الْمِسْكُ وَالْكَافُورُ قَالَ: فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ بِهَدِيَّةٍ مِنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَمَا تَخْرُجُ حَتَّى يَدْخُلُ عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ آخَرُونَ مِنْ بَابٍ آخَرَ بِهَدِيَّةٍ مِنْ رَبِّهِمْ -الجهاد لابن المبارك - المجلد - ১ الصفحة - ৪০جامع الكتب الإسلامية

ابن المبارك، الجهاد لابن المبارك، مجلد১ ، صفحة৪০ ، تونس، الدار التونسية - تونس

মুত্তালিব ইবনে হানতাব বর্ণনা করেন, "শহীদের জন্য এমন প্রাসাদ রয়েছে, যার প্রশস্ততা ইয়ামানের শহর সানা থেকে শামের শহর জাবিয়াহ পর্যন্ত বিস্তৃত। যেটা বানানো হয়েছে বাহিরে হীরা ও ইয়াকুত দিয়ে এবং ভিতরে মিস্ক ও কাফুর দিয়ে।"

যদি সফলতা সুন্দরী রমনীকে বিয়ে করা হয়ে থাকে, তবে এক্ষেত্রেও কি শহীদের মোকাবেলা কোনো দুনিয়াদার ব্যক্তি করতে পারবে? যে কেউ শহীদ হওয়ার সাথে সাথেই জান্নাতের দুইজন হুর জান্নাত থেকে একশত জোড়া পোশাক নিয়ে শহীদের কাছে পৌঁছে যায় এবং তার চেহারায় হাত বুলিয়ে তার আগমনের শুভ সংবাদ শুনায়। এমন হুর যাদের সৌন্দর্যের সামনে দুনিয়ার সব সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যাবে, যাকে দেখে পূর্ণিমার চাঁদও লজ্জা পাবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন-

وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلأَتْهُ رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

"জান্নাতী কোন হুর যদি দুনিয়াবাসীদের প্রতি উঁকি দিত, তাহলে আসমান ও যমীনের মাঝের সব কিছু আলোকিত এবং সুরভিত হয়ে যেত। আর তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও তার সবকিছু চেয়ে উত্তম।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৭৯৬)

প্রিয় ভাই! আপনি জানেন কি, জান্নাতে একজন শহীদ স্ত্রী হিসেবে কতজন হূর পাবে?

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ فِيْ الْجَنَّةِ قَصْرٌ، يُقَالَ لَهُ عَدَنٌ، فِيْهِ خَمْسَةُ اٰلَافِ بَابٍ عَلٰى كُلِّ بَابٍ خَمْسَةُ اٰلَافِ حِبَرة قَالَ يَعْلَ أَحْسَبُهُ، قَالَ : لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ ، أَوْ صِدِّيْقٌ، أَوْ شَهِيْدٌ - مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجهاد، مشارع الاشواق ٧٢٤- ١١٣١

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি. বর্ণনা করেন, জান্নাতে একটি প্রাসাদ আছে যার নাম 'আদন'। তাতে পাঁচ হাজার দরজা রয়েছে, আবার প্রত্যেক দরজায় পাঁচ হাজার করে হূর রয়েছে। এতে কেবল নবী, সিদ্দিক ও শহীদগণ প্রবেশ করবেন।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, মাশারিউল আশওয়াক্ব)

সুবহানাল্লাহ!

যদি সফলতা এটাকে বলা হয়ে থাকে যে, সন্তান পিতা-মাতা, নিজ পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের উপকারে আসবে, তবে শহীদ কেয়ামতের দিনে নিজের পিতা-মাতা এবং আত্মীয়স্বজনের উপকারে আসবে যেদিন কেউ কাউকে জিজ্ঞাসাও করবে না; যেদিন পিতা-মাতা সন্তান হতে আর সন্তান পিতা-মাতা হতে পালাবে; স্বামী স্ত্রী হতে আর স্ত্রী তার স্বামী হতে পালাবে। মানুষ নিজের ঘামে ডুবে একটি নেকির সন্ধানে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের কাছে ধরনা দিতে থাকবে।

ঐদিন শহীদ সেসব আত্মীয়-স্বজনের উপকারে আসবে যাদের ব্যাপারে জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে।

عَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :يُشَفَّعُ الشَّهِيْدُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ - ابو داود كتاب الجهاد باب في الشهيد يشفع، البيهقى كتاب السير باب الشهيد يشفع، مشارع الاشواق৭৩৯-১১৪৮

হযরত আবূ দারদা রাদি. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "শহীদ নিজ পরিবারভূক্ত সত্তরজনের জন্য সুপারিশ করবে।" (আবু দাউদ, বাইহাক্বী, মাশারিউল আশওয়াক্ব)

প্রিয় ভাই, জীবনের সফলতা আসলে কী?

আমরা তো প্রকৃত সফলতার দিকে তখন অগ্রসর হতে থাকব, যখন আমাদের অন্তরগুলো শাহাদাত লাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে, আমাদের অন্তরগুলো ছোট ছোট জিনিসের মধ্যে আটকে থাকবে না, আমরা সব কিছুকে পিছনে রেখে সবচেয়ে উঁচু জিনিসের নির্বাচন করব। না দুনিয়ার ধন-সম্পদ আমাদের দৃষ্টি কাড়বে, না দুনিয়ার যশ-খ্যাতি আমাদের প্রভাবিত করবে, না আমাদের মনে বেপরোয়া রূপের আকর্ষণ প্রভাব বিস্তার করবে, আর না দুনিয়ার কোনো মোহ আমাদের প্রলুব্ধ করতে পারবে।

বরঞ্চ, আমাদের অন্তরগুলো চিরস্থায়ী জান্নাতের নেয়ামতসমূহের প্রতি লেগে থাকবে, যা আমরা শাহাদাতের সাথে সাথে লাভ করব, যার ওয়াদা মহান প্রতিপালক দিয়েছেন-

وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَٰلَهُمْ ۝٤ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝٥ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝٦

"যে আল্লাহর রাহে শাহাদাত লাভ করে তার আমলসমূহ কস্মিনকালেও বিনষ্ট করা হবে না। তিনি তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবেন, (পরকালে তাদের) অবস্থা ভাল করে দিবেন এবং তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যা তাদেরকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭: ৪-৬)

প্রিয় ভাই!

জান্নাতে একজন শহীদকে যে সম্মান দেয়া হবে, কখনোই তার তুলনা হতে পারে না; তাকে এই পরিমাণ সম্মানিত করা হবে যে, সে দশবার দুনিয়াতে ফিরে এসে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে পুনরায় শহীদ হতে চাইবে যাতে করে আবারো তাকে একইভাবে সম্মানিত করা হয়; অথচ অন্য কোনো জান্নাতী কস্মিনকালেও এমনটি আকাঙ্ক্ষা করবে না।

আর শহীদের জান্নাতের সৌন্দর্য কখনও মলিন হবে না; যেখানে জীবনের স্থায়িত্ব সর্বদা যৌবনের শীর্ষে থাকবে, না কোনো দুঃখ-দুর্দশা আমাদের স্পর্শ করবে; সেখানে সব কিছু থাকবে যা কোনো অন্তর তামান্না করতে পারবে; সেখানে সব মনোবাসনা পূর্ণ করা হবে যা কোনো অন্তর চাইতে পারে, সমস্ত চাহাদগুলো সেখানে বাস্তবতার রূপ ধারণ করবে। জগতসমূহের প্রতিপালক ইরশাদ করেন,

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝٣١

"সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমরা দাবী করবে।" (সূরা হা-মীম-সিজদাহ ৪১:৩১)

তাহলে ভাই, আপনিই চিন্তা করুন, যাদের কাছে সাফল্যের মাপকাঠি এতটা উঁচু, তাদের কাছে দুনিয়াদারদের জীবনের সাফল্যের স্থান কোথায়, যা কিনা মাছির ডানার বরাবরও নয়!

আমার প্রিয় ভাই! আপনিই সিদ্ধান্ত নিন,

কারা জীবনের ব্যাপারে উত্তম পরিকল্পনা করেছেন?

কারা নিজেদের বোধশক্তিকে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগিয়েছেন?

কাদের সংকল্প ও অভিপ্রায় দূরদৃষ্টি সম্পন্ন?

কারা জীবনকে বহু দূর পর্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছেন?

কারা জীবনের প্রকৃত সফলতায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন?

.........কারা????

.........আর এটাই মহাসাফল্য!!

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۝١١١

"আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে, অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক (সত্যবাদী)? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। **আর এ হল মহান সাফল্য।**" (৯ সূরা তাওবা: ১১১)

সুবহানাল্লাহ্!

فَلْيُقاتِل فى سَبيلِ اللَّهِ الَّذينَ يَشرونَ الحَياةَ الدُّنيا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقاتِل فى سَبيلِ اللَّهِ فَيُقتَل أَو يَغلِب فَسَوفَ نُؤتيهِ أَجرًا عَظيمًا

"সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। আর যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা পুরস্কার।" (সূরা নিসা ৪:৭৬)

আমার প্রিয় ভাই!

জীবনের প্রকৃত এই সফলতার দিকটি সবচেয়ে বেশি অনুধাবন করেছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিজ হাতে গড়া সাহাবায়ে কেরামগণ! চলুন দেখা যাক, কেমন ছিল সাহাবায়ে কেরামের শহীদী তামান্না!!

সাহাবায়ে কেরামের শহীদী তামান্না

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ....فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ " . قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ بَخٍ بَخٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ " . قَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا . قَالَ " فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا " . فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ - قَالَ - فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ . ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ .

** হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদি. হতে বর্ণিত,........... বদরের ময়দানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এবার প্রস্তুত হয়ে যাও জান্নাতে যাওয়ার জন্য, যে জান্নাতের বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর সমান।" হযরত উমাইর ইবনুল হুমাম আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজীর কথাটি শুনলেন। তিনি খেজুর খাচ্ছিলেন। এরপর বলতে থাকেন: "যদি আমি এই খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত জীবিত থাকতে চাই তাহলে তো (জান্নাতে যেতে) অনেক দেরী হয়ে যাবে।" তাঁর কাছে যা খেজুর ছিল সব দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে কাফিরদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে শহীদ হয়ে গেলেন। (মুসলিম-৪৮০৯, আবু দাউদ-২৬১৮)

عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ يَوْمَ أُحُدٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ :فِي الْجَنَّةِ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ

** উহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বলল: আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমি কোথায় থামব? তা আমাকে বলুন। তিনি ﷺ বললেনঃ জান্নাতে। তারপর সে ব্যক্তি তার হাতের খেজুর ফেলে দিয়ে যুদ্ধে যোগদান করলো এবং শহীদ হয়ে গেল। (সহীহ, সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৫৪)

عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ، لَئِنِ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ ـ يَعْنِي أَصْحَابَهُ ـ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ " ـ يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ ـ ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ، الْجَنَّةَ، وَرَبِّ النَّضْرِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ. قَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ. قَالَ

أَنَسٌ فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ أَنَسٌ كُنَّا نَرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ. وَقَالَ إِنَّ أُخْتَهُ وَهْىَ تُسَمَّى الرُّبَيِّعَ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا. فَرَضُوا بِالأَرْشِ وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ ".

** হযরত আনাস ইবনে নদর রাদিয়াল্লাহু আনহু বদরের লড়াইয়ে শরীক হতে পারেন নি। তাই তিনি নিবেদন করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি মুশরিকদের সাথে যে প্রথম লড়াই করেছেন তাতে আমি শরীক হতে পারিনি। আগামীতে মুশরিকদের সাথে যে লড়াই হবে তাতে যদি আমি শরীক হতে পারি, তাহলে আল্লাহ পাক দেখে নিবেন আমি কী করি। এরপর যখন ওহুদের যুদ্ধ সংগঠিত হলো এবং মুসলমানরা বাহ্যত পরাজিত হলো তখন তিনি বলতে থাকেন, "হে আল্লাহ! এরা (মুশরিকরা) যা কিছু করেছে তা থেকে নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করছি। একথা বলে তিনি সামনে সা'দ ইবনে মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে চলে আসেন। তখন বলতে থাকেন: "হে সা'দ ইবনে মুআয! নদরের রবের শপথ! উহুদের পাহাড়ের কাছ থেকে আমি জান্নাতের খুশবু পাচ্ছি।" এরপর তিনি দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। হযরত আনাস রাদিয়াল্লহু আনহু বলেন,"আমরা তাঁর (হযরত আনাস ইবনে নদর রদিয়াল্লহু আনহুর) গায়ে আশিটিরও অধিক তলোয়ার, বর্শা ও তীরের আঘাত দেখতে পাই এবং আমরা তাঁকে এমন অবস্থায় পেয়েছিলাম তখন তিনি শহীদ হয়ে গিয়েছেন এবং মুশরিকরা তাঁর চেহারা মুবারক বিকৃত করে দিয়েছিল। ফলে তাঁর বোন ব্যতীত কেউ তাঁকে চিনতে পারেননি এবং তিনিও তাঁকে চিনেছিলেন তাঁর আঙুলের অগ্রপ্রান্তগুলো দেখে।" হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা মনে করি এবং আমাদের মত হচ্ছে এটাই যে নিম্নোক্ত আয়াতটি তাঁর এবং তাঁর মত লোকদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে: "মুমিনদের মাঝে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে তাদের কৃত ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করেছে। আবার তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছে যারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছেছে।" আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (বুখারী-২৭০৩,২৮০৬, মুসলিম-১৯০৩, নাসায়ী-৪৭৫৫)

** ওহুদের যুদ্ধে সকল ছাহাবায়ে কেরাম শাহাদাতের এমন তামান্না, এমন অসাধারণ বীরত্ব ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন, যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর কখনোও কোথাও পাওয়া যায় না। হযরত আবু তালহা রদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে বুক টান করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সাধারণ মুসলমানরা পরাজিত হয়ে প্রিয় নবী ﷺ- এর কাছে না এসে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছিলেন। তাঁর কাছে কেউ ছিল না, কেবল হযরত আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের শরীরকে ঢাল বানিয়ে নবীজী ﷺ এর সম্মুখে প্রতিরোধ ব্যূহ হয়ে দাঁড়ালেন। এভাবে নবীজী -ﷺ এর দিকে কোনো তীর আসলে তিনি তাঁর বুক দিয়ে তা ফিরাতে লাগলেন। একসময় তিনি ঢলে পড়লেন, ইতোমধ্যেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্য কয়েকজন সাহাবী চলে আসলেন। নবীজী ﷺ বললেন, তোমাদের ভাই আবু তালহাকে সামলাও। সে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে। তিনি শহীদ হলে দেখা গেল, তাঁর শরীরে আশিটিরও অধিক আঘাত ছিল। একই ভাবে হযরত আবু দোজানা রাদিয়াল্লাহু আনহুও নবী করীম -ﷺ এর দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং নিজের পিঠকে ঢাল স্বরূপ পেতে দিলেন। তাঁর পিঠে এসে শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীর বিঁধছিল, তিনি একটুও নড়ছিলেন না। হযরত মুস'আব ইবনে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি ইবনে কোম্মা ও অন্যদের আঘাত প্রতিরোধ করছিলেন। তাঁর হাতেই ছিলো ইসলামের পতাকা। শত্রু সৈন্যরা তাঁর ডান হাতে এমন আঘাত করে যে, তাঁর হাত কেটে যায়। তিনি তখন

তাঁর বাম হাতে ইসলামের পতাকা তুলে ধরেন। কিন্তু শত্রুদের হামলায় তার বাম হাতও কেটে যায়। তিনি তখন ইসলামের পতাকা তাঁর দুই বাহু দিয়ে বুকের সাথে জড়িয়ে উর্ধ্বে তুলে ধরেন। এরপর এই অবস্থায় দুশমনের আঘাতে তিনি শহীদ হয়ে যান। (আর রাহীকুল মাখতুম)

** বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী কাফেররা যখন হযরত হারাম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বর্শা বিদ্ধ করল এবং বর্শাটি তাঁকে এফোঁড় ওফোঁড় করল, তখন তিনি বলতে লাগলেন,

فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

"কা'বার রবের শপথ! আমি তো সফলকাম হয়ে গেছি।" (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

** মুতার যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে এক ভয়াবহ অসম যুদ্ধ। এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনজন সেনাপতি নির্বাচন করে দিয়েছিলেন এই শর্তে যে, একজন শহীদ হলে আরেকজন পতাকা তুলে নিবেন। মুতার যুদ্ধে মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্য দুই লক্ষাধিক রোমান-আরব সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মুসলমানরা এই বিশাল সংখ্যক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে প্রস্তুত ছিলেন না। আসলে তারা কল্পনাও করেননি, কাফেরদের বাহিনী এত বিশাল হবে। তাই সিদ্ধান্ত হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে পত্র পাঠিয়ে শত্রুর লোক লস্করের সংখ্যা জানাবেন। তিনি হয় আরো সৈন্য পাঠাবেন, নচেত যা ভালো মনে করেন নির্দেশ দিবেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মুসলমানদের উৎসাহিত করে বললেন,

يَا قَوْمِ، وَاللَّهِ إِنَّ الَّتِي تَكْرَهُونَ، لَلَّتِي خَرَجْتُمْ تَطْلُبُونَ الشَّهَادَةُ، وَمَا نُقَاتِلُ النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ، مَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَّا بِهَذَا الدِّينِ الَّذِي أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِهِ، فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا هِيَ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِمَّا ظُهُورٌ وَإِمَّا شَهَادَةٌ

"হে মুসলমানগণ! আল্লাহর কসম, আজ তোমরা যা অপছন্দ করছ সেটাই তোমরা কামনা করছিলে। আর তা হলো শাহাদাত। আমরা সংখ্যা-শক্তি বা সংখ্যাধিক্যের জোরে লড়াই করি না। যে জীবনব্যবস্থার দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন তার জন্য আমরা লড়াই করি। অতএব এগিয়ে যাও, বিজয় বা শাহাদাত এ দুটো উত্তম জিনিসের যে কোন একটা অবশ্যই আমাদের জন্য নির্ধারিত আছে।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ:২৬২)

** মুতার যুদ্ধের প্রধান ও প্রথম সেনাপতি হযরত যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পতাকা বহনরত অবস্থায় প্রাণপণ যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর দ্বিতীয় সেনাপতি হযরত যাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু পতাকা তুলে নেন। তিনি প্রথমে ডান হাতে পতাকা তুলে ধরেন। শত্রুর তরবারিতে ডান হাত কাটা গেলে বাম হাতে পতাকা তুলে ধরেন। এরপর সে হাতও কাটা পড়ল। তখন তিনি তা দুই ডানা দিয়ে চেপে ধরলেন। এরপর শত্রুর আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন। এসময় তাঁর বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাকে দুই খানা ডানা দেন, যা দিয়ে তিনি যেখানে খুশী উড়ে বেড়াতে থাকেন। কথিত আছে, একজন রোমক সৈন্য তাঁকে তরবারীর আঘাতে দ্বিখন্ডিত করে ফেলেছিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ: ২৬৩)

হযরত জাফর রাদিয়াল্লহু আনহু শহীদ হওয়ার পর দেখা যায়, তাঁর দেহে তীর ও তলোয়ারের পঞ্চাশটি (আরেক বর্ণনা অনুযায়ী নব্বইটি) আঘাত ছিল। এসব আঘাতের একটিও পিছনের দিকে ছিল না। (ফতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃ: ৫১২)

** তাবুক যুদ্ধে যোগদান করার জন্য আনসার ও অন্যান্যদের মধ্য থেকে সাতজন মুসলমান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে সওয়ারী জানোয়ার চাইলেন। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। নবীজী তাঁদেরকে সওয়ারী বাহন দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। ফলে তাঁরা জিহাদে যেতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যান। ইতিহাসে এরা 'বাকুন' অর্থাৎ ক্রন্দনকারী নামে পরিচিত। এঁরা হলেন: হযরত সালেম ইবনে উমায়ের, হযরত উলবা ইবনে যায়িদ, হযরত আবু

লায়লা আব্দুর রহমান, হযরত আমর ইবনে হুমাম, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাগাফ্ফাল মুযানী রাদিয়াল্লাহু আনহুম আযমাঈন। এঁদের মধ্যে দু'জন হযরত আবু লায়লা আব্দুর রহমান ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে কাঁদতে দেখে হযরত ইবনে ইয়ামীন ইবনে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কাঁদছ কেন?" তাঁরা বললেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ -ﷺ এর কাছে গিয়েছিলাম তাবুক অভিযানে যাওয়ার জন্য সওয়ারী চাইতে। কিন্তু তিনি দিতে পারেননি। আমাদের কাছেও এমন কিছু নেই যা দ্বারা তাঁর সাথে অভিযানে যেতে পারি।" তখন ইবনে ইয়ামীন তাদেরকে একটি উট এবং কিছু খোরমা দিলেন। তাঁরা ঐ সওয়ারীতে চড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে অভিযানে চলে গেলেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ " . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ رَثُّ الْهَيْئَةِ أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُهُ قَالَ نَعَمْ . فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ . وَكَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيِّ . وَأَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هُوَ اسْمُهُ

** আবূ বাকর ইবনু আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শত্রুর মোকাবিলায় আমি আমার বাবাকে (যুদ্ধক্ষেত্রে) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তলোয়ারের ছায়াতলে জান্নাতের দরজাসমূহ। দলের উস্কখুস্ক একজন লোক বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কি তা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি তার সঙ্গীদের নিকট ফিরে গিয়ে বললেন, আমি তোমাদের বিদায়ী সালাম জানাচ্ছি। এই বলে তিনি নিজ তলোয়ারের খাপ ভেঙ্গে ফেললেন এবং তলোয়ার দ্বারা (শত্রুর প্রতি) আঘাত হানতে থাকেন। অবশেষে তিনি শহীদ হন। (সহীহ, মুসলিম, জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৬৫৯)

কী রহস্য ছিল, সাহাবায়ে কেরামের এই বীরত্বের?

কী রহস্য ছিল, সাহাবায়ে কেরামের এই বীরত্বের? কেন তারা মৃত্যুকে এভাবে ভালোবাসতে পেরেছিলেন? কেন তারা শাহাদাতের জন্য উতলা হয়ে থাকতেন? কেন তারা দুনিয়ার সব সুখ, চাওয়া-পাওয়া, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি বিসর্জন দিতে পেরেছিলেন দ্বীন ইসলামের জন্য? এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নিম্নের দুটি উদাহরণ হতে-

** শাহাদাত বরণের প্রাক্কালে হযরত জাফর ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এই কবিতা আবৃত্তি করলেন:

يا حبّذا الجنّة واقترابها
طيّبةً وبارداً شرابُها
والروم روم قد دنا عذابُها
كافرةٌ بعيدةٌ أنسابُها
عليَّ إذْ لاقيتُها ضرابُها

"আহ্! কী চমৎকার জান্নাত এবং তার সান্নিধ্য লাভ!
জান্নাত যেমন অতি উত্তম ও পবিত্র, তার পানীয়ও তেমনি।
রোমকদের আযাব ঘনিয়ে এসেছে,
তারা কাফির এবং আমার তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট,
তাদের সাথে মিলিত হওয়ার সময় তাদেরকে আঘাত করা আমার উপর আবশ্যক।"

(সীরাতে ইবনে হিশাম, মূতার যুদ্ধ অধ্যায়)

** মুতার যুদ্ধে হযরত জাফর রাদিয়াল্লহু আনহুর পর পতাকা তুলে নেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এবং ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। তিনি ঘোড়া হতে নেমে লড়াইতে অংশগ্রহণ করবেন কিনা ভাবতে ও কিছুটা ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। অতঃপর স্বগতভাবে বললেন,

أقسمتُ يا نفسُ لَتَنْزِلنّهْ — لتنزِلَنْ أو لَتُكْرَهِنَّهْ
إن أجلب الناس وشدُّوا الرَّنَّهْ — مالِي أراكِ تكرهين الجنّهْ
قد طال ما قد كنتِ مطمئنّهْ — هل أنتِ إِلَّا نُطْفةٌ فِي شَنَّهْ
يا نفسُ إلاَّ تُقْتَلِي تموتِي — هذا حمامُ الموت قد صليت
وما تمنَّيْتِ فقد أُعْطِيْتِ — إن تفعلي فِعْلَهُمَا هُدِيْتِ

"কসম খেয়ে বলছি, হে ইবনে রাওয়াহা, এই ময়দানে তোমাকে নামতেই হবে, হয় তোমাকে নামতেই হবে, নচেত তোমাকে অপছন্দ করতে হবে। সকল মানুষ যদি রণহুঙ্কার দিয়ে জমায়েত হয়ে থাকে এবং তাদের মধ্যে কান্নার রোলও পড়ে থাকে, তোমাকে কেন জান্নাত সম্পর্কে নিস্পৃহ দেখছি? সুখে শান্তিতে অনেকদিন তো কাটিয়েছো, অথচ তুমি তো আসলে একটি পুরনো পাত্রে এক ফোটা পানি ছাড়া আর কিছুই ছিলে না।

হে আমার আত্মা, আজ যদি নিহত না হও তাহলেও তোমাকে একদিন মরতেই হবে। এটা (রণাঙ্গন) মৃত্যুর ঘর যাতে তুমি প্রবেশ করেছো। তুমি এ যাবৎ যা চেয়েছো পেয়েছো। এখন যদি ঐ দু'জনের মতো (যায়িদ ও জাফর) কাজ কর তাহলে সঠিক পথে চালিত হবে।"

এরপর তিনি তরবারী হাতে অগ্রসর হলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, মূতার যুদ্ধ অধ্যায়)

(আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও সাহাবায়ে কেরামের পরিপূর্ণ অনুসারী বানান। আমীন।

যেই বিষয়গুলো সাহাবায়ে কেরামকে জিহাদে অংশগ্রহণ করা ও তাতে বীরত্ব প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করত তা হলো-

১. আল্লাহর একটি ‘ফরয হুকুম’ লঙ্ঘনের ভয়

২. আল্লাহ তা‘আলার সামনে দাঁড়ানো ও জবাবদিহিতার ভয়

৩. নিফাকের ভয়

৪. দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্বের হাকীকত অনুধাবন

৫. শাহাদাতের ফাযায়েল এবং জান্নাতের নায-নেয়ামত লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

চিত্র: জান্নাতুল ফিরদাউসে পৌঁছার অতি সহজ ও সংক্ষিপ্ত রাস্তার একটি প্রতীকী মানচিত্র।

অতএব, হে ভাই!

এমন কেউ কি আছে, যে নিজের জীবন কে ভালোবাসে, যে মরতে চায় না, অনন্ত জীবন আশা করে?.........

তাহলে, আমাদের উচিত শাহাদাতের তামান্না রাখা।

এমন কেউ কি আছে, যে নিজের দেহকে ভালোবাসে, যেন তার দেহ কবরেও না পঁচে, পোকা-মাকড়ের আহার্যে পরিণত না হয়?..........

তাহলে আমাদের উচিত শাহাদাতের পথে অগ্রসর হওয়া।

এমন কেউ কি আছে, যে চায় তার মৃত্যু কষ্ট না হোক?.............

তাহলে আমাদের উচিত আল্লাহ তা'আলার কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে।

এমন কেউ কি আছে, যে চায় তার কবরে হিসাব না হোক, কবরের আযাব না হোক?...............

তাহলে আমাদের উচিত শহীদী তামান্না নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া।

এমন কেউ কি আছে, যে কামনা করে রূহ দেহত্যাগ করার সাথে সাথেই হূরে ঈ'নের সাথে মিলিত হতে এবং জান্নাতে সবুজ পাখি হয়ে যথেচ্ছা ঘুরে বেড়াতে?............

তাহলে আমাদের জন্য অতি সংক্ষিপ্ত রাস্তা হলো শাহাদাত।

এমন কেউ কি আছে, যে চায় কিয়ামতের মহা বিভীষিকা হতে নিরাপদ থাকতে, হাশরের ময়দানে আরশের নিচে ছায়া পেতে?................

তাহলেও আমাদের জন্য একটি সহজ রাস্তা 'শাহাদাত'।

এমন কেউ কি আছে, যে চায় বিনা হিসেবে জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করতে?.............

ওহে বন্ধু! 'জান্নাতুল ফিরদাউসে' পৌঁছার জন্য অতি সহজ ও সংক্ষিপ্ত রাস্তা 'শাহাদাত'।

সর্বশেষ কথা

প্রিয় ভাই! নিচের কথাগুলো একটু ভালোভাবে চিন্তা করি,

আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা, আমাদের মহান, মহীয়ান প্রতিপালক, আমাদের জন্য জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ ফরয করেছেন। স্বাভাবিকভাবে জিহাদ ফরযে কিফায়া। কিন্তু বিশেষ অবস্থায়, যেমন বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে জিহাদ করা অবশ্যই সক্ষম সকল মুসলমানের উপর ফরযে আইন, যেমনভাবে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও রমযান মাসের রোযা রাখা ফরযে আইন।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের উপর কেন জিহাদ ফরযে আইন করেছেন??

......যেন আমরা আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দুশমনদের হটিয়ে আল্লাহর বিধান কায়েম করি;

.......সমস্ত বাতিল মতবাদ আর জীবনাদর্শকে মিটিয়ে দিয়ে যেন আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করি;

......যেন মজলুম মুসলমানের বুকফাটা কান্নার আওয়াজ শুনে আমরাও ছটফট করি;

.......যেন তাদের জুলুম নির্যাতন থেকে উদ্ধার করতে বীরদর্পে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ি;

.......সারা জাহানের মুসলিম মিল্লাতের সকল মা-বোনের ইজ্জতকে নিজের আপন মা-বোনের মত হেফাযত করি;

.......দুনিয়ার সকল প্রকারের শিরকী, কুফুরি আর দাজ্জালি ফিতনার মূল উৎপাটন করে অন্যায় ও পাপাচার মুক্ত একটি 'আদল্ ও ইনসাফের সাম্রাজ্য কায়েম করি;

.......এককথায়, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ তা'আলার খলিফা (তথা প্রতিনিধি) হিসেবে সারা বিশ্বব্যাপী তাঁরই বিধান অনুযায়ী 'নবুওয়তের আদলে খিলাফত' কায়েম করি।

এই জন্যই জিহাদ। এজন্যই আল্লাহ্ পাক আমাদের উপর জিহাদ ফরযে আইন করেছেন। কিন্তু........

জিহাদ কোনো ছেলে-খেলা নয়! আল্লাহ্ সুব্হানাহু তা'আলার সকল হুকুমের মধ্যে বান্দার জন্য জিহাদ সর্বাপেক্ষা কঠিন ও ভারী হুকুম। অবশ্য তিনি যার জন্য সহজ করেন তার কথা স্বতন্ত্র।

জিহাদ যেন অশ্রু, ঘাম আর রক্তের হোলিখেলা। জিহাদ মানে সতত ত্রস্ততা, ভয় আর সীমাহীন আশংকা। জিহাদ মানে বাতিলের অন্ধকার কারাগারে নির্যাতনের স্টীমরোলার আর ধুঁকে ধুঁকে মরা। জিহাদ মানে দিবানিশি মৃত্যুর হাতছানি আর জীবন হারানোর আশংকা। জিহাদ মানে বুলেটের বিদীর্ণ আঘাতে জমিনে লুটিয়ে পড়া; বোমার আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও টুকরো-টুকরো হওয়া।

তাছাড়া, জিহাদ মানে নিন্দুকের নিন্দা, আর সমাজ থেকে বয়কট হওয়া। জিহাদ মানে পরিবার-পরিজন হারানো আর ক্যারিয়ার ধ্বংস হওয়া। এককথায়, জিহাদ মানে দুনিয়ার সর্বস্ব খোয়ানো; সর্বোচ্চ ক্ষয়-ক্ষতি আর দুঃখ-যাতনার সম্মুখীন হওয়া। এ এক ঈমানের ভয়ানক ও চরম পরীক্ষা!

প্রিয় ভাই! আল্লাহ্ তা'আলা কেবল জিহাদ ফরজই করেননি, জিহাদকে দুনিয়ার সকল কিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসতে হুকুম করেছেন। আবার কেবল হুকুমই করেননি, জিহাদকে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসতে না পারলে তার পরিণতির ব্যাপারে ধমকি আর হুমকিও দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَـٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَـٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَـٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা (ক্ষতি বা) বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর, এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত (দেখ, তোমাদের পরিণতি কি হতে যাচ্ছে), আর আল্লাহ তা'আলা ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" (০৯ সূরা তাওবাহ: ২৪)

অদ্ভূত বিষয়! জিহাদের মতো এমন একটি কঠিন আমলকে দুনিয়ার সবকিছু থেকে এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও ভালোবাসতে হবে; এটি কী করে সম্ভব, যার প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে দুঃখ-কষ্টের অমোঘ পঙক্তিমালা???

আবার রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর নিজ হাতে গড়া সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী সলফে সালেহীনদের সীরাতের দিকে তাকালে অবাক হতে হয়, কিভাবে তারা জিহাদকে এত ভালোবেসেছেন?? কিভাবে জিহাদ প্রেমে তাঁরা তাদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছেন?? কিভাবে তারা এত শাহাদাত প্রেমিক ছিলেন?? কিভাবে তারা আল্লাহর রাহে জীবন দেয়াকে 'নারী ও মদের' চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন?? এটা কিভাবে সম্ভবপর হয়েছে??? কী তার রহস্য???......

জ্বী ভাই! এটা তখনই সম্ভব-

.... যখন আমরা আল্লাহর হুকুম পালনের ব্যাপারে সত্যবাদী হব;

.... যখন আমরা জিহাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করব;

.... যখন আমরা জিহাদকে ততটুকু গুরুত্ব দিব যতটুকু গুরুত্ব আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর প্রিয় হাবীব ﷺ দিয়েছেন;

.... যখন আমরা সত্যিকার অর্থে উম্মতের ব্যথায় ব্যথিত হব;

.... যখন আমাদের অন্তরে 'মুনাফিক হয়ে যাওয়ার ভয়' প্রবেশ করবে;

.... যখন আমরা নিজেদেরকে আমলের নামে নিজেরাই ধোঁকা দিব না;

.... যখন আমাদের সামনে জিহাদের ফযীলত ও ফাযায়েলসমূহ থাকবে;

.... যখন আমাদের সামনে জীবন-মৃত্যুর হাকীকত সুস্পষ্ট হয়ে যাবে;

.... যখন আমাদের অন্তর থেকে 'মৃত্যুর ভয়' দূর হয়ে তার স্থানে 'শাহাদাতের তামান্না' জায়গা করে নিবে;

.... যখন আমরা বুঝব পরকালীন সাফল্যের জন্য শাহাদাতের কতটুকু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে;

...........যখন আমাদের অন্তর থেকে 'দুনিয়ার মহব্বত' দূর হয়ে তার স্থানে 'জান্নাত লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা' জায়গা করে নিবে;

.... যখন আমরা অনুধাবন করব যে, দুনিয়ার একটু ক্ষতি, কষ্ট আর বিরহের বিনিময়ে পরকালে আমাদের জন্য নয়ন-প্রীতিকর কী কী নিয়ামত লুকায়িত রয়েছে;

.... যখন আমাদের অন্তরে প্রকৃত 'আল্লাহর ভয়' পয়দা হবে;

.... যখন আমরা জাহান্নামের ভয় করব;

.... যখন আমাদের অন্তরসমূহ হতে 'ওয়াহন' বিদায় নিবে;

কেবল তখনই আমরা জান্নাতের বিনিময়ে আমাদের নিজেদের জান ও মাল আল্লাহর কাছে বিক্রি করে করে দিতে পারব।

.... এককথায়, জিহাদ আল্লাহ্ পাকের ফরয হুকুম- এই কথাটি, আর পাশাপাশি এই দুনিয়ার নশ্বরতা এবং পরকালের চিরস্থায়িত্ব ও জান্নাতের অফুরন্ত ও চিরন্তন নায-নেয়ামতসমূহ যদি আমাদের সামনে থাকে, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আশা করা যায়- 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্'র মেহনত করা আমাদের জন্য অনেক, অনেক সহজ হয়ে যাবে। ছুম্মা ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে জিহাদের গুরুত্ব বুঝার, এবং তাঁর কালিমা বুলন্দ করার মেহনত 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্'য় জুড়ার তাওফীক দান করুন। আমাদেরকে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করার তাওফীক দান করুন। তাঁর সত্যবাদী বান্দাদের কাফেলায় আমাদেরকে অন্তর্ভূক্ত করে নিন। আমীন। ইয়া রব্বাল 'আলামীন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَوَفَاةً بِبِلَدِ رَسُوْلِكَ

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার রাহে শাহাদাত দান করুন এবং আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শহরে শাহাদাত দান করুন।"

-হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু (মুয়াত্তায়ে মালেক)

হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকেও তোমার রাস্তায় শাহাদাতের জন্য কবুল কর এবং তোমার হাবীবের কদম মোবারকের পাশে (বাকীয়ে গারকাদ্-এ) একটু ঠাঁই দাও। আল্লাহুম্মা আমীন।

****

কিতাবুত্ তাহরীদ্ 'আলাল ক্বিতাল

চতুর্থ পর্ব: **তোমাকেই শুধু চাই, হে শাহাদাত!**

****

**** জাযাকুমুল্লাহু খাইরান ****

কিতাবুত তাহরীদ: দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হওয়ার পর **"দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্ ফোরাম"** এর মুহতারাম মুজাহিদ ভাইদের রিভিউ: নির্বাচিত কিছু স্ক্রীনশট্ (পোস্ট লিংক: https://bit.ly/tahrid4)

03-27-2023, 12:48 AM #15

ওয়াও!!! অ-সাধারণ একটি পোস্ট!!!
মা শা আল্লাহ! মা শা আল্লাহ!!
আল্লাহ পাক আপনাদের খিদমতকে কবুল করুন এবং আমাকেও শহীদী কাফেলায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন্।

05-18-2023, 01:28 AM #16

السلام عليكم ورحمت الله
ভাই বাকি দুই পর্ব কখন আসবে??? 😭😭😭

05-19-2023, 02:52 PM #17

'যার গুনাহ অনেক বেশি তার সর্বোত্তম চিকিৎসা হল জিহাদ'-শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.

05-22-2023, 11:28 AM #18

আসসালামু আলাইকুম
ভাই ১,২,৩,৪ পর্ব পড়েতো হৃদয়ে জ্বালা বাড়িয়ে দিলেন।বাকি ২ পর্ব কখন আসবে??? অধির আগ্রহী হয়ে আছি

05-22-2023, 09:36 PM #19

ইয়া রব, আমাদের জান্নাতের সবুজ পাখি হওয়ার তাওফীক দান করুন । আমিন ।

05-23-2023, 08:33 AM #22

মাশাআল্লাহ। অনেক সুন্দর। আল্লাহ তায়ালা কলমে আরো জোর দান করেন। আমীন।

salahuddin bin ali
Member

Join Date: Nov 2022
Posts: 106

Share
Tweet

06-14-2023, 04:05 PM #23

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদেরকে ফলমূল খেতে দেয়া হবে, তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকা রূপে যা দেওয়া হতো এ তো তাই; তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেয়া হবে। সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী থাকবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।" (সূরা বাকারা ২:২৫)

khaled Adil
Member

06-14-2023, 09:24 PM #24

হে আল্লাহ আমাদেরকে শহীদ হওয়ার তাওফীক দান করুন । আমিন ।

Abdullah ibn Rawahah
Member

06-14-2023, 09:28 PM #25

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলার পথে মৃত্যুবরণ করা সকল পাপের কাফফারা হয়ে যায়।" তখন জিবরাঈল (আঃ) বললেন, ঋণ ব্যতীত (তা ক্ষমা করা হয় না)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঋণ ব্যতীত।

কিতাবুত্ তাহরীদ্ আলাল ক্বিতাল

চতুর্থ পর্ব

তোমাকেই শুধু চাই, হে শাহাদাত!!!

চলো বন্ধু যাই উড়ে,
সবুজ পাখি হয়ে,
জান্নাতের নীড়ে....

–মুস'আব ইলদিরিম

কিতাবুত্‌ তাহ্‌রীদ্‌ ‘আলাল ক্বিতাল

মুস‘আব ইলদিরিম

লেখকের কথা

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده- أما بعد

উম্মাহ-দরদী প্রিয় ভাই!

আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

অনেক দীর্ঘ সময় পরে হলেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা **"কিতাবুত্ তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল, পঞ্চম পর্ব: আর কতকাল আমরা নিজেদেরকে এমনিভাবে ধোঁকা দিব?"** কিতাবটি নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ। ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

দেরী করার কারণ ছিল- প্রথমতঃ আমার নিজের কমতি ও অযোগ্যতা, দ্বিতীয়তঃ এই পর্বটি রচনা করতে গিয়ে আমাকে অনেক বেশি বাধা-বিপত্তি ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে, আর সবশেষেঃ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, হিকমাহ্ ও ফয়সালা। তবে যাই হোক, কৃতজ্ঞতায় সিজদায় লুটাই সে রব্বে কারীমের দরবারে যিনি আমাদেরকে কিতাবটি শেষ করার তাওফীক দিয়েছেন।

কিতাবুত্ তাহরীদ্, পঞ্চম পর্ব নিয়ে কিছু কথা

মুহতারাম ভাই! আমরা যারা কমবেশি 'দাওয়াহ ইলাল জিহাদের' ময়দানে কাজ করেছি, এই কাজ করতে গিয়ে অবশ্যই আমরা কিছু না কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি; একজন আলেম কিংবা পাক্কা দ্বীনদার অথবা দ্বীনের কোনো মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত দ্বীনী সাথী ভাইয়ের দুয়ারে যখন আমরা জিহাদের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছি আর সেই ভাই যখন 'দাওয়াহ ইলাল জিহাদ'কে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কিংবা চুপ রয়েছেন, অথবা পাশ কাটিয়ে গিয়ে জিহাদ না করার পিছনে অদ্ভূত কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন, তখন আমাদের হৃদয় ব্যথিত হয়েছে, কখনো অন্তর ভেঙে খানখান হয়েছে, নিশ্চুপে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে আর স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে কয়েকটি প্রশ্ন উদিত হয়েছে। যেমন:

ক. আমাদের দেশে আলহামদুলিল্লাহ, অগণিত মসজিদ-মাদরাসা-খানকাহ কিংবা দাওয়াতের মারকাজ রয়েছে, রয়েছেন অসংখ্য দ্বীনদার, ধর্মপ্রাণ মুসলমান। কিন্তু জিহাদের দাওয়াত দিলে কেন সবাই সেটিকে এড়িয়ে যেতে চান? বা গ্রহণ করতে চান না?

খ. অনেক বড় আলেম, পীর সাহেব, দা'ঈ কিংবা ইসলামী রাজনীতিবিদ, কিন্তু তিনিও কেন জিহাদ করতে চান না, বা জিহাদের প্রতি কেন এত অনীহা? জিহাদের দাওয়াত দিলে এটা-সেটা বুঝিয়ে কেন তিনি পাশ কাটিয়ে যান? দ্বীনের এত গূঢ় তত্ত্ব বুঝলেও কেন জিহাদ বুঝতে চান না?

গ. বর্তমান সময়ে জিহাদ একটি ফরযে আইন আমল হওয়া সত্ত্বেও এ থেকে উম্মাহর দ্বীনদার শ্রেণি কেন এত পিছিয়ে থাকতে পছন্দ করেন?

ঘ. আরেকদল ভাই আছেন তারা জিহাদকে কেন অপব্যাখ্যা করেন? উম্মাহকে জিহাদ থেকে দূরে রাখতে কেন তারা নানাভাবে উম্মাহকে বিভ্রান্ত করেন?

ঙ. আল্লাহর সাথে আমাদের সত্যবাদিতার এত অভাব কেন? যে আল্লাহ আমাদেরকে নামাযের হুকুম দিয়েছেন, সেই আল্লাহই তো আমাদেরকে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন, জিহাদকে ফরযে আইন করেছেন, কিন্তু কেন আমরা তাঁর এই হুকুমটিকে এতটুকু গুরুত্ব দেই না যতটুকু আমরা নফল নামায, তিলাওয়াত, যিকির কিংবা অন্যান্য আমল ও মেহনতকে এতটা গুরুত্ব দিয়ে থাকি?

চ. উম্মাহর উপর কুফ্ফারদের আগ্রাসন, নির্যাতন, গণহত্যা দেখেও কেন আমরা চুপ করে থাকি, কিংবা কেবল মিটিং-মিছিল-র‍্যালী আর দুআ করেই আমাদের ঈমানী দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে ভেবে বসে থাকি?

ছ. আমাদের উপর কেন পরাজিত মানসিকতা চেপে বসেছে? ইসলাম কায়েম করার প্রশ্নে আমরা কেন 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' বাদ দিয়ে গণতন্ত্রের মত কুফুরী ও শিরকী ব্যবস্থা কিংবা অন্যান্য মনগড়া পন্থা অবলম্বন করছি? আমরা দ্বীনদাররা ইসলামী(?) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যদি রাজপথে রক্ত দিতে প্রস্তুত থাকি, তাহলে প্রকৃত জিহাদ ও শাহাদাতের পথে যেতে কেন আমাদের এত ভয় ও অনীহা?

জ. এক কথায়, দ্বীনদার হওয়া সত্ত্বেও 'জিহাদের আযান' কেন আমাদের কাছে এত অপ্রিয়? জিহাদের ডাক কেন আমাদের কাছে এত অপছন্দনীয়? জিহাদের আওয়াজ কেন আমাদের কাছে এত অপরিচিত ও অবহেলিত? অথচ আল্লাহ পাকের হুকুম হল- আমরা যেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ ও তাঁর রাহে জিহাদ করাকে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি? (দেখুন: সূরা তাওবা: আয়াত নং-২৪)

মুহতারাম ভাই, তাহলে, আমাদের সমস্যাটা কোথায়? কেন এমন হচ্ছে?...................

হ্যাঁ ভাই, আমাদের মূল সমস্যাটা হল- 'ওয়াহন' তথা দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয়। আর এই ওয়াহনের ফলাফল হল- জিহাদ বিমুখতা ও জিহাদ পরিত্যাগ।

দুঃখজনক বিষয় হল- জিহাদ পরিত্যাগের জন্য আমরা নিজেরা মনগড়াভাবে নানান অজুহাত ও বাহানা বানিয়ে নিয়েছি; আর দাবী করছি এগুলো হলো আমাদের 'হিকমাহ'। যে যত বেশি জিহাদ থেকে পালানোর পন্থা বের করতে পারছি, সে ততবেশি নিজেকে 'হিকমাহওয়ালা' ভাবছি। আর শরীয়তের ভুল কিংবা অপব্যাখ্যা করে আমরা উম্মাহর সামনে জিহাদ না করার নানান কারণ তুলে ধরছি, নিজেরাও বিভ্রান্ত হচ্ছি এবং উম্মাহকেও বিভ্রান্ত করছি। সচেতনভাবে কিংবা অবচেতনমনে আমরা আকীদা ও বিশ্বাসের নানান প্রাচীর দাঁড় করিয়েছি, যা আমাদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রাখছে।

প্রিয় ভাই! আজকের আমাদের এই পর্বটিতে (কিতাবুত্ তাহরীদ, পঞ্চম পর্ব: আর কতকাল আমরা নিজেদেরকে এমনিভাবে ধোঁকা দিব?) এই সমস্ত ধোঁকার প্রাচীরগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং যথাসম্ভব কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন দলীল ও যুক্তির মাধ্যমে সেগুলোকে খণ্ডন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায়, ইনশাআল্লাহ, কিতাবটি

আমাদের সমাজের প্রতিটি দ্বীনদার ভাইয়ের অন্তরে নাড়া দিবে, সকল তবকার দ্বীনদারদেরকে জিহাদ নিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করতে একরকম বাধ্য করবে এবং আমাদের প্রত্যেকের উপর আপতিত এই ফরযিয়াত আদায়ে উদ্বুদ্ধ করবে।

সবশেষে বলব, আমি (লেখক) একজন নগণ্য মানুষ, আমার ইলমও সীমাবদ্ধ। তথাপি যতটুকু সত্য ও সঠিক কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি সেটি আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যা কিছু ভুল সেটি আমার নফস ও শয়তানের পক্ষ থেকে। আর আমি ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নই। কারো নজরে কোনো ভুল ত্রুটি ও অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে, মেহেরবানী করে কমেন্টে তা জানিয়ে দিলে আমি আপনাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব, ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন যেন আমাকে এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে শয়তান ও তার দোসরদের ধোঁকা থেকে হেফাযত করেন এবং জিহাদ ও শাহাদাতের পথে অবিচল রাখেন। তিনি যেন সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে, বিশেষ করে গাজার মুসলিম ভাই-বোনদের উপর চলমান ইয়াহুদী ও অন্যান্য কুফফারদের আগ্রাসন ও গণহত্যা থেকে হেফাযত করেন। সারা বিশ্বের মুজাহিদ ভাইদেরকে বিশেষ করে ফিলিস্তিনের ভাইদেরকে কবুল করেন, জিহাদের পথে অবিচল রাখেন, গাইবী মদদ ও নুসরত করেন, এবং আমাদের চক্ষু ও হৃদয়ে শীতলতা দানকারী 'ফাতহে মুবীন' দান করেন। আমীন ছুম্মা আমীন।

পরিশেষে, আল্লাহ পাক তাঁর দ্বীন কায়েমের জন্য 'এলায়ে কালিমাতুল্লাহর' এই ক্ষুদ্র মেহনতকে কবুল করুন, ঘুমন্ত মুসলিম উম্মাহর জাগরণের কাজে কিতাবটিকে ব্যবহার করুন, আমাদের নাজাতের উসীলা বানান, যেসকল আলেম-মুজাহিদ ভাই শত ব্যস্ততার মাঝেও অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে কিতাবটি সম্পাদনা করে দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে জাযায়ে খায়ের দান করুন, তাদেরকে এবং তাদের আহালদেরকে জিহাদ ও শাহাদাতের জন্য কবুল করুন, ক্ষমা করুন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দিন। আমীন, ইয়া রব্বাল 'আলামীন।

-মুস'আব ইল্‌দিরিম

সূচিপত্র

বিভিন্ন মেহনতের সাথে জড়িত সাথিদেরকে শয়তানের ধোঁকা

সুপ্রিয় দ্বীনদার ভাইয়েরা আমার!

আজ আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা নিবেদন করতে চাই। আপনারা আমার এমন সব ভাই যাদের অন্তরে দ্বীনের মহব্বত রয়েছে এবং আপনারা সমাজে দ্বীনদার হিসাবে পরিচিত। আমার এই নিবেদন বিশেষ করে সেই সব দ্বীনী ভাইদের প্রতি, যারা কোন না কোন দ্বীনী মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত।

মুহতারাম ভাই!

আজ আমরা এমন কিছু বিষয় আপনাদের সাথে তুলে ধরব, যা অত্যন্ত স্পর্শকাতর; হতে পারে তা অনেকের চিন্তা চেতনার সাথে মিলে যাবে। কিন্তু বিষয়গুলো আমাদের সকলের সামনে স্পষ্ট হওয়া দরকার। কেননা, বুঝনেওয়ালারা চুপ থাকতে থাকতে সত্যের ব্যাপারে উম্মত আজ দিশেহারা। সত্যকে স্পষ্ট করা আমাদের উপর ফরয দায়িত্ব। আজ আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। আপনাদের সামনে হককে 'হক' হিসেবে আর ভ্রান্তিগুলোকে 'ভ্রান্তি' হিসেবে আমাদেরকে আজ তুলে ধরতেই হবে।

প্রিয় ভাই!

পরবর্তী আলোচনার দ্বারা আমরা কাউকে আঘাত করতে চাইনা। এগুলো কেবলই আত্মসমালোচনা! শুধুমাত্র বিষয়গুলোর উপর সুগভীর চিন্তা করার জন্য একজন 'দ্বীনী, কল্যাণকামী ভাই' হিসেবে আপনাদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

তাছাড়া, আমরা সকলে ভাই ভাই; একে অপরের জন্য দর্পনস্বরূপ। আমরা একে অন্যের কল্যাণকামী; একে অন্যকে শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই ভালোবাসি। এক ভাইয়ের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা অপর ভাইয়ের দায়িত্ব। যেন আমরা দ্বীনের নামে নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকায় না পড়ি; সহীহ দ্বীন ও বিশুদ্ধ ঈমান-আমল নিয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হতে পারি- তাঁরই সন্তোষভাজন হয়ে, নিজেরাও সন্তুষ্ট হয়ে, আর প্রবেশ করতে পারি চিরস্থায়ী জান্নাতুল ফিরদাউসে। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন।

• 'জিহাদ' বর্তমানে ফরযে আইন:

প্রিয় ভাই! পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার আগে কুরআন-হাদীসের আলোকে আমাদেরকে সর্বপ্রথম বুঝে নিতে হবে- বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে সক্ষম সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে এবং 'সকল আমল/মেহনতের মধ্যে জিহাদই সর্বশ্রেষ্ঠ'। এই বিষয়ে "কিতাবুত্ তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল" এর দ্বিতীয় পর্ব "তাওহীদ ও জিহাদ" কিতাবটিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা সেটি দেখে নিতে পারি, ইনশাআল্লাহ।

• শয়তান দ্বীনী মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত সাথী ভাইদেরকে 'মেহনতের' ধোঁকায় ফেলে কিভাবে?...........

** আমাদের সমাজে 'দ্বীনদার' হিসেবে পরিচিত প্রত্যেক মুসলমানই আমরা কম-বেশি কোনো না কোনো মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন: কেউ মাদরাসার খেদমত, কেউ মসজিদ আবাদ/পরিচালনার মেহনত, কেউ দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত, কেউ খানকাহ/এসলাহী মেহনত, কেউ ইসলামী রাজনীতির মেহনত, কেউ বা আবার জিহাদের ময়দানে মেহনত করে থাকি। আলহামদুলিল্লাহ!

তবে ভাই, শয়তান মেহনতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেভাবে ধোঁকায় ফেলে তা হলো- জিহাদের মেহনত না করে আমরা যে ভাই যে মেহনতের সাথে লেগে আছি, তার কাছে আপন মেহনতের গুরুত্ব এমনভাবে পেশ করে যে, ধোঁকাগ্রস্ত ভাই দ্বীনের অন্যান্য মেহনত বিশেষতঃ (ফরযে আইন হওয়া সত্ত্বেও) জিহাদী মেহনতের সাথে জুড়ার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। এক পর্যায়ে আমরা প্রত্যেকেই জিহাদ না করেও যার যার আপন মেহনতকে 'পরিপূর্ণ' মেহনত মনে করতে থাকি। কুরআনের ভাষায়,

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

"প্রত্যেক দলই আপন আপন মতবাদ নিয়ে উল্লসিত।"

(৩০ সূরা রূম: ৩২)

** কয়েক ধাপ এগিয়ে আমরা কেউ কেউ তো এমন দাবী করতে থাকি..............

আমিই হক!..... আমিই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত!.... আমিই সেই জামাত যার সম্পর্কে নবীজী ﷺ ভবিষ্যদ্বানী করেছেন, "কেয়ামত পর্যন্ত একটি দল হকের উপর থাকবে!"...... আমিই সেই ছোট্ট জামাত, যার সাথে সর্বদা আল্লাহর নুসরত থাকবে!....... আমিই "সীরাতে মুস্তাকীমের উপর আছি!..... আমিই .... আমিই .... আমিই সব!......আমিই পরিপূর্ণ!..........

.... শেষ যামানায় ইমাম মাহদী আ. আমার দল থেকেই আসবেন!...... ইমাম মাহদী অমুক তরীকার খলীফা হবেন; অমুক মাদরাসার ছাত্র হবেন! .... ইত্যাদি....ইত্যাদি। আজ আমাদের বিভিন্ন ভাইদের মুখে এরকম আরো বহু দাবী শুনা যায়!!

আর এসব দাবী করার পিছনে কারণ হলো- জিহাদ না করেও প্রত্যেক দলই আমরা নিজেদেরকে 'পরিপূর্ণ হক' মনে করি এবং অন্যান্য মেহনতকরনেওয়ালা ভাইদেরকে এমনকি মুজাহিদ ভাইদেরকেও 'নিজের চেয়ে ছোট মেহনত করনেওয়ালা ভাই' মনে করতে থাকি। অথচ আমরা লক্ষ্য করিনা, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ জিহাদকে 'দ্বীন' তথা 'পরিপূর্ণ' আমল বা মেহনত সাব্যস্ত করেছেন, ইসলামের চূঁড়া তথা সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ আমল বা মেহনত আখ্যায়িত করেছেন।

আমরা কি কখনো এভাবে চিন্তা করেছি- এমনটি কি হতে পারে না যে, আমার মন হয়ত আমাকে একটি বুঝ দিয়ে রেখেছে যে- 'আমিই পরিপূর্ণ হক', আর আমি তাতেই বিশ্বাস করে সন্তুষ্টচিত্তে বসে আছি? অথচ, হয়ত আমি পরিপূর্ণ হক নই কিংবা আমার কাছে আল্লাহ্ পাক এখন যা চাচ্ছেন তা আমি করছি না; (আর এ ব্যাপারে আমার ভিতরে কোনো চিন্তা-চেতনা বা খেয়াল-খবরও নেই, অন্যদিকে আমি পরিপূর্ণ হকের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছি কিনা, বর্তমানে আমার কর্তব্য ও করণীয় কী- তাও ভালোভাবে কোনোদিন যাচাই করিনি!) হায়! অথচ আমি নিজেকে 'পরিপূর্ণ' হকের তালাশকারী মনে করি।

** আবার আমরা কেউ কেউ তো আরো এক ধাপ এগিয়ে যাই; নিজের মেহনতকে ছাড়া দ্বীনের অন্যান্য মেহনতকে 'গোমরাহী' ভাবা শুরু করি। হয়ত কেউ কেউ অন্যান্য মেহনতকে গোমরাহী বলে মুখে স্বীকার করি না, কিন্তু যারা দ্বীনের অন্যান্য মেহনত করে থাকেন এবং আমার মেহনতের সাথে জুড়েন না, তাদের সাথে আমি এমন সব আচরণ করি যেন ঐ ব্যক্তিরা গোমরাহ হয়ে গিয়েছে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ!

• 'পরিপূর্ণ হকের মানদণ্ড কী??

যার যিন্দেগী আল্লাহর রাসূলের ﷺ যিন্দেগীর সাথে সর্বাধিক মিলবে, যার যিন্দেগী আল্লাহর রাসূলের ﷺ সীরাতের সাথে সর্বাধিক মিলবে, যার যিন্দেগী সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের যিন্দেগীর সাথে সর্বাধিক মিলবে, সে-ই ততোধিক হক, সে-ই ততোধিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, তার যিন্দেগীই ততোধিক কুরআনী যিন্দেগী!...........

এক্ষেত্রে একটা দুইটা আমল কিংবা কিছু আমল করেই, অথবা বাহ্যিক কিছু দ্বীনদারী অবলম্বন করে আমি যদি সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকি যে, আমার যিন্দেগী সুন্নতী যিন্দেগী হয়ে গিয়েছে, তাহলে আমার মারাত্মক একটি ভুল হয়ে যাবে। বাহ্যিকতার পাশাপাশি আত্মিকতা, যিন্দেগীর মাকসাদ (তথা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য), পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করা, ঈমান-আকীদা, আল ওয়ালা ওয়াল বারা (আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করা), একমাত্র আল্লাহর আইনকে মেনে নেয়া এবং তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করা, তা'লিম-তরবিয়ত, তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি) এবং দাওয়াতের পাশাপাশি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কেরামকে অনুসরণ করতে হবে এবং তাঁদের পবিত্র যিন্দেগীর সাথে আমাদের যিন্দেগী মিলাতে হবে, ইনশাআল্লাহ।

• নিজের মেহনতকে বড় এবং অন্যের মেহনতকে ছোট করে দেখার কারণ-

জিহাদ সবচেয়ে দামী মেহনত হওয়া সত্ত্বেও আমরা তা করতে পারিনা বা নিজে যা করি তাকেই সবচেয়ে বেশি দামী মনে হয়, কিংবা দ্বীনের কোনো আংশিক মেহনত করেও তাকে 'পরিপূর্ণ' মনে করতে থাকি।

প্রিয় ভাই, আপনি কি জানেন, এর কারণ কী???
এর একটি কারণ হচ্ছে- আত্মতুষ্টি।

** আমরা মেহনত করি এবং আত্মতুষ্টিতে ভুগি 'আলহামদুলিল্লাহ! আমি তো সবচেয়ে দামী মেহনতের সাথেই জুড়ে আছি।' এই আত্মতুষ্টিই আমাকে নিজের মেহনতকে বড় এবং অন্যের মেহনতকে ছোট করে দেখার প্ররোচনা যোগায় এবং শয়তান আমাদের ঘাড়ে চেপে বসার সুযোগ পেয়ে যায়। আমি কখনো এটি চিন্তা করিনা যে, হয়ত শয়তান আমাকে একটি বুঝ দিয়ে রেখেছে, কিংবা আমার কর্মগুলোকে শয়তান সুশোভিত করে দেখাচ্ছে, ফলে আমি নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দিচ্ছি, আমি তো একটা মেহনতের সাথে লেগেই আছি, আর অন্য কোনো মেহনতের সাথে আমার জুড়ার দরকার নেই।

সত্যি বলতে কি! এই ধরনের মানসিকতার কারণে আমার দ্বারা দ্বীনের জন্য বড় বড় কদম দেয়া হয়ে উঠে না। আমার দ্বারা বড় কোনো খেদমতও আল্লাহ তা'আলা নিচ্ছেন না। কিংবা আমি যা করছি তা-ই আমার চোখে অনেক বড় বলে মনে হচ্ছে। (আল্লাহ্ আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।)

** এরকম হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে, মেহনতের ক্ষেত্রে আমি সবসময় আমার রুচিবোধ, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে মেহনত করি। যে মেহনত আমার রুচি মাফিক হয়, যে মেহনত আমার হাতের নাগালে আছে, যেই মেহনতের দ্বারা আমি প্রথম দ্বীনের উপর চলা শুরু করেছি কিংবা আল্লাহ তা'আলা যেই মেহনতের দাওয়াতের উসীলায় আমাকে দ্বীনের উপর উঠার তাওফীক দিয়েছেন, যেই মেহনতে বিপদাপদ ও ঝামেলা কম, তুলনামূলক নিরাপদ ও সহজসাধ্য- সেই মেহনত ছাড়া অন্য কোনো মেহনত আমি করতে চাই না। অথচ আমি যেই মেহনতই করি না কেন আমাকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে, দ্বীন এবং মুসলমানদের জন্য বর্তমানে কোন্ মেহনতটি এখন আমার উপর ফরয?! কোন্ ক্ষেত্রে কাজ করলে অল্প সময়ে উম্মতের বেশি ফায়দা হবে?! অল্প মেহনতের দ্বারা সওয়াবও অনেক বেশি হবে! আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিও সর্বাধিক হাছিল হবে!

• প্রিয় ভাই, এমনভাবে আমরা কখনো ভেবেছি কি?

** যদি এমন হয়, বর্তমানে আল্লাহ তা'আলা চাইছেন বা ফরযে আইন করেছেন যে, উম্মত এই মেহনত করুক আর আমি আমার মনোযোগকে অন্য দিকে নিবদ্ধ করে রেখেছি, অন্য কোনোভাবে সময় ব্যয় করছি, অন্যভাবে দ্বীনের ফিকির করছি, তাহলে একটু চিন্তা করি, আমি কি ফরয তরককারী হয়ে গেলাম না? ফরয নামায বাদ দিয়ে অন্যান্য নফল আমল কিংবা মেহনত করতে থাকা যেমনিভাবে মেনে নেয়া যায় না; তেমনিভাবে অন্য যে কোনো 'ফরযে আইন' বাদ দিয়ে অন্যান্য নফল, সুন্নত, ওয়াজিব কিংবা ফরযে কিফায়া আমল বা মেহনত করতে থাকলে সে কারণেও কি আমরা ফরয তরককারী হয়ে যেতে পারি না?

দ্বীনী কোনো মেহনত করার পরও, কোনটি আল্লাহর ফরয হুকুম সেটি খেয়াল না রাখার দরুন মেহনতের ক্ষেত্রে আমি আল্লাহ পাকের ইচ্ছার সামনে আমার নিজের নফসের চাহাদকেই কি বেশি প্রাধান্য দিলাম না? নেক আমল মনে করে আমি কি নিজেকে নিজে ধোঁকা দিচ্ছি না?

এমনটি হলে ভয় হয়, হায়! আমার সকল মেহনত আল্লাহ তা'আলার কাছে বেকার সাব্যস্ত হয়ে যায় কিনা; অথচ আমি মনে করছি আমি তো অনেক নেক আমল করে যাচ্ছি! নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا ۞ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

"(হে নবী!) বলুন: আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দিব, যারা আমলের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে সব লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়; অথচ তারা মনে করে যে তারা নেক কাজ করছে।"
(১৮ সূরা কাহাফ্ : ১০৩-১০৪)

** বর্তমান সময়ে, মুসলিম উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে, যখন জিহাদ প্রতিটি সক্ষম মুসলমানের উপর ফরযে আইন হয়ে গেছে, তখন জিহাদ বাদ দিয়ে কেবল আমরা যদি মাদরাসা, খানকাহ, তাবলীগ, রাজনীতি, কিতাবাদি রচনা, চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদি অন্যান্য দ্বীনী খেদমত কিংবা দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত থাকি, তাহলে জিহাদ করবে কে ভাই??? আমি যেই মেহনতই করি না কেন, আমার মেহনতের পাশাপাশি আমাকে যেভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে জিহাদও করতে হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমরা যদি বর্তমান যুগে জিহাদকে শুধু এর শাব্দিক অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চাই, কিংবা কলমের জিহাদ, পিতা-মাতার খেদমত কিংবা মাদরাসায় দরস্ দেয়ার মাধ্যমে, নফসের ইসলাহ করা, গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

ইত্যাদি কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে যদি মনে করি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ফরজিয়াত আদায় হয়ে যাবে, তাহলে আমাদের জন্য এটি হবে মারাত্মক ভুল ও ভয়ানক আত্মঘাতী একটি সিদ্ধান্ত!!!
আচ্ছা ভাই! আপনি কি খাইরুল কুরুন ও পরবর্তী সলফে সালেহীনদের যুগে এই সকল চিন্তা চেতনা খুঁজে পেয়েছেন?? হাদীসশাস্ত্র কিংবা ফিকহের কোনো কিতাবে 'কিতাবুল জিহাদে' কি ইলমী খেদমত, তাযকিয়া, সিয়াসাত (রাজনীতি) কিংবা দাওয়াতের ফাযায়েল বা মাসায়েল বর্ণনা করা হয়েছে, নাকি ক্বিতাল তথা সশস্ত্র যুদ্ধের ফাযায়েল বর্ণিত হয়েছে??

হাদীসশাস্ত্র কিংবা ফিকহের কোন্ কিতাবে 'কিতাবুল জিহাদে' সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া জিহাদের ভিন্ন অর্থ করা হয়েছে??? তাহলে ভাই, কেন আমরা জিহাদের 'ভিন্নার্থ' তালাশ করে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছি??? 'জিহাদের' নামে কেন আমরা নিজেদেরকে ধোঁকা দিচ্ছি???

** সাহাবায়ে কেরামের যামানায় দুই শ্রেণির মুসলমান ছিল। এক. খাঁটি মুসলমান, দুই. মুনাফিক। যারা আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন, তাঁরা ছিলেন খাঁটি মুসলমান আর যাঁরা জিহাদ ত্যাগ করতো, তারা ছিল মুনাফিক। মুনাফিকরা মুসলমানদের সাথে সকল আমলে জুড়ত, জিহাদ ছাড়া। তাই বর্তমান সময়েও দ্বীনের সকল কাজ করার পরেও জিহাদ ত্যাগ করার কারণে ভয় হয় আমাদের নাম 'মুনাফিক'দের তালিকায় চলে যায় কিনা, যেই অবস্থাটি আল্লাহর রাসূলের যামানায় ছিল। দ্বীনতো ভাই সেটিই আছে, কিন্তু আমাদের মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা নষ্ট হয়ে গেছে। শরীয়াহর গণ্ডিবহির্ভূত নানা তত্ত্ব ও মনগড়া যত মতবাদ উদ্ভাবন করে, শরীয়াহর বিধানসমূহের ক্ষেত্রে স্রেফ নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত ও বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন নানা অপব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে, সেগুলোকে আমরা 'হেকমত' নামে চালিয়ে দিচ্ছি। যে যত বেশি জিহাদ থেকে পালানোর পন্থা উদ্ভাবন করতে পারছি, আমি নিজেকে তত বেশি 'হেকমতওয়ালা' মনে করছি!!!

** দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদেরই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে আমরা যারা দুনিয়া নিয়েই সবসময় ব্যস্ত থাকি, দুনিয়া নিয়েই যাদের ভোর আর দুনিয়া নিয়েই যাদের সন্ধ্যা, যাদের চিন্তা-চেতনার পুরোটাই দুনিয়া, আমাদের অবস্থা কী হবে, একটু চিন্তা করি!! হায়! আমরা জিহাদ থেকে কতটুকু দূরে!!!............

প্রিয় ভাই! ইনশাআল্লাহ্, এই পর্যায়ে আমরা আলোচনা করবো কিভাবে শয়তান জিহাদের ব্যাপারে বিভিন্ন তবকার মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে থাকে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই তাওফীকদাতা।

আলেম ভাইদেরকে শয়তানের ধোঁকা:

• ইলম অর্জনের মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করে দেয়া:

** কোন্ ইলম অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি সর্বাগ্রে অর্জন করা প্রয়োজন, ইলম অনুযায়ী আমলের গুরুত্ব- এসব বিষয়ে শয়তান একজন আলেমকে গাফেল রাখে। আমাদের সামনে শয়তান শুধু ইলম অর্জনের ফায়দা-ফাযায়েল সম্বলিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহ তুলে ধরে, ফলে অভিশপ্ত শয়তান আমাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, 'যেহেতু আমি ইলম অর্জন করেছি, তাতেই আমি আল্লাহর রাসূলের ﷺ ওয়ারিশ হয়ে গেছি', যার ফলে আমাদের অর্জিত ইলমের উপর সন্তুষ্টি চলে আসে, তখন আমরা নিজেদের যিন্দেগী নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ পাইনা। যতটুকু ইলম হাছিল হলো তাতেই আমাদের 'আত্মতৃপ্তি' চলে আসে। কিন্তু ভাই! আমরা একথা চিন্তা করি না-"আল্লাহর রাসূলের ﷺ ওয়ারিশ হতে হলে কেবল তাঁর ﷺ ইলমের ওয়ারিশ হলেই চলবে না, তাঁর যিন্দেগীরও ওয়ারিশ হতে হবে; কেবল কিছু শব্দ আর বাক্যের ওয়ারিশ হলেই চলবে না, তাঁর ﷺ যিন্দেগীর আমল সমূহেরও ওয়ারিশ হতে হবে।"

** ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে, তা হলো-
এক. যে ইলম অর্জন করা অন্য সকল প্রকার ইলম হাছিলের উদ্দেশ্য (মাকসাদ), যেমন: আল্লাহ তা'আলার মা'রেফাত, তাঁর মহব্বত, আল্লাহর রাসূলের ﷺ মহব্বত, আখিরাতের স্মরণ অন্তরে সৃষ্টি করা এবং আল্লাহর রাসূলের যিন্দেগীর পরিপূর্ণ অনুসরণ করে নিজের যিন্দেগীকে গড়া- এগুলো হলো সকল ইলম হাসিলের মূল মাকসাদ।

দুই. মূল মাকসাদে পৌঁছার জন্য সহকারী ইলম হাসিল করা, যেমন: আরবী ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, নাহু-ছরফ, ফিকাহ, তাফসীর, হাদীসশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে ইলম অর্জন করা।

এক্ষেত্রে শয়তান যে কাজটি করে তা হলো, একজন তালিবুল ইলমকে (ছাত্রকে) কিংবা একজন আলেমকে মূল মাকসাদের কথা ভুলিয়ে মাকসাদ হাছিলের সহকারী/সহায়ক ইলমের পিছনেই আজীবন লাগিয়ে রাখে। যার ফলে অনেক সময় দেখা যায়- আমাদের কেউ কেউ 'ইলমের জাহাজ' কিংবা 'সাগর' হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূলের পবিত্র ﷺ যিন্দেগীর সাথে আমাদের যিন্দেগীর পরিপূর্ণ মিল পাওয়া যায় না।

আমাদের দৃষ্টি কেবল তাত্ত্বিকতার মধ্যেই আটকে যায়, ব্যবহারিকতার দিকে যায় না। অঢেল ইলমওয়ালা হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূলের ﷺ কিংবা সাহাবাদের মেজাজের সাথে আমাদের অনেকের মেজাজের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

কেউ কেউ আবার দু'চারটি টাকার সামনে মাথানত করে নিজের ঈমানকে সস্তায় বিক্রি করে দেই। তাছাড়া, মানুষের কাছে 'অনেক বড় আলেম' হিসেবে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অন্তর থেকে 'দুনিয়ার মহব্বত' আর 'মৃত্যুর ভয়' দূর হয় না।

আর, যে ইলমের দ্বারা অন্তরে 'মাখলুকের ভয়ে'র চেয়ে 'আল্লাহর ভয়' বেশি শক্তিশালী না হয়, সে ইলমের কী মূল্য আছে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে? আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ-

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاء

"নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।"

[৩৫ সূরা ফাতির: ২৮]

এজন্য, যে ইলমের দ্বারা দিল থেকে দুনিয়া নামক নাপাক বস্তুটি দূর হয় না, মৃত্যুর মহব্বত পয়দা হয় না, আল্লাহর ভয় পয়দা হয়না, আল্লাহকে পাওয়া যায় না, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ﷺ ভালোবাসা দুনিয়ার সকল কিছুর মহব্বতের তুলনায়, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও বেশি না হয়, সেই ইলম তো প্রকৃতপক্ষে ইলম নয়, তাকে আমরা 'ইলমের' আবরণে এক প্রকারের 'জাহেলিয়াত' বলতে পারি! আর রব্বে তা'আলার কাছে জাহেলিয়াতের কোনো মূল্য থাকতে পারে না।

আরেকটি বিষয় হলো, আল্লাহর রাসূলের ﷺ যিন্দেগী ও মেজাজের সাথে মিল সৃষ্টি না হলে, দীনের সর্বত্র বিচরণ করাও সম্ভব হয়ে ওঠে না; দ্বীনের কোনো একটি শাখায়ই আজীবন ঘোরপাক খেতে হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক পথ দেখান। আমীন।

• জিহাদের মেহনত করলে ইলমী খেদমতের ক্ষতি বা কমতি হবে-এরূপ চিন্তা করানো:

** ধরুন, আমি কুরআন কারীমের তিলাওয়াত শিখানোর মেহনত করছি; আমি একটি মক্তব বা হাফেযী মাদরাসার উস্তাদ। আমার মাদরাসায় পাঁচশত বা হাজার খানেক নিয়মিত ছাত্র আছে। আলহামদুলিল্লাহ! নিঃসন্দেহে, এটি অনেক বড় দ্বীনী খেদমত। কেননা, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে-ই, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়।"

(সহীহ বুখারী-৫০২৭; আবু দাউদ-১৪৫২; তিরমিজি-২৯০৭, ২৯০৮, ২৯০৯)

কিংবা মনে করুন, আমি একজন মাদরাসার উঁচু পর্যায়ের উস্তাদ, কিংবা শাইখুল হাদীস, প্রধান মুফতী অথবা কোনো মাদরাসার মুহতামিম আমি; আমার দ্বারা ইলমী অনেক খেদমত আল্লাহ তা'আলা নিচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ। এখন মনে করুন, সাধারণভাবে উম্মাহর সক্ষম সকলের উপর জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ' ফরয হয়ে গেল, তাহলে এখন আমার-আপনার করণীয় কী?

একটু চিন্তা করুন তো ভাই, দ্বীনী কোনো দায়িত্বে থাকা অবস্থায় কারো মাঝে আল্লাহর ভয় থাকলে ফরজ নামাজ পরিত্যাগ করা বা তাতে অলসতা করা কি কারো পক্ষে সম্ভব? তাহলে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেলে, আমরা কিভাবে তা পরিত্যাগ করতে পারি বা তাতে অলসতা প্রদর্শন করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম আমাদের স্থানে থাকলে কী করতেন? তাঁরা কি কেবল মসজিদ-মাদরাসার ফিকির নিয়েই বসে থাকতেন?? নাকি পাশাপাশি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মেহনতও করতেন, এলায়ে কালিমাতুল্লাহর ফিকিরও করতেন?? আসহাবে সুফফারা কি কেবল ইলম চর্চাতেই ব্যস্ত থাকতেন, নাকি 'সামরিক জীবন' বলতেও তাঁদের একটি যিন্দেগী ছিল?? যুদ্ধের অবস্থার প্রেক্ষাপটে তো তাঁরা 'মাদরাসায়ে সুফফা' বন্ধ রেখেই ময়দানে চলে যেতেন এবং লড়াই করতেন, তাইনা??

প্রিয় ভাই!

হযরত আবু হুরাইরা রাদি. কি ময়দানের লড়াকু বীর ছিলেন না??.............
হযরত আনাস বিন মালিক রাদি. কি যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তেন না??.............
হযরত বেলাল রাদি. কি কেবল মুয়াজ্জিন-ই ছিলেন, মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ্ ছিলেন না???..................
লক্ষ লক্ষ পুরুষ সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আযমাঈন) ছিলেন, সক্ষম এমন একজন পুরুষের নাম কি আমরা দেখাতে পারবো যিনি মুজাহিদ ছিলেন না?? আল্লাহর রাহে জিহাদ করেননি???
বরং আল্লাহর রাসূলের যামানার কোনো কোনো নারী সাহাবাগণও যুদ্ধের ময়দানে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন। আল্লাহু আকবার! হযরত ছফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, হযরত উম্মে উমারা, হযরত আসমা বিনতে আবু বকর, হযরত আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না আযমাঈন)-গণের কথা কি আমরা ভুলে গিয়েছি? তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তো বীরত্ব ও সাহসিকতায় অনেক পুরুষ সাহাবীকেও হার মানিয়েছিলেন। সুবহানাল্লাহ!

শুধু কি তাই, যেই অন্ধ সাহাবী হযরত উম্মে মাকতুম রাদি.-এর দোয়ার উসীলায় আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার সকল অক্ষমদের উপর থেকে জিহাদের ফরযিয়াত রহিত করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে জিহাদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন, প্রিয় ভাই, আপনি কি জানেন সেই অন্ধ সাহাবী কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন??

অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি জিহাদে অংশগ্রহণ আর শাহাদাতের তামান্না থেকে একচুল পরিমাণও পিছিয়ে ছিলেন না; জিহাদের ফজিলত থেকে মাহরূম থাকা তার জন্য খুব কষ্টকর ও বেদনাদায়ক ছিল।

অবশেষে, হযরত উমর রাদি. এর খিলাফতের যামানায় চতুদর্শ হিজরিতে সংঘটিত পারস্যদের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ও সিদ্ধান্তমূলক ঐতিহাসিক 'কাদেসিয়ার যুদ্ধে' এই মহান অন্ধ সাহাবী অংশগ্রহণ করেন। যেহেতু লড়াই করতে পারবেন না, তাই মুসলিম বাহিনীর পতাকা বহন এবং জীবন দিয়ে হলেও তা সমুন্নত রাখার দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেকে পেশ করেন।

যুদ্ধের ইতিহাসে নজির বিহীন ভয়াবহ এক যুদ্ধ ছিল এটি। তিনদিন ব্যাপী চলমান রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধের ফলাফল হয়েছিল মুসলিম বাহিনীর চূড়ান্ত বিজয়। আর এরই মাধ্যমে তৎকালীন পৃথিবীর প্রধান পরাশক্তি পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। আল্লাহু আকবার!
এই মহা বিজয় অর্জনের জন্য মূল্য হিসেবে পরিশোধ করতে হয়েছিল শত শত শহীদের অমূল্য জীবন। তাদের মাঝে ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাকতূম রাদি. এর জীবনও। সেদিন যুদ্ধের প্রান্তরে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তাঁর রক্তমাখা নিষ্প্রাণ দেহ- যা মুসলিম বাহিনীর পতাকাটিকে তখনো বুকের মাঝে আগলে রেখেছিল।
সুবহানাল্লাহ!! উনারাই ছিলেন আমাদের পূর্বসূরী, উনারাই ছিলেন আমাদের প্রকৃত সালাফ!! উনারাই ছিলেন আমাদের প্রকৃত আকাবীর!!! রাদিয়াল্লাহু আনহুম আযমাঈন।
এই রকম আরো অনেক ঘটনা রয়েছে সীরাতের কিতাবগুলোতে। শারীরিক অক্ষমতাও সাহাবায়ে কেরামদেরকে জিহাদ থেকে দূরে রাখতে পারেনি!! আল্লাহু আকবার।

** আমরা অনেকে মনে করি, আমি একটি মাদরাসার ইলমী খেদমতে আছি। আমি জিহাদ করলে বা জিহাদের জন্য আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়লে ইলমের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে, মানুষের মধ্যে ইলমের প্রচার প্রসার কিভাবে হবে?? বা তখন আমার মাদরাসার কি অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে না??...................................

প্রিয় ভাই! জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মেহনতের মাধ্যমে আমাদের কুরআনের খেদমত আরো বেশি হতে পারে। কিভাবে?.......
কুফ্ফার কর্তৃক আক্রান্ত মুসলিম ভূমিতে আমাদের মাধ্যমে মুসলমানদের দ্বীন শিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে; হয়ত আল্লাহ তা'আলা আমাদের দ্বারা পৃথিবীর কোনো ভূমিতে তাঁর দ্বীন পরিপূর্ণরূপে কায়েম করাবেন, ফলে সেখানে কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন আমরা এরকম হাজারটা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে পারবো ইনশাআল্লাহ; তখন, লক্ষ লক্ষ মানুষ কুরআন শিখতে পাবে, দ্বীনের ইলম লাভ করে পরকালে নাজাত পাবে আর আমরাও কেয়ামত পর্যন্ত সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব পেতে থাকবো ইনশাআল্লাহ্।

আর না হয়, হয়ত আমরা শহীদ হয়ে কামিয়াবীর যিন্দেগী লাভ করবো। আর আমি যদি জিহাদ করতে করতে শহীদ হওয়ার কারণে মাদরাসার খেদমত না করে যেতে পারি, তাহলেও ক্ষতি নেই। কেননা, আমার ভাইয়েরা যখন দ্বীন কায়েম করবেন এবং এরকম বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করবেন, তারা যা সওয়াব লাভ করবেন, তাদের সাথী হওয়ার কারণে আমাদেরকেও আমাদের নিয়তের কারণে সেই সওয়াব দেয়া হবে, ইনশাআল্লাহ্। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অভাব মুক্ত, অমুখাপেক্ষী।

** জিহাদের কারণে কোনো মাদরাসা বন্ধ হয়েছে, ইলমের তলব কিংবা ইলমী খেদমতের ত্রুটি হয়েছে, এমন নজির ইসলামের ইতিহাসে কোথাও আছে কি? বরং ইসলামের ইতিহাসের একদম শুরু থেকেই জিহাদ আর ইলমের তলব একসাথে চলেছে।

আল্লাহর রাসূলের ﷺ যামানার কথাই ধরা যাক! জিহাদের কারণে সাময়িকভাবে মসজিদে নববীর 'ছুফ্ফা' কেন্দ্রিক ইলমী মারকায/মাদরাসা বন্ধ থাকলেও ইলমের তলব কিন্তু একদিনের জন্যও বন্ধ থাকেনি। জিহাদের ময়দানে গিয়ে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূলের কাছে জিহাদ কিভাবে করতে হয় তা শিখেছেন, কিভাবে গনীমত, ফাঈ ইত্যাদি বণ্টন করতে হয় তা শিখেছেন, বন্দীদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম কী তা শিক্ষা করেছেন, বিজিত এলাকাসমূহে কিভাবে আল্লাহর আইন ও শরীয়াহ্ কায়েম করতে হয় তা শিখেছেন, শত্রুপক্ষের কোনো গাদ্দার বা গোয়েন্দা ধরা পড়লে তাদের ব্যাপারে কী হুকুম তা শিখেছেন, বন্দী হওয়া নারী-শিশু ও দাসী-বাদীদের ব্যাপারে আল্লাহর কী হুকুম তা শিখেছেন। তাছাড়া, জিহাদের ময়দানে তো আর আয়াত নাজিল হওয়া কখনো বন্ধ ছিল না। সেখানেও 'কাতেবে ওহী' (ওহী লেখক)-গণ থাকতেন। যখন যে আয়াত নাযিল হত, সাহাবায়ে কেরাম সঙ্গে সঙ্গে তা লিপিবদ্ধ করে রাখতেন আর তা শিখে নিতেন। সে সকল আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছ থেকে বুঝে নিতেন। সুবহানাল্লাহ! এভাবেই সর্ব হালতে সাহাবায়ে কেরামের ইলমী মেহনত ও খেদমত জারী থাকত! সাহাবায়ে কেরাম ইলমী খেদমতের দোহাই দিয়ে কখনো জিহাদ হতে পিছিয়ে থাকতেন না।

** প্রিয় ভাই! জিহাদ করার কারণে ইলমী মেহনতের বা ইলমী খেদমতের কিংবা মাদরাসাসমূহের কখনো কোনো ক্ষতি হয়নি- এটা যেমনভাবে অকাট্য সত্য, তার চেয়েও বেশি সত্য ব্যাপার হচ্ছে- জিহাদ না করার কারণে ইসলামী

ইতিহাসের একটি-দুটি নয়, বিখ্যাত হাজার হাজার মাদরাসা আমরা হারিয়েছি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হায়! কোথায় আজ বুখারা আর সমরখন্দের সেই মাদরাসাগুলো? আজ কোথায় রাশিয়ার সেই হাজার হাজার মাদরাসাগুলো?

কোথায় কর্ডোভা আর গ্রানাডার হিফযখানা আর কিতাবখানাগুলো? কোথায় হারিয়ে গেল আরাকানের সেই ইলমী মারকাযগুলো??

তুর্কিস্তানের মাদরাসাগুলো আজ কোথায়?

কোথায় হারিয়ে গেল আমাদের 'জিহাদহীন' সেই ইলমের তলব আর ইলমী খেদমত?

আমাদের কী ছিল না?...............

আমাদের কি হাজার হাজার তালেবে ইলম ছিল না? আমাদের কি বিশ্বের সবচেয়ে বড় বড় পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক আর আলেমে দ্বীন ছিল না? আমাদের কি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় 'কুতুবখানা' ছিল না?? সেগুলো আজ কোথায়?? কোথায় 'তাতারীদের হাতে ধ্বংস হওয়া' বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাঠাগার, বাগদাদের সেই লাইব্রেরি???...............

রক্তাক্ত এই ইতিহাসগুলো কি আমরা ভুলে গিয়েছি? আজ আমাদেরকে অবশ্যই সত্য সত্য জবাব দিতে হবে-"সেই মাদরাসাগুলো কি আমরা জিহাদ করার কারণে হারিয়েছি, নাকি জিহাদ না করার কারণে?"...........

আজ আফগানিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখি! আল্লাহর রহমতে জিহাদের মাধ্যমে মাদরাসার মেহনত সেখানে কতটা জোরদার হচ্ছে!!! আমাদের বীর মুজাহিদ ভাইয়েরা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে ইলমের খেদমত কিভাবে করে যাচ্ছেন!! তারা হাজার হাজার মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করছেন, সকল শ্রেণির মানুষের জন্য দ্বীন শিক্ষার ব্যবস্থা করছেন! প্রতিটি মুসলমানের বাচ্চার জন্য দ্বীন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন! প্রিয় ভাই! জিহাদ না করে আমরা কি পারছি তাদের মতো ইলমী খেদমত করতে??............

• জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার পর আমাদের করণীয় কী???-এই বিষয়ে অসচেতন রাখা:

প্রিয় ভাই, এ সম্পর্কে "কিতাবুত্ তাহরীদ্ 'আলাল ক্বিতাল: দ্বিতীয় পর্ব: তাওহীদ ও জিহাদ" কিতাবটিতে বিস্তারিত দলীল ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে আমরা শুধু এতটুকু বলতে চাই, জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় আমাদেরকে কুরআন কারীম শিখানোর মেহনত কিংবা মাদরাসার দরস্ দানের ইবাদত (যা একটি ফরযে কিফায়া কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে নফল আমল) এর পাশাপাশি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মেহনত অবশ্যই করতে হবে। মুজাহিদ ভাইদের হক জামাত তালাশ করে তাতে যোগ দিতে হবে। অতঃপর আমীরের ফয়সালা অনুযায়ী (জিহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী) আমাদেরকে যেভাবে দ্বীনী খেদমত করতে বলা হয় সেভাবেই করতে হবে। যদি আমাকে মসজিদ বা মাদরাসার খেদমতের ফয়সালা দেয়া হয় এবং পাশাপাশি জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোনো তাকাজা দেয়া হয় (যেমন- দাওয়াত ও ই'দাদ) তবে আমাকে তাই করতে হবে। সেক্ষেত্রে ময়দানে না গিয়েও আমি জিহাদের সওয়াব পাব ইনশাআল্লাহ। আর যদি জিহাদের প্রয়োজনে আমাকে ময়দানে যাওয়ার ফয়সালা দেয়া হয়, তাহলে আমাকে মসজিদ-মাদরাসা-খানকাহ-অন্যান্য দ্বীনী বা দুনিয়াবী কাজকর্ম ছেড়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ইনশাআল্লাহ, ঠিক যেমনভাবে সাহাবায়ে কেরামগণ করেছিলেন।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, যদি আমরা ফরযে আইনের তাকাজা পুরা করতে গিয়ে ফরযে কিফায়া কিংবা নফল ইবাদত করতে সক্ষম না হই, এজন্য আমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, কিন্তু ফরযে আইন ত্যাগ করলে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার সামনে 'অপরাধী' সাব্যস্ত হতে হবে, আমাদেরকে 'ফরয তরককারী' সাব্যস্ত হতে হবে, যদিও আমরা দ্বীনী অনেক বড় মেহনত করছি। এককথায়- জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় আমাদের নিজেদের মনগড়া ভাবে দ্বীনী মেহনত করলে চলবে না, অবশ্যই জিহাদের তাকাজা/প্রয়োজনকে সামনে রেখে দ্বীনের অন্যান্য শাখায় মেহনত চালিয়ে যেতে হবে, যে কোনো সময় জিহাদের যে কোনো তাকাজা পুরা করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে, খুরুজের (জিহাদের জন্য বের হওয়ার) প্রয়োজন হলে খুরুজ, জীবন দেয়ার প্রয়োজন হলে জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকতে হবে, ইনশাআল্লাহ।

• আমরা (আলেমরা) সশস্ত্র জিহাদ করি না; তার কারণ....

প্রথম কারণ:

একজন প্রসিদ্ধ আলেম অনেক উলামায়ে কেরামের সক্রিয়ভাবে সশস্ত্র জিহাদ না করার ব্যাপারে অবাক হওয়ার মতো একটি কারণ বয়ান করলেন। প্রকৃতপক্ষে, আমরা অনেকেই এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে থাকি। তাই বিষয়টি উম্মতের সামনে পরিষ্কার করা দরকার। তিনি বললেন, "আমরা (আলেমরা) সশস্ত্র জিহাদ করিনা; কারণ, আমাদের চার মাযহাবের কোনো ইমাম এবং আমাদের অমুক অমুক আকাবীরদের যিন্দেগীতে সশস্ত্র জিহাদ ছিল না। তারা আজীবন এলেমের খেদমত করে গেছেন। তাই আমরাও আজীবন এলেমের খেদমত করে যাবো।"

যুক্তিখণ্ডন:

প্রিয় ভাই! এই ধরণের মন্তব্য করার আগে আমাদের আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। কেননা, এই ধরণের মন্তব্য যদি আমরা করি, তাহলে এটি মূলত ইসলামের বড় বড় ইমামদের উপর অনেক বড় ধরণের অপবাদ আরোপ করা হয়!

কিভাবে?...........

এবার, তাহলে ভালো করে খেয়াল করুন, উপরোক্ত উক্তিটির দ্বারা আইম্মায়ে কেরামের উপর মূলতঃ নিচের অপবাদগুলো আরোপ করা হয়-

১. একদল লোক আছে, তারা শুধু 'জিহাদ, জিহাদ' করে; যেন জিহাদ ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। আইম্মায়ে কেরাম কি দ্বীন বুঝেন নাই? তাঁরা যেমন বুঝে-শুনে, যথেষ্ট কারণ বের করে এবং আমলের গুরুত্ব অনুধাবন করে জিহাদ করেননি, তেমনিভাবে আমরাও বুঝে-শুনে, যথেষ্ট কারণ জেনে এবং আমলের গুরুত্ব অনুধাবন করেই জিহাদ করছি না। যেটা এখন সবচেয়ে বেশি করা দরকার, আমরা সেটাই করছি। আমরা ও তাঁরা এক পথেই হাঁটছি। একটু অন্যভাবে বললে, যদি কেউ মনে করে যে, আমরা দ্বীন বুঝি না, তাহলে তো তাঁরাও (আইম্মায়ে কেরামগণও) দ্বীন বুঝেন নাই! (নাউযুবিল্লাহ্)

২. যেহেতু আমরা এবং আইম্মায়ে কেরামগণ একই মানহায/পথ/তরীকার উপর আছি, সেহেতু যদি কেউ বলে যে, আমরা জিহাদ তরককারী, তাহলে কি তাঁদেরকেও (আইম্মায়ে কেরামগণকেও) 'জিহাদ তরককারী' বলা হবে না?? (নাউযুবিল্লাহ্)

৩. আইম্মায়ে কেরাম কি জিহাদের গুরুত্ব বুঝেন নাই? যেহেতু আমরা ও তাঁরা একই সিলসিলার পথিক, জিহাদ না করার কারণে যদি কেউ আমাদেরকে বলে যে, আমরা জিহাদের গুরুত্ব বুঝি না, তাহলে কি তাঁরাও (আইম্মায়ে কেরামগণও) জিহাদের গুরুত্ব বুঝেন নাই?? (নাউযুবিল্লাহ্)

৪. আমরা মনে করি, তাঁরা (আইম্মায়ে কেরামগণ) ইলমের খেদমতকে জিহাদের ময়দানের খেদমতের চেয়ে বড় মনে করতেন। তাই তাঁরা আজীবন ইলমের খেদমত করে গেছেন। তাই মাযহাবের ইমামদের মতো আমরাও মনে করি, ইলমের খেদমত জিহাদের খেদমতের চেয়ে বড় ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরাও আজীবন মাদরাসার তথা ইলমের খেদমত করে যাবো। মাদরাসার খেদমত ছেড়ে আমরা অন্য কোনো ফিকির করবো না। জিহাদ না করার কারণে যদি কেউ বলে যে, আমরা ভুল পথে আছি, তাহলে কি আইম্মায়ে কেরামগণও ভুল পথের পথিক ছিলেন না?? (নাউযুবিল্লাহ্)

এইখানে এসে কিছু কথা!!!

সাহাবায়ে কেরামগণ হচ্ছেন হিদায়াতের মানদণ্ড। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-

............ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ ....

"………লোকেরা (সাহাবায়ে কেরামগণ) যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরাও সেভাবে ঈমান আনয়ন কর……"

(সূরা বাকারা ০২:১৩)

فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَواْ

"আর যদি তারা ঈমান আনে, যেরূপ তোমরা (সাহাবায়ে কেরামগণ) তাঁর (আল্লাহর) প্রতি ঈমান এনেছ, তাহলে তারা অবশ্যই হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।" (সূরা বাকারা ০২: ১৩৭)

সুতরাং, আল্লাহর রাসূলের ﷺ পর কাউকে যদি অনুসরণ করতেই হয়, তাহলে সাহাবায়ে কেরামগণকে অনুসরণ করতে হবে।

আবার হাদীসে এও এসেছে,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

"সর্বশ্রেষ্ঠ জামাত হচ্ছে আমার সাহাবীদের জামাত, এরপর শ্রেষ্ঠ যারা তাদের পরবর্তী (তাবেয়ীগণ), এরপর শ্রেষ্ঠ যারা তাদের পরবর্তী (তাবে-তাবেয়ীগণ)।………"

(সহীহ বুখারী-২৬৫১, ২৬৫২, ৩৬৫১, ৬৪২৯, ৬৬৫৮; সহীহ মুসলিম-৬৩৬৪; আল লু'লু ওয়াল মারজান-১৬৪৬; বুলুগুল মারাম-১৪০০; সুনানে আন-নাসায়ী-৩৮০৯; আত্ তিরমিজি-২২২১, ২৩০২; সুনানে ইবনে মাজাহ-২৩৬২)

এখন, আমরা যদি সাহাবায়ে কেরামের যিন্দেগী দেখি, তাহলে তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের সীরাতেই সশস্ত্র জিহাদ বা কিতালের (যুদ্ধের) আলোচনা পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেকের যিন্দেগীতেই কোনো না কোনো যুদ্ধের কাহিনী রয়েছে। এমনও সাহাবী আছেন, ঈমান আনার পর নামাযের ওয়াক্ত না হওয়ায় নামায পড়তে পারেননি, জিহাদ চলছিল,

জিহাদে শরীক হয়ে শহীদ হয়ে যান। এমনকি জিহাদের ফাযায়েল লাভ করার জন্য জিহাদের বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও অন্ধ, খোঁড়া সাহাবীগণও জিহাদ করেছেন। তাই, নবীজী ﷺ-এর সাহাবাগণের পবিত্র জামাতকে যদি অনুসরণ করতে হয়, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই জিহাদ করতে হবে।

এবার আসুন, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের কথায়। একথা সত্য যে, তাঁদের সকলের যিন্দেগীতে সশস্ত্র জিহাদ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ চার মাযহাবের (ফিকাহ শাস্ত্রের) ইমামগণ, হাদীসের ইমামগণ, মুজতাহিদীন, এক কথায় ইলমের জগতের সাথে সম্পর্কিত ইমামদের মধ্যে কারো কারো যিন্দেগীতে সশস্ত্র জিহাদের ইতিহাস পাওয়া যায়, আবার কারো কারো যিন্দেগীতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কেন?

এখানে এসে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে- তাঁরা কি তাহলে সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী ছিলেন না? যদি অনুসারী হয়েই থাকেন, তাহলে সাহাবাদের প্রায় সকলের যিন্দেগীতেই তো সশস্ত্র জিহাদ ছিল, কিন্তু তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীদের সকলের যিন্দেগীতে সশস্ত্র জিহাদ নেই কেন? আর যদি তাঁরা সাহাবীদের অনুসারী না হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁরা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত' হলেন কিভাবে? নবীজী ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী হলেন কিভাবে?...........

(বি.দ্র: সাহাবায়ে কেরামের জামাতের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণও সশস্ত্র জিহাদ (যুদ্ধ) করেছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পরবর্তী বিশ বছরে প্রায় ত্রিশ হাজার সাহাবী ও তাবেয়ী কেবল শহীদই হয়েছেন। আহতের সংখ্যা অগণিত। বরকতময় এই জামাতের হাতেই পারস্য ও রোম বিজয় হয়েছে। এ সম্পর্কে "কিতাবুত্ তাহরীদ্ 'আলাল ক্বিতাল"-এর দ্বিতীয় পর্বে "জিহাদের অপর নাম জীবন: একটি ইতিহাস ভিত্তিক পর্যালোচনা" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ!

উপরের প্রশ্নগুলো দ্বারা ইলমের সাথে সম্পর্কিত বড় বড় আইম্মায়ে কেরামগণ উদ্দেশ্য। অবশ্য তারাও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ করেছেন। কেউ কেউ সরাসরি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহয় অংশগ্রহণও করেছেন। যেমন: হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক রাহি. ছয় মাস ইলমী খেদমত করতেন, আর বাকী ছয় মাস ময়দানে জিহাদ করতেন। তাঁর মত এরকম আরো অনেকেই ছিলেন। কেউ কেউ শাসকবৃন্দকে সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করেছেন। যালিম শাসকের সামনে অকপটে সত্যকে প্রকাশ করে দিতেন। আর হাদিসে যালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলাকেও জিহাদ বলা হয়েছে।

তাছাড়া তারা শরীয়তকে খুলে খুলে মানুষের সামনে বয়ান করতেন। কোনো কিছু গোপন করতেন না। সত্যকে মিথ্যার সাথে মিলাতেন না। অর্থের লোভ, সম্মানের হাতছানি তাদেরকে টলাতে পারতো না। মাদরাসার ছাত্রদের সামনে, মসজিদে মুসল্লীদের সামনে, ওয়াজের ময়দানে জনতার সামনে, লেখনীর মধ্যে পাঠকের সামনে সুস্পষ্টরূপে সত্যকে বলে দিতেন। সত্য প্রকাশের ব্যাপারে কারো চোখ রাঙ্গানিকে তারা পরোয়া করতেন না, জালিমের জুলুমকে ভয় করতেন না। কোনো ধরণের জুলুম, নির্যাতন, বন্দিত্ব, নির্বাসন তাদেরকে হক বলা থেকে কিংবা হক প্রচার করা থেকে টলাতে পারতো না। অর্থ কিংবা সম্মানহানির ভয়ে কখনো তারা ভীত হতেন না। চাকুরি কিংবা খেদমত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কায় শঙ্কিত হতেন না। মাদরাসা রক্ষা, হেকমত, মাসলাহাত ইত্যাদি অজুহাতে ফরযে আইন অবস্থায় কখনো জিহাদ পরিত্যাগ করতেন না। নিজের সাধ্য অনুযায়ী জিহাদের পথে অগ্রসর হতেন। নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহর জন্য দুআ করতেন। মুজাহিদ ভাইদের সফলতার জন্য কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করতেন। জিহাদ ও

মুজাহিদীনদের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা ও মুহাব্বতে তাদের অন্তর পূর্ণ ছিল। সর্বোপরি, তাদের হৃদয়ে দুনিয়ার মহব্বত আর মৃত্যুর ভয় (তথা ওয়াহন) ছিল না।
জিহাদ করার অপরাধে তারা কখনো কোনো ছাত্রকে তাদের মাদরাসা থেকে বের করে দেননি। তারা কখনো মাদরাসাগুলোকে জঙ্গীবাদ তথা জিহাদমুক্ত ঘোষণা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন না। তারা কখনো তাগুতকে খুশি করতে তাগুতের মনমত ফতোয়া দিতেন না।..............)

প্রিয় ভাই!

আইম্মায়ে কেরামগণ অবশ্যই "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত", তাঁরা অবশ্যই হকের উপর ছিলেন, তাঁরা অবশ্যই সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী ছিলেন, সন্দেহ নেই। তাহলে, সাহাবাদের যিন্দেগীর সাথে কোনো কোনো আইম্মায়ে কেরামের যিন্দেগীর পার্থক্য দেখা যায় কেন? কেন তাদের কারো কারো যিন্দেগীতে সরাসরি অস্ত্রের জিহাদ পাওয়া যায় না? যদি তাঁরা সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী হয়েই থাকেন, তাহলে (বর্তমান যামানায়) তাঁদেরকে কি অনুসরণ করা যাবে না? (যেহেতু তাঁরা 'পরিপূর্ণ' হক ছিলেন), তাঁদেরকে অনুসরণ করতে গিয়ে যদি (বর্তমান যামানায়) সশস্ত্র জিহাদ না করা হয়, তাহলে কেন 'পরিপূর্ণ' হকের উপর থাকা হবে না?.........

দুঃখজনক হলেও সত্য, এইখানে এসেই আমরা অভিশপ্ত শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যাই। বিষয়টি যতটুকু জটিল মনে হচ্ছে, আসলে এতটা জটিল নয়। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

এক্ষেত্রে এসে আমরা অনেকে ভুলে যাই, শরীয়তের কিছু কিছু হুকুম পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে পরিবর্তনশীল। যেমন: কখনো কখনো কোনো একটি হুকুম ফরযে কিফায়া, আবার একই হুকুম বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে কখনো কখনো ফরযে আইন হয়ে যায়। সাহাবাদের যামানা আর তাবেয়ী/তাবে-তাবেয়ীদের যামানার পরিস্থিতি এক রকম ছিল না, আবার তাবেয়ী/তাবে-তাবেয়ীদের যামানার সাথে বর্তমান যামানার পরিস্থিতির মিল নেই। বরং সাহাবায়ে কেরামের সময়ের সাথে বর্তমান যামানার যথেষ্ট মিল রয়েছে। নবুয়ওতের যামানায় যেমন পরিবেশ ইসলামের প্রতিকূল ছিল, বর্তমান যামানায়ও তেমনি প্রতিকূল পরিবেশ বিদ্যমান। অন্যদিকে তাবেয়ী/তাবে-তাবেয়ীদের যামানা ছিল ইসলামের জন্য পুরোপুরি অনুকূল, মুসলমানদের নিরাপত্তার দিক থেকে 'স্বর্ণযুগ' বলা যেতে পারে। অধিকাংশ আইম্মায়ে কেরাম কেন জিহাদ করেননি, আর বর্তমান যামানায় কেন তাদের যিন্দেগীর বিশেষ দিকটি (জিহাদ করা বা না করা) অনুসরণ করা যাবে না, তা বুঝতে হলে নিচের কথাগুলো ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ্-

১. আইম্মায়ে কেরামের যামানায় জিহাদ 'ফরযে আইন' ছিল না, 'ফরযে কিফায়া' ছিল। তখন ইসলামী খিলাফত ছিল। দেশরক্ষা এবং অমুসলিমদের অঞ্চলগুলো জয় করার জন্য উম্মতের যথেষ্ট পরিমাণ বাহিনী ও শক্তি ছিল। শাসকগোষ্ঠীও জিহাদ ছাড়া অন্য কিছু বুঝতো না। সাধারণ মুসলমানদের মাঝে জিহাদী জযবা ছিল একশতে একশ। এক ডাকে পুরো উম্মাহ্ জিহাদের এক পতাকাতলে সমবেত হয়ে যেত। পৃথিবীর বাতিল শক্তিগুলো মুসলমানদের উপর তরবারি উত্তোলন করবে তো দূরে থাক্, নিজেরাই মুসলমানদের ভয়ে দৌঁড়ের উপর ছিল। দিগ্বিজয়ী মুসলিম সেনাপতিরা তাদের ঘুম হারাম করে রেখেছিলেন। এই সকল কারণে তখন সাধারণভাবে সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন ছিল না, ফরযে কিফায়া ছিল। আর তাই জিহাদ না করার কারণে আইম্মায়ে কেরামগণ দোষী সাব্যস্ত হবেন না।

কিন্তু বর্তমানে উম্মতের পরিস্থিতি কী, তা লক্ষ্য করুন! আগেই এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে যে, বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে, ফরযে কিফায়া নয়। তাই বর্তমান সময়ে উম্মতের মাঝে জিহাদ করতে সক্ষম যে কেউ জিহাদ না করলে দোষী সাব্যস্ত হবে, ফরয তরককারী হয়ে যাবে।

২. আইম্মায়ে কেরামের যামানায় ইলমের খেদমত করা জিহাদ করার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কিভাবে?..........................

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর নানামুখী ফেতনা দেখা দেয়। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান ফেতনা হলো, ইহুদী-নাসারা ও মুনাফিক কর্তৃক জাল হাদীস ও মাসআলা-মাসাইল উদ্ভাবন এবং সাধারণ মানুষের ঈমান-আকীদা নষ্ট করার ফেতনা। এরা বিভিন্ন রকমের মনগড়া জাল হাদীস বানিয়ে উম্মতকে গোমরাহ করছিল। তাই তখন সময়ের দাবী ছিল ইলমুল আকাঈদ, ইলমুল হাদীস এবং মাসআলা মাসাইল (ফিকহ) সমূহ কিতাবাকারে লিপিবদ্ধ করা। উম্মতকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচানোর জন্য বিশুদ্ধ আকীদা, সহীহ হাদীস ও বিশুদ্ধ ফিকহের ইলমকে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা। আর যারা এ কাজের উপযুক্ত ছিলেন, সে সকল ব্যক্তিদের উপর কাজটি করা অবশ্যই ফরয (ফরযে কিফায়া) ছিল। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, জরুরত পরিমাণ ইলম শিক্ষা করা ফরযে আইন; কিন্তু ইলমের উপর পান্ডিত্য অর্জন করা, কিতাবাদি রচনা করে ইলমের সংরক্ষণ করা ইত্যাদি ফরযে কিফায়া। যারা এই কাজ আঞ্জাম দেয়ার মত যোগ্যতা রাখেন তাদের উপর তা ফরযে কিফায়া। আইম্মায়ে কেরাম যদি তখন ইলমের খেদমত (যা তখন তাদের উপর ফরযে কিফায়া ছিল, তা) বাদ দিয়ে জিহাদের (এটিও তখন তাদের উপর ফরযে কিফায়া ছিল, তার) মেহনত করতেন তাহলে উম্মত লাভবান হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্ত হতো বেশি। এবং তাঁরা (যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ইলমের সংরক্ষণ না করার দায়ে) একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয তরকের গুনাহে দোষী হতেন। তাঁদের আজীবন সাধনার প্রেক্ষিতে কুরআন হাদীসের বিশুদ্ধ ইলম সংরক্ষিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্, যা বর্তমান পর্যন্ত বিদ্যমান আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে ইনশাআল্লাহ। যেহেতু বর্তমানেও ইলমের খেদমত করা ফরযে কিফায়া, অপরদিকে জিহাদ ফরযে আইন, তাই বর্তমানে আমরা যদি কেবল মসজিদ, মাদরাসা, মারকাজ আর খানকার খেদমত কিংবা অন্যান্য মেহনত নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকি, তাহলে আমাদের অবশ্যই ফরয তরক করার গুনাহ হবে। তাই, যে ভাই যেই মেহনতই করি না কেন, আমাদেরকে অবশ্যই পাশাপাশি জিহাদের ব্যাপারে চিন্তা ফিকির ও সক্রিয়ভাবে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মেহনতে অংশগ্রহণ করতে হবে, ইনশাআল্লাহ।

৩. দ্বীনের মধ্যে যত প্রকারের মেহনত ও রক্ষাপ্রাচীর আছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চারটি, যথা: ইলম, তাযকিয়া, দাওয়াত ও জিহাদ। এর কোনো একদিকে দূর্বলতা থাকলে বাতিল সেদিক দিয়েই উম্মতকে আক্রমণ করবে। অর্থাৎ একথা থেকে বুঝা যায়, বাতিল যদি কোনো একদিকে আক্রমণ করে, বুঝতে হবে ঐ দিকটি উম্মতের দুর্বল হয়ে গেছে। তখন সেদিকটিকে শক্তিশালী করা উম্মতের উপর ফরয। আইম্মায়ে কেরামের সময় যেহেতু বাতিলের আক্রমণ ইলমী ময়দানে বেশি ছিল (অন্যদিকে জিহাদের ক্ষেত্রে উম্মত তখন যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল), তাই তখন সেটিকে সুরক্ষিত করা জিহাদ করার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আলহামদুলিল্লাহ তাঁরা সেটি যথাযথভাবে পালন করেছেন। কিন্তু বর্তমানে উম্মত জিহাদের ক্ষেত্রে অধিকতর দুর্বল হয়ে যাওয়ায় সবদিক থেকে বাতিলের আক্রমণ ও আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে, তাই বর্তমানে জিহাদ করা সক্ষম সকলের উপর ফরযে আইন। তাই বর্তমান সময়ে ইলমী খেদমত বা অন্যান্য মেহনতের পাশাপাশি (জিহাদের প্রয়োজনে সেগুলো বাদ দিয়ে হলেও) অবশ্যই জিহাদ করতে হবে, ইনশাআল্লাহ।

৪. যদিও আইম্মায়ে কেরামের সকলেই সরাসরি সশস্ত্র জিহাদ করেননি, কিন্তু তাঁরা কেউই কখনো বাতিলের সাথে আপোস করেননি। কোনো কুফরকে 'হেকমত' রূপে গ্রহণ করেননি। শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য করেননি। হীন স্বার্থসিদ্ধি কিংবা খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের দরবারে গমন করেননি। নগন্য দুনিয়াবী স্বার্থের কারণে তাঁদের ঈমান বিক্রি করেননি। বরং শাসকদেরকে সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করেছেন (হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী যা সবচেয়ে বড় জিহাদ)। আর এ কাজ করতে গিয়ে, বাতিল/তাগুত/গোমরাহ/পথভ্রষ্ট শাসকবর্গের সামনে হক ও সত্য কথা বলার অপরাধে তাদের অনেককেই কারাবরণ করতে হয়েছে; নিষ্ঠুর-নির্মম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বর্তমান যামানায় আমাদের অনেকেই তাগুতের গোলামী করে ও আইম্মায়ে কেরামের উল্টোপথে চলেও দাবী করছি যে, আমরা আইম্মায়ে কেরামের অনুসারী।

৫. সেই যামানার আইম্মায়ে কেরাম যদি বর্তমান সময়ে জন্মগ্রহণ করতেন, অবশ্যই তাঁরা কেবল "ইমামুল ফিকহ" হতেন না, "ইমামুল জিহাদ"ও হতেন, হতেন "মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ"ও। কেননা তাঁরা আমলের গুরুত্ব বুঝতেন, আমলের প্রয়োজনীয়তা বুঝতেন, ফরযে আইন অবস্থায় জিহাদ পরিত্যাগের ক্ষতি ও শাস্তির কথা তাঁরা উপলব্ধি করতেন। উম্মতের মাঝে জিহাদকে পুনর্জীবিত করতে, উম্মাহর উপর উত্তোলিত বাতিলের তরবারিগুলো ভেঙে ফেলতে মেহনত করতেন, সেজন্য কলম ধরতেন, সেজন্য লড়াই করে নিজের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতেন।

৬. আইম্মায়ে কেরাম সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী ছিলেন। কেননা সাহাবায়ে কেরামের যিন্দেগীতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জিহাদের দুইটি অবস্থাই ছিল। কখনো জিহাদ ফরযে আইন হতো তখন সকলকেই তাতে জুড়তে হতো, কেবল মুনাফিক ও অক্ষম ছাড়া আর কেউ তা থেকে পিছনে পড়তো না। আবার কখনো জিহাদ ফরযে কিফায়া হতো, তখন সবাই তাতে অংশগ্রহণ করতেন না।

আচ্ছা ভাই বলুনতো, ইসলামের প্রথম যুদ্ধ কী?.......... বদরের যুদ্ধ।

এটি আক্রমণাত্মক নাকি আত্মরক্ষামূলক?..........আক্রমণাত্মক বা ইকদামী (Offensive)। কেননা, আল্লাহর রাসূল ﷺ তৎকালীন মক্কার অন্যতম কাফের সরদার আবু সুফিয়ানের (তখনও তিনি মুসলমান হননি) বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করতে বের হলেন। এই বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষা করার জন্য মক্কা থেকে বাহিনী আসলে বদর প্রান্তরে তারা মুসলমানদের মুখোমুখি হয়। যেহেতু এতে মুসলমানরা আক্রান্ত হয়নি, বরং মুসলমানরাই আগে বেড়ে আক্রমণ করতে গিয়েছে, তাই এটি ছিল আক্রমণাত্মক/ইকদামী (Offensive) জিহাদ।

এটি কি ফরযে আইন ছিলো, নাকি ফরযে কিফায়া?..........ফরযে কিফায়া। যেহেতু আক্রমণাত্মক তাই এটি ফরযে কিফায়া। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনার সকল সাহাবীদের সাথে করে নিয়ে বের হননি। মদীনায় তখন হাজারের উপর পুরুষ সাহাবী ছিলেন, এর মধ্য থেকে মাত্র ৩১৩ জন বা কিছু কম বা বেশি সংখ্যক সাহাবীকে নিয়ে 'আক্রমণাত্মক' এই অভিযানে বের হন। অর্থাৎ যুদ্ধটি ছিল ফরযে কিফায়া। এছাড়াও মূতা, মক্কা বিজয়, খাইবার অভিযান ইত্যাদি আক্রমণাত্মক যুদ্ধ ছিল। এবার আসুন বাকি যুদ্ধগুলো, যেমন: ওহুদ, খন্দক, তাবুক ইত্যাদি এগুলো ছিল প্রতিরক্ষামূলক/দেফায়ী (Defensive) যুদ্ধ। এই যুদ্ধগুলোতে মুসলমানদের উপর কুফ্ফাররা আগে বেড়ে আক্রমণ চালায়, যার ফলে 'নফীরে আম' এর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ফলে সকলের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক (ফরযে আইন) ছিল। অন্যদিকে, আমাদের আইম্মায়ে কেরামের যামানায় যেহেতু জিহাদ ফরযে কিফায়া ছিল, আর তাঁদের সকলের জিহাদ করার প্রয়োজনও ছিল না, বরং তাঁরা ইলমের হিফাযতের জন্য ফরয (ফরযে কিফায়া) খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছিলেন,

তাই তাঁরাও মূলত সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপরই ছিলেন, কেননা, ফরযে কিফায়া যুদ্ধগুলোতে সকল সাহাবী যোগ দিতেন না।

প্রিয় ভাই! ভালো করে বুঝে নেই, মুসলিম উম্মাহর জন্য বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপট হলো ওহুদ, খন্দক কিংবা তবুকের যুদ্ধের ন্যায়, আর এই যুদ্ধগুলোতে সকল মুসলমানদের অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল। খন্দকের জিহাদের কাজ করতে গিয়ে স্বয়ং আল্লাহর রাসূলের ﷺ চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায়, এ থেকেই প্রতিরক্ষামূলক/দেফায়ী জিহাদের গুরুত্ব বুঝে আসে। কেবল মুনাফিক ও অক্ষম ছাড়া এই যুদ্ধগুলোতে সকল সাহাবায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর মুনাফেক সবর্প্রথম চিহ্নিতই হয় ইসলামের দ্বিতীয় যুদ্ধ- ওহুদের যুদ্ধের সময়। তাই আমরা যারা ফরযে আইন জিহাদ ত্যাগ করে ঘরে বসে আছি, জিহাদের ব্যাপারে কোনো চিন্তা ফিকির করছি না, সক্রিয়ভাবে জিহাদী মেহনতে জুড়ছি না, আমাদের "মুনাফেকী"র ব্যাপারে খুব ভয় করা দরকার। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নেফাক থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

তাই আমরা যারা বলছি, "আইম্মায়ে কেরাম জিহাদ করেননি, তাই আমরাও জিহাদ করবো না।" তাদেরকে বলি-

* তাদের মাঝে কেউ কেউ যারা জিহাদ করেননি, তাঁরা দ্বীন বুঝেই জিহাদ করেননি, আর আমরা দ্বীন না বুঝার কারণে জিহাদ ত্যাগ করেছি।
* তাঁরা আল্লাহ তা'আলার কাছে জিহাদ তরককারীদের অর্ন্তভূক্ত ছিলেন না, কিন্তু আমাদের ব্যাপারে ভয় আছে।
* তাঁরা 'ফরযে আইন তরককারী' ছিলেন না, কিন্তু জিহাদ না করার কারণে আমরা তা হয়ে যাচ্ছি।
* তাঁরা জিহাদের গুরুত্ব বুঝেছিলেন, 'জিহাদ ফরযে আইন' না হওয়াতে তাঁরা অনেকে হয়তো তখন সশস্ত্র জিহাদ করেননি। অন্যদিকে, আমরা হয়তো জিহাদের গুরুত্ব বুঝছি না, এজন্য 'জিহাদ ফরযে আইন' হওয়া সত্ত্বেও জিহাদ করছি না; নতুবা, আমরা হয়তো জিহাদের গুরুত্ব বুঝেছি, কিন্তু 'ওয়াহানে' আক্রান্ত হওয়াতে জিহাদ করছি না।
* আইম্মায়ে কেরামের যামানায় মুসলিম জাহানে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল, কিন্তু ইলমী জগতে ছিল নানামুখী ফিতনা- এই কারণে জিহাদের উপর ইলমী খেদমতকে বেশি গুরুত্ব দেয়া ছিল তখন সময়ের দাবী। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্তমানে জিহাদ করা ফরযে আইন আর ইলমী খিদমত করা ফরযে কিফায়া। তাই আমরা একই কাজ করে অর্থাৎ জিহাদের উপর ইলমের মেহনতকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে 'সময়ের ও অবস্থার নাজুকতার বিচারে' আইম্মায়ে কেরামের উল্টো পথে হাঁটছি। কেননা বর্তমানে আইম্মায়ে কেরাম উপস্থিত থাকলে অবশ্যই তারা জিহাদী মেহনত করতেন।
* তাঁরা জিহাদ না করার কারণে তাঁদের ব্যাপারে মুনাফেকীর ভয় ছিল না, তাঁদের যামানায় সেই পরীক্ষা আসেনি (অর্থাৎ তাঁদের উপর জিহাদ ফরযে আইন ছিল না); কিন্তু বর্তমানে সমস্ত উম্মতের উপর সেই পরীক্ষা চলছে, যা এসেছিল সাহাবাদের জামাতের উপর।

সুতরাং ভাই, সাবধান!..............

• আমরা (আলেমরা) সশস্ত্র জিহাদ করি না; তার কারণ...

দ্বিতীয় কারণ:

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন,

وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

"নিশ্চয় ইবাদতকারীর উপর আলিমের মর্যাদা তারকারাজির উপর চাঁদের মর্যাদার সমতুল্য। আলিমগণ নবীগণের ওয়ারিস্। আর নবীগণ দীনার ও দিরহাম (টাকা-পয়সা) ওয়ারিসী স্বত্ব হিসেবে রেখে যাননি, বরং তারা ওয়ারিসী স্বত্বরূপে রেখে গেছেন ইলম (জ্ঞান)। যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করলো সে যেন একটি পূর্ণ অংশ লাভ করলো।" (সুনানে ইবনে মাজাহ-২২৩)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো ইরশাদ করেন:

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَى أَدْنٰى رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِيْ

"একজন আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব এবাদতকারীর উপর এমনি, যেমন আমার শ্রেষ্ঠত্ব সাহাবীদের উপর।"

(সহীহ, জামে' আত্ তিরমিজি-২৬৮৫, মিশকাতুল মাসাবিহ-২১৩)

লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এলেমকে কিভাবে নবুয়তের স্তরে রেখেছেন এবং এলেমহীন স্তরের মর্তবা কেমন করে ছোট করে দিয়েছেন। এই ইলম ছাড়া এবাদত হবে না। (এহইয়াউ উলূমিদ্দীন, খণ্ড ১, পৃ. ১৮)

আল্লামা ইমাম ইবনুল বার (رحمة الله) তার প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ جامع بيان العلوم و فضله- গ্রন্থের **১/৩১** পৃষ্ঠায় হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে শহীদের উপরে আলেমের মর্যাদা প্রসঙ্গে একটি হাদিস বর্ণনা করেন। যেমন-

للانبياء على العلماء فضل درجتين و للعلماء على الشهداء فضل درجة

"নবীদের আলেমদের উপর দুই স্তর বেশি মর্যাদা রয়েছে । আর আলেমদের শহীদদের উপর একস্তর মর্যাদা রয়েছে ।"

হযরত ইমাম গায্যালী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এ হাদীস দ্বারা ইলমের এমন মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয় যে, ইলমের স্থান নবুওয়তের পরে এবং শাহাদাতের পূর্বে। অথচ শাহাদাতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত আছে।" (এহইয়াউ উলূমিদ্দীন, খণ্ড ১, পৃ. ১৮)

যে ফজিলত গুলো বিভিন্ন আয়াত/(নির্ভরযোগ্য) হাদীসে বলা হয়েছে, সে অনুযায়ী বুঝে আসে, "কিয়ামতের দিন নবীদের পর আলেমদের মর্যাদা হবে আর আলেমদের পর হবে শহীদ বা মুজাহিদদের মর্যাদা।" এককথায়, উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান উলামায়ে কেরাম, এমনকি মুজাহিদ এবং শহীদদের থেকেও।

হাদীসগুলোর ভাবার্থ:

যাইহোক, ইলম ও আলেমের মর্যাদা সম্পর্কিত হাদীসগুলো থেকে আমরা অনেকেই এই ভাবার্থ গ্রহণ করে থাকি- "আমরা আলেমগণ তো উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সকল আবেদের উপর আমাদের মর্যাদা। যেহেতু জিহাদ করা একটা আমল। তাই ইলম চর্চা সর্বাবস্থায় জিহাদ অপেক্ষা মর্যাদাবান। একজন মুজাহিদ (কেবল জিহাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন

তিনি) হচ্ছেন আবেদ। আর একজন আলেম (যিনি এলেম চর্চা ও এলেমের খেদমতে নিয়োজিত থাকেন তিনি এরকম) হাজারটা আবেদ অপেক্ষা উত্তম। তাই, আমরা সর্বাবস্থায় মুজাহিদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর যেহেতু আমরা অধিক উত্তম কাজে নিয়োজিত আছি, আমাদের (আলেমদের) জিহাদ করার দরকার কী? আমাদের স্থানতো মুজাহিদদের উপরেই আছে? আমরা কেন নিচে নামব? আমরা তো অধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতই করছি? দ্বীনের অধিক গুরুত্বপূর্ণ খিদমতই করছি? তাই না?"

যুক্তিখণ্ডণ:

মুহতারাম ভাই!

এখন আমি আপনাদেরকে কিছু প্রশ্ন করছি, কোন্ আলেমের স্থান নবীদের পরে, কিন্তু শহীদের আগে?

নবীদের পরেই কি সেই আলেমের স্থান হবে, যিনি সমাজে আলেম হিসেবে স্বীকৃত, অথচ নামায পড়েন না?

নবীদের পরেই কি সেই আলেমের স্থান হবে, যে আলেম রোযা রাখেন না?

নবীদের পরেই কি সেই আলেমের স্থান হবে, যে আলেম যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় করেন না?

নবীদের পরেই কি সেই আলেমের স্থান হবে, যে আলেমের উপর হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ করেন না?

প্রশ্ন হচ্ছে, যেসব আলেম 'ফরযে আইন' উক্ত কাজগুলো করেন না, তাদের স্থান কি নবীদের পরে, আর শহীদের আগে হবে?...........

হবে না! কারণ, তিনি যত বড় আলেমই হোন না কেন, শরীয়ত তাকে 'একজন ফরয তরককারী' হিসেবে আখ্যায়িত করবে।

আর কোনো ফরয তরককারীর স্থান নবীদের পরে হবে, আর শহীদের আগে হবে, এটি কিভাবে সম্ভব?

তাই যদি হয়, তাহলে নবীদের পরেই কি সেই আলেমের স্থান হবে, যে আলেম তার উপর আপতিত অন্য কোনো 'ফরযে আইন' হুকুমকে আদায় করেন না?

তাহলে ভাই, একটু চিন্তা করুন, বর্তমান যামানায় জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে গেছে, তখন আমরা যে সব আলেম জিহাদ করছি না, জিহাদের বিষয়ে কথা বলছি না, জিহাদের জন্য কলম ধরছি না, জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি না, জিহাদের জন্য উম্মতকে জাগ্রত করছি না, জিহাদের জন্য ময়দানে আসছি না, তাদেরকে কেন 'ফরয তরককারী' বলা হবে না? আর জিহাদ না করার কারণে আমরা যদি 'ফরয তরককারী' হই, তাহলে এমন একজন 'ফরযে আইন তরককারীর' স্থান কেন নবীদের পরে আর শহীদের আগে হবে?

প্রিয় ভাই!

আমরা কত বড় আলেম যে, আমাদের জিহাদ করা লাগে না?

আমরা কি হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

আমরা কি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

আমরা কি হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

আমরা কি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

আমরা কি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

আমরা কি হযরত আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

আমরা কি হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?
আমরা কি হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?
আমরা কি হযরত আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?
আমরা কি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?
আমরা কি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?
আমরা কি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?
আমরা কি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?
....
আমরা এমনি ভাবে কোন্ সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে বড় আলেম? (নাউযুবিল্লাহ)
প্রিয় ভাই! উনারা কি উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন না?
উনাদের সীরাত কি আপনি পড়ে দেখেননি?
উনাদের যিন্দেগীতে কি জিহাদ নেই?
উনারা কেন জিহাদ করেছেন? আর আমরা কেন জিহাদ করছি না?

"ফরযে আইন" অবস্থায় আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাহাবাদের জামাতে থাকা সত্ত্বেও জিহাদ না করলে যদি 'আলেম' না হওয়া যায়, বরং মুনাফেকদের তালিকায় নাম চলে যায়, তাহলে বর্তমান যামানায় আমরা জিহাদ না করে, জিহাদের পক্ষে না থেকে, উল্টো পৃথিবীতে যেন জিহাদ না থাকে সেজন্যে জিহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কেউ কেউ ফতোয়াবাজি করে কেন আমরা "মুনাফিক" হব না? জিহাদ না করেও কিভাবে আমরা আল্লাহ পাকের কাছে 'আলেম' সাব্যস্ত হব?

হায়! শুধু কুরআন-হাদীসের জ্ঞান থাকলেই যদি আলেম হয়ে যায়, তাহলে তো ইবলিস সবচেয়ে বড় আলেম!
হযরত ইমাম গায্যালী রাহি. তাঁর 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন' কিতাবে লিখেন, এক হাদীস শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে,

خصلتانِ لا تجتمعانِ في منافقٍ حُسنُ سمتٍ ولا فقْهٌ في الدِّينِ

"মুনাফিকদের মধ্যে দুটি অভ্যাস পাওয়া যায় না। (১) চমৎকার পথ প্রদর্শন (হিদায়াত), (২) দ্বীনের ইলম (ফিকহ)।" (সুনানে তিরমিযি, হাদীস নং-২৬৮৪; এহইয়াউ উলূমিদ্দীন: খণ্ড ১, পৃ. ১৬)

তিনি আরো লিখেন, "মনে রাখতে হবে, সমসাময়িক ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী (কিছু শব্দ ও বাক্যের অধিকারী) আলেমদের কপটতা (মুনাফেকী) দেখে এ হাদীস সম্পর্কে সন্দেহ করা ঠিক হবে না। কেননা 'ফেকাহ' শব্দ বলে আল্লাহর রাসূল ﷺ সে জ্ঞান বুঝাননি, যা আপনারা ধারণা পোষণ করে থাকেন। প্রকৃত ফেকাহবিদ তিনিই যিনি আখিরাতকে দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম বলে মানে (এবং তাঁর যিন্দেগীতে তা প্রকাশ পায়)।" (এহইয়াউ উলূমিদ্দীন: খণ্ড ১, পৃ. ১৭)

সুতরাং ভাই, কেবল বাহ্যিক লেবাস-পোশাক আর ডিগ্রি দেখে যেন আমরা ধোঁকা না খাই!
আমাদের মাঝে যদি আখিরাতের ভয় থাকে, তাহলে কী করে আমরা 'ফরয তরককারী হওয়া'র ভয় করি না?
আমাদের মাঝে যদি আখিরাতের ভয় থাকে, তাহলে কী করে আমরা নিফাক্-এর ভয় করি না?
আমাদের মাঝে যদি আখিরাতের ভয় থাকে, তাহলে কী করে আমরা (উম্মাহর বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে নামায-রোযার মত একটি ফরয হুকুম) জিহাদ না করে ঘরে বসে থাকতে পারি?

জিহাদ ফরযে আইন হওয়া সত্ত্বেও আমরা কী করে কেবল মসজিদ মাদরাসা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে পারি?
প্রিয় ভাই! একটু ভেবে দেখি- একটি দেশে ইলমী খিদমতের জন্য কি লক্ষ লক্ষ মুফতী, মুহাক্কীক আলেমের দরকার আছে?
সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কি সকলেই ফতোয়া দিতেন? একটি দেশের ফতোয়ার খেদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য কয়জন মুফতী দরকার? নিশ্চয় লক্ষ লক্ষ মুফতী সাহেবের দরকার নেই!

'জিহাদ ফরযে আইন' অবস্থায় সকলকেই প্রথমে 'এলায়ে কালিমাতুল্লাহর মেহনত' জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহয় আত্মনিয়োগ করতে হবে। অতঃপর 'আমীরে জিহাদ' প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু সংখ্যক মুহাক্কীক আলেম ও মুফতী সাহেবকে ইলমী খেদমতে নিয়োজিত করতে পারেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে হাফেয, মুহাক্কীক আলেম ও মুফতী সাহাবীর সংখ্যা ছিল সীমিত, অথচ তারা সকলেই সাধারণভাবে মুজাহিদ ছিলেন। সুবহানাল্লাহ!

আসলে, সাহাবায়ে কেরামের যামানায় জিহাদকে একজন মুসলমানের যিন্দেগী থেকে আলাদা করার কথা কেউ কখনো ভাবতেও পারতেন না, যেমনভাবে নামায-রোযাকে আলাদা করার কথা ভাবা যায় না। একজন মুসলমান জিহাদ করবে না, এটা তাঁরা ভাবতেও পারতেন না। নিচের হাদীসটি লক্ষ্য করুন-

عن عبد الرحمان بن زيد بن أسلم عن أبيه :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :لا يزال الجهاد حلوا أخضر ما قطر القطر من السماء، وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم :ليس هذا زمن جهاد، فمن أدرك ذلك الزمان، فنعم زمان الجهاد، قالوا يا رسول الله أو أحد يقول ذلك؟ قال نعم ...من عليه لعنة الله والملاءكته والناس أجمعين

নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন, "যতদিন পর্যন্ত আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, ততদিন পর্যন্ত জিহাদ সতেজ ও সুমিষ্ট থাকবে। আর অদূর ভবিষ্যতে মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যে যুগের কিছু আলেম বলবে, এটি জিহাদের যুগ নয়। অতএব, যে ব্যক্তি সে যুগটি পাবে, তার জন্য সেটি হবে জিহাদের শ্রেষ্ঠ যুগ।" সাহাবায়ে কেরাম অবাক হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! একজন মুসলমান কি এমন কথা বলতে পারে? নবীজী ﷺ বললেন, "হ্যাঁ, এমন মুসলমানরা বলবে, যারা আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপে অভিশপ্ত।" (আস্সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খ. ৩, পৃ. ৭৫১)

প্রিয় ভাই! তাহলে কেন আমরা জিহাদকে আমাদের যিন্দেগী থেকে আলাদা করে দিয়েছি?? এখনো কেন আমরা 'মুজাহিদ' হওয়ার স্বপ্ন দেখি না? এখনো আমরা কেন বসে আছি? জিহাদের ব্যাপারে কেন আমরা এত উদাসীন? আমরা উম্মতকে কেন সতর্ক করছি না? উম্মতকে কেন জিহাদের জন্য প্রস্তুত করছি না? তাদেরকে কেন জিহাদের জন্য 'তাহরীদ' (উদ্বুদ্ধ) করছি না? অথচ জিহাদ করা বর্তমানে ফরযে আইন।

আল্লাহ্ তা'আলা কি তাঁর প্রিয় হাবীব ﷺ-কে এই নির্দেশ দেননি?-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ

"হে নবী! আপনি মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।"

(সূরা আনফাল ০৮:৬৫)

প্রিয় ভাই! এখন তো আর নবী নেই, নবুওয়তও নেই। উম্মতকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব এখন কার?? এই দায়িত্ব কি আল্লাহর রাসূলের ﷺ ওয়ারিশদের উপর একটুও বর্তায়নি?? আমরা কি কেবল কতিপয় শব্দ আর বাক্যের ওয়ারিশ-ই গ্রহণ করবো, নবুওয়তের ফেলে রাখা আর কোনো দায়িত্ব কি আমরা গ্রহণ করবো না???

হায়! 'তাহরীদ্ 'আলাল ক্বিতাল'-এর কাজ উলামায়ে কেরাম ছাড়া আর কে ভালোভাবে করতে পারবে? কেন আমরা এগিয়ে আসছি না? আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা কী হিসাব দিবো, কী জবাব দিবো, একটু চিন্তা করেছি কী?

প্রিয় ভাই! একটি বিষয় আমাদেরকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে, ইনশাআল্লাহ। সেটি হল- 'যে সকল হাদীসে একজন সাধারণ উম্মতের উপর একজন আলেমের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য অবশ্যই সে সকল উলামায়ে কেরাম হবেন, যারা এলেমের দাবী অনুযায়ী আল্লাহ্ পাকের অন্যান্য হুকুমের সাথে সাথে ফরযে আইন 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্'র হুকুমও আদায় করেন। নচেৎ, ইনশাআল্লাহ, আল্লাহর রাস্তার একজন মুজাহিদের মর্যাদা (তিনি আলেম হোন কিংবা গাইরে আলেম) সর্বাবস্থায়ই 'ঘরে বসে থাকা' (ক্বয়ীদুন) একজন আলেমের উপর হবে, যেমনটি নিম্নের আয়াতে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে-

لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا- دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"৯৫. গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান (যারা লড়াই করার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং জিহাদ ত্যাগ করার)- যাদের কোনো সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ সব মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারা সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ্ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। ৯৬. এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

(৪ সূরা নিসা :৯৫-৯৬)

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

• আমরা (আলেমরা) সশস্ত্র জিহাদ করি না; তার কারণ...

তৃতীয় কারণ:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

يُوزَنُ يومَ القيامةِ مدادُ العلماءِ بدمِ الشهداءِ

"কিয়ামতের দিন আলেমদের লেখার কালি শহীদের রক্তের সাথে ওজন করা হবে।"

(এহইয়াউ উলূমিদ্দীন: খণ্ড ১, পৃ. ১৭)

ইবনে আব্দিল বার (رحمة الله) হযরত আবু দারদা (رضي الله عنه) থেকে যঈফ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।"

(তাখরিজু আহাদিসুল ইহ্ইয়াউল উলূম, হাদিস নং ৪)

আরেকটি হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وُزِنَ حِبْرُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ فَرَجَحَ عَلَيْهِمْ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ ফরমান, "কিয়ামতের দিন আলিমের কলমের কালি ও শহিদের রক্ত ওজন করা হবে, তখন আলিমের কলমের কালি শহিদের রক্তের চেয়ে ভারী হয়ে যাবে।"

(ইমাম ইবনে জাওযী, আল-ইললুল মুতনাহিয়্যাহ, ১/৭১ পৃ. হাদিস, ৮৩, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১০/১৭৩ পৃ. হাদিস, ২৮৯০৩, তিনি ইবনে নাজ্জারের সূত্রে। সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস: ১৮/১৬৯ পৃ. হা/১৯১৩৬; হাদীসের মান- দুর্বল, কেউ কেউ মাউযু বলেছেন।)

হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে এই জাতীয় আরো বেশ কয়েকটি হাদীস পাওয়া যায়।

প্রিয় ভাই! একজন আলেমের কলমের কালি আর একজন শহীদের রক্তের তুলনামূলক হাদীসগুলো থেকে আমরা কেউ কেউ এমন কিছু ভাবার্থ গ্রহণ করি, যা আমাদেরকে জিহাদ বিমুখ করে কেবল ইলমী খেদমতেই লাগিয়ে রাখে; আমরা তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকি। আপনি কি জানেন, হাদীসগুলো থেকে আমরা কী ভাবার্থ গ্রহণ করি?? ভাবার্থ: "হাশরের ময়দানে একজন আলেমের কলমের কালি আর শহীদের রক্ত ওজন করা হলে যেহেতু একজন আলেমের কলমের কালির ওজনই ভারী হবে, তাই আমরা (আলেমরা) বুকের রক্ত ঝরানোর চেয়ে কেবল কলমের কালি দিয়ে জিহাদ করাকেই বেশি ভালোবাসি। আমাদের আমল মীযানের পাল্লায় এমনিতেই বেশি ভারী হবে; তাই বেশি লাভজনক কাজ ছেড়ে আমরা কম লাভজনক কাজে নিয়োজিত কেন হব?"

যুক্তি খণ্ডন:

প্রিয় ভাই! এ সম্পর্কে কিছু কথা!

* মুহাক্কীক মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে, এই জাতীয় যতগুলো হাদীস পাওয়া যায়, সেগুলো যইফ (দুর্বল) কিংবা জাল (তথা বানোয়াট)। যেমন:

وبالجملة فالحديث ضعيف من جميع طرقه

"সমষ্ঠিগতভাবে এই হাদিসের সকল সূত্রই যঈফ।"

(সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দ্বঈফাহ, হাদিস নং ৪৮৩২ এর ব্যাখ্যায়)

প্রিয় ভাই! 'আলেমের কালির ফযিলত' সম্পর্কে আলাদা কোন সহীহ হাদিসই পাওয়া যায় না, যার ভিত্তিতে আমরা আলেমের কালিকে শহীদের রক্তের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে পারি, দামি হবে তো দূরের কথা! অপরদিকে শহীদের রক্ত সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদিস আছে, যার ভিত্তিতে আমরা প্রমাণ করতে পারি- শহীদের রক্তের মূল্য আল্লাহ্ পাকের কাছে অবশ্যই আলেমের কলমের কালি অপেক্ষা বেশি। যেমন: কিয়ামতের দিন শহীদের রক্ত হতে মেশকের ঘ্রাণ বের হওয়া, শহীদের প্রথম ফোঁটা রক্ত পড়ার সাথে সাথে ক্ষমা করে দেওয়া ইত্যাদি। (উক্ত হাদীসগুলো আমরা পূর্ববর্তী পর্বে আলোচনা করেছি।) আলেমের কলমের কালির ব্যাপারে সহীহ হাদীস সমূহে এই ধরণের কোনো ওয়াদা নেই। সুতরাং যেই বিষয়ে (আলেমের কলমের কালি সম্পর্কে) সহীহ হাদীসসমূহে কোনো আলোচনাই নেই, কিছু দুর্বল আর জাল হাদীসের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়টিকে কুরআনের বহু আয়াত আর অসংখ্য সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাশীল আরেকটি বিষয় (শহীদের রক্তের মর্যাদা)-কে আমরা কিভাবে ছোট ও খাটো করে দেখতে পারি? তাহলে, কিভাবে আমরা শহীদের রক্তের চেয়ে আলেমের কালিকে সর্বাবস্থায় ভারী বলতে পারি??? প্রকৃতপক্ষে, যইফ আর জাল হাদীসের ভিত্তিতে আলেমের কলমের কালিকে 'সর্বাবস্থায়' শহীদের রক্তের চেয়ে বেশি দামী বা ওজনদার মনে করা- এক প্রকারের 'চিন্তাগত বিভ্রান্তি'।

* প্রিয় ভাই! কার মর্যাদা বেশি হবে, এই বিষয়টি আপেক্ষিক। ইবাদতের মান অনুযায়ী পার্থক্য হয়। ইমাম মানাবি, ইবনুল কায়্যিম রহঃ এর এমন আলোচনা আছে । কখনো শহীদের মর্যাদা বেশি হবে, আবার কখনো আলেমের ফজিলতও বেশি হতে পারে তার আমলের মান অনুযায়ী। শহীদ হওয়া ছাড়া সিদ্দিকও শহীদ থেকে উপরের স্তরের হন। যেমনঃ আবু বকর রা.। তবে বর্তমানে ফরজে আইন জিহাদ থেকে দূরে থেকে একজন আলেমের পক্ষে একজন শহীদ কিংবা একজন মুজাহিদের চেয়ে বেশি ফজিলত লাভ করা, অথবা একজন সিদ্দিকের মর্তবা লাভ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

* প্রিয় ভাই আমার! উপর্যুক্ত হাদীসগুলো যদি অকাট্যভাবে সহীহও হতো, তবুও এই কারণে জিহাদ ত্যাগ করা আল্লাহর রাসূল ﷺ কিংবা সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ ফরমান,

والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل

"সে সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জান! অবশ্যই আমি আশা করি: আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাব এবং এতে শহীদ হয়ে যাব, এরপর আবার জিহাদে যাব এবং আবার শহীদ হবো, এরপর আবার জিহাদে যাব এবং আবার শহীদ হয়ে যাবো।" (বুখারী-৩১২৩ এবং মুসলিম-১৮৭৬)

যদি মীযানের পাল্লায় শহীদের রক্ত কলমের কালি অপেক্ষা হালকা হওয়ার কারণে জিহাদকে ইলমী খিদমত অপেক্ষা ছোট মনে করা হতো বা জিহাদে যাওয়াকে অপছন্দ করা হতো, তাহলে আল্লাহর রাসূল ﷺ এভাবে বারবার শহীদ হওয়ার তামান্না লালন করতেন না, জিহাদের তুলি দিয়ে আপন সীরাতকে রাঙাতেন না; বরং কলমের জিহাদ করে কেবল ঘরেই বসে থাকতেন। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, কলমের কালি অপেক্ষা শহীদের রক্তের দাম অনেক বেশি। আর এই কথার বাস্তব প্রমাণ হল, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর পবিত্র যিন্দেগীতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সর্বমোট ৬৩ টি যুদ্ধাভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন, যেগুলোর মধ্যে তিনি নিজে প্রত্যক্ষভাবে ২৭ টিতে উপস্থিত হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, কোনো কোনো যুদ্ধে তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন, দন্ত মোবারক শহীদও করেছেন।

* প্রিয় ভাই! শরীয়ত যেই আমলকে যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছে, মীযানের পাল্লায় সেই আমলের ওজন ততটুকু হবে। যে আমলের গুরুত্ব বেশি তার ওজনও বেশি, যার গুরুত্ব তুলনামূলক কম, তার ওজনও তুলনামূলক কম হবে। যেমন: ফযরের দুই রাকাত ফরয নামাযের ওজন সর্বাবস্থায়ই (ফরযে কিফায়া) জানাযার নামাযের তুলনায় বেশি হবে।

এমনিভাবে, আলেম হওয়া বা ইলমের খিদমত করা ফরযে কিফায়া। কিন্তু জিহাদ যদিও সাধারণভাবে ফরযে কিফায়া, কিন্তু বর্তমানে সক্ষম প্রতিটি মুসলমানের উপর অবশ্যই জিহাদ করা ফরযে আইন। অর্থাৎ বর্তমানে শরীয়তের চাহিদা অনুযায়ী ইলমী ময়দানে খেদমতের তুলনায় জিহাদ করাটা বেশি জরূরী। তাই অবশ্যই, নিঃসন্দেহে বর্তমানে একজন আলেমের কলমের কালি অপেক্ষা একজন সাধারণ শহীদের রক্তের ওজন মীযানের পাল্লায় ভারী হবে, ইনশাআল্লাহ্। আবার, বর্তমান পরিস্থিতিতে একজন মুজাহিদ আলেমের মর্যাদা একজন সাধারণ আলেম কিংবা একজন সাধারণ মুজাহিদ অপেক্ষা অবশ্যই বেশি হবে, ইনশাআল্লাহ।

* প্রিয় ভাই! আরো লক্ষ্য করি, জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় জিহাদ না করলে আমরা 'ফরয তরককারী' সাব্যস্ত হব। সুতরাং একজন ফরয তরককারীর কলমের কালির কী মূল্য হতে পারে আল্লাহ্ পাকের কাছে? শহীদের রক্তের সাথে এমন একজন ব্যক্তির কলমের কালির তুলনা চলে কি, যে তার উপর আপতিত একটি ফরযে আইন হুকুম তরক করে চলেছে, যার কোনো তোয়াক্কাই সে করে না; এ নিয়ে যার কোনো মাথা ব্যাথাই নেই??? উপরন্তু কখনো কখনো সে এই ফরযে আইন হুকুমের বিরোধিতাও করে থাকে?? অন্যদিকে, একজন শহীদ?........যে নিজের স্ত্রী-সন্তান, পিতা-মাতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্যারিয়ার, সুরম্য অট্টালিকা, এককথায়, তার দুনিয়ার সকল কিছু এবং সবশেষে তার নিকট অবশিষ্ট, দুনিয়ার সর্বাধিক প্রিয় বস্তু- তার আপন জীবনটুকুও আল্লাহর ফরয বিধান পালনার্থে কুরবানী হিসেবে পেশ করল! এই দুই জনের মধ্যে কী করে তুলনা করা চলে ভাই???.............

* বিশেষ দ্রষ্টব্য: কখনো এমন হতে পারে যে, শহীদের মর্তবার চেয়ে স্বাভাবিক আমল কারীর মর্যাদাও বেশি হতে পারে। যেমন: এক হাদিসে আছে, এক বছর পর মৃত্যুবরণ করে এক সাহাবী শহীদের উপরের মর্তবা লাভ করেন। এর কারণ হয়ত এই যে, তখন জিহাদ ফরজে কিফায়া ছিল। তাছাড়া, উভয় সাহাবীই জিহাদের ময়দানে ছিলেন, আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করেছেন, শাহাদাতের আশা উভয়েরই ছিল, বাকি! স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারী সাহাবী এক বছর বাড়তি আমলের সুযোগ পেয়েছেন, যা উনার মর্তবা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটি এমন ছিল না যে, এক বছর পর স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণকারী সাহাবী জিহাদ না করে কেবল ঘরে বসে ইবাদত-বন্দেগী করেই শহীদের উপর মর্তবা অর্জন করেছিলেন। তাহলে ভাই! বর্তমানে ফরজে আইন জিহাদ পরিত্যাগকারী কারও ব্যাপারে এটা কী করে ধারণা করা যায় যে, তিনি ফরযে আইন জিহাদ না করে কেবল কিছু নফলের পাবন্দী করেই একজন শহীদের উপর মর্তবা লাভ করবেন, তা তিনি যে-ই হোন না কেন?? এটি কি ভাই যৌক্তিক কোনো কথা হলো?...........

* আল্লাহর রাসূলের ﷺ যামানায়, যখন নাযিলকৃত শরীয়তের হুকুম আহকাম পালন এবং সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য ইলমী মেহনত এবং জিহাদ উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ফলে সাহাবায়ে কেরাম দুটোকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তথাপি যখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যেত (যেমন- ওহুদের যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ ইত্যাদি), তাঁরা সুফ্ফার (ইলমী) স্বাভাবিক মেহনত ও খেদমত বাদ দিয়ে আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে জিহাদে শরীক হয়ে যেতেন। অবশ্য জিহাদের ময়দানেও ইলমী মেহনত জারি থাকত, যে বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করে এসেছি। সুতরাং আমাদেরকেও জিহাদী মেহনত

এবং ইলমী মেহনত/খেদমত উভয়টিই সমানতালে চালিয়ে যেতে হবে, ইনশাআল্লাহ। আর বর্তমানে যেহেতু জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে, তাই জিহাদকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে ইনশাআল্লাহ।

* প্রিয় ভাই! বর্তমানে যদি জিহাদের মেহনত না করা হয়, তাহলে আমরা ফরয তরককারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব এবং মর্তবার দিক থেকে মুজাহিদ ভাইদের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ব। (জিহাদ ফরযে আইন হওয়া সত্ত্বেও) জিহাদ না করে যদি আমরা ঘরে বসে থাকি, তাহলে কুরআনের ভাষায় আমরা 'ক্বয়ীদূন' (গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান)! আর এ ধরণের ব্যক্তিরা কখনোই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের সমকক্ষ হবে না। যে আয়াতটি আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি, আবারো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি-

لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا– دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"৯৫. গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান (যারা লড়াই করার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং জিহাদ ত্যাগ করার)- যাদের কোনো সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ সব মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারা সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ্ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। ৯৬. এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

(৪ সূরা নিসা :৯৫-৯৬)

* সুতরাং প্রিয় ভাই, আল্লাহ্ পাকের কাছে সেই সকল ভাইদের মর্তবার কথা চিন্তা করি, যারা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একই সাথে আলেম এবং মুজাহিদ হিসেবে বিবেচিত। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ্ পাক ভাইদের মর্যাদা আরো অনেক বাড়িয়ে দিন এবং তিনি তাঁর আপন শান ও খুশি অনুযায়ী ভাইদেরকে প্রতিদান দান করুন। আমীন।

• আমরা (আলেমরা) সশস্ত্র জিহাদ করি না; তার কারণ....

চতুর্থ কারণ:

অন্য আরেকজন জিহাদ না করার আরেকটি সুন্দর(?) কারণ বয়ান করলেন, যা আপাতদৃষ্টিতে 'অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত' বলেই মনে হয়। তার কথাগুলোর ভাবার্থ ছিল মোটামুটি এরকম-

"সবাই তো আর সকল খেদমত একসাথে করতে পারবে না। একেকজনকে একেকটা খেদমত করতে হবে। দ্বীনের মাঝে অনেক কাজ বা আমল আর মেহনত বিদ্যমান। সকল খেদমত মিলে একটা পরিপূর্ণ দ্বীন। যেমনভাবে একটা বাড়ি তৈরি করতে হলে বিভিন্ন রকম লোকের প্রয়োজন পড়ে। রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রি, ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রি, স্যানিটারি মিস্ত্রি ইত্যাদি। সকলের কাজ মিলে একটা বিল্ডিং তৈরি হয়। একইভাবে, দ্বীনের কাজগুলোও এমন। সবাই তো আর সব করবে না। কেউ ইলমী খেদমত করবে, কেউ খানকার, কেউবা দাওয়াত আর কেউবা জিহাদ করবে। সবার খেদমত মিলেই ইসলাম পরিপূর্ণ হবে।"

প্রিয় ভাই! উপর্যুক্ত এই উক্তিটির দ্বারা এই ভাবার্থ বুঝে আসে যে- অন্য ভাইয়েরা জিহাদ করতে থাকুন আর আমাকে আপাততঃ জিহাদ না করলেও চলবে। আল্লাহ্ পাক যেহেতু আমাকে ইলমী যোগ্যতা দিয়েছেন, তাই ইলমী ময়দানে বিচরণ করেই যিন্দেগী পার করে দিব। এটাই সর্বোত্তম। ইত্যাদি..........।

যুক্তিখণ্ডন:

* প্রিয় ভাই! প্রথম কথা হলো- এটি হল "খণ্ডিত ইসলামের দর্শন"। নফীরে আম বা জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় এই ধরণের শ্রেণি-বিভাজন করা কিংবা অন্য কোনো মেহনতের অজুহাতে জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকা বৈধ নয়; সকলকেই যার যার অবস্থান থেকে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র কাজে শরীক হতে হবে। যে যেখানেই থাকুক, দ্বীনী যে কোন খেদমতই করুক না কেন, যে পেশাতেই থাকুক না কেন, সকলকেই জিহাদ করতে হবে, জিহাদে অংশগ্রহণ করার পর আমীর যাকে যে কাজে কিংবা দ্বীনী খেদমতে নিয়োজিত করবেন তখন তিনি সে কাজ করবেন; যেমনটি আমরা তাবুক, খন্দক, উহুদ ইত্যাদি জিহাদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই।

* দ্বিতীয়তঃ ঐ ভাইয়ের উদাহরণটি আরেকটু বিশ্লেষণ করা যাক! তাহলেই বিষয়টি পরিষ্কার বুঝে আসবে, ইনশাআল্লাহ্। একটি প্রাসাদ তৈরি করতে অনেক ধরণের মিস্ত্রির প্রয়োজন- কথা ঠিক আছে। কিন্তু মনে করুন, সকল মিস্ত্রিরা দালানে কর্মরত অবস্থায় শর্টসার্কিট হয়ে দালানের কোনো এক অংশে হঠাৎ আগুন লেগে গেল, তখন অবস্থা কী দাঁড়াবে? তখন কি প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, নাকি যার যা কাজ তা ফেলে আগে সকলে মিলে আগুন নিভানোর চেষ্টায় লিপ্ত হবে? যদি সবাই মিলে আগুন না নিভানোর চেষ্টা করে কিংবা মনে করে- এটা তো কেবল ফায়ার সার্ভিসের কাজ আর এমতাবস্থায় প্রত্যেকে যার যার কাজ করতেই থাকে (যেমন রাজ মিস্ত্রি রাজের কাজ, রঙ মিস্ত্রি রঙের কাজ, স্যানিটারী মিস্ত্রি স্যানিটারীর কাজ, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ইলেকট্রিকের কাজ.......ইত্যাদি) তাহলে সকলের পরিণতি কী হবে তা কি ভাবা যায়? সকলেই জ্বলে-পুড়ে কি ভস্ম হয়ে যাবে না?? ঠিক এমনিভাবে ইসলাম বা উম্মাহ্ একটি দালানের মত-এই কথাটিও ঠিক আছে। আমরা যার যার দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকব। আর যখন মুসলমানদের উপর কুফফারদের আগ্রাসন চলে আসে তখন সেটা দালানে আগুন লেগে যাওয়ার মত। তখন সকলকে সেই আগুন নিভানোর চেষ্টায় লিপ্ত হতে হবে। নতুবা এর করুণ পরিণতি সকলকেই উপভোগ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।

• আমরা (আলেমরা) সশস্ত্র জিহাদ করি না; তার কারণ....

পঞ্চম কারণ:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন-

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

"আলেমগণ হলেন নবীদের উত্তরসূরি। নবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম (টাকা-পয়সা) মীরাসরূপে রেখে যান না; তারা উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে যান শুধু ইলম। সুতরাং যে ইলম অর্জন করেছে সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে।"

(সহীহ, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৬৪১; ইবনু মাজাহ- ২২৩; দারেমী-৩৪২; রিয়াদুস্ সালেহীন-১৩৯৬)

ভাবার্থ: এই হাদীস থেকে আমরা অনেকেই এই রকম চিন্তা করি-"আলহামদুলিল্লাহ্, আমিতো একটি মাদরাসা থেকে পাস করে আলেম হয়েছি। যেহেতু আমি ইলম অর্জন করেছি, তাই আমি আল্লাহর রাসূলের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকার হয়ে গিয়েছি।" এভাবে ভাবার দ্বারা আমাদের মাঝে এক ধরণের আত্মতৃপ্তি এসে যায়। হাশরের ময়দানে নবীদের পরেই আমরা নিজেদের অবস্থানকে কল্পনা করতে থাকি। আর অন্যদিকে আমরা ইলম চর্চা/ইলমী খিদমতের পাশাপাশি দ্বীনের অন্যান্য আমল ও মেহনতকে উপেক্ষা করে চলতে থাকি। আল্লাহর রাসূলের ﷺ যিন্দেগীর বাকী আমল/মেহনতগুলো করার ব্যাপারে কোনো ফিকির করিনা।

আমরা কোন্ নবীর ওয়ারিশ?

প্রিয় ভাই!

আমরা অনেকেই কোনো একটি মাদরাসা হতে কেবল একটি ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট অর্জন করতে পারলেই নিজেকে 'আলেমে দ্বীন' মনে করি। দাবী করি, আমার সিলসিলা (আমি-আমার উস্তাদ- তাঁর উস্তাদ- উস্তাদের উস্তাদ..... এভাবে) প্রিয় নবীজী ﷺ -পর্যন্ত পৌঁছে। এতটুকু অর্জন করতে পারলেই আমরা ভাবতে থাকি, আমরা আল্লাহর রাসূলের ﷺ ওয়ারিশ হয়ে গিয়েছি।

কিন্তু ভাই! প্রশ্ন হল,

আমি কি শুধু কিছু শব্দ আর বাক্যের ওয়ারিশ?

আমি কি শুধু ইলমের ওয়ারিশ?

তাহলে, আল্লাহর রাসূলের ﷺ যিন্দেগীর ওয়ারিশ কারা?

আল্লাহর রাসূলের ﷺ সীরাতের ওয়ারিশ কারা?

আল্লাহর রাসূলের ﷺ যিন্দেগীর আমলসমূহের ওয়ারিশ কারা?

প্রিয় ভাই!

আমরা তো রাসূল ﷺ-এর যিন্দেগীকেই আদর্শ মনে করি। তাই না!

'জিহাদ' কি আল্লাহর রাসূলের ﷺ আদর্শের অন্তর্ভূক্ত নয়?

'জিহাদ' কি আল্লাহর রাসূলের ﷺ যিন্দেগীর অংশ নয়?

'জিহাদ' কি আল্লাহর রাসূলের ﷺ সুন্নাহ নয়?

'জিহাদ' কি আল্লাহর রাসূলের ﷺ রেখে যাওয়া অন্যতম সম্পত্তি নয়?

রাসূল ﷺ কি জিহাদের ময়দানে দান্দান মুবারক শহীদ করেননি?

রাসূল ﷺ কি জিহাদের ময়দানে রক্তাক্ত হননি?

আল্লাহর রাসূল ﷺ কি বলেননি,

بُعِثتُ بالسيفِ بينَ يدَي الساعةِ حتى يُعبدَ اللهُ وحدَه لا شريكَ له

"কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে আমাকে তরবারি সহকারে পাঠানো হয়েছে, যাতে করে এই যমীনে এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়, যার কোনো শরীক নেই।" (মুসনাদে আহমাদ-৫১১৪)

তাহলে, আল্লাহর রাসূলের ﷺ তরবারির ওয়ারিশ কারা?

আল্লাহর রাসূল ﷺ কি বলেননি,

جعل رزقي تحت ظل رمحي

"আমার রিযিক বর্শার ছায়াতলে রাখা হয়েছে।" (বুখারী শরীফ-১/৪০৮)

তাহলে, তরবারির নিচে তাঁর ﷺ কোন ওয়ারিশরা রিযিক অন্বেষণ করবে?

আল্লাহর রাসূল ﷺ কি কুফফার নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বলেননি,

أتسمعون يا معشر القريش، أما والذى نفس محمد بيدة لقد جئتكم بذبح

"হে কুরাইশের দল, তোরা কি আমার কথা শুনতে পারছিস? ঐ সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে আমি মুহাম্মাদের জীবন! নিশ্চয় আমি তোদেরকে জবাই করতে এসেছি।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা: ৩২০)

তাহলে ভাই, উম্মাহর উপর তরবারি উত্তোলনকারী কাফেরদেরকে আল্লাহর রাসূলের ﷺ কোন ওয়ারিশগণ জবাই করবে?

বীরত্ব ও বাহাদুরির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্থান কি সকলের উপরে ছিল না? তিনি কি সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন না? কঠিন পরিস্থিতিতে বিশিষ্ট বীর পুরুষদের যখন পদস্খলন হয়ে যেত, তখনও কি রাসূলুল্লাহ ﷺ দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকতেন না? সে সুকঠিন সময়েও কি তিনি পশ্চাদপসরণ না করে সামনে অগ্রসর হতেন না? তাঁর দৃঢ়চিত্ততায় এতটুকু বিচলিত ভাবও আসত না। এটাই কি আল্লাহর রাসূলের আদর্শ ছিল না?

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লহ আনহু কি বলেননি,

مَا رَأَيْتُ أَشْجَعَ وَلَا أَنْجَدَ وَلَا أَجْوَدَ ولا أرضى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা না কোনো বীর, সরল ও উদারপ্রাণ ব্যক্তি দেখেছি এবং না অন্যান্য চরিত্র গুণেও তাঁর চাইতে পছন্দনীয় কাউকে দেখেছি।" (নশরুত্তীব) [https://shamela.ws/book/23645/225#p3]

হযরত আলী রাদিয়াল্লহু আনহু কি বলেন নি,

إِنَّا كُنَّا إِذَا حَمِيَ الْبَأْسُ- وَيُرْوَى اشْتَدَّ الْبَأْسُ- وَاحْمَرَّتِ الحدق، اتقينا برسول الله صلّى الله عليه وسلم فَمَا يَكُونُ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ .وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا

"যে সময় যুদ্ধের বিভীষিকা দেখা যেত এবং সুকঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো, সে সময় আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ছত্র ছায়ায় আশ্রয় নিতাম। কারণ, তখন তিনিই থাকতেন কাফেরদের সবচেয়ে নিকটবর্তী। বদর যুদ্ধে আমরা তাঁর আড়ালে আশ্রয় নিতাম। তাঁর চেয়ে বেশি দৃঢ়তার সাথে অন্য কেউ শত্রুর মোকাবিলা করতে পারতো না।" (শাফী, কাজী আয়ায, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৯) [https://shamela.ws/book/23645/225#p4]

হুনাইনের যুদ্ধের দিনও রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা অধিক দুঃসাহসী, বীর ও নির্ভীক কাউকে দেখা যায়নি। (মাদারেজুন্নবুওয়ত)

এভাবে প্রতিটি যুদ্ধে তিনি ﷺ-ই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।

তাহলে, তাঁর ওয়ারিশ হয়েও আমাদের যিন্দেগীতে এত কাপুরুষতা কেন?

আল্লাহর রাসূল ﷺ কি কাফের ও মুনাফেকদের প্রতি কঠোর ছিলেন না?

আল্লাহ তা'আলা কি ইরশাদ করেননি,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

"হে নবী! আপনি কাফের ও মুনাফেকদের সাথে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল সেটি!" (সূরা তাহরীম ৬৬: ৯)

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তাঁর সাথে যারা আছে তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত রহম দিল।" (৪৮ সূরা ফাৎহ: ২৯)

আল্লাহ্ তা'আলা কি প্রতিটি মুমিনকে এই হুকুম করেননি-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও; আর তারা যেন তোমাদের মাঝে কঠোরতা অনুভব করে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" (০৯ সূরা তাওবা: ১২৩)

এরপরও কি আমরা কাফেরদের প্রতি কঠোর হব না?

আমরা কি শুধু 'দাওয়াতের খাতিরে কাফেরদের সাথে উত্তম আচরণ' করার সুন্নত'ই আঁকড়ে ধরে রাখব? যখন আল্লাহর হুকুম আসল তাদের প্রতি কঠোর হওয়ার, তখনও কি আমরা তাদের প্রতি কঠোর হব না? কী হল ভাই আমাদের?

কাফেররা যখন দুনিয়া থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের নাম নিশানা মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তখন কেন আমরা তাদের প্রতি কঠোর হবো না?

আমরা কি শুধু মিষ্টি খাওয়ার সুন্নত-ই আদায় করব? আল্লাহর রাসূলের দাঁত ভাঙ্গা'র সুন্নত আদায় করব না?

আল্লাহর রাসূল ﷺ কি বলেননি,

وَأَنَا الْحَاشِرُ ، وَنَبِيُّ الْمَلاحِمِ

"আমি একত্রকারী, আমি যুদ্ধের নবী (নাবিয়্যুল মালাহিম)"

(শামায়েলে তিরমিযি, হাদিস নং-২৮৩; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৪৯২; শারহুস্ সুন্নাহ, হা/৩৬৩১; মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/৪১৮৫; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হা/৩২৩৫১; মুস্নাদুত তায়ালুসী, হা/৪৯৪)

তাহলে বলুন ভাই, আল্লাহর রাসূলের ওয়ারিশগণ যুদ্ধ করবে না কেন?

আল্লাহর রাসূল ﷺ কি প্রত্যক্ষ ভাবে ২৭ টি যুদ্ধের নেতৃত্ব দেননি?

আল্লাহর রাসূল ﷺ কি পরোক্ষভাবে ৪৬ টি যুদ্ধের নেতৃত্ব দেননি?

তাহলে, আমরা যে রাসূলের ওয়ারিশ দাবী করি, আমাদের জীবনে যুদ্ধ কোথায়? আমাদের জীবনে জিহাদ কোথায়? আমাদের সিলসিলায় কোথায় এসে যুদ্ধ 'নাই' হয়ে গেল? কোথায় এসে 'জিহাদ' হারিয়ে গেল?

এরপরেও কি রাসূলে কারীম ﷺ-এর ওয়ারিশ দাবী করতে আমাদের লজ্জা বোধ হবে না?
এভাবে আমরা আর কতদিন আত্মতৃপ্তিতে ভুগব?
এভাবে আমরা আর কতদিন নিজের মনকে বুঝ দিয়ে যাব?
আর কতদিন আমরা এভাবে নিজেদেরকে ধোঁকা দিতে থাকব?
আর কতকাল আমরা 'অলীক' তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে থাকব?
কবে আমরা 'তাত্ত্বিক ইসলামের দর্শন' পরিত্যাগ করে 'নববী মানহাজের' উপর উঠব?
কবে আমরা 'খণ্ডিত ইসলামের' দর্শন ত্যাগ করে 'পরিপূর্ণ ইসলাম'কে আঁকড়ে ধরব?
কবে আমরা জিহাদের কথা বলব?
কবে আমরা জিহাদের পক্ষে লিখব?
কবে আমরা জিহাদের প্রস্তুতি নিব?
কবে আমরা হকের পথে লড়ব?
কবে ভাই, আর কবে?

মাদরাসাগুলো কোন আদর্শে পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল:

ইসলামের শুরু লগ্ন থেকেই তা'লীম ও জিহাদের একসাথে পথ চলা। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পবিত্র যিন্দেগী থেকে তা'লীম ও জিহাদকে আলাদা করার কোনো সুযোগ কারো নেই?

প্রিয় ভাই!

এমন একটা নজির কি কেউ কখনো দেখাতে পারবেন, কুফ্ফাররা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেছে, আর নবীজী ﷺ কিছু সাহাবাদেরকে নিয়ে প্রতিরোধ জিহাদ করেছেন, অন্যদিকে অন্যান্য সাহাবাগণ মাদারাসা নিয়ে পড়ে আছেন?................

এ থেকেই কি (জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায়) 'মাদরাসার মেহনত' থেকে জিহাদের মেহনতের অধিক গুরুত্ব প্রমাণিত হয়না?

আসহাবে সুফ্ফা মাদরাসা কি নবীজীর ﷺ যামানায় ছিল না? মাদরাসার ইতিহাস কি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শুরু হয়েছে? মাদরাসার ইতিহাস কি মদীনা ভার্সিটি কিংবা কায়রোর আল আযহার ভার্সিটি থেকে শুরু হয়েছে? না! মাদরাসার ইতিহাস তো শুরু হয়েছে সেদিন, যেদিন আমার নবী ﷺ মক্কায় সাহাবী হযরত আরকাম বিন আবিল আরকাম রা. এর ঘরে কুরআনের তা'লীম শুরু করেছিলেন। এরপর মদীনায় হিজরতের পর 'সুফ্ফা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

যেই মাদরাসার আদর্শ আল্লাহর রাসূলের সাথে মিলবে সেটাকেই প্রকৃত মাদরাসা বলা যাবে। কেবল কুরআন হাদীস শিক্ষা আর গবেষণা করলেই যদি তার নাম 'মাদরাসা' হয়ে যায় তাহলে এমন বহু মাদরাসা ইহুদীদেরও আছে, এমন অনেক মাদরাসা খ্রিস্টানদেরও আছে, যেগুলোতে বাইবেল/তালমুদ নয়, কুরআনই পড়ানো হয়; ওল্ড বা নিউ টেস্টামেন্ট নয়, সেগুলোতে হাদীসেরই দরস দেয়া হয়, যেগুলোতে ইসলাম নিয়েই গবেষণা করা হয়। বরং তাদের মেহনত, তাদের গবেষণা, তাদের কুরআন-হাদীস শিক্ষার পিছনে খরচের পরিমাণ আমাদের বড় বড় অনেক মাদরাসার চেয়েও ঢের বেশি।

প্রিয় ভাই!

আল্লাহর রাসূলের ﷺ মাদরাসার একশত ভাগ তালিবুল ইলম মুজাহিদ ছিলেন। তাঁর ﷺ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা-ই হয়েছিল আল্লাহর দ্বীনকে উঁচা করার জন্য, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য, আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ তৈরির জন্য। তাই আমাদের যামানার মাদরাসাগুলোতে আমাদের বাচ্চাগুলোকে আজ কেন শেখানো হচ্ছে না, আমার মাথা শুধু একজনের জন্যই খাছ, শুধু একজনের সামনেই নুয়াবে, যার সামনে আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে সিজদা করি; কোনো তাগুত বা বাতিলের সামনে মাথানত করা যাবেনা, দুনিয়াবী সামান্য স্বার্থে নিজের পরকাল, নিজের ইলম আর ঈমানকে বিক্রি করা যাবে না! আজ ইলমী দরসগাহগুলোতো কেন শেখানো হয় না- 'জিহাদই সর্বশ্রেষ্ঠ আমল'?? এর জন্য আজ কেন তাহরীদ করা হয় না? কেন?

সকল আমল/মেহনতের মধ্যে জিহাদই সর্বশ্রেষ্ঠ:

প্রিয় ভাই! এই নামে "কিতাবুত্ তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল" এর দ্বিতীয় পর্ব "তাওহীদ ও জিহাদ" কিতাবটিতে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা সেটি দেখে নিতে পারি, ইনশাআল্লাহ।

• 'আমরা (আলেমরা) সশস্ত্র জিহাদ করি না; তার কারণ....

ষষ্ঠ কারণ:

একজন বয়ান করলেন, "আমাদের দেশের মুসলমানদের উপর তো জুলুম করা হচ্ছে না, তাই আমরা কেন, কার বিরুদ্ধে জিহাদ করব?"

যুক্তিখণ্ডন:

- প্রিয় ভাই! আমাদের দেশে মুসলমানদের উপর জুলুম হচ্ছে কি হচ্ছে না, এটি বুঝতে হলে আমাদেরকে প্রথমে জুলমের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ বুঝতে হবে।

জুলম কাকে বলে?

ফিকহের কিতাবসমূহে যুলমের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায়, তাহলো-

الظلم: هو مجاو زة الحد، ووضع الشيء في غير موضعه

জুলম অর্থ : সীমাতিক্রম করা।

জুলমের প্রকারভেদ:

শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে জুলম দুই প্রকার: ظلم أكبر (১. জুলমে আকবর/ বড় জুলুম) ও ظلم أصغر (২. জুলমে আছগর/ ছোট জুলুম)

الظلم الأكبر: هو رديف الكفر والشرك، يطلق ويراد به نفي مطلق الإيمان عن صاحبه؛ لأن أظلم الظلم الذي لا يعدله ظلم هو الإشراك بالله ﷻ .. وأن تجعل لله تعالى نداً في أي خاصية من خصائصه ﷻ وهو الذي خلقك .. كما أن أعدل العدل الذي لا يعدله عدل، هو توحيد الله ﷻ .وإفراده بالعبودية

১। জুলমে আকবর: এটিকে কুফরে আকবর এবং শিরকে আকবরের সমার্থক শব্দ বলা যায়। কারণ জুলমে আকবরও মানুষকে দ্বীনে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আর সবচেয়ে বড় জুলুম হল আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কাউকে শরিক করা এবং অন্য কাউকে তার সমকক্ষ মনে করা। কারণ এক আল্লাহ তায়ালাই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যেমনি ভাবে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদকে স্বীকার করা এবং একমাত্র তারই ইবাদত করাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইনসাফ ও ন্যায় বিচার।

কুরআনে কারীমে জুলমে আকবরের উদাহরণ : আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বললঃ হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা সবচেয়ে বড় জুলুম। (সূরা লুকমান ৩১:১৩)

الظلم الأصغر: وهو ظلم دون ظلم؛ لا ينفي مطلق الإيمان عن صاحبه، كما لا ينفي عنه صفة الإسلام واسمه.

২। জুলমে আছগর : এটি মানুষকে দ্বীনে ইসলাম থেকে বের করে না। কিন্তু সে আল্লাহ তায়ালার নিকট অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

কুরআনে কারীমে জুলমে আছগরের উদাহরণ : আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না।" (সূরা আলে ইমরান ৩:১৩৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"তারা উভয়ে বলল, হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।" (সূরা আরফ ৭:২৩) আয়াতে কারীমে উল্লেখিত জুলুম দ্বারা জুলমে আছগর উদ্দেশ্য।

হাদীস শরীফ থেকে উভয় প্রকার জুলুমের উদাহরণ রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

فقد صح عن النبي ﷺ أنه قال:" الظلم الذي لا يغفره الله الشرك، قال الله :﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ وأما ، الظلم الذي يغفره فظلم العباد فيما بينهم وبين ربهم ، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضاً حتى يُدبر لبعضهم من بعض"

"আল্লাহ তায়ালা যেই জুলুম ক্ষমা করবেন না তা হল শিরক। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয় শিরকই হল সবচেয়ে বড় জুলুম"। আর আল্লাহ তায়ালা যেই জুলুম ক্ষমা করবেন তা হল হক্কুল্লাহ আদায়ের ক্ষেত্রে জুলুম করা। আর এক বান্দার প্রতি অন্য বান্দার জুলুম আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করবেন না। যতক্ষণ না উক্ত বান্দা থেকে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।"

- প্রিয় ভাই! এবার আসুন আমরা চিন্তা করি-
  - ✓ আমাদের দেশে কি গনতন্ত্র নেই? গনতন্ত্র কি শিরকী শাসনব্যবস্থা নয়?....... তাহলে গনতন্ত্র কি সবচেয়ে বড় জুলুম/জুলমে আকবর নয়?
  - ✓ ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করা, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার স্লোগান তোলা এবং ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া কি মুসলমানদের উপর সবচেয়ে বড় জুলুম/জুলমে আকবর নয়?
  - ✓ কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন করা এবং তা মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া ও মানতে বাধ্য করা কি সবচেয়ে বড় জুলুম/জুলমে আকবর নয়?
  - ✓ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানের মূল ভিত্তি বানিয়ে এহেন কুফুরী সংবিধানে মুসলমানদের শাসন করা কি মুসলমানদের উপর সবচেয়ে বড় জুলুম/জুলমে আকবর নয়?
  - ✓ কুরআন-সুন্নাহর আইন ছেড়ে পাশ্চাত্য বিধর্মীদের তৈরিকৃত নীতিমালা দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করা কি মুসলমানদের উপর সবচেয়ে বড় জুলুম/জুলমে আকবর নয়?
  - ✓ আল্লাহ তা'আলা যে সব বস্তুকে হারাম করেছেন (যেমন- সুদ, যিনা, মদপান, অশ্লীলতা ইত্যাদি) রাষ্ট্রীয়ভাবে তার অনুমোদন দেওয়া, রাষ্ট্রীয়ভাবে সেসবের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং প্রচার-প্রসার করা কি মুসলমানদের উপর সবচেয়ে বড় জুলুম/জুলমে আকবর নয়?

- ✓ আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তুকে হালাল করেছেন, (যেমন- বাল্যবিবাহ, জিহাদ ইত্যাদি) সেসব বস্তুকে নিষিদ্ধ করা কি মুসলমানদের উপর সবচেয়ে বড় জুলুম/জুলমে আকবর নয়?
- ✓ যে সকল ভাইয়েরা আল্লাহর আইন রাষ্ট্রে কায়েম করার জন্য নিজের সকল কিছু কুরবানী করে মেহনত করে যাচ্ছেন তাদেরকে বন্দী করা, তাদেরকে 'সন্ত্রাসী' ট্যাগ দেয়া, অত্যাচার নির্যাতন চালানো, তাদেরকে ধরে ধরে ভারত, আমেরিকা, ইসরাঈলসহ অন্যান্য কাফেরদের হাতে হস্তান্তর করা, তাদেরকে হত্যা করা- এগুলো কি মুসলমানদের উপর জুলুম নয়?
- ✓ বোরকা ও হিজাব পরিহিতা পর্দানশীন নারীদেরকে 'চলন্ত তাঁবু' আখ্যায়িত করা, পর্দা বিরোধী আইন চালু করা- এগুলো কি মুসলমানদের উপর জুলুম নয়?
- ✓ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে দিল্লী কিংবা ওয়াশিংটনের কাছে বিক্রি করা কি মুসলমানদের উপর জুলুম নয়?
- ✓ মুসলমানদের উপর নারী নেতৃত্বের অভিশাপ চাপিয়ে দেয়া কি মুসলমানদের উপর জুলুম নয়?
- ✓ মুসলমানদের উপর সুদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া কি মুসলমানদের উপর জুলুম নয়?
- ✓ দ্রব্যমূল্যে উর্ধ্বগতি ও তা সাধারণ মুসলমানদের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলে যাওয়া কি মুসলমানদের উপর জুলুম নয়?

....

প্রিয় ভাই! এর পরও কি আমরা বলতে পারবো, আমাদের দেশে মুসলমানদের উপর জুলম হচ্ছে না???
হায়! আমাদের অবস্থা যেন সেই ডাহুকের ন্যায় না হয়, যে শিকারী দেখে চোখ বুজে থেকে মনে করে, যেহেতু আমি শিকারীকে দেখতে পাচ্ছি না, তাই শিকারীও আমাকে দেখতে পাচ্ছে না! জুলুমের সাম্রাজ্যে হাবুডুবু খেয়েও যদি আমরা বলি আমাদের উপর জুলুম করা হচ্ছে না, তাহলে বিষয়টি সত্যিই দুঃখজনক। বিশেষতঃ এই ধরণের কথা একজন আলেমের মুখে কখনোই শোভা পায়না ভাই!
আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন।

জিহাদ কি কেবলই দেফায়ী?

প্রিয় ভাই! "আমাদের দেশের মুসলমানদের উপর তো এখন জুলুম হচ্ছে না"- এই কথা দ্বারা যদি এটি বুঝানো উদ্দেশ্য হয় যে, "আমাদের দেশে তো বহিঃবিশ্বের কেউ আক্রমন করে অত্যাচার-নির্যাতন কিংবা হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে না", তাহলে এই কথার অর্থ দাঁড়ায়-

- ✓ কুফ্ফার দ্বারা আক্রান্ত না হলে আমরা কেন জিহাদ করব?
- ✓ আগে বেড়ে কাফেরদের সাথে জিহাদ করার সুযোগ ইসলামে নেই, যতক্ষণ না কাফেররা মুসলমানদের উপর আক্রমন করছে।
- ✓ এককথায়, ইসলামে কেবলই প্রতিরোধমূলক (দেফায়ী) যুদ্ধের অনুমোদন আছে, আক্রমণাত্মক (ইক্বদামী) যুদ্ধের অনুমতি নেই।

প্রিয় ভাই! এ ধরণের চিন্তা মূলতঃ আল্লাহ পাকের একটি ফরয হুকুম (আক্রমনাত্মক জিহাদ)-কে অস্বীকার করার নামান্তর। কেননা আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।" [সুরা তাওবা - ৯:২৯]

উপর্যুক্ত আয়াতে ততদিন পর্যন্ত ক্বিতাল জারী রাখার আদেশ করা হয়েছে যতদিন না কাফেররা অবনত হয়ে জিযিয়া প্রদান করে। আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা শেষ হয়ে যায়; এবং যে সময় দ্বীন (বিজয়) সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। [সুরা আনফাল - ৮:৩৯]

যদি ক্বিতালের উদ্দেশ্য শুধু আক্রান্ত হওয়ার পর প্রতিরোধ করাই হত তবে বলা হত, 'তোমরা ততদিন যুদ্ধ করতে থাক, যাবত না কাফেররা তোমাদের উপর আক্রমন বন্ধ করে'। কিন্তু জিযিয়া ওয়াজিব করা এবং এর পাশাপাশি তাদের অবনত হওয়া আর সারা পৃথিবীতে ইসলাম বিজয়ী ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উল্লেখ এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, কুফ্ফারদের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করা এবং কুফর ও শিরকের সকল ফেতনার মূল উৎপাটনই আসল উদ্দেশ্য, যাতে কুফরের রাজনৈতিক প্রভুত্বের কারণে ভীতির যে পর্দায় মনমানস আচ্ছন্ন হয়ে আছে তা উন্মোচিত হয়, অতঃপর মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি স্বাধীন ও মুক্ত মনে চিন্তা করার সুযোগ ঘটে। ইমাম রাযী রহ. সুরা তাওবা - ৯:২৯ আয়াতের আলোচনায় তাফসীরে কাবীরে বলেন,

لَيْسَ الْمَقْصُوْدُ مِنْ أَخْذِالْجِزْيَةِ تَقْرِيْرُهُ عَلىٰ الْكُفْرِ- بَلِ الْمَقْصُوْدُ مِنْهَا حَقْنُ دَمِه, وَإِمْهَالُهُ مُدَّةً, رَجَاءَ أَنَّهُ رُبمَّاَ وَقَفَ فِي هٰذِهِ الْمُدَّةِ عَلىٰ مَحَاسِنِ الْإِسْلاَمِ, وَقُوَّةِ دَلاَئِلِه, فَيَنْتَقِلُ مِنَ الْكُفْرِ إِلىٰ الْإِيمَانِ ..... فَإِذَا أُمْهِلَ الْكَافِرُ مُدَّةً وَهُوَ يَشْهَدُ عِزَّالْإِسْلاَمِ, وَيَسْمَعُ دَلاَئِلَ صِحَّتِه, وَيُشَاهِدُ الذِّلَّ وَالصّغَارَ فِي الْكُفْرِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْمِلُهُ ذٰلِكَ عَلٰى الْاِنْتِقَالِ إِلَى الْإِ سْلاَمِ, فَهٰذَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ مِنْ شَرْعِ الْجِزْيَةِ-

'জিযিয়ার উদ্দেশ্য কাফেরকে কুফরীর হালতে বাকী রাখা নয়, বরং উদ্দেশ্য হল তাকে বাঁচিয়ে রেখে কিছু দিন সময় দেওয়া, যে সময়ের মধ্যে তার ব্যাপারে এই আশা হবে যে, সে ইসলামের সৌন্দর্য অবলোকন করে কুফর থেকে ইসলামের দিকে আসবে.......। অতএব যখন কাফেরকে কিছু দিন সময় দেওয়া হবে এবং সে ইসলামের প্রভাব দেখবে, তার সত্যতার দলীলসমূহ শুনবে এবং কুফরের লাঞ্ছনা দেখবে তখন এইসব বিষয় তাকে ইসলামের প্রতি অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবে। বস্তুতঃ জিযিয়া বিধিবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য এটিই।'

আক্রমনাত্মক জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়া সম্পর্কে মুফতী আব্দুল মালেক সাহেব দা.বা. লিখেন-

"এই শেষ যামানার কোন কোন লেখকের রচনা থেকে, যা তারা জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং জিহাদের তাৎপর্য, উপকারিতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করার জন্য লিখেছেন, এই ধারণা জন্মায় যে, ইসলামে শুধু দিফায়ী জিহাদ (প্রতিরোধমূলক জিহাদ) অনুমোদিত, ইক্বদামী জিহাদের (আক্রমণমূলক জিহাদ) অনুমোদন ইসলামে নেই। তাদের এ জাতীয় কথাবার্তার কারণ হয়ত জিহাদ সম্পর্কীয় কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও

খোলাফায়ে রাশেদীনের বরকতময় জীবনচরিত সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা পাশ্চাত্যের অন্যায় আপত্তিসমূহের কারণে ভীত কম্পিত মানসিকতা।

বাস্তবতা হল, জিহাদের মূল উদ্দেশ্য ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ বা ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কুফরের প্রভাব প্রতিপত্তি চুরমার করা। এতদুদ্দেশ্যে ইক্বদামী বা আক্রমনমূলক যুদ্ধ শুধু অনুমোদিতই নয় বরং কখনো কখনো তা ফরয ও প্রভূত সওয়াবের কারণও বটে। কুরআন সুন্নাহর দলীলসমূহের পাশাপাশি পুরো ইসলামী ইতিহাস (রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে) এ ধরণের জিহাদের ঘটনায় পরিপূর্ণ।"

('কিতাবুল জিহাদ' কিতাবের ভূমিকা, পৃ. ৩৯; লিংক: https://archive.org/details/kitabuljihad_202210)

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তক্বী উসমানী দা.বা. এর ভাষায়-

"অমুসলিমদের আপত্তিতে ভীত হয়ে এসব বাস্তব বিষয়কে অস্বীকার করা বা এতে ওযরখাহীমূলক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা একটি অর্থহীন কাজ। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, একজন ব্যক্তিকেও জবরদস্তি করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয় নাই এবং এর অনুমোদনও শরীয়তে নেই, অন্যথায় জিযিয়ার পুরো ব্যবস্থাপনাই অর্থহীন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই তরবারী উঠানো হয়েছে, কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগত পর্যায়ে কুফরের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতে চায় থাকুক কিন্তু আল্লাহর বানানো এই পৃথিবীতে বিধান আল্লাহরই চলা উচিত এবং মুসলমান আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য এবং আল্লাহদ্রোহীদের প্রভাব প্রতিপত্তিককে চুরমার করার জন্যই জিহাদ করে। আমরা এই বাস্তব সত্য প্রকাশ করতে ঐসব লোকের সামনে কেন লজ্জাবনত হব যাদের পুরো ইতিহাস সাম্রাজ্য বিস্তারের উন্মত্ত নেশায় হত্যাযজ্ঞ সংঘটনের ইতিহাস এবং যারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির জাহান্নাম পূর্ণ করার জন্য কোটি কোটি মানুষের প্রাণ সংহার করেছে! যাদের নিক্ষিপ্ত গোলামীর জিঞ্জিরে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ জাতির দেহ আজও রক্তাক্ত!" (জিহাদ ইক্বদামী ইয়া দিফায়ী? ফিকহী মাকালাত খণ্ড ৩, পৃ. ২৮৮-২৮৯, ৩০৩)

সুতরাং প্রিয় ভাই! উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটিই প্রতীয়মান হয়না কি-

- মুসলমানদের উপর কুফ্ফারদের আক্রমন না থাকলেও জিহাদের ফরজিয়ত থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো না?
- জিহাদ আমাদেরকে করতেই হবে, যতক্ষণ না দুনিয়ার বুকে কুফর ও শিরকের ফিতনা বাকী থাকে?

সুতরাং "মুসলমানদের উপর জুলুম হচ্ছে না" একথা বলে জিহাদ থেকে পলায়ন করার কোনো সুযোগ ইসলামী শরীয়ত আমাদেরকে দিয়েছে কি?

• আমরা (আলেমরা) সশস্ত্র জিহাদ করি না; তার কারণ....

সপ্তম কারণ:

আমরা অনেক ভাই আছি, যারা মনে করি, ইসলাম তো শান্তির ধর্ম, ইসলাম মারামারি-কাটাকাটি পছন্দ করে না, তাই আমরাও মারামারি-কাটাকাটি আর বিশৃঙ্খলা (এককথায় জিহাদ) পছন্দ করিনা।

যুক্তিখণ্ডন:

'ইসলাম শান্তিপ্রিয়' একথাটির প্রকৃত অর্থ কী?

• প্রিয় ভাই! আমাদের মহান ধর্ম 'ইসলাম' সব সময়ই চায় যে, দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ সদা সর্বদা সুখে থাকুক, শান্তিতে থাকুক, নিরাপদে থাকুক; সমাজে কোনো অশান্তি, অরাজকতা, খুন, হত্যা, ধর্ষণ, অশ্লীলতা, ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি না থাকুক; রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় কোনো অন্যায়, অবিচার, যুলুম না থাকুক, প্রকারান্তরে, সকল কল্যাণের আধার 'আসমানী আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, ন্যায়-ইনসাফ আর আদলের রাজ কায়েম হোক, মানুষ মন্দ মানুষের যন্ত্রনা থেকে রেহাই পাক, বান্দার গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর দাস হয়ে যাক; সমাজের প্রতিটি পরিবার সুখে-শান্তিতে থাকুক, তাই পরিবারের কোনো সদস্যই যেন মাদকাসক্ত না হয়ে যায়, যিনা, ব্যভিচার আর পরকিয়ায় লিপ্ত না হয়; প্রতিটি মানুষ অর্থনৈতিকভাবে মুক্তি লাভ করুক, সমাজ দারিদ্র্যমুক্ত হোক, সকলেই সচ্ছল হোক, সকলে যাকাত দেয়ার উপযুক্ত হোক, কেউ যাকাতগ্রহণকারী না থাকুক, সমাজে কোনো মধ্যস্বত্যভোগী বা সিন্ডিকেট না থাকুক, সম্পদের সুষম বন্টন হোক, সমাজে অন্যায় ভোগ-দখল না থাকুক, শোষনের হাতিয়ারগুলো (সুদ, ঘোষ ইত্যাদি) সমাজ থেকে বিদায় নিক; রাষ্ট্রযন্ত্রে কোনো দুর্নীতি ও ঠকবাজ না থাকুক; সমাজের প্রতিটি মানুষ অপরাপর মানুষের জন্য কল্যাণকর হোক, একে অন্যের কল্যাণকামী হোক, কেউ কারো দ্বারা কষ্ট না পাক, একে অন্যের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করুক; নারীরা সমাজে পূর্ণ নিরাপত্তা, সম্মান, ইজ্জত লাভ করুক, সকলের সম্মানের পাত্র হোক, নষ্টদের ভোগ্যসামগ্রী কিংবা পণ্যে পরিণত না হোক, অন্যদিকে তারা যেন সমাজের পুরুষদের কামোদ্দীপনা, কুমন্ত্রনা আর কুচিন্তার কারণ না হয়, সুস্থ চিন্তা আর মস্তিষ্কের, সভ্য ও শালীন মানবসমাজ গড়ে উঠুক। ইত্যাদি। আর এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই আমাদের মহান প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা দ্বীন ইসলামের সমস্ত হুকুম আহকাম নাযিল করেছেন, প্রিয় নবী ﷺ, খোলাফায়ে রাশেদা এবং পরবর্তীতে নেককার খলিফা ও শাসকবৃন্দ মানব ইতিহাসে এর বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, পৃথিবীর বুকে এমন সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির সমাজ প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব। (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য যিনি আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা ধন্য করেছেন।)

.... প্রিয় ভাই! এই অর্থে 'ইসলাম শান্তিপ্রিয়', একথাটি শতভাগ সঠিক।

কিন্তু সমাজের একদল ব্যক্তি রয়েছে, যাদের অন্তর বক্রতাসম্পন্ন, যারা মানবসমাজের কল্যাণকামী নয়, যারা কখনো চায়না মানবজাতি সুখে শান্তিতে থাকুক, মানুষের মন-মগজ সুস্থ চিন্তা করুক, যারা চায় মানুষের মাঝে অন্যায়, অবিচার, যুলুম আর অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, যারা চায় কেবল নিজেরাই সম্পদের পাহাড় গড়ুক, অন্যদিকে সাধারণ জনগণ না খেয়ে মরুক, মানুষ খাহেশাত আর ফাহেশাতের দাস হোক, আমজনতা তাদের দাসত্ব করুক, নারী কেবল প্রদর্শন ও ভোগ্য পণ্য হোক, সমাজে মাদক ব্যাপক আকারে সয়লাব হোক, ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্র

সকলেই সর্বদা অশান্তির অন্ধকারে ডুবে থাকুক; এককথায়, ইসলাম যা চায় তারা সর্বদাই তার বিপরীত কামনা করে থাকে, এই লোকগুলো চায় মানবজাতি এক আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে তাদের পূঁজা করুক, তাদের নফসের উপাসনা করুক, শয়তানী ও দাজ্জালী শাসনব্যবস্থা সারা দুনিয়ায় কায়েম হোক, তারা তাদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মানবজাতিকে যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধানাবলি চাপিয়ে দিবে তাই মানুষ গ্রহণ করুক। মোটকথা, তারা কখনো চায় না সমাজে ইসলাম থাকুক, মানুষ ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করুক, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে সমাজে সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ফিরে আসুক।

এই লোকগুলো ক্যান্সারের মত, এরা সাধারণ এন্টিবায়োটিক দ্বারা সমাজ থেকে নির্মূল হবে না, এদের একমাত্র প্রতিকার হল অস্ত্রোপচার (সার্জারী)। ক্যান্সারের কোষযুক্ত টিউমারকে যদি দেহ থেকে কেটে ফেলা না হয়, তাহলে এই ক্যান্সার যেমন সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে, তেমনিভাবে এই লোকদেরকে যদি সমাজ থেকে নির্মূল না করা হয়, তাহলে মানবসমাজ অশান্তির ক্যান্সারে আক্রান্ত হবে, আর এই অশান্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে, মানব সমাজ অসুস্থ হয়ে অশান্তির আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে, জাহান্নামের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবে।

এই লোকগুলোর ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান হলো- এদের জন্য কেবল দাওয়াতী মেহনত করাই যথেষ্ট নয়, এদের জন্য কেবল ওয়াজ-নসীহত করাই যথেষ্ট নয়, সমাজে কেবল মসজিদ-মাদরাসা আর খানকাহর সংখ্যা বৃদ্ধি করাই এদের হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট নয়, কেবল কিছু কিতাবাদি রচনা করে রেখে যাওয়াই যথেষ্ট নয়,.........................; এদের জন্য চাই 'রক্ত ঝরানো', হ্যাঁ, এদের রক্ত ঝরাতে হবে, এদেরকে সমাজ থেকে বিদায় দিয়ে জাহান্নামে পাঠাতে হবে, এদেরকে হত্যা করতে হবে, এদেরকে হত্যা করতে প্রতিটি ঘাটিতে ওঁৎ পেতে বসে থাকতে হবে, এটিই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর বিধান। ইসলাম তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে (সমাজ থেকে সকল অশান্তি দূর করতে) এজন্যই জিহাদের বিধান দিয়েছে। আর সমাজে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে যে বা যারাই বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, ইসলামের অগ্রযাত্রার বিরুদ্ধে যারাই তরবারি ধারণ করবে, তাদের বিরুদ্ধেই জিহাদের হুকুম দেয়া হয়েছে, এদেরকে হত্যা করার বিধান দেয়া হয়েছে, এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিধান দেয়া হয়েছে।

সুতরাং 'ইসলাম শান্তিপ্রিয়' এই কথার অর্থ কখনোই এই নয় যে, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম কাউকে হত্যা করার অনুমতি দেয়না, ইসলাম কখনোই মারামারি কাটাকাটি পছন্দ করেনা; বরং সারাবিশ্বে পরিপূর্ণ রূপে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি ফিরিয়ে আনতে যতদিন প্রয়োজন জিহাদ করতে হবে, যতটুকু মারামারি-কাটাকাটি করতে হয় ততটুকুই করতে হবে, যারাই আল্লাহর সাথে দুশমনি করবে, দ্বীন ইসলামের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে, ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে তাদের সকলকে হত্যা করতে হবে, যতজনকে দরকার ততজনকেই বন্দী কিংবা হত্যা করতে হবে; কত হাজার কিংবা কত লক্ষ লোককে হত্যা করা হল, কী পরিমাণ কিংবা কতটুকু রক্তপাত করা হল তা দেখা হবে না; তবে হ্যাঁ, অন্যায়ভাবে ও অপ্রয়োজনে কিংবা বিনা কারণে একজন মানুষ তো দূরে থাক একটি প্রাণিকেও হত্যা করা ইসলাম পছন্দ করেনা; হত্যা করা তো পরের কথা স্বাভাবিক কষ্ট দেয়াও ইসলাম অপছন্দ করে। আলহামদুলিল্লাহ, এভাবেই ইসলাম একটি পরিপূর্ণরূপে ভারসাম্যপূর্ণ ও শান্তির ধর্ম।

- প্রিয় ভাই! নিচের আয়াতগুলো দ্বারা একথা কি বুঝে আসে না, ইসলাম রক্তপাত (জিহাদ ও ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ, দ্বীন কায়েমের জন্য প্রয়োজনে কুফ্ফারদের রক্ত ঝরানো) পছন্দ করে কি করে না?

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না। [সুরা বাকারা - ২:২১৬]

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। [সুরা তাওবা - ৯:২৪]

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ-لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

আর যখন আল্লাহ দু'টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোন রকম কন্টক নেই (অর্থাৎ যাতে কোনো রক্তপাত নেই), তাই তোমাদের ভাগে আসুক; অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং (জিহাদ/ক্বিতাল/রক্তপাতের মাধ্যমে) কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে। যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপীরা অসন্তুষ্ট হয়। [সুরা আনফাল - ৮:৭, ৮:৮]

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

“অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে! একথা শুনলে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না।” (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:০৪)

فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সুরা তাওবা - ৯:৫]

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

"সুতরাং যদি কখনো তুমি তাদেরকে যুদ্ধে পেয়ে যাও, তবে তাদের এমন শাস্তি দাও, যেন তাদের উত্তরসূরিরা তাই দেখে পালিয়ে যায়; তাদেরও যেন শিক্ষা হয়"। (সূরা আল-আনফাল ০৮:৫৭)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। [সুরা তাওবা - ৯:১৬]

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيرًا

(ওহে বনি ইসরাঈল!) তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদের জন্যেই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। [সুরা বনী-ইসরাঈল - ১৭:৭]

الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারাই সফলকাম। [সুরা তাওবা - ৯:২০]

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ

তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। [সুরা তাওবা - ৯:২১]

....................ইত্যাদি।

এরকম শত শত আয়াত রয়েছে কুরআন কারীমে যেগুলো পাঠ করলে সুস্পষ্টরূপে বুঝে আসে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জিহাদ করাকে (দ্বীনের প্রয়োজনে যুদ্ধ করা ও রক্তপাত ঘটানোকে) কতটুকু ভালোবাসেন, যারা জিহাদ করে তাদেরকে তিনি কতটুকু ভালোবাসেন, পরকালে তাদেরকে তিনি কত বেশি পুরস্কৃত করবেন! সুবহানাল্লাহ।

- প্রিয় ভাই! ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখি! দ্বীন ইসলামকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে কী পরিমাণ রক্তপাত ঘটানো হয়েছে! ইসলামের প্রাথমিক যুগের (নবুওয়তের যামানা ও খোলাফায়ে রাশেদার যামানার) কিছু যুদ্ধের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। নিচের পরিসংখ্যানটি লক্ষ্য করি-

নবুয়তের যামানায় সংগঠিত হওয়া যুদ্ধ সমূহের পরিসংখ্যান			
সাল	যুদ্ধের নাম	কাফেরদের সৈন্যসংখ্যা	নিহত কাফেরের সংখ্যা
রমজান, ২য় হিজরি	বদর যুদ্ধ	৯৫০	৭০
শাওয়াল, ৩য় হিজরি	উহুদ যুদ্ধ	৩০০০	২২
	বনু কুরায়যার যুদ্ধ	-	৬০০-৭০০
মুহাররাম, ৭ম হিজরি	খায়বার যুদ্ধ		৯৩
জমাদিউল আউয়াল, ৮ম হিজরি	মূতার যুদ্ধ	২,০০,০০০	অগণিত
	হুনাইনের যুদ্ধ		৭০

হযরত আবু বকর রাদি. এর খিলাফতের সময় সংগঠিত যুদ্ধসমূহ			
সাল	যুদ্ধের নাম	কাফেরদের সৈন্যসংখ্যা	নিহত কাফেরের সংখ্যা
মুহাররাম, দ্বাদশ হিজরি	শিকলের যুদ্ধ	-	অসংখ্য
সফর, দ্বাদশ হিজরি	মাযারের যুদ্ধ		৩০,০০০
সফর, দ্বাদশ হিজরি	ওয়ালাজার যুদ্ধ		অসংখ্য
সফর, দ্বাদশ হিজরি	উল্লায়শ বা আমগিশিয়ার যুদ্ধ		৭০,০০০
জিলহজ্জ, দ্বাদশ হিজরী	ফিরাযের যুদ্ধ		অসংখ্য
	আযনাদাইন	১,০০,০০০	অসংখ্য

প্রিয় ভাই! ইসলামী ইতিহাসের পরবর্তী যুদ্ধগুলো ছিল আরো ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী, যা কুফ্ফারদের জন্য ছিল অভিশাপস্বরূপ! "হযরত উমর ফারুক রাদি. অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছিলেন"- এই কথাটি আমরা প্রবাদবাক্যের মত এক নিঃশ্বাসে বলে থাকি। কিন্তু আমরা কি জানি, এই অর্ধ জাহান জয় করতে কী পরিমাণ রক্তপাত ঘটানো হয়েছিল? কী পরিমাণ কাফেরকে হত্যা করা হয়েছিল?? প্রিয় নবীজীর ﷺ ওফাতের পরবর্তী বিশ বছরে অর্ধজাহান জয় করা

হয়েছে; আর এই অর্ধজাহান জয় করতে যুদ্ধের ময়দানে কত লক্ষ কাফেরকে হত্যা করা হয়েছে তার সঠিক হিসাব ঐতিহাসিকগণও সঠিকভাবে নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রাদি. এর সময়ের কিছু যুদ্ধের পরিসংখ্যান লক্ষ্য করুন-

হযরত উমর ফারুক রাদি. এর খিলাফতের সময় সংগঠিত যুদ্ধসমূহ			
সাল	যুদ্ধের নাম	কাফেরদের সৈন্যসংখ্যা	নিহত কাফেরের সংখ্যা
শাবান, ত্রয়োদশ হিজরি	ফিহল	৮০,০০০	প্রায় সকল কাফেরকেই হত্যা করা হয়
রজব, পঞ্চদশ হিজরি	ইয়ারমুকের যুদ্ধ	২,৪০,০০০ মতান্তরে ৪,০০,০০০	৭০,০০০ মতান্তরে ১,২০,০০০
শাবান, ত্রয়োদশ হিজরি	সেঁতুর যুদ্ধ	-	৬,০০০
রমজান, ত্রয়োদশ হিজরি	বুআইবের যুদ্ধ	১,৫০,০০০	এই যুদ্ধেও প্রায় সকল কাফেরকেই হত্যা করা হয়
১৩-১৫ শাবান, পঞ্চদশ হিজরী	কাদেসিয়ার যুদ্ধ	৩০,০০০	গণনাতীত

- প্রিয় ভাই! 'রক্তের নদী' কথাটি সাহিত্যে বা প্রবাদে পাওয়া গেলেও বাস্তবে পৃথিবীর ইতিহাসে এমনটি পাওয়া যায় না, একমাত্র ইসলামের ইতিহাস এর ব্যতিক্রম। **উল্লায়শ (বা আমগিশায়া)-এর যুদ্ধে (সফর, দ্বাদশ হিজরি)** 'সাইফুল্লাহ' তথা আল্লাহর তরবারি হিসেবে খ্যাত মুসলিম সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. আল্লাহর কাছে দোয়া করেন- "হে আল্লাহ! আমাদের সাহায্য করা আপনার ইখতিয়ার। আপনি যদি শত্রুবাহিনীকে আমাদের কর্তৃত্বে এনে দেন, তাহলে তাদের সকলকে নিশ্চিহ্ন করব; এমনকি তাদের রক্তে নদী প্রবাহিত করব।" (তাবারী ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬০; আরো বিস্তারিত পড়ুন- হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. এর জীবনী "আল্লাহর তলোয়ার"- মেজর জেনারেল এ আই আকরাম, লিংক- https://archive.org/details/KhalidbinwalidRa)

এমন দুআ করার কারণ ছিল, এই কুফফার বাহিনী ইসলামের অগ্রসরের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এরা এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পরবর্তী যুদ্ধে আরো শক্তি সঞ্চার করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছিল। তাই হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তমূলক আচরণের (সকলকে হত্যার) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে মুসলমানরা পারসিক বাহিনীকে পরাজিত করে। হযরত খালিদ রাদি. ঘোষণা দেন- শত্রুদেরকে হত্যা করো না, জীবিত আটক করো। কেবল তাকেই হত্যা করো যে বাধা প্রদান করে।

সেনাপতির নির্দেশে মুসলমানরা পারসিক সৈন্যদেরকে আটক করে। এরপর হযরত খালিদ রাদি. এদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন।

প্রিয় ভাই! দৃশ্যটি একটু কল্পনা করুন। দ্বীনের স্বার্থে সাহাবায়ে কেরাম কুফ্ফারদের প্রতি কেমন কঠোর ও নির্দয় ছিলেন!!! দুনিয়ার জীবনে এটিই তাদের আসল প্রাপ্তি, আর পরকালের আযাব তো আরো কঠিন! পারসিক বাহিনীর সত্তর হাজার বন্দীকে নদীর তীরে দাঁড় করিয়ে এমনভাবে হত্যা করা হয় যে, তরবারির আঘাতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরো শরীর নদীতে গিয়ে পড়ত। এভাবে তিনদিন ব্যাপী কুফ্ফার নিধন চলতে থাকে।

এভাবে কুফ্ফার নিধন পর্ব শেষ হলে কয়েকজন মুসলিম সামরিক অফিসার হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. এর চারপাশে জমায়েত হন। হযরত কাকা রহ. খালিদ রাদি. এর দিকে তাকিয়ে বলেন, "আপনি পৃথিবীর সমস্ত লোককে হত্যা করলেও এই নদীর বুকে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হবে না যতক্ষণ না এর উজানের বাঁধ খুলে দেয়া হয়। নদীর বুকে পানি আসতে দিন, তাহলেই আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা হবে।" (প্রাগুক্ত)

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. বাধ কেটে দিতে নির্দেশ দেন, ফলে 'রক্তের নদী' প্রবাহিত হয়। এভাবে তিনি আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়ন করেন।

সুবহানাল্লাহ! আর এভাবেই রক্তের নদী সাঁতরিয়ে ইসলাম তার মঞ্জিলে পৌঁছেছিল, বিজয়ী ধর্মরূপে অর্ধপৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আল্লাহু আকবার! আর এই বাস্তবতাকে কোন বধির ও অন্ধ ব্যতীত অন্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তাঁর সাথে যারা আছে তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত রহম দিল।" (৪৮ সূরা ফাৎহ: ২৯)

সুতরাং প্রিয় ভাই! "ইসলাম শান্তি চায়" এই কথার অর্থ কখনোই এই নয় যে, ইসলাম কাপুরুষ ও ভীরুদের ধর্ম, ইসলাম একদল খোঁজা-নপুংসকের ধর্ম; বরং ইসলাম চিরদিনই অসীম সাহসী বীরদের ধর্ম, যারা চোখের পলকে, দ্বীনের স্বার্থে, আপন প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন দিতে সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকে। ইসলাম এমন ধর্ম, যে অন্য কোনো বাতিল ধর্ম ও মতবাদকে সহ্য করতে পারে না। এই মহান ধর্ম চায় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মাধ্যমে আপন শাসন প্রতিষ্ঠা করে সারা পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করতে, খোদায়ী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। আর এই প্রক্রিয়ায় যে বা যারাই কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে, তাদের জবাব হবে একমাত্র এবং কেবলমাত্র তরবারি।

দাওয়াতী মেহনতের সাথীদেরকে শয়তানের ধোঁকা

• আমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ:

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" (০৩ সূরা আলে ইমরান: ১১০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"আর তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে (মানুষদেরকে) দাওয়াত দেয়, নিজে সৎকর্ম করে আর বলে, নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত?" (৪১ সূরা হা মিম সিজদাহ: ৩৩)

প্রিয় ভাই! আমরা যারা দাওয়াতের ময়দানে মেহনত করি, তারা অনেকে উপরের আয়াত দুটির এই তাৎপর্য এমনটি গ্রহণ করি- "দাওয়াতের মেহনত-ই সর্বশ্রেষ্ঠ মেহনত। কেননা, নবী রাসূলগণের মূল কাজই ছিল মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকা। আর এই উম্মতকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াতের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে। আর আমরা দাঈ'রাই উম্মতের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বা সকলের উপরে। আর যেহেতু আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ মেহনত করছি, তাই আজীবন এই মেহনতের সাথেই লেগে থাকব। অন্য কোনো মেহনতের সাথে জুড়ব না।"

প্রিয় ভাই! নিচের কথাগুলো একটু গভীরভাবে চিন্তা করি-

আমরা যদি সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের অন্তর্ভূক্ত হতে চাই, তাহলে কি আমাদেরকে শুধু দাওয়াতের মেহনত করলেই চলবে? দাওয়াতের পাশাপাশি-

.... আমাদেরকে কি নামায কায়েম করতে হবে না?

.... আমাদেরকে কি রমাযান মাসে সিয়াম পালন করতে হবে না?

.... আমাদেরকে কি হজ্জ ফরয হওয়ার পরও হজ্জ করতে হবে না?

.... আমাদেরকে কি যাকাত ফরয হওয়ার পরও যাকাত আদায় করতে হবে না?

ঠিক এমনিভাবে- জিহাদ ফরযে আইন হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে কি জিহাদ করা লাগবে না? ....

নামায কায়েম না করে, সিয়াম পালন না করে, ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করে, বাইতুল্লায় হজ্জ না করে কেবল দাওয়াতী মেহনত করে যদি 'সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত' না হওয়া যায়, তাহলে প্রিয় ভাই আমার, জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেলে জিহাদ না করে কী করে আমরা নিজেদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত দাবী করতে পারি??? ....

আর ভাই!

"নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত?"-একথার অর্থ কী??

একথার অর্থ হল-

নিশ্চয়ই আমি 'আত্মসমর্পণকারীদের' অন্তর্ভূক্ত।.............
কার প্রতি আত্মসমর্পণ??..........
আল্লাহ্ পাকের প্রতি..........আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের প্রতি.......

আর তাই "নিশ্চয়ই আমি 'আত্মসমর্পণকারীদের' অন্তর্ভূক্ত।" একথার অর্থ হল-
"হে আল্লাহ্! আমি তোমাকে আমার রব হিসেবে মেনে নিয়েছি। আমি তোমাকে আমার হুকুমদাতা হিসেবে মেনে নিয়েছি। আমি তোমাকে একমাত্র বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ করেছি। তুমি আমাকে যখন যে হুকুম করবে, যখন যে বিধান দান করবে, আমি তা মাথা পেতে নিব। আমি তোমাকে আমার গর্দান দিয়ে দিয়েছি। তুমি যখন ইচ্ছা, যেখানে খুশি তাকে ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার হায়াত, আমার মওত- সবকিছুই তোমার জন্য নিবেদিত। তুমি যখন আমাকে নামায-রোযার হুকুম দিয়েছ, তা মেনে নিয়েছি; তুমি যখন হজ্জ-যাকাতের বিধান দিয়েছ, তাও মেনে নিয়েছি; তুমি যখন দাওয়াতের মেহনতের আদেশ দিয়েছ, তখন তাও করে যাচ্ছি; আর এখন তুমি জিহাদের হুকুম দিয়েছ, তাও আমি মাথা পেতে নিচ্ছি; আমার জান, আমার মাল, আমার পরিবার-পরিজন, আমার ক্যারিয়ার- সবকিছু তোমার জন্য কুরবানী করে দিলাম। কবুল কর হে প্রভু দয়াময়- এই গরীবের পক্ষ থেকে ক্ষুদ্র এই নজরানা! ক্ষমা কর আমায় তুমি! আর পরকালে আমাকে দাও তোমার দীদার, তোমার হাবীবের প্রতিবেশ, শহীদের সুউচ্চ জান্নাত, জান্নাতুল ফিরদাউস্! নিশ্চয়ই তুমি পরম দাতা ও দয়ালু, পরম ক্ষমাশীল।"

• আমরা একটি ফরযে আইন বিধান তরক করছি নাতো!

আমরা যে সকল ভাইয়েরা কেবল দাওয়াতের ময়দানে মেহনত করে থাকি, আমরা একটু ভেবে দেখি! আমরা ফরযে আইন ইবাদত বাদ দিয়ে অন্য কোনো নফল বা ওয়াজিব বা ফরযে কিফায়াকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি নাতো? প্রিয় ভাই! বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন (সক্ষম সকলের উপর ফরয)। তাই অন্য কোনো ব্যাখ্যা না দিলেও এটাই তো ইসলামী শরীয়ত ও সময়ের নাজুকতার দাবী ছিল যে, যে যার অবস্থান হতে আমরা জিহাদের পতাকা উত্তোলন করবো, কিংবা জিহাদের প্রস্তুতি নিব, জিহাদের জন্য উম্মাহকে দাওয়াত দিব, যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করবো, যুদ্ধের মাঠ প্রস্তুত করব, ফরজে আইন মেহনত (জিহাদ)-কে ঠিক রেখে সম্ভব হলে দ্বীনের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করে যাব, সম্ভব না হলে কেবল জিহাদের মেহনতই আজীবন করে যাব; তাইনা ভাই?
কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা (দা-ঈ ভাইয়েরা) সবসময় একটি আত্মতুষ্টিতে ভুগি, সেটি হলো আমরা তো 'নবীওয়ালা কাজ' নিয়েই আছি। অনেক ভাইকে একথা বলতে শুনা যায়, একাজের সাথে আজীবন লেগে থাকতে হবে। অন্য কোনো মেহনত করা যাবে না।
'আজীবন কেবল দাওয়াতী মেহনতই করে যাওয়া'র পাক্কা নিয়ত করা- এটা তো প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর আদর্শ হতে পারে না!
যখন যে পরিস্থিতি, তখন শরীয়ত আরোপিত সে দায়িত্ব পালন করা, শরীয়তের চাহিদা পুরা করা- এটাই নববী আদর্শ।
তাছাড়া, আজীবন একটি মেহনতের সাথে জুড়ে থাকার নিয়ত সাহাবায়ে কেরামও করেছিলেন, তবে সেটি অন্য কোনো মেহনত ছিল না, সেটি ছিল 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্'র মেহনত! যেমন-

: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ كَانَتْ الأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُوْلُ

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدَا *عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِيْنَا أَبَدَا

: فَأَجَابَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ *فَأَكْرِمْ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ খন্দকে যুদ্ধের দিন আবৃত্তি করছিলেনঃ

"মুহাম্মদের ﷺ হাতে করেছি শপথ জিহাদের,
পিছু হটবনা কভূ পূর্বে মউতের।"

আল্লাহর রাসূল ﷺ এর উত্তর দিয়ে বললেনঃ

"হে আল্লাহ্! পরকালের সুখ হচ্ছে প্রকৃত সুখ;
তাই তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সম্মানিত কর।"

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৯৬১)

প্রিয় ভাই, আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না, নবীওয়ালা কাজ তো শুধু উম্মতকে ইসলামের সীমাবদ্ধ কিছু বিধি-বিধানের দিকে দাওয়াত দেয়ার নাম নয়, মাদরাসার খেদমত তথা দ্বীন শিক্ষা করা- শিখানো, তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধি করা, মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া যেমন নবীওয়ালা কাজ, ঠিক তেমনিভাবে জিহাদের প্রয়োজনে সর্বশক্তি আর জান-মাল দিয়ে জিহাদ করাটাও নবীওয়ালা কাজ, নববী আদর্শ। তবে, আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে, বর্তমানে কোন নবীওয়ালা কাজটা অধিক জরুরী, কোনটি ফরযে আইন! আমার মন মত মেহনত- সেটা আল্লাহ পাকের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। শরীয়তের বিধান হল, আমরা যেন ফরযে আইন বাদ দিয়ে ফরযে কিফায়া, ওয়াজিব, সুন্নত বা নফল নিয়ে ব্যস্ত না থাকি। বরং, ফরজে আইন দায়িত্ব পালন করার পর সামর্থ্য থাকলে ফরজে কিফায়া, সুন্নত, নফল আমল বা মেহনতে সময় দেয়া। তা না পারলে কমপক্ষে ফরজে আইন মেহনতই আঞ্জাম দিতে থাকা।

প্রিয় ভাই! মেহনতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে শরীয়তের মেজাজ ও চাহিদা বুঝতে হবে। কখন আল্লাহ পাকের কী হুকুম সেটা মানার নামই 'আনুগত্য'। যখন যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতিতে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার নামই শরীয়ত, আর এভাবে শরীয়ত মেনে চলাই প্রকৃত দ্বীন। সব সময় বা আজীবন কিংবা কোথায় শরীয়তের কোন্ হুকুম, তা লক্ষ্য না রেখে নির্দিষ্ট একটি আমল বা কাজ বা মেহনতে লেগে থাকাটা শরীয়তের মর্জির সাথে মুয়াফিক নয়। আর, যখন আল্লাহ্ পাকের যেই হুকুম তা পুরা করতে না পারলে, ভয় হয়, সেটি দ্বীনদারী না হয়ে দ্বীনের নামে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা পুরা করা হয়ে যেতে পারে। (আল্লাহ্ পাক আমাদের হেফাযত করুন। আমীন।)

• জিহাদ সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াত:

মুহতারাম ভাই!

যদি আমরা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করাকেই নিজের জীবনের ব্রত বানিয়ে থাকি, তাহলে বলছি, যদি দাওয়াতী মেহনতের উদ্দেশ্য হয়, আমার ঈমান কিভাবে বনে, আমার যিন্দেগী কিভাবে বদলায়, উম্মতের ময়দানে কিভাবে আল্লাহর কালাম বুলন্দ হয়ে যায়, কিভাবে বান্দা মাখলুকের গোলামী ছেড়ে এক আল্লাহর গোলামী করে, কিভাবে আল্লাহ পাকের সাথে বান্দার তা'আল্লুক (সম্পর্ক) হয়ে যায়; তাহলে বলব, জিহাদ ঈমান ও ইসলামের চূড়া,

জিহাদ আমার যিন্দেগীর এসলাহ আরো বেশি করবে, আল্লাহর কালাম বেশি বুলন্দ হবে, জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহর সাথে সবচেয়ে বেশি তা'আল্লুক হয়, জিহাদই বান্দাকে সবচেয়ে বেশি গাইরুল্লাহর গোলামীর শৃঙ্খল ছিন্ন করে এক আল্লাহর গোলামী করতে শিখায়, আর জিহাদ নিজেই সবচেয়ে বড়ো 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ', জিহাদ নিজেই সবচেয়ে বড় 'দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্'। কারণ জিহাদের দ্বারা কুফর, শিরক, বাতিল ও যাবতীয় ফেতনা যত দ্রুত ও কার্যকরী ভাবে সমাজ থেকে দূর হয় এবং তার স্থলে আল্লাহর দীন মানুষের যিন্দেগীতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা অন্য কোনো ভাবে সম্ভব নয়।

এর প্রমাণ, নবুয়ত প্রাপ্তির পর মাক্কী যিন্দেগীতে শুধু দাওয়াতের মেহনত ছিল, জিহাদ ছিল না, তখন মক্কা-মদীনা মিলে তের বছরে মাত্র দেড় থেকে দুই হাজার মুসলমান হয়েছিলেন। আর হিজরতের পর যখন জিহাদ ফরয করা হলো, তখন মাত্র দশ বছরে লক্ষ লক্ষ সাহাবী তৈরী হয়ে গেলেন।

আল্লাহর রাসূলের মাক্কী যিন্দেগী আমাদেরকে যেন এই শিক্ষাই দেয় যে, দেখ! দেখ! পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ আখলাক নিয়ে, সর্বাপেক্ষা ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়ে, আরবের শ্রেষ্ঠ বক্তা বা বাগ্মী হয়েও, দু-জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ-অলী আর আল্লাহ্ওয়ালা হওয়া সত্ত্বেও তের বছরের দাওয়াতে মক্কায় মাত্র তিন শতের মত মানুষ মুসলমান হল। সুতরাং কেবল দাওয়াত দেওয়াই দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসার আর প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়।

অন্যদিকে, আল্লাহর রাসূলের মাদানী যিন্দেগী আমাদেরকে শিক্ষা দেয়, দেখ! দেখ! পৃথিবীর সর্বশেষ্ঠ নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ আখলাকওয়ালা নবী, সর্বাপেক্ষা রহমদিলওয়ালা নবী, তরবারীর নবী, মালহামার (মহাযুদ্ধের) নবী যখন তরবারি হাতে নিলেন, কাফের ও মুনাফেকদের প্রতি কঠোর হলেন, তখনই ইসলামের বিজয় সূচিত হল, ফলে আল্লাহর বান্দারা প্রকৃত ইসলামের স্বাদ পেল, আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা পেল, দিকে দিকে মানুষ ইসলামের প্রকৃত রূপ বুঝতে পারল আর ইসলামে দলে দলে দাখিল হতে লাগল।

আল্লাহর রাসূলের ﷺ ওফাতের পর মাত্র দশ বছরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে "আক্রমণাত্মক (ইকদামী) জিহাদের" মাধ্যমে সিরিয়া, ইরাক, মিশর, রোম, পারস্য জয় হয়ে ইসলাম অর্ধপৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দিকে দিকে মানুষ ইসলামের পরিচয় পেয়ে তার সত্যতা অনুধাবন করে তার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে শুরু করে, আর এটি এজন্য যে মানুষ সাধারণত পৃথিবীর পরাশক্তিদের দ্বারা সবসময়ই প্রভাবিত হয়, তাদের কৃষ্টি-কালচার, সংস্কৃতি, আকীদা-বিশ্বাস সহজেই গ্রহণ করে; মানুষ কখনো পরাজিত জাতির দীন ও মানহাজকে গ্রহণ করেনা। নবুয়ত এবং খুলাফায়ে রাশেদার যামানায় এটি কোন্ দাওয়াতের বরকতে সম্ভব হয়েছিলো? তা জিহাদ নয়কি?

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ– وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

"যখন আসবে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও বিজয়, এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন।" (১১০ সূরা নছর:১-২)

প্রিয় ভাই, দাওয়াত হচ্ছে মানুষকে (কুফর/শিরক/অন্যান্য) ফেতনা থেকে আল্লাহর দিকে ডাকার জন্য (এতে হয়তো কিছু মানুষ দ্বীনের সন্ধান পাবে), আর জিহাদ হচ্ছে সমাজ থেকে সেই ফেতনাকে নির্মূল করার জন্য (ফলে সকল মানুষ দ্বীনের ছায়া পাবে)।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ

"আর তোমরা তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করতে থাকো, যে পর্যন্ত না সকল ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" (৮ সূরা আনফাল: ৩৯)

তাই ভাই, আমরা কি বলতে পারিনা, জিহাদ-ই সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াত?

অতএব, আমরা যদি দাওয়াতের কাজ করতে ভালোবাসি, তাহলে তো জিহাদ করা-কে আরো বেশি ভালোবাসা উচিত, তাইনা ভাই?

তাছাড়া, আল্লাহর রাসূলের ﷺ মাদানী যিন্দেগীতে দাওয়াত ও জিহাদের কাজ উভয়টিই একসাথে চলেছিল, তাই আমাদেরকে 'শুধু দাওয়াত' নয়, জিহাদ-ও করতে হবে, ইনশাআল্লাহ্।

• কুরআন ও হাদীসের তাহরীফ করছি নাতো!

আরেকটি দুঃখজনক বিষয় হলো, আমরা যারা দাওয়াতের মেহনত করি, তাদের কেউ কেউ জিহাদের আয়াত ও 'আল্লাহর রাস্তা'র ফাযায়েল সম্বলিত হাদীসসমূহকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। এটি দ্বীনের এক প্রকার বিকৃতি (তাহরীফ)।

যদিও এর দ্বারা কিছু ফায়দা হচ্ছে, "মানুষ দাওয়াতের দিকে ঝুঁকছে", কিন্তু এর 'ক্ষতি' লাভের চেয়ে অনেক বেশি, এর পরিণতি মারাত্মক, আর এর দ্বারা উম্মাহর জিহাদী চেতনার অবস্থা দাঁড়িয়েছে ভয়াবহ, "হায়! মানুষ জিহাদকে ভুলে গিয়েছে। দাওয়াতের ময়দানকে জিহাদের ময়দান মনে করা শুরু করেছে। জিহাদ না করেও জিহাদের সওয়াব পাচ্ছে বলে বিশ্বাস করা শুরু করেছে। ফলে উম্মাহ্ প্রকৃত জিহাদকে ভুলে যেতে শুরু করেছে।"

আবার, অনেক ভাই আছি যারা দাওয়াতকেই জিহাদ ভাবা শুরু করে দিয়েছি।

প্রিয় ভাই!

স্বীকার করছি, 'আল্লাহর রাস্তা' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। যে ইলম হাছিল করছে, যে আত্মশুদ্ধির মেহনত করছে, যে দাওয়াত দিচ্ছে, যে জিহাদ করছে, যে মসজিদে নামায পড়তে যাচ্ছে, যে হজ্জ করতে যাচ্ছে ইত্যাদি, শাব্দিক অর্থে সকলকেই 'ফী সাবিলিল্লাহ' তথা 'আল্লাহর রাস্তার পথিক' বলা যায়। কিন্তু আমাদেরকে তাকাতে হবে সাহাবাদের দিকে, তাবেয়ীদের দিকে, তাবে-তাবেয়ীদের দিকে, ফুকাহাগণের দিকে; তাঁরা 'ফী সাবিলিল্লাহ'র আয়াত ও হাদীস দ্বারা কী বুঝতেন। তাঁরা সাধারণভাবে 'জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'-ই বুঝতেন।

سَبِيل اللّهِ :التَّعْرِيفُ

وَسَبِيل اللَّهِ فِي أَصْل الْوَضْعِ هُوَ :الطَّرِيقُ الْمُوَصِّلَةُ إِلَيْهِ تَعَالَى، فَيَدْخُل فِيهِ كُل سَعْيٍ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيل الْخَيْرِ.وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ الْجِهَادُ.

'ফী সাবীলিল্লাহ' এর পরিচয়:

শাব্দিক অর্থে 'ফী সাবীলিল্লাহ' হল- যে রাস্তা আল্লাহ তা'আলার দিকে পৌঁছে দেয়। সুতরাং এর মাঝে আল্লাহর আনুগত্য ও কল্যাণের পথের সব চেষ্টাই অন্তর্ভূক্ত হবে।

আর পারিভাষিক অর্থে 'ফী সাবীলিল্লাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হল জিহাদ।

(সূত্র: মুখতারুস সিহাহ, বাদায়িউস সানায়ে' ২/৪৫-৪৬, ফাতহুল কাদীর ২/২৫০, ইবনে আবেদীন ২/৬০, নিহায়াতুল মুহতাজ ৬/১৫৮, কালউবী ৩/১৯৮, রউজুল তালেব ২/৩৯৮, আলমুগনী ৬/৪৩৫, কাশশাফুল কিনা' ২/২৮৩)

[আলমাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়াইতিয়্যাহ, খণ্ড: ২৪, পৃষ্ঠা: ১৬৬]

প্রিয় ভাই! 'ফী সাবীলিল্লাহ' শব্দটি কুরআন হাদীসে জিহাদ ছাড়াও অন্যান্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিহাদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং কুরআন হাদীসে বর্ণিত 'ফী সাবীলিল্লাহ' এটা জিহাদ ছাড়া অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার আলামত না পাওয়া গেলে বুঝতে হবে, ব্যাপকভাবে এটা জিহাদের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ শাব্দিক অর্থে ব্যাপকতা থাকলেও পারিভাষিক অর্থে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল 'জিহাদ'।

'জিহাদের ক্ষেত্রে কোন্ অর্থ নেয়া হবে? সাধারণ অর্থ, নাকি পারিভাষিক অর্থ?

প্রিয় ভাই! আবার খেয়াল করুন, ইসলামের প্রায় প্রতিটি আমলের জন্য ব্যবহৃত শব্দের দুটি করে অর্থ বিদ্যমান। একটি সাধারণ অর্থ; অপরটি পারিভাষিক অর্থ। তেমনিভাবে, 'জিহাদ' শব্দটিরও একটি সাধারণ অর্থ এবং একটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। "জিহাদের" সাধারণ অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, শরীয়তের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের কালিমা বুলন্দ করার জন্য যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, কষ্ট ও মুশাক্কাত সহ্য করা হয় তাই জিহাদ, তা যে কোনো পথেই হোক বা যে কোনো পন্থায়ই হোক না কেন।

কিন্তু "জিহাদ" যা শরীয়তের একটি পরিভাষা, তার অর্থ হলো, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা, ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষা করা, মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করা ও কাফের মুশরিকদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে চূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা। এটিই জিহাদের শরয়ী অর্থ। (কিতাবুল জিহাদের ভূমিকা, মাওলানা আব্দুল মালেক হাফি.পৃ. ২৪; লিংক: https://archive.org/details/kitabuljihad_202210)

এখন প্রশ্ন হলো আমরা কোন্ অর্থকে গ্রহণ করবো, আগেরটা না পরেরটা, নাকি দুটাই? আমাদেরকে খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে, শরীয়তের কোনো একটি পরিভাষার ক্ষেত্রে সাধারণ অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়, শরীয়তের পারিভাষিক অর্থই গ্রহণ করতে হবে। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক। 'যাকাত' এর সাধারণ অর্থ 'পবিত্র করা'। ওযু করে পবিত্রতা হাছিল করলেই "যাকাত" আদায় হবে না। শরীয়তের পরিভাষায় "যাকাত" বলতে আমরা শুধু পবিত্র করা বা হওয়া বুঝি না, আমরা বুঝি 'যার নেসাব পরিমাণ মাল এক বছর অতিবাহিত হবে, তার সম্পদের আড়াই শতাংশ কুরআনে বর্ণিত সাত শ্রেণির উপযুক্ত হকদার ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে সম্পদকে পবিত্র করা।'

আবার দেখুন 'সিয়াম' (রোযা) অর্থ সংযমী হওয়া বা বিরত থাকা। একজন লোক চুরি করা বা মিথ্যা বলা থেকে সংযমী হলো বা বিরত থাকল, তাতেই কি তাকে 'সায়িম' (রোযাদার) বলা যাবে? না। যে ব্যক্তি সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকল, তাকেই কেবল শরীয়তের পরিভাষায় 'সায়িম' (রোযাদার) বলা হবে।

একই ভাবে 'সালাত' (নামায) শব্দের অর্থ 'দুআ বা আশীর্বাদ' কিংবা 'নিতম্ব হেলানো'। শুধু দুআ করলেই কিংবা নিতম্ব হেলালেই কি নামায আদায় হয়ে যাবে? হবে না।

এখন, কেউ যদি শরীয়তের পারিভাষিক অর্থকে গ্রহণ না করে কেবল সাধারণ অর্থকে নিয়ে দাবী করে, আমি ওযু করে পাক-সাফ হয়েছি, তাই আমার আর যাকাত দেয়া লাগবে না, তাহলে সে 'তাহরীফ' (শরীয়তের বিধানের বিকৃতি) সাধন করল; কেউ যদি বলে আমি সারাদিন মিথ্যা বলা থেকে বিরত রয়েছি, তাতেই আমার রোযা হয়ে গেছে কিন্তু সে খানাপিনা ও স্ত্রী-সম্ভোগ থেকে বিরত থাকেনি, তাহলে সেও তাহরীফ করল; একইভাবে, কেউ যদি কেবল দুআ

করে বা নিতম্ব হেলিয়েই দাবী করে আমার নামায আদায় হয়ে গিয়েছে, তাহলে সেও 'তাহরীফ' করল। আর শরীয়তের বিধানের ক্ষেত্রে এ ধরনের 'তাহরীফ' করার দ্বারা ক্ষেত্র বিশেষে অনেক সময় 'কুফর' পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে, যা ব্যক্তিকে ইসলামের গন্ডি হতে বেরও করে দিতে পারে।

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রাদি. এর যামানায় রিদ্দার ঘটনা থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যারা যাকাত কার কাছে হস্তান্তর করবে এই ব্যাপারে 'তাবীল' (ভুল ব্যাখ্যা) করে। আর এই 'তাহরীফ'-এর ফলস্বরূপ তারা আল্লাহ্ পাকের একটি ফরয বিধান মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং যাকাত না দেয়ার ঘোষণা দেয়। ফলে আল্লাহর রাসূলের খলীফা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেন।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা এগুলো বুঝি, কিন্তু জিহাদের ক্ষেত্রে আমরা জিহাদের অর্থ 'যুদ্ধ ও যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম' বাদ দিয়ে অন্য অর্থ তালাশ করি। আমরা কেন জানি ভুলে যাই, শরীয়তের অন্যান্য হুকুমের মত জিহাদের ক্ষেত্রেও সাধারণ অর্থকে নেয়া যাবে না, শরয়ী অর্থই নিতে হবে। জিহাদের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করে দাওয়াতকে 'জিহাদ' বলা যাবে না, তাযকিয়াকে 'জিহাদ' বলা যাবে না, ইসলামের উপর কেবল কিছু লেখালেখি করে তাকে 'জিহাদ' করা বলা যাবে না। এতে 'তাহরীফ' (দ্বীনের বিকৃতি) হবে।

প্রিয় ভাই! আমরা সলাত আদায়ের ফাযায়েলগুলিকে কি সিয়ামের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি? সিয়ামের ফাযায়েলগুলিকে কি হজ্জের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি? যদি না করি, তাহলে জিহাদের ফাযায়েলগুলিকে কেন দাওয়াতের মধ্যে টেনে আনি?

জিহাদের পারিভাষিক অর্থ:

আমরা নিরপেক্ষভাবে নবীজীর ﷺ সীরাত আর সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগী পর্যালোচনা করি। তাহলে আমরা দেখতে পাব, সাহাবায়ে কেরাম জিহাদ বলতে "সশস্ত্র যুদ্ধ"-কেই বুঝতেন, 'যুদ্ধ করা' ব্যতীত তাঁরা কখনো জিহাদের অন্য কোনো অর্থ করেননি। খোদ নবী করীম ﷺ-ও জিহাদের ব্যাখ্যা সশস্ত্র যুদ্ধ-ই করেছেন।

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ....قَالَ وَمَا الْجِهَادُ قَالَ أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ اِذَا لَقِيْتَهُمْ قَالَ فَأَيُّ الْجِهَادُ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيْقَ دَمُهُ

আমর ইবনে আবাসা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, জিহাদ কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যখন তাদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হয়। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করল: কোন জিহাদ সর্বোত্তম? রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, "ঐ ব্যক্তির জিহাদ সর্বোত্তম যার ঘোড়া যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয়েছে এবং সে নিজেও বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে শাহাদাত বরণ করেছে।" (জামিউল আহাদীস ১০১৪৪, আহমদ ১৭০২৭, ত্বাবরানী)

এই হাদীসে স্বয়ং রাসূল ﷺ-ই বলে দিলেন জিহাদ কাকে বলে। এরপর জিহাদকে অন্যত্র টেনে নেয়ার আর কোনো সুযোগ আছে কি?

প্রিয় ভাই! মদীনার অলীতে-গলীতে যখন حَيَّى عَلَى الْجِهَادِ (জিহাদের দিকে আস) এই আযান দেয়া হত, তখন কি সাহাবায়ে কেরাম দাওয়াত দেয়ার জন্য বের হতেন? তখন কি তারা জায়নামায আর তসবীহ নিয়ে যিকিরের মজমা কায়েম করার জন্য বের হতেন? নাকি তারা মিটিং-মিছিল করার জন্য বের হতেন? নাকি তারা নফসের জিহাদ, কলমের জিহাদ, বক্তৃতার জিহাদ ইত্যাদি করেই ক্ষান্ত হয়ে যেতেন? বরং তারা কি লোহার পোশাক পরে, তীর-ধনুক, তরবারী আর বর্শা নিয়ে উটে কিংবা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করার জন্য তৈরী হয়ে ছুটে আসতেন না?

সুতরাং একথা সুস্পষ্ট হল, জিহাদ বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তীতে সকল মুহাদ্দিসীনে কেরাম, ফুকাহায়ে কেরাম ও সলফে সালেহীনগণ যুদ্ধ করাকেই বুঝতেন।

প্রিয় ভাই! "তা'লীম, তাযকিয়া, দা'ওয়াত ও তাবলীগ, ওয়াজ নসীহাত ইত্যাদি করা 'আমর বিল মা'রুফ' সৎকাজের আদেশ ও 'নাহী আনিল মুনকার' অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার একেকটি নতুন পদ্ধতি হতে পারে। আর এসবই স্ব-স্ব স্থানে কাম্য, বরং এসব কর্মপ্রচেষ্টার প্রত্যেকটাই খেদমতে দীনের একেকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এগুলোর ভিন্ন ভিন্ন ফাযায়েল, ভিন্ন আহকাম ও ভিন্ন মাসায়েল রয়েছে। এসবের কোনটিকেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। আবার কোনটাই এমন নয় যা পারিভাষিক জিহাদের অন্তর্ভূক্ত করা যায় বা তার ব্যাপারে জিহাদের ফাযায়েল ও আহকাম আরোপ করা যায়।" (হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল মালেক সাহেব দা.বা., 'কিতাবুল জিহাদ' কিতাবের ভূমিকা: পৃ. ৩৭)

রাসূলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেন,

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

"যে আমার নামে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে লিখে নেয়।" (বুখারী ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০,২০২; মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃ. ১০)

প্রিয় ভাই! সতর্ক হই!

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সকল আয়াত ও হাদীস দ্বারা জিহাদ করার ফাযায়েল বর্ণনা করেছেন, উদ্দেশ্য ছিল উম্মাহকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা, নিয়ত ছিল উম্মাহ্ যেন জিহাদ করে, ক্বিতাল তথা যুদ্ধ করে, সে সকল আয়াত ও হাদীসের অর্থ পরিবর্তন করে অন্যত্র ব্যবহার না করি, জিহাদের ফাযায়েলকে দাওয়াতের মধ্যে টেনে না আনি, এতে দ্বীন বিকৃতি, তাহরীফ ও বিদ্আতের গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করি! আল্লাহর রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করা হয়ে যায় কিনা ভয় করি! জাহান্নামকে ভয় করি!!

দয়াকরে নিচের হাদীসগুলো এবং জিহাদের ফাযায়েল সম্বলিত অন্যান্য হাদীসগুলোকে দাওয়াতের মধ্যে ব্যবহার বন্ধ করি। আল্লাহর দোহাই!!!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

" لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ".

"আল্লাহর পথে একটা সকাল কিংবা একটা বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও তার সমস্ত জিনিস (এর অধিকারী হওয়া কিংবা তা সাদাকা করার সওয়াব) হতে অধিক উত্তম।" (বুখারী-২৭৯২ ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَلَوْ قُوْفُ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ رَجُلٍ سِتِّيْنَ سَنَةً

"সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! এক সকাল কিংবা এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে নিয়োজিত রাখাটা গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সমস্ত জিনিস হতে উত্তম। আর তোমাদের কারোও যুদ্ধের ময়দানে কাতার বন্দী হওয়া ষাট বৎসরের নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।" (মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক-৫/২৫৯, হাদীস নং-৯৫৪৩)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الحَجَرِ الْأَسْوَدِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "আল্লাহর পথে একটি মুহূর্ত অবস্থান করা কদরের রাতে হাজরে আসওয়াদকে সামনে নিয়ে ইবাদত করার চাইতে উত্তম।" (ইবনে হিব্বান ১৫৮৩, ইবনে আসাকির, বায়হাকী)

আমার প্রিয় ভাই! আল্লাহর ওয়াস্তে বলি- এই হাদীসগুলো আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের ফাযায়েল বর্ণনা করে। দাওয়াতের নয়। গাশতে বেরিয়ে কোন মুসলমানের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও এই সওয়াব হাছিল হবে এমনটি আশা না করি!

وَعَن أَبِي يَحيَى خُرَيْمِ بنِ فَاتِكٍ رضي الله عنه، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُمِئَةِ ضِعْفٍ.

প্রিয় রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) কিছু ব্যয় করে, তার আমলনামায় তার সাত শত গুণ লেখা হয়ে থাকে।" (তিরমিযী-১৬২৫ ও নাসাঈ-৩১৮৬)

এটি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য ব্যয় করার ফযীলত। দয়া করে, এই হাদীসকে অন্যত্র ব্যয়ের ফাযায়েল হিসেবে ব্যবহার না করি।

رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام ألف يوم، وقيام ألف ليلة

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত প্রহরা দেয়া হাজার দিন রোযা রাখা এবং হাজার রাত্রি ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।" (তিরমিযী, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ)

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত প্রহরা দেয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার উপর সমস্ত সম্পদের চেয়ে উত্তম।" (তিরমিযী, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ)

এই হাদীসগুলো সীমান্ত পাহারা দেয়ার ফাযায়েল বর্ণনা করে, মারকাজের পাহারাদারির নয় ভাই। আল্লাহর দোহাই! এভাবে জিহাদের ফাযায়েলকে অন্যত্র ব্যবহার করে উম্মাহকে বিভ্রান্ত না করি। মরদুদ শয়তান যেন আমাদেরকেও বিভ্রান্ত না করতে পারে!

প্রিয় ভাই! হ্যাঁ, একথা অস্বীকার করছি না- আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে উক্ত ফাযায়েল ও সওয়াব দ্বীনের অন্যান্য শাখায় মেহনত করলেও দিতে পারেন, এটা তাঁর দয়া ও অফুরন্ত করুণার বহিঃপ্রকাশ হবে। তিনি চাইলে আরো অনেক বেশি দিতে পারেন, বা আরো অনেক কিছু করতে পারেন। কিন্তু এ হাদীসগুলো আল্লাহর রাসূল ﷺ দাওয়াতের বা অন্যান্য মেহনতের ফাযায়েল বর্ণনা করতে গিয়ে কোনদিনও বর্ণনা করেননি। অন্য কোনো মেহনতের মাধ্যমে জিহাদের ফাযায়েল লাভ হবে, এমনটি কুরআন-হাদীসের কোথাও বর্ণনা করা হয়নি। বরং উল্টো বর্ণনা এসেছে ভাই! অন্য কোনো আমল বা মেহনত করে কস্মিনকালেও জিহাদের সমান সওয়াব লাভ করা সম্ভব নয়। যেমন-

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِيْ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَهُ مَالٌ كَثِيْرٌ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ :يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ أُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَقَالَ كَمْ مَالُكَ؟ قَالَ سِتَّةَ الاف دِيْنَارٍ، فَقَالَ لَوْ أَنْفَقْتَهَا فِيْ طَاعَةِ اللهِ لَمْ تَبْلُغْ غُبَارَ شِرَاكِ نَعْلِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَأَتَاه رَجُلٌ فَقَالَ :يَا رَسُوْلَ اللهَ أَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ أُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَقَالَ لَوْ قُمْتَ اللَّيْلَ وَصُمْتَ النَّهَارَ لَمْ تَبْلُغْ نَوْمَ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আমার সম্পদ দান করি, তাহলে কি আল্লাহর পথে মুজাহিদদের আমলে পৌঁছতে পারব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার সম্পদের পরিমাণ কত? লোকটি বলল, ছয় হাজার দিরহাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই সম্পদ যদি আল্লাহ তা'আলার মনোনীত পথে দান করে দাও তবেও একজন মুজাহিদের পায়ের নিচে জুতার বালি সমপরিমাণ হতে পারবে না। অন্য এক ব্যক্তি এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে এমন কিছু আমল বর্ণনা করে দিন যার দ্বারা আমি মুজাহিদের আমলের সমপর্যায়ে পৌঁছব! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যদি তুমি

সারা রাত্র নামায পড় আর দিন ভর রোযা রাখ তবেও মুজাহিদগণের ঘুমের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না। (সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর-২/১৫০)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ " لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ " . فَرَدُّوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ " لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ " . فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ " مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُ الْقَائِمِ الصَّائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করে, একদা রাসূলে আকরাম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল, "কোন কাজটি সওয়াবের দিক থেকে আল্লাহর পথে জিহাদের সমতুল্য?" রাসূলে আকরাম ﷺ বললেন, তোমরা সে কাজের মতো শক্তির অধিকারী নও।" সাহাবায়ে কেরাম দুই কিংবা তিনবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসূলে আকরাম ﷺ প্রতিবার এটাই বলছিলেন, "তোমাদের এরূপ করার মতো শক্তি-সামর্থ্য নেই। এরপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত থাকে তার দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে রোযা রাখে, কিয়াম করে, আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করে, এবং নামায-রোযার ব্যাপারে গাফিল থাকে না (অনবরত করতেই থাকে যতক্ষণ না); মুজাহিদ জিহাদ শেষে বাড়িতে ফিরে আসে।" (বুখারী-২৮৯৬ ও মুসলিম, তিরমিজি)

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ. قَالَ " لاَ أَجِدُهُ ـ قَالَ ـ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُرَ وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ ". قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ

বুখারীর আরেক বর্ণনা হল: এক ব্যক্তি নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমায় এমন কোনো আমলের কথা বলুন যা জিহাদের সমতুল্য? তিনি ﷺ বললেন, "আমি এমন কোনো আমল তো দেখছি না।" তারপর আবার বললেন, "তুমি কি এতটা শক্তির অধিকারী, যখন জিহাদকারী আল্লাহর পথে বের হয়, তখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে, অতঃপর (মুজাহিদ ফিরে আসার আগ পর্যন্ত) নামায পড়তে থাকবে, এবং গাফলতি করবে না এবং রোযা রাখবে কিন্তু (মুজাহিদ ফিরে আসার আগ পর্যন্ত) ইফতার করবে না।" সে ব্যক্তি বললেন, "এ কাজ করার ক্ষমতা কার আছে?" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৭৮৫)

সুতরাং ভাই! জিহাদ না করে অন্য আমল বা মেহনতের মধ্যে জিহাদের সমান ফাযায়েল লাভ করার স্বপ্ন দেখা বোকামি নয় কি? ইসলামের প্রতিটি আমলের আলাদা ফাযায়েল রয়েছে। যে যেই আমল যতটুকু করছি, সে সেই আমলের ততটুকু সওয়াব-ই আশা করব, ইনশাআল্লাহ।

তাই, আসুন ভাই, জিহাদের ফাযায়েল ও মুজাহিদের মর্যাদা লাভ করার জন্য আজ থেকেই জিহাদী মেহনতে নেমে পড়ি, ইনশাআল্লাহ।

• বর্তমানে কি মক্কী যামানা চলছে (?)

অনেক ভাইদের মুখে শুনা যায়, বর্তমানে (আল্লাহর রাসূলের মাক্কী যামানার ন্যায়) মাক্কী যামানা চলছে, তাই এখন শুধু দাওয়াত চলবে। পরিবেশ তৈরি হলে বা ইমাম মাহদী আসলে (মাদানী যামানা শুরু হবে, তখন) জিহাদ শুরু হবে আর আমরা জিহাদে জুড়ে যাব!

প্রিয় ভাই! বর্তমান সময়ে এই কথা বলার আর মোটেও সুযোগ নেই। একথা এজন্য বলা যাবে না, কারণ, মাক্কী যিন্দেগীতে জিহাদ ফরয ছিল না, বরং জিহাদের হুকুমই নাযিল হয়নি। কিন্তু বর্তমানে প্রতিটি মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে আছে। আবারো বলছি, ইসলামের বিধান পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। যারা বলবেন, বর্তমানে মাক্কী

যিন্দেগী চলছে, তাদের ঈমান-হারা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, তারা এসকল উক্তির দ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর একটি ফরয বিধান, কেবল জিহাদকেই অস্বীকার করছেন। প্রশ্ন আসতে পারে, কিভাবে? কেননা, বর্তমানে যদি মক্কী যামানাই হয়, তাহলে আমরা সিয়াম (রোযা) কেন পালন করি? রমাযান মাসের রোযা তো আল্লাহর রাসূলের মাক্কী জীবনে ছিলনা!

বর্তমানে তাহলে হজ্জ কেন করবো? মাক্কী জীবনে তো হজ্জের বিধান ছিল না!

আমরা পর্দা কেন করবো? মাক্কী যিন্দেগীতে তো পর্দার বিধান ছিল না।

যদি আমার সেই সব ভাইদের কথা মতো মেনে নেয়া হয়, বর্তমানে মাক্কী যামানাই চলছে, তাহলে মাক্কী যিন্দেগীতে তো মদ হালাল ছিল, তাই বলে কি এখন মদ হালাল হবে?

প্রিয় ভাই! মাক্কী যিন্দেগীর দোহাই দিয়ে আমরা অন্য কোনো আমল কেন বাদ দেই না? বুঝা গেল, মাক্কী যিন্দেগীর দৃষ্টান্ত শুধু জিহাদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়।

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে হেফাযত করুন এবং দ্বীনের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

• তাবলীগের অনুমতি পেয়ে যাওয়াই কি জিহাদ পরিত্যাগের জন্য যথেষ্ট?

এই প্রশ্নের জবাবে হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল মালেক সাহেব দা.বা. 'কিতাবুল জিহাদ' কিতাবের ভূমিকায় ৪০-৪৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেন- ('কিতাবুল জিহাদ' কিতাবের লিংক: https://archive.org/details/kitabuljihad_202210)

কোনো কোনো ভাইয়ের এমন ভুল ধারণাও আছে যে, কোনো অমুসলিম সরকার তার দেশে তাবলীগের অনুমতি দিলে তাদের সাথে ইক্বদামী (আক্রমণাত্মক) জিহাদ করা জায়েয নয়! এ জাতীয় ভুল ধারণার শিকার এক ব্যক্তি হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তক্বী উসমানী (দাঃ বাঃ)-কে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেন। হযরত মাওলানা পত্র লিখকের ভ্রান্তি দূর করেন এবং এ বিষয়ে শরয়ী নির্দেশনার ব্যাপারে তাকে অবহিত করেন। তাঁর পুরো উত্তর 'ফিক্বহী মাক্বালাত" খণ্ড ৩ পৃঃ ২৮৭-৩০৪ এ মুদ্রিত আছে। প্রিয় ভাই! হযরতের উত্তরের নির্বাচিত অংশ আপনাদের সামনে পেশ করা হল:

"আপনি জিহাদের ব্যাপারে যা লিখেছেন তার সারাংশ আমি এই বুঝি যে, কোনো অমুসলিম সরকার তার দেশে তাবলীগের অনুমতি প্রদান করলে অতঃপর তার সাথে আর জিহাদ করা জায়েয থাকে না। যদি এই আপনার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে আমি আপনার সাথে একমত নই। ইসলাম প্রচারের পথে প্রতিবন্ধকতা শুধু এই নয় যে, সরকার ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে আইনী নিষেধাজ্ঞা জারী করে, বরং মুসলমানদের বিপরীতে কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র অধিক প্রতিপত্তির মালিক হওয়াও দ্বীনে হক্ব এর প্রচারে অনেক বড় বাধা। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে তাবলীগের ব্যাপারে কোনো আইনী নিষেধাজ্ঞা নেই, কিন্তু পৃথিবীতে তাদের বর্তমান প্রতিপত্তির কারণে বিশ্বব্যাপী সাধারণভাবে এমন একটি মানসিকতা তৈরি হয়ে গেছে যা সত্য প্রচারের ব্যাপারে কোনো আইনী নিষেধাজ্ঞার চেয়ে কোনো অংশে কম নয় বরং বেশি। এজন্য কাফেরদের প্রতিপত্তি চুরমার করা জিহাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম। যাতে করে তাদের বিদ্যমান এই প্রতিপত্তির কারণে যে মানসিক ভীতি (ও প্রভাব) মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তা দূরীভূত হয় এবং সত্য গ্রহণের পথ উন্মুক্ত হয়। যতদিন পর্যন্ত তাদের এই প্রতিপত্তি বজায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত মানুষের মনে এই ভীতিও অটুট থাকবে এবং দ্বীনে হক্ব কবূল করার জন্য পুরোপুরি অগ্রসর হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভপর হবে না।

অতএব জিহাদ জারী থাকবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। [সুরা তাওবা - ৯:২৯]

উপর্যুক্ত আয়াতে ততদিন পর্যন্ত ক্বিতাল জারী রাখার আদেশ করা হয়েছে যতদিন না কাফেররা অবনত হয়ে জিযিয়া প্রদান করে। যদি ক্বিতালের উদ্দেশ্য শুধু তাবলীগের আইনী অনুমতি অর্জনই হত তবে বলা হত, 'যাবত না তারা তাবলীগের অনুমতি প্রদান করে'। কিন্তু জিযিয়া ওয়াজিব করা এবং এর পাশাপাশি তাদের অবনত হওয়ার উল্লেখ এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তাদের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করাই আসল উদ্দেশ্য, যাতে কুফরের রাজনৈতিক প্রভুত্বের কারণে ভীতির যে পর্দায় মনমানস আচ্ছন্ন হয়ে আছে তা উন্মোচিত হয়, অতঃপর মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি স্বাধীন ও মুক্ত মনে চিন্তা করার সুযোগ ঘটে। ইমাম রাযী রহ. এই আয়াতের আলোচনায় তাফসীরে কাবীরে বলেন,

لَيْسَ الْمَقْصُوْدُ مِنْ أَخْذِالْجِزْيَةِ تَقْرِيْرُهُ عَلَى الْكُفْرِ- بَلِ الْمَقْصُوْدُ مِنْهَا حَقْنُ دَمِهِ، وَإِمْهَالُهُ مُدَّةً، رَجَاءَ أَنَّهُ رُبَّمَا وَقَفَ فِي هٰذِهِ الْمُدَّةِ عَلَى مَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ، وَقُوَّةِ دَلَائِلِهِ، فَيَنْتَقِلُ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمَانِ ..... فَإِذَا أُمْهِلَ الْكَافِرُ مُدَّةً وَهُوَ يَشْهَدُ عِزَّالْإِسْلَامِ، وَيَسْمَعُ دَلَائِلَ صِحَّتِهِ، وَيُشَاهِدُ الذِّلَّ وَالصِّغَارَ فِي الْكُفْرِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْمِلُهُ ذٰلِكَ عَلَى الْاِنْتِقَالِ إِلَى الْإِ سْلَامِ، فَهَذَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ مِنْ شَرْعِ الْجِزْيَةِ-

'জিযিয়ার উদ্দেশ্য কাফেরকে কুফরীর হালতে বাকী রাখা নয়, বরং উদ্দেশ্য হল তাকে বাঁচিয়ে রেখে কিছু দিন সময় দেওয়া, যে সময়ের মধ্যে তার ব্যাপারে এই আশা হবে যে, সে ইসলামের সৌন্দর্য অবলোকন করে কুফর থেকে ইসলামের দিকে আসবে.......। অতএব যখন কাফেরকে কিছু দিন সময় দেওয়া হবে এবং সে ইসলামের প্রভাব দেখবে, তার সত্যতার দলীলসমূহ শুনবে এবং কুফরের লাঞ্ছনা দেখবে তখন এইসব বিষয় তাকে ইসলামের প্রতি অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবে। বস্তুতঃ জিযিয়া বিধিবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য এটিই।'

দ্বিতীয় যে বিষয়টি ভাবার তা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবায়ে কেরামের যুগে কোথাও কি একটি নযীরও এমন পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবায়ে কেরাম কোনো রাষ্ট্রে জিহাদের পূর্বে কোনো তাবলীগী মিশন পাঠিয়েছেন এবং অপেক্ষা করে দেখেছেন যে, তারা তাবলীগী কাজ কর্মের অনুমতি দেয় কিনা? অতঃপর তাবলীগী কাজের অনুমতি দানে অস্বীকৃতি জানানোর ক্ষেত্রেই শুধু জিহাদ করেছেন?....... বলা বাহুল্য এমনটি কখনো হয়নি। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এছাড়া আর কী ফলাফল বের করা সম্ভব যে, শুধু তাবলীগের অনুমতি লাভ করাই উদ্দ্যেশ্য ছিল না। অন্যথায় বহু রক্তক্ষয়ী লড়াই শুধু এই এক শর্ত দিয়েই বন্ধ করা সম্ভপর হত যে, মুসলমানদের তাবলীগের ব্যাপারে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। কিন্তু অন্তত অধমের সীমাবদ্ধ অধ্যয়নে পুরো ইসলামী ইতিহাসের কোথাও এমন একটি ঘটনাও নেই যাতে এটুকু সুযোগ চেয়ে লড়াই বন্ধ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ এর পরিবর্তে কাদেসিয়ার যুদ্ধের সময় মুসলমানগণ জিহাদ করার পিছনে নিজেদের যে উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেছিলেন তা ছিল এই-

وَإِخْرَاجُ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ

'মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে নিয়োজিত করা।' (কামিল, ইবনে আসীর খণ্ড ২, পৃ. ১৭৮)
অনুরূপ কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّه

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা শেষ হয়ে যায়; এবং যে সময় বিজয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যায়। [সুরা আনফাল - ৮:৩৯]

এই আয়াতের তাফসীরে আমার পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. লিখেন-
'দ্বীন অর্থ বিজয় ও কর্তৃত্ব। এই অর্থে আয়াতের তাফসীর এই হবে যে, মুসলমানদের জন্য কাফেরদের সাথে ঐ সময় পর্যন্ত লড়াই জারী রাখা উচিত যতক্ষণ না মুসলমানগণ তাদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ হয়ে যায় এবং দ্বীনে ইসলামের বিজয় অর্জিত হয়, যাতে সে অন্যদের অত্যাচার থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে পারে।'
'এই তাফসীরের সারকথা হল, মুসলমানদের উপর ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দুশমনদের সাথে জিহাদ ও ক্বিতাল করা ওয়াজিব যতক্ষণ না মুসলমানদের উপরে তাদের অত্যাচারের ফিতনা বন্ধ হয় এবং ইসলাম সকল ধর্মের উপর বিজয়ী হয় এবং এই অবস্থা ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সৃষ্টি হবে, তাই জিহাদের বিধানও ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে।' [মা'আরিফুল কুরআন খণ্ড ৪, পৃ. ২৩৩]

মোটকথা, জিহাদের উদ্দেশ্য শুধু তাবলীগের আইনগত অনুমতি লাভ করা নয়, বরং কাফেরদের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করে মুসলমানদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা, যাতে একদিকে কোনো মুসলমানের প্রতি খারাপ দৃষ্টিতে তাকানোর সাহস তাদের না হয় এবং অন্যদিকে কাফেরদের প্রতিপত্তিতে ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ এই মানসিক ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে মুক্ত মনে ইসলামের সৌন্দর্য অনুধাবন করতে আগ্রহী হতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে এই বিষয়টিও ইসলামের হেফাজতের উদ্দেশ্যই পূর্ণ করে। এজন্য যে উলামায়ে কেরাম জিহাদের জন্য 'হেফাযতে'র শব্দ অবলম্বন করেছেন, তাদের উদ্দেশ্যও তাই। মনে রাখতে হবে কুফরের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করা ও ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা হেফাজতে ইসলামের একটি মৌলিক স্তম্ভ। অতএব এই মৌলিক স্তম্ভটিকে 'হেফাযত' এর আওতা থেকে কোনভাবেই বের করা যায় না।'

আমার মতে সকল বড় বড় আলেম জিহাদের উদ্দেশ্য এই বিষয়কেই সাব্যস্ত করেছেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস কান্দলবী রহ. লিখেন-

"জিহাদের আদেশ প্রদান করার পিছনে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, এক মুহূর্তে সকল কাফেরের প্রাণ সংহার করা হবে, বরং উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর দ্বীন পৃথিবীতে কর্তৃত্ববান হবে, মুসলমান মর্যাদার সাথে জীবন যাপন করবে এবং নিরাপত্তার সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে সক্ষম হবে। কাফেরদের ব্যাপারে এই আশংকা থাকবে না যে তারা দ্বীনের ব্যাপারে কোন অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। ইসলাম তার দুশমনদের অস্তিত্বের দুশমন নয়, বরং তাদের এমন প্রতিপত্তির দুশমন যা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য হুমকির কারণ হয়।" (সীরাতে মুস্তফা, খণ্ড ২ পৃ. ৩৮৮)
অন্যত্র লিখেন- "আল্লাহ তা'আলার বাণী-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّه

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা শেষ হয়ে যায়; এবং যে সময় বিজয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যায়। [সুরা আনফাল - ৮:৩৯]

এই আয়াতে এই ধরণের জিহাদই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হে মুসলমান জাতি! তোমরা কাফেরদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করতে থাক, যখন আর কুফরের ফিৎনা বিদ্যমান না থাকে এবং আল্লাহর দ্বীনের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আয়াতে ফিৎনা বলতে কুফরের শক্তি ও প্রতিপত্তির ফিৎনা উদ্দেশ্য। এবং وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ থেকে দ্বীনের বিজয় ও কর্তৃত্ব উদ্দেশ্য। অন্য আয়াতে এসেছে لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ অর্থাৎ দ্বীনের এ পরিমান শক্তি ও কর্তৃত্ব অর্জিত হবে যে, কুফুরী শক্তির সামনে তার আর পরাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না এবং দ্বীন ইসলাম কুফরের ফিৎনা থেকে পুরোপুরি নিরাপদ হয়ে যাবে। [প্রাগুক্ত খণ্ড ২ পৃ. ৩৮৬]

যদি শুধু তাবলীগের অনুমতি লাভের পর জিহাদের প্রয়োজন বাকী না থাকে তবে তো আজ দুনিয়ার অধিকাংশ দেশেই তাবলীগের অনুমতি আছে (এবং আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, অনুমতি না থাকলে কিছু মুসলিম দেশেই নেই) অতএব বলতে হবে এখন আর মুসলমানদের জন্য অস্ত্র ধারণ করার প্রয়োজন নেই। বিশ্ববাসীর মন মগজে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বসতে থাকুক, তাদেরই নীতিমালা প্রচলিত হতে থাকুক, বিধি-বিধানও তাদেরই চলুক, তাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা ও মতবাদই প্রচারিত হোক আর মুসলমানগণ শুধু এই নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকুক যে, ঐসব অমুসলিম দেশে আমাদের মুবাল্লিগগণের প্রবেশাধিকারতো আর বন্ধ হয় নাই! প্রশ্ন হয়, যে পৃথিবীতে কুফর তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের জয়ভেড়ী বাজিয়ে চলেছে সেখানে যদি আপনাকে তাবলীগের অনুমতি প্রদান করা হয়, তবে কয়জন লোক এমন পাবেন যারা এই তাবলীগকেই স্থির চিত্তে শোনার জন্য এবং তাতে চিন্তা ফিকির করার জন্য প্রস্তুত হবে?

যে পরিবেশে রাজনৈতিক শক্তি ও ক্ষমতার সাহায্যে ইসলাম ও তার শিক্ষার পুরো বিপরীত চিন্তা ভাবনা পূর্ণ শক্তিতে প্রচারিত হচ্ছে এবং এসবের প্রচারের জন্য এমন সব মাধ্যমও ব্যবহৃত হচ্ছে যা মুসলমানদের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়, সেখানে তাবলীগের অনুমতি লাভ হলেও তা কী পরিমাণ ফলদায়ক হতে পারে?

হ্যাঁ যদি ইসলাম ও মুসলমানদের এমন শক্তি সামর্থ অর্জিত হয়ে যায় যার মোকাবেলায় কাফেরের শক্তিমত্তা পরাস্ত হয় বা অন্তত তারা ঐ ফিৎনা সৃষ্টি করতে সক্ষম না হয় যা ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে তো সেক্ষেত্রে অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে নিরাপত্তা চুক্তির মাধ্যমে শান্তি বজায় রাখা জিহাদের বিধানের পরিপন্থি নয়। অনুরূপ যে পর্যন্ত কুফরের প্রতিপত্তি নির্মূল করার মত প্রয়োজনীয় শক্তি মুসলমানদের অর্জিত না হয় ততদিন পর্যন্ত শক্তি অর্জনের পাশাপাশি অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়াও নিঃসন্দেহে জায়েয। মোটকথা অমুসলিমদের সাথে শান্তি চুক্তি দুই অবস্থায় হতে পারে।

ক. যে সব রাষ্ট্রের শক্তি মুসলমানদের শক্তির জন্য বিপজ্জনক নয় তাদের সাথে সন্ধিমূলক ও নিরাপত্তা চুক্তি করা যেতে পারে, যাবৎ না তারা দ্বিতীয়বার মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

খ. মুসলমানদের কাছে সশস্ত্র জিহাদের সামর্থ না থাকলে সামর্থ অর্জিত হওয়া পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ থাকা যেতে পারে।"
[ফিকহী মাক্বালাত, খণ্ড ৩ পৃ: ৩৫১]

• জিহাদের বিধান কি বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে ছিল?

এই প্রশ্নের জবাবে হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল মালেক সাহেব দা.বা. 'কিতাবুল জিহাদ' কিতাবের ভূমিকায় ৪৭-৫১ নং পৃষ্ঠায় লিখেন-

"জিহাদের হাকীকত, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও এর বিধানাবলী সম্পর্কে যিনিই অবহিত হবেন তিনিই নিঃসংশয় হবেন যে, জিহাদ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ 'আলমী ইসলাহী' (আন্তর্জাতিক সংশোধনমূলক) দায়িত্ব, জিহাদের ফরযিয়্যত এখনও বাকী আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে এবং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট অতি পছন্দনীয় আমল সমূহের অন্যতম।

ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। [সুরা তাওবা - ৯:২৪]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ۝١٠ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝١١ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে উত্তম ব্যবসার সন্ধান দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বুঝ। আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। আর এটাই মহাসাফল্য।" (সূরা আস সাফ ৬১: ১০-১২)

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل

"সে সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জান! অবশ্যই আমি আশা করি: আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাব এবং এতে শহীদ হয়ে যাব, এরপর আবার জিহাদে যাব এবং আবার শহীদ হবো, এরপর আবার জিহাদে যাব এবং আবার শহীদ হয়ে যাবো।" (বুখারী-৩১২৩ এবং মুসলিম-১৮৭৬)

মোট কথা, জিহাদের ফযীলত সংক্রান্ত আয়াতে কুরআনের পৃষ্ঠাসমূহ পরিপূর্ণ এবং শত শত সহীহ হাদীসে এর ফযীলত উল্লেখিত হয়েছে।

কিন্তু ইসলামী শিক্ষা ও নির্দেশনা থেকে দূরত্বের কারণে অথবা না জানি অন্য কী কারনে কোন কোন লোককে বলতে শোনা যায় যে, 'যেহেতু তখন ক্বিতাল ছাড়া ক্ষমতার পট পরিবর্তনের অন্য কোনো মাধ্যম ছিলনা, তাই ইসলাম এই পন্থাটিকেই বহাল রেখেছে; কিন্তু বর্তমান অবস্থা ভিন্ন' অর্থাৎ এখন রাজনৈতিক কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ক্ষমতা দখল করে পৃথিবীতে ইসলামের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব স্থাপন সম্ভব। অতএব এখন জিহাদের প্রয়োজন নেই। জিহাদের বিধান মানসুখ বা রহিত হয়ে যাওয়াই উচিত।' (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

কেউ কেউ তো এ ধারণাও প্রকাশ করেছে যে, 'যে সরকার তার নিজের দেশে দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি প্রদান করে তাদের সাথে ইক্বদামী বা আক্রমণাত্মক জিহাদ করা উচিত নয়, বিশেষত বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে, যখন সাম্রাজ্যবাদকে নিন্দার দৃষ্টিতে দেখা হয়, কিন্তু যখন রাজ্যজয়ের সাধারণ প্রচলন ছিল এবং এ বিষয়টি রাজ রাজড়ার কীর্তি ও গুণাবলির মধ্যে পরিগণিত হত তখনকার কথা ভিন্ন। যেসব ইক্বদামী জিহাদের ঘটনাবলীতে ইসলামী ইতিহাস পরিপূর্ণ তা সবই ঐ সময়কার।'

এই দুইটি মত যে ভ্রান্ত এবং কিতাব ও সুন্নাহর জিহাদ সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী এবং শরীয়তের ইজমায়ী বিধানাবলীর পরিপন্থি তা তো একেবারেই স্পষ্ট কিন্তু লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হল, এই দুই মতের মধ্যে অজান্তেই ইসলামী শরীয়তের প্রতি কত বড় অপবাদ আরোপ করা হল যে, একটি সাময়িক বা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট বিধানকে ইসলামী শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য চলমান একটি বিধান বানিয়ে দিয়েছে এবং তার এত এত ফাযাইল বর্ণনা করেছে এবং এর প্রতি এত বেশি উদ্বুদ্ধ করেছে, যদ্দরুন তা একটি সাময়িক বিধান নয়, বরং চিরন্তন বিধান হওয়া সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

আর দ্বিতীয় মতটিতো আরো বেশি ভয়াবহ। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাক্বী উসমানী (দা.বা.) এর ভাষায়, 'যদি এই মতটি ঠিক ধরে নেওয়া হয় তবে এর অর্থ এই হবে যে, কোন বস্তু ভালো বা মন্দ হওয়ার জন্য ইসলামের নিজস্ব কোনো মাপকাঠি নেই। যদি কোনো যুগে কোনো একটি মন্দ বিষয়কেও 'ভালো ও কীর্তিমূলক' গণনা করা হয় তবে ইসলামও তার অনুসরণ করে এবং যে যুগে মানুষ একে মন্দ মনে করে ইসলামও সেখানে থেমে যায়!

প্রশ্ন হল, 'ইক্বদামী জিহাদ' কোনো ভালো বিষয় কিনা? যদি ভালো হয় তবে মুসলমান এ থেকে শুধু এজন্য কেন বিরত থাকবে যে, আজকাল সাম্রাজ্যবাদকে নিন্দার দৃষ্টিতে দেখা হয়? আর যদি বিষয়টি আসলেই ভালো না হয় তবে বিগত সময়ে ইসলাম কেন এ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে নাই? ইসলাম কি শুধু এজন্যই একে অবলম্বন করেছিল যে, তা রাজা বাদশার কীর্তির মধ্যে পরিগণিত হত?

আমার মতে, ইসলামী ইতিহাসের ইক্বদামী জিহাদসমূহের এই ব্যাখ্যা নিতান্তিই ভুল ও বাস্তবতাবিরোধী। বাস্তব কথা হল, কুফরের প্রতিপত্তি খর্ব করার জন্য ঐ যুগেও জিহাদ করা হয়েছে যখন তা "রাজ রাজড়ার কীর্তি হিসেবে পরিগণিত হত" কিন্তু তা এজন্য হয় নাই যে, ঐ যুগে তার ব্যাপক প্রচলন ছিল, বরং এজন্য ছিল যে, আল্লাহর দ্বীনের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই বিষয়টি বাস্তবিক পক্ষেই উপযোগী ও ভালো। অন্যথায় রাজা বাদশাহর বীরত্ব প্রদর্শনের মধ্যে তো এও পরিগণিত হত যে, তারা জয়ের নেশায় চুর হয়ে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরও রেহাই দিত না কিন্তু ব্যাপক প্রচলনের কারণে এসব বিষয়কে ইসলাম কখানো সমর্থন করে নাই, বরং লড়াইয়ের এমন সব বিধি-নিষেধ ও সীমা-রেখা নির্ধারণ করেছে এবং বাস্তবক্ষেত্রে তা অনুসরণ করে দেখিয়েছে যা তখনকার রাজা বাদশার কল্পনারও অতীত

ছিল বরং তা ঐসব নিপীড়িত মানবশ্রেণির জন্যও অকল্পনীয় ছিল যারা শুধু রাজা বাদশার এ জাতীয় জুলুম অত্যাচারে কেবল অভ্যস্তই ছিলনা বরং এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল।

যে উদ্দেশ্যে ইক্বদামী জিহাদ অতীতে জায়েয ছিল ঠিক সেই একই উদ্দেশ্যে আজও তা জায়েয এবং শুধু এজন্য এই বৈধতাকে আড়াল করার কোনো অর্থ নেই যে, "এটম বোমা" ও "হাইড্রোজেন বোমা" আবিষ্কার ও উৎপাদনকারী শান্তিপ্রিয়(?) ব্যক্তিবর্গ একে নিতান্তই অপছন্দ করেন এবং এতে ঐসব মহান(?) ব্যক্তিবর্গের নাক-মুখ কুঁচকে যায়, যাদের নিক্ষিপ্ত গোলামীর জিঞ্জিরে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ জাতির শরীর রক্তে রঞ্জিত।

মূলতঃ এই বিষয়টিও কুফরের প্রভাব প্রতিপত্তিরই অবাঞ্ছিত ফলাফল বলে আমার বিশ্বাস যে, মানুষ ভালো মন্দ নির্ধারণের মাপকাঠিও এই বিশ্বব্যাপী প্রচারণাকেই বানিয়ে নিয়েছে যা দিনকে রাত ও রাতকে দিন করে মানুষের মন মগজে স্থাপন করছে এবং শুধু অমুসলিমই নয় খোদ মুসলমানরাও এই প্রচারণায় কাবু হয়ে নিজেদের দ্বীন ও ধর্মের বিধানাবলীর ব্যাপারে ওজরখাহীর পথ অবলম্বন করতে আরম্ভ করেছে। যদি অন্যায়, অসত্যের এই প্রতিপত্তিকে চুরমার করা "সাম্রাজ্যবাদের" সংজ্ঞায় আসে তবে এ জাতীয় সাম্রাজ্যবাদের অভিযোগ পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে মাথা পেতে গ্রহণ করা উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, আমরা ঐসব অভিযোগকারীদের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে যাব এবং বলব, জনাব! যখন আপনি ইক্বদামী জিহাদকে নন্দিত মনে করতেন তখন আমরাও তা ভালো মনে করতাম এবং তা কর্মে রূপ দিতাম এবং যখন আপনি আপনার লিখনীতে এবং শুধুই লিখনীতে একে মন্দ বলছেন এবং শুধুই বলছেন তখন আমরাও একে নিন্দিত মনে করছি এবং নিজেদের জন্য একে হারাম করে নিচ্ছি। এ জাতীয় চিন্তারীতির সাথে একমত হওয়া এই অধমের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়।" [ফিকহী মাক্বালাত, খঃ ৩ পৃ. ৩০২-৩০৫]

মোটকথা, জিহাদের উভয় প্রকার, ইক্বদামী ও দিফায়ী ইসলামের চিরন্তন ফরযসমূহের অন্যতম। যতদিন পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠে কুফর ও শিরকের প্রভাব প্রতিপত্তির ফিৎনা বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত সত্য-ন্যায়ের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য জিহাদের দায়িত্বও অবশ্য-পালনীয় থাকবে।

রাসূলুল্লাহ সাﷺ. ইরশাদ করেছেন,

اَلْجِهَادُ مَاضٍ مِنْهُ بَعَثَنِيَ اللهُ إِلى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِى الدَّجَّالَ، لَا يُبْطِلُه عَدْلُ عَادِلٍ وَلَا جَوْرُ جَائِرٍ

"আমার প্রেরিত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে আমার উম্মতের শেষ ভাগ দাজ্জালের সাথে লড়াই করা পর্যন্ত জিহাদ চলমান থাকবে। কোন ন্যায়পরায়ণ শাসকের ন্যায়পরায়ণতা এবং কোনো জালেমের জুলুম একে রহিত করবে না।" [সুনানে আবু দাউদ ১/৩৪৩]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিকভাবে বুঝার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন।

ইসলাহী মেহনত করনেওয়ালা সাথীদেরকে শয়তানের ধোঁকা:

• এটি আমাদের কেমন বিচার!

আমরা যারা ইসলাহী মেহনত করি, তারা কেউ কেউ মনে করি, যারা নিজেদের সোহাগিনী ও প্রাণ-প্রিয়া স্ত্রীদের ছেড়ে, কলিজার টুকরা আদরের সন্তানদের ছেড়ে, মমতাময়ী মায়ের আচলকে উপেক্ষা করে, পিতার স্নেহ হতে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে, খেয়ে না খেয়ে, পরে না পরে, গুহার আঁধারে রাত্রিযাপন করে, জিহাদের তপ্ত ময়দানে নিজের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিচ্ছে, তারা ছোট জিহাদ (জিহাদে আসগর) করছে; আর আমরা যারা স্ত্রী সন্তান-পিতা-মাতা নিয়ে আনন্দ-ফূর্তিতে লিপ্ত, তিন বেলা পেট পুরে আহার করছি, ফ্যান-এসি, গ্যাস-বিদ্যুৎ আর রঙ-বেরঙের আলোকসজ্জায়, সকল সুবিধা নিয়ে শহরের পাকা বাড়িতে মজ-মাস্তি করছি, আর যেহেতু আমি অমুক পীর সাহেবের হাতে বাইয়াত হয়েছি, নফসের মুজাহাদা করছি, তাই আমি বড় জিহাদ (জিহাদে আকবর) করছি।

প্রিয় ভাই! একটু চিন্তা করে দেখুন তো, কেমন বিচার আমাদের!

যেই হাদীসটির উপর ভিত্তি করে এই দাবী করা হয়, তা হল-
বলা হয় যে, নবীজী ﷺ এক জিহাদ হতে ফিরে এসে বলেছিলেন,

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ قَالُوْا وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرِ قَالَ جِهَادُ الْقَلْبِ

"আমরা জিহাদে আসগর/ময়দানের জিহাদ হতে জিহাদে আকবর/বড় জিহাদের দিকে ফিরে এলাম।" সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! বড় জিহাদ কোনটি? তিনি ﷺ বললেন, কলবের তথা অন্তরের জিহাদ।" অথচ, অনেক উলামায়ে কেরামের মতে এটি একটি জাল হাদীস; আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, এই হাদিসের কোন ভিত্তি নেই। (তানজীমুল আশতাত, খণ্ড ১, পৃ. ৬৯; তাফসীরে বাইযাবি)

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, এটি কোন হাদীস-ই নয়, বরং এটি ইবরাহীম ইবনে আবলাহ্ নামক এক ব্যক্তির বাণী। (মাওযুআতে কুবরা, মোল্লা আলী ক্বারী রহ.,পৃ. ১২৭)

তারপরও যদি ধরে নেই এটি একটি হাদীস, তথাপি সেই হাদীসের অর্থ না বুঝে, আমরা এতবড় একটা অবিচার দ্বীনের মুজাহিদীনদের সাথে করতে পারি না, তাদের উপর এমন একটি অপবাদ চাপিয়ে দিতে পারি না- "তারা ময়দানে ছোট জিহাদ করছে আর আমরা ঘরে বসে বড় জিহাদ করছি।" এই ব্যাপারে আমি নিজে কিছু বলতে চাইনা। কেননা, এই ব্যাপারে আমি কিছু বললে, সালেকীন ভাইয়েরা হয়ত আমার কথা গ্রহণ নাও করতে পারেন, তাই এই ব্যাপারে পীর-মুরীদীর লাইনে শীর্ষ একজন আলেম, যিনি হিন্দুস্তানে আধ্যাত্মিক মেহনতের রাহবার, হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত শাহ আশরাফ আলী থানবী রাহিমাহুল্লাহর এই ব্যাপারে একটি বিখ্যাত উক্তি আছে সেটিই উল্লেখ করতে চাই।

তিনি বলেন,

آج کال عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قتال مع الکفار جہاد اصغر ہے اور مجاہدۂ نفس جہاد اکبرہے گویا کہ قتال مع الکفار کو علی الا طلاق اس مجاہدۂ نفس سے جو خلوت میں ہودرجہ میں گھٹا ہوا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں بلکہ اس میں تفصیل ہے ، وہ یہ کہ قتال مع الکفار اگربلا اخلاص ہے تب تو واقع میں وہ مجاہدۂ نفس سے درجہ میں کم ہے، وہ مجاہدۂ نفس اس

سے افضل ہے، اور ایسے قتال مع الکفار کو جہاد اصغر اور اس کے مقابلہ میں مجاہدۂ نفس کوجہاد
اکبر کہا گیا
لکین قتال مع الکفار اخلاص کے ساتھ ہو تو ایسے حالت میں قتال مع الکفار کو جہاد اصغر کہنا غیر
محققین صوفیہ کا گلو ہے بلکہ ایسا قتال مع الکفار جہاد اکبر ہی ہے، اور ایسا قتال اس مجاہدۂ نفس
سے جو خلوت میں ہو افضل ہے، کیونکہ جو قتال مع الکفار اخلاص کے ساتھ ہوغا وہ مجاہدۂ نفس کو
بھی شامل ہوگا،ایسے قتال کے اور دونوں جہاد کی فضیلت جمع ہو جائیگی-) الا فاضت الیومیہ جلد۴
قط ۸۲ ملفوظ۱۰۴۱

"আজকাল সাধারণভাবে মানুষের ধারণা এই যে, কাফেরদের সাথে লড়াই করা জিহাদে আসগর (ছোট জিহাদ) এবং নফসের মুজাহাদা (কুপ্রবৃত্তির দমন ও আত্মশুদ্ধি) জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ)। যেন তারা নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে কাফেরদের সাথে লড়াই করাকে সকল ক্ষেত্রেই নিম্নমানের মনে করে। এই ধারণা ঠিক নয়। বরং বাস্তব কথা হলো, কাফেরদের সাথে লড়াই করা ইখলাস শূন্য হলে বাস্তবিকপক্ষেই তা নফসের মুজাহাদা থেকে নিম্নমানের কাজ। এ ধরণের লড়াইকেই জিহাদে আসগর এবং বিপরীতে নফসের মুজাহাদাকে জিহাদে আকবর বলা হয়েছে।

কিন্তু কাফেরদের সাথে লড়াই যদি ইখলাসপূর্ণ হয় তবে এই লড়াইকে জিহাদে আসগর বলা গাইরে মুহাকক্বিক (অগভীর জ্ঞানের অধিকারী), সুফীদের বাড়াবাড়ি, বরং এই লড়াই অবশ্যই জিহাদে আকবর এবং তা (ময়দানে ইখলাসের সাথে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ করা) নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে উত্তম। কেননা যে লড়াই ইখলাসপূর্ণ হবে তাতে নফসের মুজাহাদাও বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং এতে উভয় জিহাদের ফযীলতই একত্রিত হচ্ছে।" (আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ খঃ ৪, হিস্সা: ৫, পৃঃ ৮২, মালফূয, ১০৪১)

প্রিয় ভাই! সবচেয়ে বড় কথা হলো, সাহাবায়ে কেরাম আমাদের মতো কোনো দিন 'জিহাদে আকবরের' ওযর দেখিয়ে সশস্ত্র জিহাদকে ত্যাগ করে ঘরে বসে থাকেননি, আর মনে করেননি যে, আমরা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করেই ময়দানের সওয়াব হাছিল করছি।

• জিহাদ-ই উম্মতে মুহাম্মাদীর সন্ন্যাসবাদ!

প্রিয় ভাই! আমরা যারা সুলূকের (আত্মশুদ্ধির) লাইনে মেহনত করে থাকি, তারা একটু খেয়াল করি, হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহিমাহুল্লাহর "যে লড়াই ইখলাসপূর্ণ হবে তাতে নফসের মুজাহাদাও বিদ্যমান থাকবে।"-এ কথার ব্যাখ্যা কী?

আমরাতো নফসের সাথে কম খাওয়া, কম ঘুমানো, কম কথা বলা, কম মিলামিশা করা ইত্যাদির মেহনতই করে থাকি, যেন আমাদের নফস দুর্বল হয়, আমরা গুনাহমুক্ত হতে পারি, তাইনা?

আমরা যখন জিহাদের ময়দানে থাকব, তখন স্বাভাবিক ভাবেই খাবার দাবারের কষ্ট করতে হবে, নিজের বাসার মত হয়তো এতটা সুখের হবে না! (এটি হলো কম খাওয়ার মেহনত)।

ময়দানে আমাকে 'রিবাত' তথা সীমানা পাহারা দেয়া, কিংবা ছামানা ও অস্ত্র-শস্ত্র পাহারা দেয়া, নৈশকালীন অভিযান, এক স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে গমন, নরম বিছানা নেই, মাটি কিংবা পাথরের উপর পিঠ স্থাপন, ফ্যান-এসির অভাব, পোকা-মাকড় ও মশার কামড়, যে কোনো সময় শত্রুর আক্রমণ/বোম্বিং-এর ভয় ইত্যাদি সবকিছু মিলে আমি খুব কমই হয়ত শান্তি বা পরিপূর্ণ তৃপ্তির ঘুম ঘুমাতে পারব! (এ হলো কম ঘুমানোর মেহনত)।

ময়দানে যখন আমি সর্বদা মাথার উপর মৃত্যুকে দেখব, তখন আমার পেট থেকে খোশগল্প বের হবে না। বরং সর্বদা আমার ক্বলবে জিকির জারি থাকবে। সেই সময়টির কথা একটু কল্পনা করুন তো ভাই, যখন একটু পরেই আমরা কোনো অভিযানে বের হব। ফিরে আসতে পারবো কিনা গ্যারান্টি নেই। হয়ত আজকের দিনটিই আমার যিন্দেগীর শেষ দিন। হয়ত এই ওয়াক্তের নামাযটাই আমার জীবনের শেষ নামায। প্রতি পদে পদে মৃত্যুর হাতছানি! তখন আমার থেকে কি অহেতুক খোশগল্প আর আজেবাজে কথা আশা করা যায়? আমার চেহারায় কি গাম্ভীর্য ফুটে উঠবে না? এটি 'নিরহঙ্কারপূর্ণ গাম্ভীর্য'। (এই হলো কম কথা বলা এবং অধিক পরিমানে আল্লাহর জিকির ও মৃত্যুর স্মরণ করার মেহনত)।

আর ময়দানে আসার আগে আমি তো আমার স্ত্রী-সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা-বন্ধু-বান্ধব ছেড়েই আসব, তাইনা? তাহলে অধিক মেলামেশার সম্ভাবনা কোথায়? ময়দানের সাথীদের সাথে যে মিলামিশা হবে সেটি তো হবে নিয়ন্ত্রিত। (এটি হলো কম মিলা-মিশার মেহনত)।

ময়দানে তো আমরা রাস্তা-ঘাটের বেপর্দা মহিলাদের কম দেখবো, গান-বাদ্য আর অশ্লীল কথা শুনবো না, কম খাওয়া আর কম ঘুম, চব্বিশ ঘন্টা মৃত্যু ও আখিরাতের চিন্তা, এসব পারিপার্শ্বিকতার চাপে পড়ে আমার নফস্ এমনি 'সোজা' হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। আলাদা ভাবে নফসের মুজাহাদার প্রয়োজন পড়বে না। তাছাড়া ময়দানে আমি যখন নিজের চোখে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য দেখব, দেখব যে শহীদদের লাশ পঁচে-গলে যাচ্ছে না, রক্ত লাল কিন্তু ঘ্রাণ অপার্থিব কোনো মেশকের, হাস্যোজ্জ্বল শুহাদাদের চেহারা, চিন্তা করুন তো, তখন আমার ঈমান কেমন হবে? এগুলো কি ঘরে বসে থেকে অর্জন করা সম্ভব, ভাই? কক্ষনো নয়।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم :إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

আবু উমামাহ রাদি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সন্ন্যাসী জীবন অবলম্বনের অনুমতি দিন। নবী করীম ﷺ বললেন, "আমার উম্মতের সন্ন্যাসবাদ হল- মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৪৮৬)

অর্থাৎ বৈরাগ্য সাধনার জন্য, কৃচ্ছ্রতা সাধনের জন্য চিরকুমার সেজে, পরিবার পরিজন ছেড়ে, খাল্ওয়াতের (একাকীত্বের) উদ্দেশ্যে বনে জঙ্গলে পাড়ি জমানোর প্রয়োজন এই উম্মতের নেই। জিহাদের মাঝেই রয়েছে উম্মতের জন্য বৈরাগ্য। বৈরাগ্য সাধনার সকল উপাদান জিহাদে বর্তমান রয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এটিই উম্মতের জন্য শ্রেষ্ঠ কৃচ্ছ্রতার সাধনা।

• সেই সময়টির কথা মনে করুন তো!

প্রিয় ভাই! আমাদের জীবনে কখনো কি এমন একটি সময় এসেছে, যখন আমরা আমাদের প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছ থেকে চির বিদায় নিয়ে, কলিজার টুকরা সন্তানের মমতার গলায় ছুরি চালিয়ে, মায়ের আদরের কোলকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে, পিতার মমতাময় বুককে 'না' বলে আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর একটি ফরয হুকুম 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্'র জন্য ময়দানে পাড়ি জমিয়েছি? এসেছে কি এমন একটি কঠিন পরীক্ষার মুহূর্ত আমাদের জীবনে?? চেখে দেখেছি কি এমন একটি 'মৃত্যুযন্ত্রণাসম' অভিজ্ঞতা???

এমন একটি সময় যার জীবনে একবার এসেছে, সে অবশ্যই বুঝেছে, 'নফসের সাথে মুজাহাদা' নামক বস্তুটি কী জিনিস! জিহাদের জন্য যে কুরবানী পেশ করতে হয়, আর যা কিছু হারাতে হয়, তা তো সারা জীবনের জন্য হারানো! আর এই হারানোর বেদনাও আজীবনের!

অন্যদিকে, ঘরে বসে নফসকে যে সকল মুজাহাদার সম্মুখীন হতে হয়, তার কষ্ট তো ক্ষণস্থায়ী। আমি যতই একাকীত্ব অবলম্বন করি না কেন, আমার নফস জানে, দিন শেষে আমি আমার পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে আসবো। আমি যতই কম খাইনা কেন, আমার নফস জানে আমার এই সাধনা একদিন অবশ্যই শেষ হবে। আমি যতই কম ঘুমাই না কেন আমার নফস জানে একসময় আমি দুর্বল হয়ে প্রয়োজন মতো ঘুমাবোই।

কিন্তু জিহাদের ক্ষেত্রে???

হয়তো এই বের হওয়াই আমার জীবনের শেষ বের হওয়া। একটু চিন্তা করুন তো ভাই- আপনি পরিবার থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হচ্ছেন, হয়তো এই দেখাটাই শেষ দেখা, আপনার প্রাণপ্রিয়া স্ত্রীর উপর এই দৃষ্টিটিই শেষ দৃষ্টি! যাকে ছাড়া আপনার ঘুম আসতো না, যার দেহের পরশ ছাড়া আপনার শরীরের ক্লান্তি দূর হতো না, যাকে ছাড়া জীবনটাই ছিল অর্থহীন, বিস্বাদময়, যার সাহচর্যে অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি হতো, প্রেম-সাগরে ভালোবাসার জোয়ার বইত, নীরবে-নিভৃতে যার কাছে পাওয়া যেত জান্নাতের এক টুকরো সুখ, হায়! সেই প্রাণপ্রিয়া স্ত্রীকে ছেড়ে আজ আপনি আল্লাহর ডাকে তাঁর ফরয হুকুম পালনের জন্য বেরিয়ে যাচ্ছেন। কেমন লাগছে আপনার??

আপনার স্ত্রীও জানে- হয়ত আপনাকে শেষবারের মতো বিদায় দিচ্ছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না করছে, কান্নার কারণে মুখে কথা বের হচ্ছে না, আঁচল দিয়ে বারবার চোখ মুছছে, নিজের ও সন্তানদের অনিশ্চিত ভবিষ্যত আর প্রিয়জন হারানোর চিন্তায় তারও তনুমন আচ্ছন্ন, আপনাকে চিরবিদায় দিয়ে দরজা বন্ধ করে আপনার মানিকদের বুকে নিয়ে আপনার স্ত্রীর বুকফাঁটা কান্নার শব্দ কি কখনো শুনেছেন ভাই???

দেখেছেন কি আপনার কলিজার টুকরা সন্তানদের সেই সময়টির চেহারা, যখন তারা হয়ত বুঝতে পারছে না কী ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু আপনার স্ত্রীর কান্না থেকে কিছুটা হয়তো আঁচ করতে পারছে! আপনাকে হয়ত জিজ্ঞেস করেছিল, আব্বু, তুমি কোথায় যাচ্ছ? আপনি হয়তো তাদেরকে বুঝ দিলেন, মানিকেরা আমার! খুব শীঘ্রই তোমাদের জন্য মজার জিনিস নিয়ে ফিরে আসবো। কিন্তু আপনি জানেন যে, মজার জিনিস নিয়ে হয়তো আর ফিরা হবে না। হয়তো দেখা হবে আরশের নিচে, নয়তো বা মজার জিনিস পাওয়া হবে খোদা তা'আলার জান্নাতে। তখন আপনার কলিজা ছেঁড়া সে ব্যথার কথা কি আপনার মনে আছে??

প্রিয় ভাই! আমাদের সলাত, আমাদের কুরবানী, আমাদের হায়াত, আমাদের মওত- সবকিছু বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্যই নিবেদিত।

সত্য বলতে কি ভাই, জিহাদের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে কুরবানী আর ত্যাগ তিতিক্ষার নজরানা আল্লাহ্ জাল্লা শা-নুহুর দরবারে পেশ করা হয়, তার তুলনা অন্য কোনো কুরবানী আর মেহনতের সাথে হতেই পারে না!.............

• আরে ভাই, আমরা এখন ইখলাস বানানোর মেহনত করছি!

কোনো কোনো ভাই বলেন, 'আমরা এখন ইখলাস বানানোর মেহনত করছি। ইখলাস তৈরি হয়ে গেলে আমরা জিহাদ করবো।'

তাহলে আমি বলবো, ভাই! এটি শয়তানের একটি ধোঁকা, এই চিন্তা করলে আমার দ্বারা জিহাদ কস্মিনকালেও সম্ভব

হবে না। কেননা ইখলাসের কোনো বাহ্যিক সূরত নেই, যা দেখে আমরা বুঝতে পারবো, আমার ইখলাস অর্জন হয়ে গেছে।

আমি যখন বললাম, "আমি আল্লাহর জন্য জিহাদ করছি" আর আমার ভিতর ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, র‍্যাংক, পদ-পদবী, মালে গনিমত, বীর খেতাব লাভ করার অভিলাষ নেই, কেবলই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা, তাঁর হুকুম পালন, আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ, সাহাবায়ে কেরামের অনুকরণ, নির্যাতিত মুসলমানদের উদ্ধার করা, দুনিয়া থেকে ফেতনা ও বদদ্বীনী মিটানো, আল্লাহ্ তা'আলার একটি ফরয বিধান বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে জিহাদ করব, কেউ আমাকে চিনুক বা জানুক এই আশা করিনা, তখন এটিই ইখলাস। এর জন্য তো ভাই বছরের পর বছর মেহনত করার কোনো দরকার নেই!

কখনো মনে উল্টা-পাল্টা চিন্তা এলে সাথে সাথে তাওবা করে নেয়া। যেমনটি আমরা সবসময় বলে থাকি- প্রত্যেক আমলের শুরুতে, মাঝে এবং শেষে নিজের নিয়তকে যাচাই করি। "যদি সেটি আল্লাহর জন্য হয় তাহলে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে আমলটি চালু রাখি। আর যদি নিয়তে কোনো সমস্যা মনে হয়, তাহলে সাথে সাথে 'আসতাগফিরুল্লাহ্' পড়ে নেই এবং নিয়ত সংশোধন করে আমলটি করতে থাকি।"

প্রিয় ভাই! ইখলাস অর্জনের এই উসুলটি আমরা কেন জিহাদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করিনা?
জিহাদের জন্য পৃথকভাবে 'বিশেষ' ইখলাস অর্জন করতে হবে, এমনটি শরীয়তে কোথাও নেই!

প্রিয় ভাই! একটু চিন্তা করি- "ইখলাস তৈরির মেহনত করছি" বলে জিহাদ ত্যাগ করলে আল্লাহ তা'আলা কি আমাদেরকে ছেড়ে দিবেন? আল্লাহ্ তা'আলা কি তাঁর ফরয হুকুমের ব্যাপারে এমনি এমনি ছেড়ে দিবেন?

إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيۡـًٔاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ

"তোমরা যদি (তাঁর পথে জিহাদের জন্য) বের না হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন (দুনিয়াতে লাঞ্ছনা ও কুফ্ফারদের চাপিয়ে দিয়ে আর আখিরাতে জাহান্নাম দিয়ে) এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দিবেন, তোমরা তার কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (০৯ সূরা তাওবা: ৩৯)

وَلَنَبۡلُوَنَّكُمۡ حَتَّىٰ نَعۡلَمَ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبۡلُوَاْ أَخۡبَارَكُمۡ

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের মধ্যে জিহাদকারীকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ (অবস্থা ও কর্মকাণ্ড) যাচাই করি।" (৪৭ সূরা মুহাম্মাদ:৩১)

أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّا يَعۡلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمۡ وَيَعۡلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ

"তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ তা'আলা এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্য্যশীল।" (৩ সূরা আলে ইমরান: ১৪২)

• এই গুনাহে কবীরা থেকে কি আমাদের বাঁচতে হবে না?

প্রিয় ভাই আমার!

শুধু কি চোখের গুনাহ্ই কবীরা গুনাহ্? জিহাদ তরক করা কি গুনাহে কবীরা নয়? এই গুনাহের ইসলাহ করবে কে? এই গুনাহ থেকে বাঁচার মেহনত করবে কে ভাই?

শুধু কি কানের গুনাহ্ই কবীরা গুনাহ্? জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা কি গুনাহে কবীরা নয়? এই গুনাহ হতে বাঁচার 'মুজাহাদা' করবে কে ভাই?

কাপুরুষতা কি গুনাহ নয়? অন্তরে 'গাইরুল্লাহর ভয় দূর করা'র জন্য আমরা কোনো তরীকা অবলম্বন করেছি কি ভাই?

শুধু কি মনের গুনাহ্ই কবীরা গুনাহ্? জিহাদের প্রস্তুতি না নেয়া কি গুনাহে কবীরা নয়? এটি কি অন্তরে নিফাক থাকা'র অন্যতম একটি আলামত নয়? তাই, এই গুনাহ হতে বাঁচার মেহনত কে করবে ভাই?

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً

"আর যদি তারা (জিহাদে) বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো।" (সূরা আত-তাওবা: ৪৬)

অতএব আমরা বলতে পারি, 'ফরযে আইন জিহাদ' করতে না পারাটাও 'আত্মার একটি মারাত্মক ব্যাধি'! কেননা, ফরযে আইন হওয়া সত্ত্বেও জিহাদ না করা বা জিহাদের প্রস্তুতি না নেয়া- অন্তরের গহীনে লুক্কায়িত কিছু মারাত্মক ব্যাধির (ওয়াহন তথা দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয়/কাপুরুষতা/গাইরুল্লাহর ভয়ের) বহিঃপ্রকাশ মাত্র!

সুতরাং প্রিয় ভাই! পাঁচ ওয়াক্ত ফরযে আইন সলাত আদায় না করে আমরা কি দাবী করতে পারি আমাদের ইসলাহ তথা আত্মশুদ্ধি হয়ে গিয়েছে? তাহলে, 'ফরযে আইন জিহাদ' ত্যাগ করে আমরা কিভাবে দাবী করতে পারি যে, আমাদের 'ইসলাহ' হয়ে গিয়েছে? এটা কি নিজেকে নিজে ধোঁকা দেয়া নয়?

(আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এই সকল ব্যাধি থেকে হেফাযত করুন। আমীন।)

আমার প্রিয় ভাই! আপনি জানেন কি, জিহাদ ও ক্বিতালের সাথে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদেরকে হিদায়াত ও পরিপূর্ণ ইসলাহ করে দেয়ার ওয়াদা?

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَإِذا لَقيتُمُ الَّذينَ كَفَروا فَضَربَ الرِّقابِ حَتّىٰ إِذا أَثخَنتُموهُم فَشُدُّوا الوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعدُ وَإِمّا فِداءً حَتّىٰ تَضَعَ الحَربُ أَوزارَها ۚ ذٰلِكَ وَلَو يَشاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنهُم وَلٰكِن لِيَبلُوَ بَعضَكُم بِبَعضٍ ۗ وَالَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعمالَهُم سَيَهديهِم وَيُصلِحُ بالَهُم

"অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দানে মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে! একথা শুনলে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন (ইসলাহ/ভাল) করে দিবেন।" (সূরা মুহাম্মাদ , আয়াত ৪,৫)

আল্লাহর তা'আলা আমাদেরকে শাহাদাত নসীব করুন, আমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে ইসলাহ করে দেন। আমীন।

• আমার পীর কি জিহাদ বুঝেন না??

অনেক ভাই আছেন, যারা এই ধারণা লালন করেন যে, "আমার পীর একজন হক্কানী আলেম। তিনি কি জিহাদ বুঝেন না? তিনি যখন জিহাদের কথা বলবেন, তখনই কেবল আমরা জিহাদ করবো? আমার পীরের পরামর্শ ছাড়া যেখানে আমি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ছোট-খাট কোনো কাজও করিনা, সেখানে আমার পীরের এজাজত ছাড়া

কিভাবে আমি জিহাদের মত একটা এত বড় ও কঠিন কাজ করতে পারি? সর্ব হালতে আমি আমার পীরের অনুসরণ করবো। (কাউকে তো এমনও বলতে শুনা যায়-) আমি শাইখের ব্যাপারে একদম ফানা (ফানা ফিশ্ শাইখ)! শাইখ ছাড়া আমি আর কিছুই বুঝি না! শাইখ আমাকে যেদিকে নিয়ে যাবেন আমিও সেদিকেই যাব। আমার পীর যদি জাহান্নামে যায় তাহলে আমিও জাহান্নামে যেতে প্রস্তুত আছি।" (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিক)

প্রিয় ভাই! একজন হক্কানী আল্লাহ্ ওয়ালার সোহবত প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়, বিশেষতঃ বর্তমানে এই ফেতনার যামানায় একজন বিজ্ঞ আলেমের ছায়ায় থেকে, তাঁর পরামর্শমত জীবন পরিচালনা করতে পারাটা অনেক বড় খোশ-নসীব! আলহামদুলিল্লাহ! এটা যারা পেয়েছেন তারাই কেবল এর মূল্য অনুধাবন করার ক্ষমতা রাখেন।

যাইহোক, প্রথম কথা হলো, একজন আলেম দ্বীনের সকল বিষয়ে সমান পারদর্শী হবেন, এটি আশা করা ঠিক নয় (যেমন ভাবে একজন ডাক্তার সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবেন এটি আমরা আশা করতে পারি না)।

আমার পীর সাহেব হয়ত নফসের রোগগুলোর চিকিৎসা খুব ভালো বুঝেন, তবে তিনি হয়ত ফিকহের উপর তেমন বেশি পাণ্ডিত্য রাখেন না, তাই তিনি ফতোয়া দিতে পারেন না। দুইটা দুই জিনিস, দু'টি আলাদা বিষয়! ঠিক এমনিভাবে, আমার শায়েখ হয়ত আমার যিন্দেগীর বিভিন্ন বিষয়ে যেমন মুআমালাত, মুআশারাত, নফল আমল, গুনাহমুক্ত যিন্দেগী গঠন করার তরীকা ইত্যাদি বিষয়গুলো ভালো বুঝেন এবং ভালো ফয়সালা দেন, কিন্তু তিনি হয়তোবা জিহাদ বিষয়ে, জিহাদের মাসাইল ইত্যাদি সম্পর্কে এতটা পাণ্ডিত্য বা দক্ষতা রাখেন না। হয়তোবা তিনি জিহাদ নিয়ে এতটা চিন্তা-ফিকির করেন না বা ঘাঁটাঘাটি করেন না।

ঠিক একই ভাবে, আরেকজন শাইখ হয়ত নফসের ব্যাধি গুলো সম্পর্কে খুব বেশি পাণ্ডিত্য রাখেন না, কিন্তু জিহাদের ব্যাপারে পারদর্শী, জিহাদের মাসআলা, মাসাইলগুলো ভালো জানেন, জিহাদের ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতাও বেশি। সেক্ষেত্রে, আমি উভয় শাইখের সাথে সম্পর্ক রেখে চলতে পারি। এতে আমার এছলাহী মেহনতও হচ্ছে, আবার জিহাদী মেহনতও করা হচ্ছে। তবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ভাই, জিহাদী মেহনত তুলনামূলক পরিপূর্ণ মেহনত। জিহাদী মেহনতের মধ্যেই ইলম, তাযকিয়া ও দাওয়াতের মেহনত অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। এই বিষয়ে কিছু কথা পূর্বে গিয়েছে, সামনে আরো বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

• জিহাদ করার জন্য আমার শাইখ যদি অনুমতি না দেন!

দ্বিতীয়ত কথা হলো, জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেলে আমার শাইখ আমাকে জিহাদের অনুমতি দিলেন কি দিলেন না সেটা দেখা যাবে না। বরং এই ব্যাপারে (জিহাদ করবো, কি করবো না) কারো সাথে পরামর্শ করার অনুমতিও শরীয়তে নেই।

প্রিয় ভাই! আমরা কি পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের জন্য শাইখের অনুমতি গ্রহণ করে পরে সালাত আদায় করি, নাকি শাইখের অনুমতি ছাড়াই করি? রোযা রাখার জন্য আমরা কি কোনোদিন শাইখের অনুমতি গ্রহণ করেছি?? না, তা কখনো করিনি। তাহলে আরেকটি ফরযে আইন হুকুম 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্'র জন্য কার অনুমতি লাগবে ভাই?? ফরযে আইন হুকুম মানার ব্যাপারে কারো অনুমতি লাগবে না। বরং উল্টো কেউ নিষেধ করলে তা মান্য করা হারাম। জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় সন্তানের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি, স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি, গোলামের জন্য তার মনীবের অনুমতি, ঋণগ্রহীতার জন্য ঋণদাতার অনুমতি গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। এটিই শরীয়তের হুকুম। তাহলে একজন মুরীদের জন্য তার পীরের অনুমতির কী প্রয়োজন আছে ভাই?

[এই ব্যাপারে 'কিতাবুত তাহরীদ্ 'আলাল ক্বিতাল' কিতাবের দ্বিতীয় পর্ব "তাওহীদ ও জিহাদ" খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।]

ফরযে আইন ও ওয়াজিব হুকুমের ব্যাপারে কারো সাথে পরামর্শ করা যাবে না (করবো, কি করবো না!) পরামর্শ তো করা যাবে শুধু সুন্নত, নফল আর মুবাহ বিষয় সমূহের ব্যাপারে।............

তারপরেও যদি আমার মন পীরের অনুমতি ছাড়া জিহাদ করার ব্যাপারে সায় না দেয়, তাহলে বুঝতে হবে, দ্বীনের ব্যাপারে ও দ্বীন মানার ব্যাপারে আমি সত্যবাদী নই; আমার মনে গাইরুল্লাহর ভয় ঢুকেছে, দুনিয়ার মহব্বত আর মৃত্যুর ভয়ে আমার অন্তর ব্যধিগ্রস্ত! সুতরাং খুব দ্রুত আমার এই ব্যাধিসমূহের চিকিৎসা হওয়া দরকার।

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقِتَالُ إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ يَخۡشَوۡنَ ٱلنَّاسَ كَخَشۡيَةِ ٱللَّهِ أَوۡ أَشَدَّ خَشۡيَةٗۚ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبۡتَ عَلَيۡنَا ٱلۡقِتَالَ لَوۡلَآ أَخَّرۡتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٖ قَرِيبٖۗ قُلۡ مَتَٰعُ ٱلدُّنۡيَا قَلِيلٞ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظۡلَمُونَ فَتِيلًا ٧٧ أَيۡنَمَا تَكُونُواْ يُدۡرِككُّمُ ٱلۡمَوۡتُ وَلَوۡ كُنتُمۡ فِي بُرُوجٖ مُّشَيَّدَةٖۗ

".....অতঃপর যখন তাদের প্রতি ক্বিতাল (যুদ্ধ)-কে ফরয করা হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। এমনকি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় আমাদের পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর যুদ্ধকে ফরয করলে! আমাদেরকে কেন আরোও কিছুকাল অবকাশ দিলে না (দুনিয়া ভোগ করার জন্য)! (হে রাসূল!), আপনি তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার তো একটি সূতা পরিমাণও খর্ব করা হবে না। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই- যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভিতরেও অবস্থান কর, তবুও।......" (০৪ সূরা নিসা:৭৭-৭৮)

• এটি কি ব্যক্তিপূজা নয়?

তৃতীয় কথা হলো, "আমার ইসলাহী শাইখ হুকুম না করলে বা পরামর্শ না দিলে আমি জিহাদী মেহনত করবো না, আমার শাইখ জাহান্নামে গেলে প্রয়োজনে আমিও জাহান্নামে যাব" (নাউযুবিল্লাহ্)- এই ধরনের মানসিকতা লালন করা অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বিশেষের আনুগত্যের কারণে আল্লাহর কোনো ফরয বিধানকে ত্যাগ করার দ্বারা ব্যাপারটি দাঁড়ায়- ঐ ব্যক্তিকেই আমি আমার জীবনের বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ করেছি, আল্লাহ্ তা'আলাকে নয়। আমি ঐ ব্যক্তিকেই আমার রব হিসেবে গ্রহণ করেছি, আল্লাহ্ তা'আলাকে নয়।..........

এটি আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক করা। অর্থাৎ এটি এক প্রকারের শিরক্ এবং ব্যক্তিপূজা। যেমনটি এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে-

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে'। (সূরা তাওবাহ ০৯:৩১)

(আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।)

প্রিয় রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - المصنف لابن أبي شيبة: ٣٤٤٠٦

"খালেকের নাফরমানী করে বান্দার আনুগত্য করা যাবে না।" (আল মুসান্নিফ লিবনে আবী শাইবা:৩৪৪০৬)

সুতরাং প্রিয় ভাই! একটি ফরযে আইন আমল 'জিহাদের' ক্ষেত্রে পীর সাহেবের নিষেধাজ্ঞা মানা কিংবা হুকুমের অপেক্ষা করার সুযোগ শরীয়ত দিয়েছে কি আমাদের??...............

ইসলামী রাজনীতি করনেওয়ালা সাথীদেরকে শয়তানের ধোঁকা:

• ইসলামের মোড়কে কুফর:

আমার প্রিয় ভাই! এখন আপনাদের সামনে বর্তমান যামানার একটি অন্যতম ভয়াবহ দাজ্জালী ফিতনা নিয়ে কিছু কথা নিবেদন করতে চাই।

আমরা একদল ভাই আছি, যারা প্রচলিত কুফুরি রাজনীতির উপর ইসলামী লিবাস পরিয়েছি।

প্রিয় ভাই! 'সত্তাগতভাবে একটি কুফর'কে ইসলামী পোশাক পরালে তা কখনোই ইসলাম হয়ে যায় না। আমরা সকলেই মানি যে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র- এই তন্ত্র-মন্ত্রগুলো শয়তানী তরীকা। তারপরো, হয়ত 'হিকমাহ' ভেবে, কিংবা সময়ের দাবী মনে করে, কিংবা ভুল ব্যাখ্যার শিকার হয়ে, কিংবা 'তুলনামূলক মন্দের ভালোকে অবলম্বন করা' মনে করে, বুঝে না বুঝে আমরা অনেকে গণতন্ত্রকে মেনে নিয়েছি?.......

আমরা যারা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রকে ধারণ করি সাথে সাথে ইসলামী হওয়ার দাবী করি, তাদের দৃষ্টান্ত হতে পারে "ইসলামী মদ" কিংবা "ইসলামী সুদ"-এর মতো। মদের সাথে কিংবা সুদের সাথে ইসলামী শব্দ যোগ করলেই যেমন তা হালাল হয়ে যায় না, তেমনিভাবে গণতন্ত্রের সাথে কিংবা সমাজতন্ত্রের সাথে ইসলামী শব্দ যোগ করলে তা যৌক্তিকভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

আমরা সকলেই বলি, ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইসলামে সব সমস্যার সমাধান আছে। কিন্তু দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন আসলেই আমরা কেন দ্বারস্থ হই বাতিলের তন্ত্র-মন্ত্রের কাছে? ইসলামে যদি সকল কিছুর সমাধান থেকে থাকে, তাহলে সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠার তরীকা কি ইসলামে নেই??....

অবশ্যই আছে............

দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে।

عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللهُ أَمَرَنِى بِهِنَّ اَلْجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

হযরত হারেস আল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: আমি তোমাদের (দ্বীন কায়েমের) জন্য পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে ঐগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। (সে কাজগুলো হচ্ছে-)

ক. আল জামা'আহ (সংগঠন/ঐক্য): একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

খ. আস্ সামউ': আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা।

গ. আত-ত্ব-আহ্: আমীরের নির্দেশ পালন করা।

ঘ. আল হিজরাহ: হিজরত করা।

ঙ. আল জিহাদ: আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা।

(তিরমিযি ২৮৬৩, আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন; মুসনাদে আহমদ ১৭২০৯; জামেউল আহাদীস ৪৪; সহীহ ইবনে হিব্বান ৬২৩৩; সহীহ ইবনে খুযাইমা ১৮৯৫; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৫১৪১)

প্রিয় ভাই!

আল্লাহর রাসূলের ﷺ যিন্দেগীর দিকে আমরা তাকিয়ে দেখি। দ্বীন কায়েমের মেহনত শুরু হয়েছিল প্রথমে গোপনে একান্ত আপনজনদের কাছে দাওয়াত প্রদানের মাধ্যমে। এরপর নিকটাত্মীয়দের কাছে তাওহীদ ও রিসালাতের প্রকাশ্য

দাওয়াত প্রদানের মাধ্যমে। যার ফলে মুসলমানদের উপর চলে সীমাহীন যুলুম-নির্যাতন। হিজরতের আগ পর্যন্ত দাওয়াত ও সবরের মেহনতই চলেছে। অতঃপর মদীনায় হিজরতের পর প্রথমে কেবল প্রতিরোধ জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়। এরপর প্রতিরক্ষামূলক জিহাদকে সক্ষম সকলের উপর বাধ্যতামূলক (ফরযে আইন) করা হয়। সর্বশেষে আক্রমণাত্মক জিহাদের হুকুম দেয়া হয়, যাতে করে দুনিয়ার সমস্ত ফিতনা মিটে যায় এবং সারা বিশ্বে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হয়। সুতরাং দ্বীন পূর্ণতা পেয়েছে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্'র মাধ্যমে। দ্বীনের পূর্ণতা বিধানের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিহাদ ও ক্বিতালকেই সর্বশেষ সমাধান হিসেবে আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন। সমাজে পরিপূর্ণরূপে দ্বীন কায়েমের জন্য প্রিয় নবী ﷺ যেই তরীকায় মেহনত করেছেন, তা মূলত উপরের সেই পাঁচটি ধাপেরই প্রতিফলন।

প্রিয় ভাই! আল্লাহর রাসূল ﷺ জীবনে একটি মুহূর্তের জন্যও বাতিলের সাথে এই মর্মে সমঝোতা করেননি, তোমরা আমাদের ধর্মের কিছু মেনে নাও, আর আমরাও তোমাদের ধর্মের কিছু মেনে নিচ্ছি। অন্যদিকে, আমরা কার্যত অনেক বিষয়কে কুফর জানা সত্ত্বেও দ্বীনের স্বার্থ(?) মনে করে গ্রহণ করে নিয়েছি। কিন্তু কেন? এর কারণ হল- ছোট থেকে ছোট একটি কুফর যে কতটুকু ভয়াবহ ব্যাপার, সে বিষয়টি আমরা অনুধাবন করি না; একটি ছোট থেকে ছোট শিরক যে কতটা মারাত্মক জিনিস, সে বিষয়টি চিন্তা না করে তাকে আমরা হালকা বানিয়ে ফেলি। তাই গনতন্ত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই, সেটি হল: একটি গুনাহের স্তর অনুধাবন করা। আল্লাহ্ পাক সহজ করুন। আমীন।

• কোনটা বেশি খারাপ? কে অধিক মন্দ?

হায়! আমরা একেতো কোন্ আমলের গুরুত্ব কতটুকু তা বুঝি না, এর চেয়েও খারাপ কথা হলো, কোন্ গুনাহটা কতটা মারাত্মক সেটাও অনুধাবন করি না। কোন্ গুনাহের খারাবী কতটুকু তা উপলব্ধি করতে পারি না। কোন্ গুনাহটা অধিক ঘৃণিত, অধিক জঘন্য তা বুঝি না!!!

আসল ব্যাপার হলো, শয়তান যেমন ভাবে মানুষকে আমলের গুরুত্ব বুঝতে দেয়না, ফলে এর দ্বারা সে মানুষকে অধিক সওয়াবের কাজ থেকে দূরে রাখে; ঠিক একই রকমভাবে শয়তান মানুষকে গোনাহের খারাপী ও ঘৃণার পর্যায় বুঝতে দেয় না, তুলনামূলক ছোট নাফরমানীমূলক কাজগুলোর গুনাহকে বড় করে দেখায় আর তুলনামূলক বড় নাফরমানীমূলক কাজগুলোর গুনাহ সম্পর্কে ভুলিয়ে দেয়, অজ্ঞ কিংবা গাফেল রাখে; ফলে মানুষ তুলনামূলক কম খারাপ কাজকে বেশি ঘৃণার কাজ মনে করে, পাহাড়ের মতো ভারী মনে করে; আর বেশি খারাপ কাজকে কম ঘৃণার কাজ মনে করে, মশা-মাছির মতো হালকা মনে করে। যার ফলে সে ছোট গুনাহ থেকে ঘৃণার সাথে দূরে থাকে আর বড় গুনাহ গুলো অবাধে করতে থাকে। (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিক)।

এই কারণেই আমাদের সমাজে অধিক ভয়াবহ গুনাহগুলো অকপটে, প্রকাশ্য দিবালোকে, বাধাহীনভাবে চলে, আর ছোট গুনাহগুলোর ক্ষেত্রে বাধা বেশি আসে। এই কারণেই সমাজে এক ব্যাটা পাতি চোর মার খেয়ে জান হারায়, আর ঘোষখুর রাঘববোয়ালদের 'স্যার স্যার' করা হয়। মা-বাবাকে না জানিয়ে বিয়ে করাকে অনেক বড় দোষ মনে করা হয়, কিন্তু ছেলে-মেয়েরা অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করছে, এটাকে হালকা মনে করা হয়।

ঠিক একই কারণে, আজ অনেক ভাইয়েরা নামাযে হাত উঠানো (রফ্উল ইয়াদাইন) নিয়ে মাহফিলগুলোতে প্রচুর আলোচনা-পর্যালোচনা করে থাকি, উম্মাহকে এর গুরুত্ব বুঝানোর চেষ্টা করি, কিন্তু কুফরের বিরুদ্ধে চুপ থাকি! উম্মত

নামাযে 'আমীন' জোরে বলে কিংবা আস্তে বলে, এ নিয়ে আমরা অনেক মাথা ঘামাই! কিন্তু উম্মত গণতন্ত্রকে মেনে নিয়েছে, নারী নেতৃত্বকে মেনে নিয়েছে, এগুলোর বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটা পর্যন্ত করি না!

আবার আরেকদল আছেন, যারা দেশে নাস্তিক-মুরতাদদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে নারাজ! খেলাফে সুন্নত আমাদের কারো কারো কাছে মহা গুনাহ, কিন্তু খেলাফে ঈমান (কুফর) যেন আমাদের কাছে কিছুই না!

যারা সমাজে নাস্তিক-মুরতাদ খুঁজে পান না, তাদেরকে বলি, আমাদের সমাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শানে গোস্তাকী করার মতো লোকের কি অভাব আছে? আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر

"যে কোনো ব্যক্তিই রাসূল ﷺ এর অবমাননা করবে, চাই তা ইচ্ছাকৃত হোক বা ঠাট্টাচ্ছলে হোক, সে কাফের হয়ে যাবে।" [আসসারিমুল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল: পৃ.৩১-৩২]

ইমাম ইবনে হুমাম রাহিমাহুল্লাহ লিখেন:

مَنْ أَبْغَضَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَلْبِهِ كَانَ مُرْتَدًّا

"যে কোন ব্যক্তিই রাসূল ﷺ এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, সে মুরতাদ হয়ে যাবে।" [ফাতহুল কাদীর: খ.৪, পৃ: ৪০৭]

যেই সকল মুজাহিদ ভাই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবমাননাকারীদের হত্যা করে, তাদেরকে আবার অনেকেই সহ্য করতে পারেন না। তাদের দিলের মধ্যে মানবপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি জেগে উঠে। এদের কাছে আল্লাহর রাসূলের শানে গোস্তাকীর গুনাহ অতি হালকা আর আল্লাহর রাসূলের একজন দুশমনের রক্ত ঝরানো তাদের কাছে খুব ভারী ও অমানবিক মনে হয়। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। মুজাহিদদেরকে তারা নৃশংস, মানবতাবিরোধী মনে করেন। তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া ইস্যু করেন, নিন্দাজ্ঞাপন করেন, মিটিং-মিছিল করেন। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্। তাদের মতে, আগে সেই সকল জারজদের দাওয়াত দেয়া দরকার ছিল, কেননা তারা তো বুঝে না।

হায়! আমরা আর কত পাশ্চাত্যের গোলামী করে যাবো? আর কত আমরা এভাবে গোমরাহী ছড়াব? ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم

"কোন মুসলমান যদি (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে) কটুক্তি করে তবে সে কাফের হয়ে যাবে, এবং কোনোরূপ মতভেদ ছাড়াই তাকে হত্যা করা হবে (ওয়াজিবুল-কতল)। এই ব্যাপারে চার ইমাম ও অন্যান্য মাযহাবের একই মত রয়েছে।' [আসসারিমুল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল (উর্দু তরজমা) : পৃ ৬২]

أن من قَال فِيه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم مَا فِيه نَقْص قُتِل دون اسْتِتَابَة
[الشفا بتعريف حقوق المصطفى - وحاشية الشمني، ٢/٢١٩]

কাজী ই'য়াজ রাহিমাহুল্লাহ তার 'আশ শিফা' নামক কিতাবে বলেন:

"যে কেউ এমন কোনো কথা বলল যা রাসূল ﷺ কে নিন্দা করে বলা হয়, কোনো রকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ছাড়াই তাকে হত্যা করা হবে।"

[বিস্তারিত পড়ুন- "প্রিয়নবী ﷺ-কে অবমাননার শাস্তি"- https://bit.ly/shatims]

অর্থাৎ এটি এমন এক ভয়াবহ গুনাহ যে, যারাই এ কাজ করবে, এদেরকে হত্যা করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো পরওয়ানা লাগবে না, কোনো মুজাহিদ বাহিনীর আমীরের হুকুম লাগবে না, যে কেউ যে কোনো সময়, যে কোনো অবস্থায় এদেরকে হত্যা করতে পারবে।

আরেকদল ভাই আছেন যারা মুশরিকদেরকেও প্রকাশ্যে "কাফের" বলতে নারাজ। তাদের মুখে শুনা যায় "হিন্দুদেরকে (প্রকাশ্যে) কাফের বলা উচিত নয়, কেননা তারা এতে কষ্ট পায়।" এটা কোন স্তরের হুসনে মুআশারাত ভাই? কুফর ও শিরকের প্রতি আমাদের কেন এই উদারপন্থা?? আমাদেরকে কি কাফেরদের প্রতি কঠোর মনোভাবসম্পন্ন হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি?? ভয় হয়, এভাবে আমরা নিজেদেরকে 'অতি উদারপন্থী' পরিচয় দিতে গিয়ে আবার 'মুরজিয়া' না হয়ে যাই! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।

যাই হোক, পূর্বের আলোচনায় ফিরে যাওয়া যাক!

মনে করুন! একজন মুসলমান ব্যক্তি নিয়মিত পতিতালয়ে যায়, আরেকজন মুসলমান ব্যক্তি গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনে অংশ নেয় এবং পালার্মেন্টে (সংসদ ভবনে) গিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইন প্রনয়ন করেন।

প্রিয় ভাই! আমাদের সমাজে কোনটিকে বেশি খারাপ মনে করা হয়?

শুনতেতো পতিতালয়ে গমনকারী সেই মুসলমানের কাজটাই বেশি খারাপ মনে হয়, তাই না ভাই? কিন্তু প্রকৃত অর্থে, আল্লাহ তা'আলার কাছে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাজটা এতোটাই অপছন্দীয় যে, কেয়ামত পর্যন্ত কোনো মুসলমান যদি প্রতিদিন পতিতালয়ে যায় সেটি আল্লাহর কাছে যতটা না খারাপ, কোনো মুসলমান যদি একবারও গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষ হয়ে নির্বাচনে অংশ নেয় এবং পার্লামেন্টে যায়, আর আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আইন রচনা করে, সেটি আল্লাহর কাছে বেশি খারাপ, বেশি জঘন্য। কেন জানেন?

কারণ, প্রথমটি কবীরা গুনাহ, আর দ্বিতীয়টি কুফর। আর কুফরের গুনাহের সামনে গুনাহে কবীরার তুলনা চলে না। পতিতালয়ে গমনকারী মুসলমানের গুনাহ্ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে মাফ করবেন, কিন্তু যে গণতন্ত্রের নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে, পার্লামেন্টে যাচ্ছে, আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আইন রচনা করছে, তাকে আল্লাহ তা'আলা কস্মিনকালেও মাফ করবেন না, যতদিন না সূঁচের ছিদ্রপথে উট গমন করে, তার জন্য আছে চির কালের জাহান্নাম, কতই না নিকৃষ্ট ঠিকানা সেটি! এই ব্যক্তি যতই মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করুক না কেন, যতই হজ্জ-উমরা করুক না কেন, যতই দান-সদকা করুক না কেন, যতই ইবাদত-বন্দেগী করুক না কেন, সে নামায-রোযা যাই করুক, তার কোনো আমলই কবুল হবে না। তার সমস্ত আমল আল্লাহ পাক ধ্বংস করে দিবেন। কেননা সে কুফুরী করেছে!!!

ভালোভাবে খেয়াল করি, মদ পান করা গুনাহে কবীরা, কুফর নয়। যেখানে মদের বোতলে 'ইসলামী মদ' লেভেল লাগানো দেখে তা পান করলে গুনাহে কবীরা থেকে বাঁচা যায় না, সেখানে কুফরকে 'ইসলামী' নাম দিয়ে অবলম্বন করলে তা কিভাবে জায়েয ও হালাল হবে? জেনে শুনে কোন কুফর/হারামকে ইসলামী নাম দেয়াও কি কুফুরী নয়?

তাহলে কোন মুসলমান যখন গণতন্ত্র নামক কুফরকে ইসলামের লেবাস পরিয়ে একটি কুফুরী কাজ করলো, তখন যদি তাকে বলা হয়, ভাই এই কাজ করাটা পশ্চিমাদের পতিতালয় ও নাইটক্লাবগুলোতে গিয়ে পড়ে থাকা, হাজার বার জিনা করা, মজ-মাস্তি করার চেয়েও জঘন্য, তাই পার্লামেন্টে যাবেন না, যারা আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আইন রচনা করে তাদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না, ওটা কুফর, ওটা আরো ভয়াবহ গুনাহ; আমি কি তাকে সদুপদেশ দিলাম

না?..........

হায়! কেন যে আমরা বুঝি না, গণতন্ত্র কুফর! মানবরচিত বিধান কুফর! এটি লক্ষ কোটি বার জিনা করার চেয়েও বড় গুনাহ্, জঘন্য গুনাহ্, অমার্জনীয় গুনাহ্! 'জিহাদের মাধ্যমে খিলাফত কায়েম করাই' প্রকৃত সুন্নতী রাজনীতি। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে বুঝার ও এ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

• গণতন্ত্রের নিষ্পাপ(?) রূপ:

প্রিয় ভাই! এই পর্যায়ে এসে আমরা গণতন্ত্র সম্পর্কে কিছু বিষয় বুঝার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। একজন সাধারণ মানুষকে যদি আমরা জিজ্ঞেস করি 'গণতন্ত্র কী জিনিস?' তাহলে হয়তো তিনি গণতন্ত্রের এমন একটি রূপ আমাদের সামনে বর্ণনা করতে পারেন, যেমন:

"গণতন্ত্র একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা, যেখানে একটি রাষ্ট্রে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকবে। তারা ক্ষমতার জন্য পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। নির্বাচনের আয়োজন করবে। জনগণ তাদের পছন্দমত যোগ্য নেতা ও দলকে ভোট দিবে। যে দল সর্বাপেক্ষা বেশি ভোট পাবে, সে বিজয়ী হবে আর নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। নেতৃবৃন্দ দেশের সংবিধান অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করবে; আর জনগণের উন্নতির জন্য কাজ করে যাবে। যেহেতু এখানে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ব্যক্তিদেরকে জনগণই তাদের নিজেদের মধ্য হতে পছন্দমত কাউকে নির্বাচন করছে, তাই এটি জনগণের দ্বারা পরিচালিত জনকল্যাণমূলক, জনগণের সরকার।"

এটি গণতন্ত্রের একটি নিষ্পাপ চেহারা, আপাতদৃষ্টিতে যাকে নির্দোষ মনে হয়। সাধারণভাবে কোন ব্যক্তি যখন গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলেন তখন তিনি শুধু গণতন্ত্রের এই নিষ্পাপ চেহারাকে সামনে রেখেই কথা বলেন।

কিন্তু ভাই, অন্তরে তীব্র ব্যাথা অনুভূত হয়, যেন কষ্টে কলিজা ছিড়ে যায় তখন, যখন একজন আলেম কিংবা একজন সাধারণ দ্বীনদার ভাইও গণতন্ত্রের শুধু এই নিষ্পাপ রূপটিই দেখেন, এটিকে দেখেই ফতোয়া দেন, এর চেয়ে আর গভীরে প্রবেশ করেন না; ফলে গণতন্ত্রকে ইসলামের সাথে মিলানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেন, কিংবা গণতন্ত্রকে ইসলামীকরণ করার প্রয়াস পান; অবশেষে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার দিবা স্বপ্ন দেখেন; আর গণতন্ত্রের পিছনে দৌঁড়ঝাপ করে জীবনের মহামূল্যবান সময়কে নষ্ট করেন ও পরকালকে বরবাদ করেন। অথচ গণতন্ত্রের ভিতরের রূপটি কত যে ভয়ংকর সেদিকে আমরা লক্ষ্য করিনা, হায়! সেখানে রয়েছে প্রতি পদে পদে বে-ঈমান হওয়ার সম্ভাবনা। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

প্রিয় ভাই! গণতন্ত্রের এই নিষ্পাপ চেহারা দেখে আমাদের অনেক ভাই এমন মন্তব্য করেন-

১. ইসলামের খলিফা নির্বাচনের বেশ কয়টি পদ্ধতি রয়েছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে, জনগণ তাদের মধ্য হতে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিটিকে নির্বাচন করবে। এদিক থেকে এটি গণতন্ত্রের সাথে মিলে যায়। তাই, যদি আমরা প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী রাজনীতি করে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করি তাহলে সমস্যা কোথায়?

২. আমরা সামাজিক জীব হিসেবে একটি সমাজ বা রাষ্ট্রে বসবাস করি। প্রতিটি নাগরিকের জন্য যে 'ভোটাধিকার' সরকার প্রদান করে, সেটি তার জন্য পবিত্র আমানত। কেননা আমি যদি ভোট না দেই আর এজন্য যদি একজন অযোগ্য ব্যক্তি ভোটে জয়লাভ করে যায়, আর নির্বাচিত হওয়ার পর সে যদি দুর্নীতি করে, তাহলে এর দায়ভার তো আমার উপরও বর্তাবে, কেন আমি যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে জয়ী করার চেষ্টা করলাম না!

৩. যদি সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিরা নির্বাচনে অংশ না নেয়, বিশেষতঃ উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার শ্রেণি, যাদের মাঝে আমানতদারিতা আছে, তাহলে ঐ স্থানগুলো অযোগ্য ও খেয়ানতকারীরা দখল করে দেশ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধন

করবে। আর এমনটি হলে এর দায়ভার উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার শ্রেণির উপরও বর্তাবে, কেন আমরা এগিয়ে আসলাম না!

৪. পার্লামেন্টে যেতে পারলে আমরা তো আর কুরআনের বিরোধী কোনো আইন রচনা করব না, বরং আমরা যখন দেখব কুরআনের আইনের বিরুদ্ধে আইন রচনা করা হচ্ছে তখন আমরা এর প্রতিবাদ করব। তাই কুরআনের আইনের বিরুদ্ধে যেন আইন রচিত হতে না পারে, সেজন্য পার্লামেন্টে উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার শ্রেণির থাকার আবশ্যকতা রয়েছে।

৫. আমরা দাওয়াত দিতে থাকব। দেশের জনগণ যখন দ্বীনের গুরুত্ব বুঝবে, তখন আমাদেরকে তারা ভোট দিবে এবং আমরা বিজয়ী হব। তখন আমরা দেশে কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠা করব।

৬. এভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে সমাজে ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে। জিহাদ তথা মারামারি-কাটাকাটি ও রক্তপাতের দরকার হবে না। তাছাড়া ইসলাম শান্তির ধর্ম। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সমাজে ইসলাম কায়েম করতে চাই।

৭. যেহেতু আমাদের হাতে এখন নবুওয়তের যামানার ন্যায় জিহাদ করার মত সক্ষমতা ও পরিবেশ নেই, তাই এখন আমাদের হাতে যতটুকু সক্ষমতা আছে, ততটুকু দ্বারাই দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা করে যেতে চাই। এর জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আগানোটাই সবচেয়ে সহজ ও যুগোপযোগী পন্থা হতে পারে। আশাকরি, এই আন্দোলন করতে গিয়ে আমরা যে বাধা-প্রতিবন্ধকতা, নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করব, তাতে আমাদের জিহাদের সওয়াব মিলবে। আর যদি জীবন চলে যায়, এতে আমরা শাহাদাতের মর্তবা লাভ করব ইনশাআল্লাহ।

৮. বর্তমানে উম্মাহ সাধারণ দ্বীনদারিই বুঝে না, অধিকাংশ মুসলমান নামায-কালামই ঠিকমত পড়ে না, তাই জিহাদের পদ্ধতিতে যদি আমরা সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে যাই, তাহলে হিতে বিপরীত হতে পারে, মানুষ ইসলামের একটি নেগেটিভ দাওয়াত লাভ করতে পারে। তাই আগে মানুষদেরকে দাওয়াতের মাধ্যমে দ্বীনদারি বুঝাই, কুরআনের আইনের গুরুত্ব বুঝাই, ইসলামপন্থি সরকারের গুরুত্ব বুঝাই, যখন অধিকাংশ মানুষ দ্বীন বুঝবে, ইসলামী আইন ও ইসলামপন্থি সরকারের গুরুত্ব বুঝবে তখন তারাই এগিয়ে আসবে এবং ভোট দিয়ে ইসলামী দলগুলোকে বিজয়ী করবে। এভাবে সমাজে ইসলাম কায়েম করা সহজ হবে।

....

প্রিয় ভাই! এই যুক্তি ও চিন্তাগুলো কি সঠিক? নিয়ত যদি ঠিক থাকে তাহলে কি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনীতি করায় কোনো সমস্যা আছে?

....

মুহতারাম ভাই! আপাতদৃষ্টিতে এই যুক্তি ও চিন্তাগুলো অত্যন্ত 'যুক্তিযুক্ত' মনে হতে পারে, কিংবা সময়ের দাবী বা হিকমাহ্ মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা হল- আমরা যদি গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতাম, গণতন্ত্রের গূঢ় রহস্য যদি আমাদের সামনে স্পষ্ট থাকত, তাহলে আমরা দ্বীনদার শ্রেণি স্বপ্নেও এ ধরণের চিন্তা করতাম না, নির্বাচনে অংশগ্রহণ তো দূরে থাক, ভোট দেয়ার কথাও কখনো ভাবতাম না; বরং উল্টো আমরাই বলতাম- হায়! আমরা যারা এ ধরণের চিন্তা লালন করি, তারা মারাত্মক ভুলের মাঝে আছি, আমরা ভয়ঙ্কর রকমের আত্মপ্রবঞ্চনায় ভুগছি, আমরা যামানার ভয়ানক এক ফিতনায় ফিতনাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি, এবং ইবলিশ শয়তান অত্যন্ত সুকৌশলে আমাদের ঈমান নষ্ট করে দিচ্ছে। (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ)

তাহলে, গণতন্ত্রের আসল চেহারা কী? কী সেই ভয়ঙ্কর রূপ? ....

প্রিয় ভাই! এই বিষয়গুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট হওয়া দরকার। তাই পরবর্তী আলোচনায় আমরা আপনাদের সামনে গণতন্ত্রের মূল রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ্ তা'আলাই তাওফীকদাতা।

• গণতন্ত্রের প্রকৃতরূপ:

প্রিয় ভাই! আমরা এতক্ষণ গণতন্ত্রের যে আলোচনা করলাম (গণতন্ত্রের নিষ্পাপ রূপ: শিরোনামে) সেটি গণতন্ত্রের পরিচয় নয়, বরং সেটিকে 'সমাজে/একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বাস্তবায়নের একটি মডেল' বলা চলে। অথবা এটিকে গণতন্ত্র নামক একটি দেহের বাহ্যিক কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলা যায়। অর্থাৎ গণতন্ত্রের একটি দেহ আছে, যে সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা এতক্ষণ করলাম, আরেকটি রূহ বা আত্মা আছে- যার আলোচনা আমরা সামনে করব ইনশাআল্লাহ। এই রূহ বা আত্মাই গণতন্ত্রের আসল পরিচয়। যদি কখনো গণতন্ত্র নিয়ে ভাবতে হয়, তাহলে এই রূহটি নিয়েই ভাবা উচিত, যদি কখনো গণতন্ত্রের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত বা ফতোয়া তলব করা হয়, তখন এই রূহ বা আত্মার বিচার-বিশ্লেষন করেই সিদ্ধান্ত বা ফতোয়া দেয়া উচিত। কেননা রূহ ছাড়া দেহের কোনো মূল্য নেই। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে অনর্থক আবেগ ও অদুরদর্শিতা থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

প্রিয় ভাই! গণতন্ত্রের রূহ বা আত্মা সম্পর্কে নিচের পয়েন্টগুলো ভালোভাবে আমরা খেয়াল করি ইনশাআল্লাহ্-

গণতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র শিরকী ধর্ম:

মূলত (তাত্ত্বিকভাবে) গণতন্ত্র বলতে বোঝায় জনগণের শাসন। গণতন্ত্রের ইংরেজি পরিভাষা ডেমোক্রেসি শব্দটির জন্ম গ্রীক শব্দ ডেমোক্রাটিয়া থেকে, যার অর্থ জনগণের শাসন। ডেমোস (Demos) বা জনগণ এবং ক্রাটিয়া (Kratia) তথা শাসন বা ক্ষমতা থেকে ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র নামটির জন্ম। এথেন্স সহ কিছু প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রে প্রচলন হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার। পরবর্তীতে এর সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।
আব্রাহাম লিংকনের ভাষায়, "Government of the people, by the people, for the people". অর্থাৎ জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য গঠিত, জনগণ দ্বারা পরিচালিত সরকার ব্যবস্থা।
তাছাড়া ক্লিয়ান, অধ্যাপক গেটেলসহ আরো অনেকেই গণতন্ত্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন।
প্রিয় ভাই! এটা কুফফারদের দেয়া সংজ্ঞা; তবে আমরা বলব, **গণতন্ত্র কেবলই একটি নিছক শাসনব্যবস্থা নয়, প্রকৃতপক্ষে, এটি হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিস্টান ধর্মের মত স্বতন্ত্র একটি শিরকী ধর্ম।** গণতন্ত্রের মেরুদন্ড ও কেন্দ্র কিন্তু কখনো আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী করা নয়, নয় আল্লাহ তা'আলার গোলামী করাও। বরং তা হচ্ছে: **তাঁর পবিত্র সত্ত্বার গোলামীর স্থলে মানুষের গোলামী করা। এখানে সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে প্রতাপশালী শ্রেনীর অভিলাষগুলো পূরণ করা। এক কথায় গণতন্ত্র হলো: لا إله إلا الإنسان অর্থাৎ 'মানুষ ছাড়া কোন মাবুদ নাই' এর বাস্তব নমুনা। কেননা, এখানে মানুষরূপী শয়তানদের অভিলাষ ও কামনার ইবাদত করা হয়।**
কি ভাই, অবাক হচ্ছেন?...........
ইনশাআল্লাহ্, নিচের আলোচনা দ্বারা বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে।
একটি ধর্মে যেমন একজন 'রব' বা প্রভু থাকে, তেমনি গণতন্ত্রেরও একটি রব বা প্রভু আছে, আর সেটি হল 'আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানসমূহের বিরুদ্ধে আইনপ্রণয়নকারী সম্প্রদায়'।
একটি ধর্মের যেমন ধর্মগ্রন্থ থাকে, যাকে তার অনুসারীরা অনুসরণ করে জীবনবিধান হিসেবে; তেমনিভাবে গণতন্ত্রের পবিত্র(?) ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে 'মানবরচিত' রাষ্ট্রের সংবিধান।

গণতন্ত্রের আসল হৃৎপিণ্ড হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism) এবং পুঁজিবাদ (Capitalism)। আর ধর্মনিরপেক্ষতা মানে এটি কখনোই নয় (যা আমাদের মধ্যে অনেক ভাই মনে করে থাকেন,) "ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীন বা ধর্মের পক্ষপাতশূন্য; যে যার মত নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে, রাষ্ট্র তাতে হস্তক্ষেপ করবে না।" বরং, ধর্মনিরপেক্ষতা বা (Secularism) এর প্রকৃত অর্থ হল-

Secularism is the doctrine that state, morality, education etc should be separated from religion.

অর্থাৎ, "ধর্মের প্রভাব থেকে রাজ্য, নীতি-নৈতিকতা, শিক্ষা ইত্যাদিকে মুক্ত রাখার মতবাদই হল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।" যারা এই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা, ব্যক্তিগত জীবনে নামে মাত্র কিছু ধর্ম কর্ম করায় তাদের কোনো আপত্তি নেই। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিকতা, শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে ধর্মকে নির্বাসন দেয়াই এদের মূল লক্ষ্য। ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে নাস্তিকতাবাদের ওতপ্রোত সম্পর্ক বিদ্যমান, কেমন যেন ধর্মনিরপেক্ষতার চূড়ান্ত লক্ষ্যই হচ্ছে নাস্তিক্যবাদ (Atheism)। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নেতা ব্রেডলেফের মত ছিল, ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস প্রতিহত করাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কর্তব্য। তার মতে, ধর্মের এই সব কুসংস্কারমূলক ধারণা বিশ্বাস যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিতে প্রকাশিত হতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত বস্তুগত উন্নতি সম্ভব হবে না। (ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, মাওঃ মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, পৃ. ৬২৬-৬২৯)

গণতন্ত্রের প্রভুর পরিচয়:

প্রিয় ভাই! গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শিরকী এবং কুফুরী দিকটি হল- আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আইন রচনা করা। যে সম্প্রদায় আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আইন রচনা করে, তারাই মূলত গণতন্ত্রের ইলাহ বা প্রভু বা উপাস্য। এরাই তাগুত। (এ সম্পর্কে কিতাবুত তাহরীদ দ্বিতীয় পর্ব: তাওহীদ ও জিহাদ" নামক কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখান থেকে দেখে নেয়া যায় ইনশাআল্লাহ। ডাউনলোড লিংক: https://bit.ly/tahrid2)

এখন প্রশ্ন হল, এই তাগুতগুলো কিভাবে 'ইলাহ' হয়??? এরা কিভাবে নিজেদেরকে রবের আসনে সমাসীন করেছে?? কেন মানবরচিত আইন মেনে নিলে প্রকারান্তরে এই বিশেষ সম্প্রদায়টিকে রব হিসেবে গ্রহন করা হবে?

عن عدي بن حاتم قال :أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال :يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت إنا لسنا نعبدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتستحلون قلت بلى قال فتلك عبادتهم

আদী ইবনে হাতেম (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি খ্রিস্টান ছিলেন) রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। তখন আমার গলায় একটি ক্রুশ ঝুলছিল। তিনি বললেন, হে আদী! এই মূর্তিটি তোমার গলা থেকে ছুঁড়ে ফেল। আমি তা ছুঁড়ে ফেললাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে গেলাম। দেখলাম, তিনি সূরা বারাআ'র (সূরা তাওবা) এই আয়াত তিলাওয়াত করছেন:

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে'। (সূরা তাওবাহ ০৯:৩১)

আমি আরজ করলাম, আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা যা হালাল করেছেন, তারা তা হারাম করতো আর তোমরাও তা হারাম মানতে এবং আল্লাহ তা'আলা যা হারাম করেছেন, তারা তা হালাল করতো আর তোমরাও তাকে হালাল মেনে নিতে। আমি উত্তর দিলাম- হ্যাঁ, এমনটি তো হয়েছে। তিনি

বললেন, এটিইতো তাদেরকে ইবাদত করা। (আত্ তারিখুল কাবির লিল ইমামিল বুখারি: ৭ম খণ্ড, ৪৭১ নং হাদীস, সুনানুত্ তিরমিজি: ৫০৯৩)

প্রিয় ভাই!

যারা আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় বিধান রচনা করে, আল্লাহ্ তা'আলার কৃত হালালকে হারাম করে আর হারামকৃতকে হালাল করে, এরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকে 'বিধানদাতা'র (আল্ হাকীম) আসনে নিজেকে সমাসীন করলো, যা আল্লাহ্ তাআলার একটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য, যা কেবল আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের জন্যই খাস।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

لَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ

"......রাজত্বে তাঁর কোন শরীক নেই,...."। (সূরা বনি-ইসরাইল ১৭:১১১)

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেন,"তুমি বল, হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন, আপনার হাতেই সমস্ত কল্যাণ। আপনি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান"। (সূরা আলে ইমরান ৩:২৬)

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান"। (সূরা মূলক ৬৭:০১)

আল্লাহ তায়া'লা আরো ইরশাদ করেন,

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

"শুনে রাখ, সৃষ্টি যার আদেশ/বিধানও চলবে তার।" (সূরা আল আরাফ ৭: ৫৪)

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"আল্লাহ ব্যতীত কারো বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" (সূরা ইউসুফ ১২:৪০)

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"আল্লাহ ব্যতীত কারো বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" (সূরা ইউসুফ ১২:৪০)

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"তারা কি জাহেলিয়াতের বিধান চায়? বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহর চেয়ে উত্তম হুকুমদাতা আর কে?" (সূরা মায়েদা, আয়াত: ৫০)

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

"ওদের কি এমন কতগুলো দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি?" (সূরা শুরা ৪২:২১)

মুহাম্মাদ আল আমিন আশ্ শানকিতি রহ. বলেন, "কুরআনের এই আয়াতগুলো যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রণীত এবং রাসূল ﷺ এর মুখনিঃসৃত আইনের পরিবর্তে শয়তান ও তার সহযোগীদের মুখনিঃসৃত স্বরচিত আইনের আনুগত্য করা সুস্পষ্ট শিরক এবং কুফর। এতে কোনো সন্দেহ নেই।" (আদ্বওয়া আল বাইয়ান, চতুর্থ খণ্ড, পৃ.৮২-৮৫)

শায়েখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলে শায়েখ রাহিমাহুল্লাহ্ (সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী) বলেন,

القوانين كفر ناقل عن الملة

"মানব রচিত কানূন এমন কুফর, যা (ব্যক্তিকে) ইসলাম ধর্ম থেকে বের করে দেয়।" (আল ফাতওয়া, খ. ১২, পৃ. ২৮০)

এছাড়াও শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ., আল্লামা ইবনে কাসীর রহ., আল্লামা যাহিদ কাউসারী রহ., আব্দুল কাদের আওদাহ রহ.-সহ আরো অসংখ্য উলামায়ে কেরামের একই মতামত রয়েছে।

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো থেকে এটাও স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে বিধান প্রনয়ন করার কোনো অধিকার দেননি। তাই যারা আল্লাহর আইনকে উপেক্ষা করে নিজেরাই বিধান বানিয়ে নেয়, তারা নিজেরাই বিধানদাতার আসনে বসল, তাই এরা মুশরিক এবং এদেরকে যারা মেনে নিবে, এদেরকে যারা সমর্থন করবে, এদেরকে সহযোগিতা করবে, এদেরকে নিরাপত্তা দিবে, এদের পক্ষে বল প্রয়োগ করবে, এদেরকে ভালোবাসবে, এদের বানানো বিধানে যারা বিচারকার্য পরিচালনা করবে, এদের কাছে যারা বিচার প্রার্থনা করবে, এদেরকে প্রশংসা করবে, এদের বানানো বিধান বাস্তবায়নের মাঝে যারা দেশ ও জাতির সফলতা খোঁজে পাবে, এরা সকলেই আল্লাহর সাথে শিরক ও কুফুরী করল।

(বি.দ্র: যদিও কাজগুলো কুফুরি, যারা এসকল কাজ করবে, এদেরকে আবার আমভাবে কাফের বলা যাবে না, এদেরকে কাফের বলার বিষয়টা কিছু শর্তযুক্ত। এদেরকে তাকফীর করার ব্যাপারে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আর এ বিষয়গুলো বিচার বিশ্লেষণ করা ও কাউকে তাকফির করা হকপন্থী উলামায়ে কেরামের কাজ। আমাদের কাজ হল এগুলো থেকে বেঁচে থাকা এবং হকপন্থী উলামায়ে কেরামের অনুসরণ করা।)

কি ভাই, কথাগুলো কি অনেক কঠিন মনে হল??............................

তাহলে শুনুন-

'গণতন্ত্র' নামক এই শিরকী ব্যবস্থা মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার পোশাকটি নতুন হলেও তার বাস্তবতা ফিরআউন, নমরুদ, সামিরি, শাদ্দাদ, আবু লাহাব ও আবু জাহিলদের মতোই ছেঁড়া ও পুরোনো। নমরুদ কিংবা ফিরআউন যে নিজেকে 'সবচেয়ে বড় রব' দাবী করেছিল-

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

"ফিরাউন বলল, আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব (প্রভু)।" (৭৯ সূরা নাযিয়াত:২৪)

নমরুদ ও ফিরাউনের নিজেদেরকে এইভাবে রব দাবী করার গূঢ় রহস্য কী? কিভাবে তারা নিজেদেরকে রব দাবী করল? কোন বিষয়টিকে সামনে রেখে তারা নিজেদেরকে রব দাবী করেছিল, প্রিয় ভাই, আপনি জানেন কি?

তারা কি এই দাবী করেছিল, 'আমি এই আকাশ-যমীন সৃষ্টি করেছি?' ....

তারা কি এই দাবী করেছিল, 'আমি পাহাড়-নদী, বন-বনানী ইত্যাদি সৃষ্টি করেছি?'.............

তারা কি এই দাবী করেছিল, 'আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষন করি, তা দিয়ে তোমাদের জন্য রঙ বেরঙের ফসল উৎপাদন করি। তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করি'? ....

তারা কি এই দাবী করেছিল, 'আমি তোমাদের মায়ের পেটে তোমাদেরকে তিন অন্ধকারের মাঝে সৃষ্টি করেছিলাম? সুতরাং আমি তোমাদের জন্ম ও মৃত্যুর মালিক?".............

তারা কি এই দাবী করেছিল, 'আমি তোমাদের মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করব?"................

না, এগুলোর কোনোটাই ফেরাউন কিংবা নমরুদ দাবী করেনি।

প্রিয় ভাই! আপনি কি বলতে পারেন, তাহলে তারা কোন্ ক্ষেত্রে নিজেদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ দাবী করেছিল??

হ্যাঁ, সেটি হল 'হাকামিয়্যাহ'র ক্ষেত্রে। বিধান দেয়ার ক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে খোদার আসনে বসিয়েছিল। রাষ্ট্রে কোনো ধর্মীয় আইন চলবে না, চলবে শুধু ফিরাউনের হুকুম, চলবে শুধু নমরুদের হুকুম; তাদের হুকুমই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন, তাদের হুকুমই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংবিধান। এই হল 'আনা রব্বুকুমুল আ'লা' (আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভু)-র অর্থ।

তাহলে ভাই, যে সকল লোক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন করে পার্লামেন্টে/সংসদে নিজেদের সুবিধামত মনগড়া আইন রচনা করে, তাদেরকে কেন আমরা 'নব্য ফিরাউন' কিংবা 'নমরুদের উত্তরসূরী' বলব না? নেত্রীগুলোকে কেন 'লেডি ফিরাউন' কিংবা 'লেডি নমরুদ' বলব না?? ফিরাউন যদি তার রাজ্যের রব (প্রভু) হয়ে থাকে, এরা কেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রভু হবে না? ফিরাউন যদি কাফের হয়, এরা কেন হবে না? ফিরাউন যদি মুশরিক হয়, তাহলে এরাও কেন হবে না???...............

মুফতি হামিদুল্লাহ জান রহ. লেখেন :

'প্রত্যক্ষদর্শন ও অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বর্তমানের পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই দীনহীনতা, নির্লজ্জতা ও সকল নষ্টের মূল। বিশেষ করে এ ব্যবস্থাপনায় সংসদকে আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া সম্পূর্ণরূপে কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মাহর ইজমা'র বিপরীত।' (আদইয়ান কি জঙ্গ : ৫৬)

প্রিয় ভাই! আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না, গণতন্ত্রে আল্লাহর আইন-কানুনকে পার্লামেন্টের মুখাপেক্ষী বানানো হয়। এ ব্যবস্থাপনায় আল্লাহ এবং তার রাসুলের অকাট্য আইন ও বিধানগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলো সংসদে পাশ হয়। এ কারণে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যদি ইসলামি আইন-কানুনের বাস্তবায়ন থাকেও, এরপরও সেই রাষ্ট্রের গণতন্ত্র বৈধ হয়ে যাবে না। কারণ, সেখানে ইসলামি আইনগুলো এ জন্য বাস্তবায়িত হয়নি যে, আল্লাহ এবং তার রাসুল ﷺ এগুলোর আদেশ করেছেন। বরং এ জন্য হয়েছে যে, অধিকাংশ জনগণ তা চেয়েছে। এরপর যখন তারা আবার ভিন্নটা চাবে, তখন সেই ভিন্ন কিছুই এখানে কার্যকর হবে। তো এই ব্যবস্থায় হাকিমিয়্যাত তথা বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা আল্লাহকে না দিয়ে পার্লামেন্টকে দেওয়া থাকে, যারা অধিকাংশ জনগণের রায়কে মূল্যায়ন করে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

গণতান্ত্রিক প্রভুরা আল্লাহ কর্তৃক অবৈধ ও হারামকৃত বস্তুকে সহজেই বৈধ ও হালাল বানিয়ে ফেলে। একইভাবে অবশ্য পালনীয় ফরজকে হারাম ও অবৈধ বানিয়ে ফেলে। এ কারণেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মদ, ব্যভিচার, সমলিঙ্গে বিয়ে, ভাই-বোনে বিয়ে, ফ্রি মিক্সিং, ফ্রি সেক্স এবং পতিতাবৃত্তি থেকে শুরু করে অনেক জঘন্যকর্মকে বৈধতা দেওয়া হয়, যেগুলোকে আল্লাহ হারাম করেছেন। একইভাবে এতে হদ, কিসাস, জিহাদ থেকে শুরু করে অসংখ্য বিধানকে হারাম বানিয়ে ফেলা হয়, যেগুলোকে আল্লাহ ফরজ করেছেন।

এভাবে গণতন্ত্রে আল্লাহর সঙ্গে সুস্পষ্টরূপে শিরক করা হয়। কারণ, এ ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের অধিকার পার্লামেন্টকে দিয়ে দেওয়া হয়। এটা এমন এক অপরিহার্য মূলনীতি, যা ছাড়া কোনো সরকারকেই গণতান্ত্রিক বলা হবে না। আর

এই গণতন্ত্রের সুরক্ষার জন্য রয়েছে প্রত্যেক দেশে জাতীয় নিরাপত্তাবাহিনী। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও এর সুরক্ষায় সদা তৎপর।

গণতন্ত্রের পবিত্র(?) ধর্মগ্রন্থ:

প্রিয় ভাই! প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের প্রভুরা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি জীবনব্যবস্থা প্রণয়ন করে থাকে, যাকে তারা নাম দেয় পবিত্র(?) সংবিধান; এটি গণতন্ত্রের পবিত্র(?) ধর্মগ্রন্থ। যেহেতু এই গ্রন্থে কুরআনের আইনের বিরোধী আইনসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়, তাই এটি একটি কুফুরিগ্রন্থ।

মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রের সংবিধানের ধোঁকা দেখুন! অনেক মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রের সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' লিখা থাকে; যাতে করে সাধারণ জনগণ একে পবিত্র মনে করে। প্রশ্ন করি, একটি কুফুরি কিতাবের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' লিখলেই কি তা হালাল হয়ে যায়?? 'আমি 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' বলার পর যদি এই কথা ঘোষণা দেই, সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ, আইন প্রণয়ন বা বিধান দেয়ার অধিকারও জনগনের, ভিন্নভাবে বললে- আমি আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র বিধানদাতা হিসেবে মানি না, কিংবা আল্লাহকেও মানি জনগনের বিধানদেয়ার অধিকারকেও মানি, তাহলে ভাই আপনিই বলুন, এই 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' বলার দ্বারা কী ফায়দা? এটি কি আমার কুফুরি এবং শিরককে মিটিয়ে দিবে?? (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)।

এইবার আমাদের মূর্খতা দেখুন- গণতন্ত্রের প্রভুরা যখন সংবিধান থেকে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' কথাটি তুলে দেয়ার জন্য সংসদে আইন পাশ করে, তখন আমরা আন্দোলনে রাস্তায় নেমে পড়ি। হায়! এই কুফুরী সংবিধানকে রাষ্ট্র থেকে উচ্ছেদ করার জন্য আমাদের আন্দোলন বা কর্মসূচি কোথায়?? এমন একটি কুফুরি গ্রন্থ থেকে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' তুলে দেয়াই উচিত, কেননা একটি কুফুরি গ্রন্থের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' লিখার দ্বারা বরং 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' কালিমাটির প্রতি এক প্রকারের অবমাননা করা হয়। আমাদের দ্বীনী বুঝ এত কম হলে চলে কি ভাই? দ্বীনের ব্যাপারে যদি আমরা আরো চালাক চতুর ও চৌকষ না হই, যদি এমন লো আইকিউ'র পরিচয় দেই, তাহলে আমরা শয়তান ও তার চ্যালাপ্যালাদের হাসির পাত্র হয়ে যাব!! আল্লাহ্ পাক আমাদের হেফাযত করুন।

গণতন্ত্রের বিচার বিভাগ:

গণতন্ত্রের প্রভুদের বানানো মনগড়া আইন অনুযায়ী যেখানে বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হয়, তার নাম কোর্ট বা আদালত। যেহেতু এখানে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার কার্য অনুষ্ঠিত হয় না, তাই এটি কুফরের আরেকটি মারকাজ।
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

"যে সব লোক আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের।" (৫ সূরা মায়েদা: ৪৪)

প্রিয় ভাই! আল্লাহর ইচ্ছার (বিধানের) কাছে আত্মসমর্পনকারী একজন খাঁটি মুসলিমের কাছে গণতান্ত্রিক পার্লামেন্ট (সংসদ) কিংবা বিচারকেন্দ্র (আদালত)-গুলো 'মন্দির' কিংবা 'গির্জার' মতোই ঘৃণিত, যেখানে কুফর ও শিরক চর্চা করা হয়। বরং, এগুলো মন্দির কিংবা গির্জার চেয়েও ভয়ংকর। কেননা, মন্দির কিংবা গির্জার কুফুরি ও শিরকী কার্যক্রম সাধারণ মুসলমানও বুঝে, এগুলোকে জায়েয করার জন্য কেউ ফতোয়া তালাশ করে না; অথচ পার্লামেন্ট

(সংসদ) কিংবা আদালতের কুফুরি বড় কুফুরি (কুফরে আকবার) ও বড় শিরক (শিরকে আকবার) হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ সাধারণ মুসলমান এগুলোর কুফুরি ও শিরকের দিকগুলো বুঝেই না, যার ফলে তারা দলে দলে এই কুফর ও শিরকী ব্যবস্থার ফাঁদে ফেঁসে যায়, সমর্থন দেয়, এগুলোর মাঝেই দেশ ও জাতির উন্নতি খুঁজে বেড়ায়; এমনকি অনেক আলেম ভাই ও ইসলামপন্থী দল এই কুফুরী ব্যবস্থাকে জায়েয করার জন্য নানা বাহানা ও ছিদ্রান্বেষন করেন এবং এই কুফুরি ব্যবস্থায় অংশগ্রহন করেন। (আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে হেফাযত করেন। আমীন।)

প্রিয় ভাই, আমরা কি তাগুতের সংসদ কিংবা আদালতকে ততখানি ঘৃণা করি যতটুকু একটি শিরকের মূর্তিকে করি?? তাগুত সরকার তথাকথিত পবিত্র(?) আদালত প্রাঙ্গনে ন্যায়বিচারের(?) প্রতীক গ্রিক দেবী থেমিসের মূর্তি কেন বসাবে এই নিয়ে আমরা আন্দোলনে সোচ্চার হয়ে উঠি! অথচ আমরা এই বোবা মূর্তি স্থাপনের চেয়েও বড় শিরক "আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আইন রচনা করা এবং মানবরচিত আইনে বিচারকার্য পরিচালনা করা"- এই বিষয়ে কখনো আন্দোলন করিনা। আমরা এই বিষয়টি লক্ষ্য করিনা, এই বোবা প্রভু (থেমিস মূর্তি) ইসলামের বা মুসলমানদের যতটুকু ক্ষতি করছে, তার চেয়ে হাজার কোটি গুণ বেশি ক্ষতি করছে এই বোবা মূর্তির পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা আদালতটি, যে কথা বলে, বোবা নয়, যে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে বিচারকার্য পরিচালনা করছে, হাজার হাজার নিরপরাধ মুসলমানের উপর যুলুম-নির্যাতন করছে, হাজার হাজার ইসলামপন্থীদের আজীবন কারাবাসের ঘোষণা দিচ্ছে, গোস্তাকে রাসূল-কে হত্যাকারী ও অন্যান্য নবীপ্রেমিক মুজাহিদ ভাইদের মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে, হক্কানী উলামায়ে কেরামদের উপর নির্যাতনের স্টীমরোলার চালিয়ে তাদেরকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে, বাকরুদ্ধ করে দিচ্ছে। যারাই এই কুফুরী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'টু' শব্দ করছে, তাদেরই গলাটিপে ধরছে, রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যায়িত করছে। প্রিয় ভাই! আপনিই বলুনতো, এসবের কোনগুলো ঐ বোবামূর্তি করতে পারছে??.............

গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিরক্ষা বাহিনী:

প্রতিটি গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করার জন্য তাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষা বাহিনী রয়েছে, যারা 'গণতন্ত্র' নামের এই কুফুর ও শিরকী ব্যবস্থাকে নিজেদের জীবন বাজি রেখে প্রতিরক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। এদের অনুপস্থিতিতে এই শাসনব্যবস্থা মুহূর্তের জন্যও টিকবে না। এরা মুসলমানদেরকে এই কুফুরি শাসনব্যবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য করে। এরা গণতন্ত্র নামক কুফরকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য প্রয়োজনে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

- **গণতন্ত্র বনাম ইসলাম:**

প্রিয় ভাই! গণতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে রাত-দিন পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। একটি আরেকটির সম্পূর্ণ বিপরীত। আসুন, এরকম কিছু মৌলিক পার্থক্য জেনে নেয়া যাক-

গণতন্ত্র	ইসলাম
১) গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি 'জনমত'।	১) ইসলামের মূলভিত্তি আল্লাহর অভিপ্রায়।
২) সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের নাম 'গণতন্ত্র'।	২) আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্থনের নাম ইসলাম।
৩) সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ।	৩) সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ।

৪) সার্বভৌমত্বের মালিক জনগণ।	৪) সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ।
৫) মানবরচিত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি।	৫) আল্লাহ্ প্রদত্ত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি।
৬) মত প্রকাশে, ভোট দানে ও নির্বাচনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমান অধিকার স্বীকৃত।	৬) কে কতটুকু অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা লাভ করবে, ইসলামী শরীয়তে তার সুনির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে। তবে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও তাকওয়ার ভিত্তিতে গুনীজনেরা বিশেষভাবে মূল্যায়িত হবেন।
৭) উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়েই সমান বিবেচিত।	৭) উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের প্রভেদ বিদ্যমান।
৮) নারী ও সংখ্যালঘুরা সাধারণভাবে সমাধিকার ভোগ করবে।	৮) শক্তি ও মেধার তারতম্যের কারণে নারী ও সংখ্যালঘুরা সংরক্ষণ নীতির অধীনে ভোগ করবে বিশেষ অধিকার।
৯) পরমত সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের এক বিশেষ আদর্শ। নৈতিকতার কোনো বালাই নেই গণতন্ত্রে। যেমন: জরায়ুর স্বাধীনতা বা সমকামিতা কোন মতামতকেই বর্জন করতে বাধ্য নয় গণতন্ত্র।	৯) শ্বাশ্বত আদর্শ নৈতিক মানসম্পন্ন পরমত সমাদৃত, ওহী নির্দেশিত। অনৈতিক পরমত ইসলামে বর্জনীয়।
১০) গরিষ্ঠের সমর্থন সকল বৈধতার মানদণ্ড।	১০) শাশ্বত বা প্রত্যাদিষ্ট বিধান (ওহী) গরিষ্ঠের সমর্থন ছাড়াই বৈধ।
১১) জাগতিক উন্নয়নেই সকল চেতনা সীমিত-এই অর্থে প্রগতি।	১১) জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে চেতনা পরিব্যপ্ত- এই অর্থে প্রগতি।
১২) জবাবদিহিমূলক সরকার পদ্ধতি।	১২) চরম জবাবদিহিমূলক সরকার পদ্ধতি।
১৩) মানবরচিত আইন দ্বারা বিচার কার্য নিয়ন্ত্রিত।	১৩) আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন দ্বারা বিচার কার্য নিয়ন্ত্রিত।
১৪) সংবিধান কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত।	১৪) প্রত্যাদিষ্ট বিধান (ওহী) কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত।
১৫) জীবনের সর্বস্তরে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচায়ক।	১৫) জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোই ইসলামী মূল্যবোধের পরিচায়ক।
১৬) গণতান্ত্রিক বিশ্বাসে ধর্ম অবশ্যই রাজনীতি বিবর্জিত।	১৬) ইসলামী বিশ্বাসে মানুষের প্রথম উপাধি খলীফা/প্রতিনিধি, কাজেই ইসলাম ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য।
১৭) অর্থনীতির মূলভিত্তি পুঁজিবাদ ও সুদ; যেখানে ধনীরা আরো ধনী হয়, আর গরীবরা আরো গরীব হতে থাকে। ফলে দারিদ্রতা ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়।	১৭) যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি যেখানে সম্পদের সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত করা হয়; ফলে ধনী ও গরীবের মধ্যে বিদ্যমান বিভেদ ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেতে থাকে; দারিদ্রতা নির্মূল হয়ে একসময় সকলেই যাকাত দেয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়।

• এই যামানার কুফর বনাম ঐ যামানার কুফর:

প্রিয় ভাই! গণতন্ত্রের কুফর অতীতের সকল কুফরের চেয়ে ভিন্ন। অতীতে কুফরের ধরন ছিল, মানুষ সরাসরি এক ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করত আর কেবল তখনই তাকে কাফির বলা হতো। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রের কুফরে সরাসরি আল্লাহ কিংবা তার রাসুলকেও অস্বীকার করা হয় না, ব্যক্তিগত কিছু ইবাদত পালনেও বাধারোপ করা হয় না। দাজ্জালী ফিতনার ধরনটিই এমন। সে শুধু বলবে, তোমরা গণতন্ত্রকে মেনে নাও। গনতান্ত্রিক রাজনীতিতে তোমরা অংশগ্রহণ কর। তোমরা যে কোনভাবে অংশগ্রহন কর না কেন তাতে কোন সমস্যা নেই। চাই দ্বীনদারির সাথে অংশগ্রহন কর কিংবা বদদ্বীনির সাথে- সব কিছুই মেনে নেয়া হবে। ইসলাম নিয়ে অংশগ্রহন করতে চাও? শরীয়তের কথা বলতে চাও? তাহলেও কোন সমস্যা নেই, সবই বরদাশত করা হবে; তথাপি তোমরা গণতন্ত্রে অংশগ্রহন কর! এই ফেতনা আমাদেরকে আরো বলবে, তুমি নামায পড়, রোযা রাখ, হজ্জ কর, যাকাত দাও, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা কর বা মাদরাসার খেদমত কর, আত্মশুদ্ধির মেহনত কর, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত কর, তোমার দাঁড়ি-টুপি-পাগড়ি সবই ঠিক থাক, কোনো সমস্যা নেই! শুধু রাষ্ট্রীয় বিধানের অধিকারটা গণতন্ত্রের প্রভুদেরকে দিয়ে দাও। ব্যস, তোমার ঈমান বের হয়ে গেল, এখন তুমি যত বেশি ইচ্ছা তত নেক আমল কর, তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

এই জন্যই প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. مسلم،ج:١ ص:١١٠
صحيح ابن حبان، ج:١٥ ص:٩٦

"ফেতনাসমূহ প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই যা নেক আমল করার, দ্রুত করে ফেল! কেননা, ফেতনাসমূহ অন্ধকার রাত্রির অংশের মত (কালো) হবে (মানুষ বুঝতেই পারবে না যে সে ফেতনায় পতিত হচ্ছে)। ঐ ফেতনার সময় মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, সন্ধায় কাফের হয়ে যাবে। অথবা সন্ধায় মুমিন থাকবে, সকালে কাফের হয়ে যাবে। দুনিয়ার তুচ্ছ লাভের আশায় স্বীয় দ্বীনকে বিক্রি করে দিবে।" (সহীহ মুসলিম, সহীহ ইবনে হিব্বান)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :يأتي على الناس زمان، الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني. سنن الترمذي :ج:٤ ص:٥٢٦

"মানুষের উপর এমন একটা সময় আসবে যখন দ্বীনের উপর অটল থাকা হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মত কঠিন হয়ে যাবে।" (তিরমিযি)

প্রিয় ভাই!

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বর্তমান যামানাই সেই যামানা যখন একজন মানুষ সকাল করছে ঈমানদার হিসেবে, আর বিকালেই কাফের হয়ে যাচ্ছে। কিংবা সন্ধ্যায় মুসলমান আর সকালেই কাফের হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু সে বুঝতেই পারছে না। কেননা, সে তো সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করছে, সিয়াম পালন করছে। সকাল-সন্ধ্যা তাসবীহ-তাহলীল আদায় করছে। ব্যক্তিগত জীবনে অনেক নেক আমল করার পরও যদি বিধান দেয়ার অধিকার গাইরুল্লাহকে দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তার সমস্ত নেক আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। তার নামের তালিকা কুফুরী করনেওয়ালাদের তালিকায় চলে যাবে। (আল্লাহ্ পাক আমাদের হেফাযত করুন। আমীন।)

• গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটি ধোঁকার নাম:

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের সঙ্গে অনেক ধরণের প্রতারণা রয়েছে, যা আমাদের দেশগুলোতে খুবই স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

মক্কার জাহেলি যুগের পার্লামেন্ট (দারুন নদওয়া) এই কাজই করত। নিজেদের কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, দাপট, রাজত্বকে দৃঢ় করার জন্য যা ইচ্ছা হালাল বা বৈধ করে দিত, যা ইচ্ছা হারাম বা অবৈধ করে দিত। তারপর সেই আইন প্রণয়নকে ধর্মের মুখোশ পরানোর জন্য নিজেদের উপাস্যদের দিকে সম্বন্ধ করে দিত যে, এসব তো তোমাদের উপাস্যদের পক্ষ থেকে; যাতে মূর্খ মানুষ তাতে প্রশ্ন করার অবকাশ না পায়।

এখানে সেই ধর্মীয় রাজনৈতিক বাস্তবতা বোঝা প্রয়োজন যে, প্রত্যেক যুগে ক্ষমতাবানরা আইন প্রণয়নের পর সেটিকে নিজেদের প্রভুদের প্রতি সম্বন্ধ করে থাকে। এ ক্ষমতাবান শ্রেণি সেই আইন প্রণয়নকে সচরাচর নিজেদের দিকে সম্বন্ধ করে না। নব্য জাহেলি ব্যবস্থায় হাকিমিয়্যাতের সব ক্ষমতাকে জনগণের দিকে সম্বন্ধ করা হয়। আর এটিই হলো এ জাহেলি ব্যবস্থার প্রধান প্রতারণা। বাস্তবতা হলো, সব ক্ষমতা নেতাদেরই হাতে। আরেকটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, গণতন্ত্রের আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা মূলত নেতাদের হাতেও নয়, আন্তর্জাতিক একটি মহলের হাতে, দিবানিশি যাদের দাসত্ব করে যায় আমাদের গণতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ, হোক সে ইসলামী কিংবা অনৈসলামিক দল। কেননা তারা বিদেশী প্রভুর বাঁধা-ধরা এবং নির্দেশিত আইনের বাহিরে নিজেদের পছন্দমত কোনো আইনই সংসদে পাশ করতে পারে না, ইসলামী আইনতো আরো বহু দূরের কথা!

প্রিয় ভাই! 'কোনো জাতির নেতৃস্থানীয় লোকজন আল্লাহর কিতাব ছেড়ে নিজেরাই কেন স্বতন্ত্র শরিয়তপ্রণেতা হয়ে যায়? কেন তারা আইন প্রণয়নে হাত দিয়ে দেয় এবং আল্লাহর সেই ক্ষমতাকে নিজেদের হাতে তুলে নেয়? এর কারণ হলো, সেই ক্ষমতার মাধ্যমে তারা নিজেদের দাপট-কর্তৃত্বের ভিত্তি মজবুত করতে চায় এবং নিজেদের ও সমমনাদের প্রবৃত্তির সুরক্ষা দিতে পারে; ইচ্ছামতো আইন তৈরি করতে পারে এবং সাধারণ মানুষকে নিজেদের দাস বানিয়ে রাখতে পারে। তারপর সেই আইন প্রণয়নকে সম্মানিত করার জন্য সেটাকে কোনো ধর্ম বা কোনো মতবাদের মুখোশ পরিয়ে দেয়; যাতে মানুষ ধর্মীয় শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে সেটার ইবাদত করে এবং সেটার বিরোধিতাকে পাপ মনে করে। ফলে সাধারণ মানুষ পুরো জীবন নেতৃত্বস্থানীয়দের সেবাদাস হয়েই থাকে।

এ ক্ষমতা অর্জিত হওয়ার পর ক্ষমতাশীলরা শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আইন প্রণয়নই করে না; বরং সমাজকে নিজেদের ক্ষমতার ক্রীড়নক বানাতেও নিজেদের পক্ষ থেকে আইন বানিয়ে নেয়। তারা আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই পরিপূর্ণ একটি ধর্ম বানিয়ে নেয়।

কখনো কখনো মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংবিধানে কিছু কিছু ইসলামী আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিছু আইনের ধারা রাখা হয়। এর দ্বারা মূলত সেখানে দ্বীনি দলগুলো এবং জনগণের চোখে ধুলো দেওয়া হয়ে থাকে। অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের জনগণ ইসলামকে মহব্বত করেন। এমতাবস্থায় যদি শরয়ী আইন-কানুনকে পূর্ণাঙ্গরূপে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে দ্বীনি দলগুলো গণতন্ত্রের প্রভুদের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি এখানে শরয়ী সকল আইন-কানুন বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক প্রভু সম্প্রদায় (আমেরিকা ও পশ্চিমারা) এটা কখনোই গ্রহন করে নিবে না। তাই এখানে এর সহজ সমাধান হলো-শরীয়তের কতক আইন-কানুনকে দেশীয় আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে, কিন্তু বাস্তবে তার উপর আমল কখনো করা হয় না। বিষয়টি যেন এমন হলো যে, এর দ্বারা দ্বীনদারদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে, অন্যদিকে দ্বীনের দুশমনরাও অসন্তুষ্ট হবে না।

• একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ইসলামের করুন দশা:

** আসলে গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা হলো সেই পুরোনো জাহিলিয়্যাতের নতুন সংস্করণ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যদিও ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার দাবী করে, সকল ধর্ম সমান অধিকার লাভ করবে বলা হয়ে থাকে; কার্যত এটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আরেকটি বড় ধোঁকা। গণতন্ত্র প্রায় সকল মত ও পথকে অনুমোদন দেয়, কেবল ইসলাম ছাড়া। যদিও নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমল করতে নিষেধ করা হয় না বা বাধা দেয়া হয় না, কিন্তু ইসলামের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থান, কর্তৃত্ব ও বিধানসমূহকে গণতন্ত্র কোনো অবস্থাতেই মেনে নেয়না বা সহ্য করে না। আর যে সকল মুসলমান ইসলামের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থান, কর্তৃত্ব ও বিধানসমূহ নিয়ে কথা বলেন, তাদেরকেই মৌলবাদী, জঙ্গী ইত্যাদি ট্যাগ প্রদান করা হয়, তাদেরকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যায়িত করা হয়, যুলুম নির্যাতনের শিকার করা হয়, জেলবন্দী করা হয়, শহীদ করে দেয়া হয়। এটাই গণতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ।

** গণতন্ত্র একদিকে ইসলামকে দমন করে, অন্যদিকে ইসলামবিরোধী সকল প্রকার পাপাচার ও অশ্লীলতাকে প্রমোট করে। গণতন্ত্রের কর্তৃত্বকালীন মানুষ শুধু পাপাচারেই লিপ্ত হয় না; বরং পাপাচার প্রসার করার দাওয়াত, তার প্রতি অনুরোগ ও উৎসাহিতকরণ এবং পাপাচারের সব উপকরণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় জোগাড় করা হয়। পাপাচারের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার দাওয়াত, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এগুলো প্রচার ও সুরক্ষাদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব সাব্যস্ত করা হয়। সুদের ভাগাড় (ব্যাংক) হোক বা বেহায়াপনার আখড়া (মালিশকেন্দ্র, সিনেমাহল, ক্যাবল, টিভি, ইন্টারনেট, নাইটক্লাব, ক্যাফে ইত্যাদি) হোক বা গানবাজনার অনুষ্ঠান হোক—এদের কারও কোনো আশঙ্কা হলে রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের নিরাপত্তা দেওয়াকে নিজেদের ওপর ফরজ মনে করে। এমন মুহূর্তে কোনো ঈমানদার পাপাচার রুখতে উঠে দাঁড়ালে তাকে লাল মসজিদ ও জামিয়া হাফসার মতো টার্গেট করা হয়।

** অনেক মানুষ ধারণা করে, ডেমোক্রেসি মানে- স্বাধীনতা, মুক্ততা! এটি একটি ভুল ধারণা। যদিও 'স্বাধীনতা' ডেমোক্রেসির উদ্ভাবিত একটি পণ্য। আমরা এখানে স্বাধীনতা বলতে বুঝাতে চাই: বিশ্বাসের স্বাধীনতা, চারিত্রিক স্খলনের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা। ইসলামী সমাজের উপর এগুলোর নেতিবাচক প্রভাব অনেক। এ প্রভাব মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে রাসূলগণ, তাদের রিসালাত, কুরআন, সাহাবায়ে কেরামের উপর দোষারোপ করার পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। স্বাধীনতার নামে বেপর্দা, বেহায়াপনা, খারাপ ছবি ও ফিল্ম অনুমোদন দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এভাবে এর তালিকা লম্বা হতেই থাকে। এ সবগুলো উম্মতের দ্বীনদারি ও চরিত্র ধ্বংস করার অপচেষ্টা। পৃথিবীর নানা রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক শাসনের আড়ালে যে স্বাধীনতার দিকে আহ্বান জানায় সে স্বাধীনতা আবার সবক্ষেত্রে নয়। বরং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির শিকলে এ স্বাধীনতা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কুরআনকে অবমাননা করার অনুমোদন দান করে; কিন্তু 'মুশরিক নেতা শেখ মুজিব'কে নিয়ে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নিষেধ। বরং যে কেউ মুশরিক নেতা শেখ মুজিবকে নিয়ে কোনো বাস্তবসম্মত মন্তব্যও করবে তাকে দেশদ্রোহী'র তকমা লাগানো হয়, তাকে শাস্তি দেয়া হয়, জেলে পুরা হয়।

যদি আসলেই তারা স্বাধীনতার আহ্বায়ক হতো তাহলে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণকে নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেদেরকে নেয়ার সুযোগ দিল না কেন?! কেন তারা মুসলমানদের দেশগুলোকে উপনিবেশ বানাল, তাদের ধর্ম ও বিশ্বাস পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করল? ইতালিয়ানরা যখন লিবিয়ার জনগণকে হত্যা করছিল তখন এ স্বাধীনতা কোথায়

ছিল? ফ্রান্স যখন আলজেরিয়াতে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল অথবা ইতালিয়ানরা মিশরে গণহত্যা চালাচ্ছিল বা আমেরিকানরা যখন আফগান ও ইরাকে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল তখন এ স্বাধীনতা কোথায় ছিল?

** একটি গণতান্ত্রিক মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে একজন মুশরিক নেতার যতটুকু সম্মান ও ইজ্জত আছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ﷺ ততটুকু সম্মান ও ইজ্জত নেই। বিদেশী প্রভুদেরকে খুশি রেখে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ শানে গোস্তাকদেরকে (অবমাননাকারী নাস্তিক-মুরতাদদেরকে) রাষ্ট্রীয়ভাবে নিরাপত্তা দেয়া হয়, অন্যদিকে গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক প্রভুদের মনোরঞ্জন করার জন্য নবীপ্রেমিক তাওহীদী জনতার উপর হামলা করা হয়, তাদের উপর অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালানো হয়, তাদেরকে শহীদ করা হয়। অথচ এই লোকগুলোই নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করে। প্রিয় ভাই! আল্লাহর রাসূলের শানে গোস্তাকী করনেওয়ালাদের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করে, তাদেরকে যারা তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়ে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়, সেই সকল ভাইদেরকে কি আরেকজন ঈমানদার অত্যাচার নির্যাতন করতে পারে কিংবা হত্যা করতে পারে? যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দুশমন তারাই কেবল এমন কাজ করতে পারে!! তাহলে ভাই! গণতন্ত্রের যারা সুরক্ষা দেয়, যারা গণতন্ত্রের পক্ষে লাঠি ধারণ করে আর তাওহীদবাদী মুসলমানদের যারা মাথা ফাটায়, সেই সকল প্রতিরক্ষা বাহিনীকে কেন (দলগতভাবে) কাফের বলা হবে না???............

** মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরিয়তকে প্রতিহত করার জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সকল শাখা (তথা সরকার, প্রশাসন, বিচারবিভাগ, গণমাধ্যম) নিজেদের মতো করে কাজ করে যায়। তেমনিভাবে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা, ইসলামের নিদর্শনাবলি (দাড়ি, টুপি, হুদুদ, কিসাস)-কে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা, উম্মাহকে জিহাদ থেকে দূরে সরানোর বিভিন্ন পায়তারা করা, মাদরাসা, উলামা ও দীনি শিক্ষার প্রতি ঘৃণা ছড়ানো ওদের মৌলিক মিশনের অন্তর্ভুক্ত।'

** এ ছাড়াও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দাঁড়িয়েই রয়েছে সুদ এবং করের ওপর; ইসলামের দৃষ্টিতে যে দুটো অত্যন্ত জঘন্য। যা সমাজকে একেবারে বরবাদ করে দেয়। গরীবের রক্ত চুষে খায় আর পুঁজিবাদীদের রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

** ইসলাম শক্তি প্রয়োগ করে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ প্রদানের শিক্ষা দেয়। তাছাড়া ইসলামে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ প্রদান করা ফরয। কিন্তু গণতন্ত্রে অসৎকাজ, নোংরাকাজ স্বীয় অবস্থায় বহাল থাকা, তার প্রচার-প্রসার হওয়া, এটা অসৎকাজের গণতান্ত্রিক অধিকার। কেননা, গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিই হচ্ছে: Book For Book এবং Tv Channel For Tv Channel অর্থাৎ বইকে তার আপন অবস্থায় এবং টিভি চ্যানেলকে তার আপন অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে। তাই এখন যদি কেউ খুব অশ্লীল বই লিখে, তাহলে তাকে লিখতে দাও, এই বইকে প্রচার-প্রসার হতে দাও। যদি তোমার কাছে অশ্লীল মনে হয় তাহলে তুমি এই বই পড়ো না। তার চেয়েও যদি আরো বেশী খারাপ লাগে, তাহলে তুমি এই বইয়ের পরিবর্তে আরেকটি ভাল বই লিখে ফেল। অথবা ধরুন: কেউ খুব অশ্লীল টিভি চ্যানেল খুলল, যেখানে চূড়ান্ত পর্যায়ের অশ্লীল দৃশ্য দেখানো হয় বা তাতে কুফরী মতবাদ ছড়ানো হয়, তাহলে তাতেও কোন সমস্যা নেই। আপনি সেই চ্যানেল দেখবেন না, এটা ছাড়া অন্যান্য চ্যানেল তো আরো অনেক আছে, আপনি সেগুলোর মধ্য থেকে ভালো চ্যানেলগুলো দেখুন। এরপরেও যদি আপনার বেশী কষ্ট লাগে এবং আপনার সক্ষমতাও আছে, তাহলে আপনি একটি ভালো চ্যানেল খুলুন... কিন্তু আপনি এই অশ্লীল চ্যানেলকে শক্তি প্রয়োগ করে বন্ধ করে দিবেন, এটা আপনার জন্য বৈধ হবে না। আইন এটাকে অনুমোদন করবে

না! তা এই জন্য যে, সে যা কিছুই করবে এটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের আসল রুপ, যেখানে পবিত্র মানুষকে অপবিত্রতা বরদাশত করতে হয়। আর এটা তো প্রকাশ্য বিষয় যে, অবশেষে এই অপবিত্রতাই প্রচার-প্রসার লাভ করে থাকে। তাছাড়া দুর্গন্ধযুক্ত অপবিত্র স্থানে পবিত্র মানুষ কতক্ষণ থাকতে পারে? এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের আসল চেহারা, যেখানে অকল্যাণের সামনে কল্যাণের হাতকে সম্পূর্ণরূপে বেঁধে দেয়া হয়! অথচ ইসলাম সম্পূর্ণ তার বিপরীত। কারণ, ইসলাম সমাজকে পবিত্র রাখার উপর তাগিদ প্রদান করে। কেননা, ব্যক্তি ও সমাজ সকলের দায়িত্ব হলো: তারা অসৎকর্মের রাস্তা প্রতিরোধ করবে এবং অশ্লীলতা ও নোংরামী যারা প্রচার-প্রসার করে তাদেরকে প্রতিহত করবে।

• গণতান্ত্রিক ইসলামী দলগুলোর অবস্থা:

প্রিয় ভাই আমার! এখন আমরা কিছু স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এগুলো ভাই একান্তই আত্মসমালোচনা! ইসলামী রাজনীতি মনে করে গণতন্ত্রকে অবলম্বন করার কারণে আমাদের অশুভ পরিণতি ও আমাদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে কিছু আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

প্রিয় ভাই! মেহেরবানী করে আমরা নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করি, বিষয়গুলোর বাস্তবতা অনুধাবন করার চেষ্টা করি এবং নিজেদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বৈশ্বিক জিহাদের একক পতাকাতলে একত্রিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

** প্রচলিত ধর্মীয় রাজনীতির সাথে আমরা যারা সম্পৃক্ত, ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে বাঁধ হওয়ার পরিবর্তে কালক্রমে স্বয়ং আমরাই তার স্রোতে ভেসে যাচ্ছি। আমরা দ্বীনের ধারক-বাহকরা যখন এই পথে পা বাড়াচ্ছি, তখন দ্বীনকে বিজয়ী করা তো অনেক পরের কথা, স্বয়ং আমাদের দ্বীন-ই শংকার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। এই পথে চলার দ্বারা দ্বীনের উন্নতি সাধন করা তো অসম্ভব, কিন্তু এর দ্বারা স্বয়ং আমরা (দ্বীনের ধারক-বাহকরা) ধর্মহীনতা প্রচার-প্রসারের উল্লেখযোগ্য কারণ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছি। আমাদের কারণে কাফিরদের শক্তি-সামর্থ বেড়ে যাচ্ছে এবং অসৎ কর্মকান্ডের উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

এই গণতান্ত্রিক রাজনীতির শয়তানী দিকটা হলো: শরয়ীভাবে পালনীয় আবশ্যকীয় আমল এবং দ্বীনি দায়িত্ব পালন করাটা ধর্মীয় রাজনীতিবিদদের জন্য একটা সময় বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। যা থেকে মুক্ত হতে পারার মধ্যেই দ্বীনের ধারক-বাহকরা তাদের রাজনৈতিক সফলতা দেখতে পায়!

** আমরা (দ্বীনি রাজনৈতিক দলগুলো) বাতিলদের বিজয় ও ক্ষমতায়নকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জেনে বা না জেনে গ্রহন করে নিচ্ছি। বরং এছাড়া আমাদের আর কোনো উপায়ও থাকছে না।

** গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মাপকাঠি ঠিক করে দেয় স্বার্থ। এ কারণেই আমরা (দ্বীনের ধারক-বাহকরা) যখন এই ময়দানে অবতীর্ণ হই, তখন জুলুম, নির্লজ্জতা, অসৎকাজ এবং কুফরী মতবাদের মত অনিষ্টতা প্রচার-প্রসারকারীদেরকে প্রতিহত করা তো পরের কথা, সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে এ সকল ফ্যাসাদকে 'ফ্যাসাদ' বলে আখ্যায়িত করাটাও আমাদের আয়ত্বে থাকে না। বরং এই ফ্যাসাদগুলো রক্ষা করা যেহেতু আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়, তাই আমরা তাদের (অনিষ্টতা প্রচার-প্রসারকারীগণ)-কে সন্তুষ্ট রাখা নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসাবে স্থির করে নিচ্ছি।

** আমরা (রাজনৈতিক দ্বীনি ভাইয়েরা) সেনাবাহিনী ও ধর্মনিরপেক্ষ মিডিয়াকে সন্তুষ্ট রাখাকে নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্থির করে নিয়েছি। আর এ কারণেই সেনাবাহিনীর নির্লজ্জ অত্যাচার, ইসলামী শরীয়াহর সাথে তাদের শত্রুতার প্রচন্ড যুদ্ধক্ষেত্র অথবা ধর্মনিরপেক্ষ মিডিয়ার নির্লজ্জতা ও ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণের ক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকার পরও আমাদের রাজনৈতিক দ্বীনি ভাইদেরকে এই শ্রেণীর লোকগুলির সাথে তাদের সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ করতে দেখা যায়!

** একটি সময় এমন ছিল, যখন ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতার মোকাবিলা করাই দ্বীনি দলগুলোর প্রধান টার্গেট হত এবং তারা আল্লাহ তা'আলা থেকে দুরত্ব অবলম্বন এবং দ্বীনের দুশমনদের এই ক্ষমতাকেই অসচ্ছলতা, বেকারত্ব ও নিরাপত্তাহীনতার মূল কারণ হিসাবে বিবেচনা করতেন। কিন্তু ভাই বর্তমান অবস্থা দেখুন! স্বয়ং অনেক দ্বীনি দলগুলোর প্রধানরা পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি সমস্যা বলতেও নারাজ বোধ করছেন! আজ এই সকল ভাইদের মুখে শুনা যায়-সমাজের সমস্যার সমাধান যেন রয়েছে "আইনের শাসন, সম্পদের সুষম বন্টন এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মান"!-ইত্যাদির মধ্যে! বর্তমানে এই সমস্ত কথা-বার্তা অন্য সকল ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিই বলে থাকে। তাহলে এখন বলুন! দ্বীনি দল ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির উদ্দেশ্যের মাঝে আর কোন মৌলিক পার্থক্য বাকি থাকলো কি?!

** বর্তমানে গনতান্ত্রিক রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত আমাদের দ্বীনদার ভাইয়েরা ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের শিকারে পরিণত হওয়ার দৃশ্য সামনে আসছে। আরো আফসোসের কথা হচ্ছে; এ জাতীয় সকল চাটুকারিতা দ্বীনের নুসরতের নামে চলছে! এ জাতীয় সকল বাতিল রাজনীতির জন্য "দাওয়াতি মাসলাহাত" অর্থাৎ 'দাওয়াতী স্বার্থ' পরিভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে! অথচ বাস্তবতা হলো: যে মাসলাহাতের কথা এখানে বলা হচ্ছে, তার সাথে দ্বীনের কোন সম্পর্কই নেই!! পরবর্তীতে এই "দাওয়াতি মাসলাহাত" এমন একটা মূর্তিতে পরিবর্তিত হয়ে যায় যে, ফলশ্রুতিতে দ্বীনদার ব্যক্তিরা তার আরাধনা/পূঁজা করা শুরু করেন। আবার কখনো কখনো তিনি প্রকৃত দাওয়াত ও সুষ্পষ্ট মানহাযকে পর্যন্ত ভুলে যান! অথচ দ্বীনের দাঈ'দের জন্য আবশ্যক হলো: দ্বীনের এই দাওয়াত তার আসল তরীকার সাথে জুড়ে দেওয়া; যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছে।

** গণতান্ত্রিক তাগুতের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে ইসলামী দলগুলো মন্দকে প্রতিহত করার ও বাতিলের সামনে হুংকার দেওয়ার যে ক্ষমতা ছিল তা হারিয়ে ফেলে। তা প্রথমে আপস-মীমাংসা, তারপর পুনর্মিলন, অবশেষে এটা সহযোগিতায় পরিণত হয়...। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রভুরা অসন্তুষ্ট হতে পারে চিন্তা করে আমাদের এই ভাইয়েরা অসৎকাজে বাধা দেয়ার কথা যেন বেমালুম ভুলে যান, বা সেই ক্ষমতা যেন রহিত হয়ে যায়।

** প্রিয় ভাই! একটি কঠিন বাস্তবতা হল- গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে দ্বীনদার ভাইদের একেবারেই কোন শক্তি-সামর্থ নেই, এটার জানান দেয়। কারণ, গণতান্ত্রিক রাজনীতি শক্তি প্রদান করে না, বরং যে শক্তি ধর্মকে রক্ষা করতে পারে এবং কাফের ও ধর্মের দুশমনদের পথকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে পারে (জিহাদের শক্তি), সে শক্তিকে ছিনিয়ে নেয়। আমাদের গণতান্ত্রিক ইসলামী দলগুলোর ভবিষ্যত রাজনৈতিক কর্মপরিকল্পনা কিংবা কর্মসূচির হাজার বছরের রূপরেখার মধ্যেও প্রকৃত জিহাদ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এভাবে গণতন্ত্র সুকৌশলে একটি ঈমানী তেজোদ্দীপ্ত প্রজন্ম থেকে জিহাদকে কেড়ে নিল। আর উম্মত হারাল লাখো লাখো সম্ভাবনাময় মুজাহিদকে। সন্দেহ নেই, ইসলামের উপর এটি গণতন্ত্রের এক বিশাল বিজয়। আর এর কারণ হলাম আমরাই, যারা দ্বীন কায়েমের কর্মপন্থারূপে জিহাদকে নয়, গণতন্ত্রকে বেছে নিয়েছি। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে সঠিক দ্বীনের বুঝ দান করুন। আমীন।

** আরেকদল ভাই আছেন, যারা গণতন্ত্রকেই জিহাদ মনে করেন, মিটিং-মিছিল করে নিজেদেরকে মুজাহিদ মনে করেন। (নাউযুবিল্লাহ্)
এর পরিণতি ভাই অত্যন্ত ভয়াবহ!
এর প্রমান, ইসলামের মোড়কে গণতান্ত্রিক এই ভাইয়েরাই অনেকে আজ সত্য জিহাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ গণতান্ত্রিক প্রভুদেরকে খুশি করতে প্রকৃত জিহাদের বিরুদ্ধে মিটিং-মিছিল-র‍্যালী করছেন, ফতোয়া ইস্যু করছেন, মিথ্যা ও ভ্রান্ত প্রোপাগান্ডা দিয়ে উম্মতকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বিষীয়ে তুলছেন। নিজেদের মাদরাসাগুলোকে 'জঙ্গীমুক্ত' (তথা জিহাদমুক্ত!!!) ঘোষণা দিতে খুব তৃপ্তি বোধ করছেন, হক মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে পেরে আনন্দিত হচ্ছেন!
আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাযত করুন, সঠিক ইসলাম বুঝার তাওফীক দান করুন এবং তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। গণতন্ত্রের মতো একটি কুফুরী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার তাওফীক দান করুন। আমীন।

• গণতন্ত্র নিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন....

০১. গণতন্ত্র বনাম মজলিশে শুরা: এই দুটি কি এক???

উত্তর: কিছু মানুষ ধারণা করে- ডেমোক্রেসি (গণতন্ত্র) শব্দটা ইসলামে 'শুরা' শব্দের প্রতিশব্দ। এটি কয়েকটি কারণে ভুল। কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. শুরা বা পরামর্শ করা হয় নতুন কোন বিষয় নিয়ে, এমন বিষয়ে যে বিষয়ে কুরআন-হাদিসের বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রের পার্লামেন্টে (সংসদে) ধর্মের অকাট্য বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। এরপর হারামকে হারাম ঘোষণা করা হয় না, হালাল অথবা ওয়াজিবকে হারাম ঘোষণা করা হয়। এসব আইনের বলে মদ বিক্রির বৈধতা দেয়া হয়েছে। ব্যভিচার ও সুদের বৈধতা দেয়া হয়েছে। এসব আইনের মাধ্যমে ইসলামি সংস্থাগুলো ও আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের তৎপরতাকে কোণঠাসা করা হয়েছে। এ ধরণের কোণঠাসাকরণ ইসলামি শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক। শুরা পদ্ধতিতে এমন কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন সুযোগ আছে কি?!

২. শুরা কমিটি গঠিত হয় এমন ব্যক্তিবর্গদের সমন্বয়ে যাদের মধ্যে ফিকহ, ইলম, সচেতনতা ও চরিত্র ইত্যাদির একটা উন্নত মান বিদ্যমান থাকে। কারণ চরিত্রহীন ব্যক্তি বা বোকার সাথে পরামর্শ করা যায় না; আর কাফের বা নাস্তিকের সাথে পরামর্শ তো আরও দূরের কথা। পক্ষান্তরে ডেমোক্রেটিক পার্লামেন্টে: পূর্বোক্ত গুণগুলোর কোন বিবেচনা নেই। একজন কাফের, দুর্নীতিবাজ, নির্বোধ ব্যক্তিও পার্লামেন্ট সদস্য হতে পারবে। সুতরাং শুরার সাথে এ তন্ত্রের কি সম্পর্ক?!

৩. শাসক শুরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য নন। হতে পারে শুরা কমিটির একজন সদস্য যে পরামর্শ দিয়েছেন তার দলিলের বলিষ্ঠতার কারণে তিনি সেটাই গ্রহণ করবেন। অন্য সদস্যদের মতামতের পরিবর্তে এই মতকে সঠিক মনে করবেন। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 'অধিকাংশ সদস্যের' মত চূড়ান্ত মত। জনগণকে এ মত মেনে চলতে হবে।

অতএব, মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে- তাদের ধর্মকে নিয়ে গৌরববোধ করা, তাদের রবের পক্ষ থেকে দেয়া বিধানের প্রতি আস্থা রাখা; এ বিধান তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে যথেষ্ট এবং আল্লাহর শরিয়ত বিরোধী সকল তন্ত্র-মন্ত্র থেকে নিজের মুক্ততা ঘোষণা করা।

০২. 'দুই প্রকারের খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপের পক্ষ অবলম্বন করা'র নীতিতে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা যাবে কি??

উত্তর: নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই নীতিটির দুটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে-

১. যে প্রার্থীর আদর্শ অপেক্ষাকৃত কম ইসলাম বিরোধী তাকে ভোট দেয়ার মানে হল, কম খারাপের পক্ষ নেয়া।

২. অন্যদিকে, কাউকে ভোট না দিলে বেশি খারাপ প্রার্থীটি নির্বাচিত হতে পারে ভয়ে কম খারাপকে ভোট দেয়া।

প্রিয় ভাই, উপর্যুক্ত নীতিটি কেবল সেক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যে ক্ষেত্রে দুটি পথের একটিকে গ্রহণ না করে উপায় নেই। কিন্তু যদি এগুলো থেকে বেঁচে থাকার উপায় থাকে এবং যে কোনো একটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা না হয়-তাহলে সেক্ষেত্রে এই নীতিটি প্রযোজ্য নয়। ভোটের ক্ষেত্রে এই প্রয়োগকে এভাবে দেখা যায়: কোন ব্যক্তি একজন মুসলিম ভাইকে মদ খাওয়ার দাওয়াত দিল। সেখানে একটি মদে থাকবে ৫০% এলকোহল এবং অন্য একটি মদে থাকবে ২৫% এলকোহল। সুতরাং সে দাওয়াত গ্রহণ করে ২৫% এলকোহলের মদটি পান করল।

প্রিয় ভাই, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আমাদের কেউ বাধ্য করছে না; তাই কম খারাপকে সমর্থন করার নামে একটি শিরক করা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমরা ভোট না দিলে যে ক্ষতি হবে, তার তুলনায় এই শিরক (আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আইন তৈরির অধিকার দেয়া) অনেক অনেক বেশি ক্ষতিকর।

০৩. 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা'র নীতিতে গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করা যাবে কি??

গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করে ভালো প্রার্থীকে ভোট দেয়ার দ্বারা 'সৎকাজে আদেশ' এবং অসৎ প্রার্থীকে বিজয়ী হতে না দিয়ে মন্দ প্রার্থীকে বাধা দেয়ার মাধ্যমে 'অসৎ কাজের নিষেধ' করা হচ্ছে বলে আমরা অনেকে মনে করি। এক শ্রেণির ভাইয়েরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা কেবল 'বৈধ' বলেই ক্ষান্ত হননি, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য, পবিত্র দায়িত্ব ও ভোটকে পবিত্র আমানত মনে করেন। শুধু তাই নয়, যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহনের বিরুদ্ধে কথা বলেন, এবং মানুষকে এই সিস্টেমে অংশগ্রহণ করতে বাধা প্রদান করেন, তাদেরকে 'যালিম' সাব্যস্ত করে থাকেন। (নাউযুবিল্লাহ্)

প্রিয় ভাই, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার জন্য প্রথম শর্ত হল- সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার পদ্ধতিটি শরীয়ত সম্মত হতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হল, ঐ মুনকার (খারাপ) নিষেধ করতে গিয়ে যেন আরো বড় মুনকার (ক্ষতি) না হয়ে যায়, তা নিশ্চিত করা।

যারা মন্দ প্রার্থী আর ভালো প্রার্থীর কথা বলে নির্বাচনে অংশ নেয়াকে বৈধ করে থাকেন, তাদেরকে এ মন্দ ঠেকাতে শিরক বা কুফরের মতো মূল্য দিতে হয়। যা আরো বড় মুনকার, আরো বড় ক্ষতি। চলুন ভাই দুটি জিনিসকে পরিমাপ করে দেখি!

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

"হত্যা অপেক্ষা ফিতনা গুরুতর।" (সূরা বাকারা ২:২১৭)

মহান আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যাবত না ফেতনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন (বিজয়) সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করছেন।" (সূরা আনফাল, ৮:৩৯)

ইমাম আবু বকর জাস্সাস রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

قال ابن عباس والحسن :حتّى لا يكون شركٌ

وقال محمد بن إسحاق: حتى لا يُفْتَتَنَ مُؤْمِنٌ عن دينه

ইবনে আব্বাস ও হাসান রাযি. (ফেতনার অর্থ) বলেছেন: 'যতক্ষণ না শিরক নির্মূল হয়।' আর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক রহ. বলেন, 'যতক্ষণ না প্রতিটি মুমিন দ্বীনের ব্যাপারে বিপদের সম্মুখীন হওয়া থেকে নিরাপদ হয়।' (আহকামুল কুরআন ৩/৬৫)

অর্থাৎ উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে "ফিতনা" বলতে আল্লাহ্ পাক কুফর ও শিরককে বুঝিয়েছেন, অধিকাংশ তাফসীরের কিতাবগুলিতে তাই পাওয়া যায়।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ্ রহ. বলেছেন: "যদিও হত্যা করার মাঝে পাপ ও অমঙ্গল রয়েছে, তবে কাফিরদের ফিৎনার (কুফুরী) মাঝে রয়েছে তার চেয়েও অধিক গুরুতর পাপ এবং অমঙ্গল।" (আল ফাতওয়া ২৮/৩৫৫) ।

শাইখ আলী আল খুদাইর তাঁর "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এই সাক্ষ্যদানে আহ্বান" কিতাবটিতে শেখ সুলাইমান বিন সাহমান রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন: "আল ফিতনা হল-কুফর। সুতরাং সমস্ত বেদুঈন ও নগরবাসী যদি যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যায়, তা অনেক কম গুরুতর ঐ জমীনে একটি তাগুতকে নির্বাচন করার চেয়ে, যে এমন এক আইনে শাসন করে যা ইসলামের শরীয়ত বিরোধী।"

তাই, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের অজুহাতে শিরক করা যাবে না, তাতে অত্যাচার যতই কমে যাবার সম্ভাবনা থাকুক। এটা এ কারণে যে, মুসলিমরা অত্যাচারের কারণে যে ক্ষতির শিকার হচ্ছে তার চেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে শিরক করার মাধ্যমে।

০৪. 'আমলসমূহ সর্বোপরি নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল' এই ভিত্তিতে আমরা ভালো নিয়তে (ক্ষমতা লাভ করে মুসলমানদেরকে যুলুম থেকে বাঁচানোর নিয়তে/কুরআনের আইন প্রণয়ন করার নিয়তে) গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করতে পারব কি??

উত্তর: প্রিয় ভাই, উত্তম নিয়্যতের দ্বারা কোনো গুনাহের কাজ সওয়াবের কাজে পরিণত হয় না। ইমাম আবু হামিদ আল গাজ্জালী রহ. বলেন, "গুনাহ, এগুলোর প্রকৃতি নিয়্যতের দ্বারা কখনো পরিবর্তন হয়ে যায় না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বাণী: "প্রত্যেক আমলই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল" তিনটি জিনিসের (ইবাদত, মুবাহ ও গুনাহ) এর মধ্যে

কেবল আনুগত্য ও মুবাহ (অনুমতি প্রাপ্ত আমলের) মধ্যে সীমিত, গুনাহের জন্য নয়। এটা এই কারণে যে, আনুগত্য গুনাহতে পরিণত হয় (খারাপ) নিয়্যতের দ্বারা। বিপরীতে একটি খারাপ কাজকে কখনোই নিয়্যতের দ্বারা আনুগত্যে পরিণত করা যায় না।" (এহইয়াউ উলুমিদ্দিন, ৪/৩৮৮-৩৯১)

প্রিয় ভাই, কুফর হলো সবচেয়ে বড় গুনাহ। গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নে অংশ নেয়া কুফর, এটিকে ভালো নিয়তের দ্বারা জায়েয করা যায় না। কেননা হতে পারে কোনো ব্যক্তি নেক নিয়তের মাধ্যমে সংসদে আইন প্রণয়নের সময় আল্লাহর আইনের বিরোধী আইন প্রণয়নের বিপক্ষে ছিল; কিন্তু আইন প্রণয়নের এই পদ্ধতিটিই তো কুফর। আজ যদি আইন প্রণয়নকারীদের অধিকাংশই আল্লাহর আইনের পক্ষে রায় দেয় (যেহেতু জনগণ কুরআনের আইন চায়), আগামীকালই হয়ত কুরআন বিরোধী আইন জয়যুক্ত হবে। কেননা আগামীকাল হয়ত জনগণ কুরআন বিরোধী আইনই চাইবে। তাই এই পদ্ধতিটিই কুফুরী, যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা বা ক্ষমতার উপর মানুষের ইচ্ছাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর মানুষকে ক্ষমতাবান করা হয়। তাই নেক নিয়ত থাকলেও এই পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করা কিভাবে জায়েয হতে পারে??

প্রিয় ভাই, নেক নিয়তে (অভাবী মুসলিমদেরকে সাহায্য করার নিয়তে) আমি যদি বাইবেল কিংবা মুর্তি বিক্রি করে টাকা উপার্জন করি, তাহলে আমার এই কাজকে আপনি কি জায়েয বলবেন??.....

০৫. 'নিতান্ত প্রয়োজনে হারাম গ্রহণ করার অনুমতি রয়েছে'- এই যুক্তিতে গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করা যাবে কি??

উত্তর: কিছু কিছু ভাই মনে করেন, এখন মুসলমানদের জন্য জরুরি অবস্থা বিরাজ করছে, সুতরাং এমতাবস্থায় ইসলামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গণতান্ত্রিক রাজনীতি করার অনুমতি রয়েছে। অর্থাৎ যে জিনিসটি হারাম ছিল বর্তমান পরিস্থিতিতে হালাল হয়ে যাবে।

প্রিয় ভাই, এই নীতি সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। এর কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে এবং কিছু বাধ্যবাধকতা বা সীমা আছে যার কারণে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এটির ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমতঃ অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে 'প্রয়োজন' বা জরুরী বলা যায় না। সুতরাং আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন আমরা সত্যিকার প্রয়োজন ছাড়া এই নীতির নমনীয়তাকে ব্যবহার না করি। মানুষের 'প্রয়োজন' বা জরুরি অবস্থা পাঁচ প্রকারের। ১. দ্বীনের জন্য আবশ্যকীয়, ২. জীবনের জন্য আবশ্যকীয়, ৩. মানসিক সুস্থ্যতার জন্য আবশ্যকীয়, ৪. রক্ত (বংশ) বা সম্মান রক্ষার্থে আবশ্যকীয়, ৫. সম্পদের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়।

এই সকল প্রয়োজনীয়তা সমান পর্যায়ের নয়। যেমন: কারো জ্বিনা করার কিংবা কোনো মাহরাম মহিলাকে বিবাহ করার অজুহাত কখনো এই হতে পারে না যে, আমার যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল। সুতরাং সকল প্রয়োজনকেই এই নীতির আওতায় ফেলা যাবে না, এক্ষেত্রে একটি সীমারেখা আছে।

দ্বিতীয়তঃ শিরক বা কুফরের ক্ষেত্রে এই নীতি কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শিরক এবং কুফর থেকে নিজেকে রক্ষা করাই সবচেয়ে বড় আবশ্যকীয় ব্যাপার। মানুষের দ্বীন রক্ষা করাটাই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। একটি প্রয়োজন রক্ষা করতে গিয়ে আরো বড় প্রয়োজন বিসর্জন দেয়া কখনোই অনুমোদনযোগ্য হতে পারে না। শুধুমাত্র ইকরাহ

(চূড়ান্ত জোর জবরদস্তি)-এর ক্ষেত্রেই এটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। সুতরাং গণতন্ত্র নামক শিরক ও কুফরকে হালাল করার জন্য আমরা এই নীতিটি কিভাবে অবলম্বন করতে পারি?

০৬. 'জোর জবরদস্তি বা নিপীড়নের ক্ষেত্রে কুফুরী ক্ষমার যোগ্য'- এই নীতিতে কি আমরা গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করতে পারি?

উত্তরঃ প্রিয় ভাই, যদি কোন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই জোরজবরদস্তি ও নিপীড়নের শিকার হয়, তাহলে তার জন্য এটি হালাল। কিন্তু আমরা যেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি এই ক্ষেত্রে ইকরাহর (জোর-জবরদস্তি) সংজ্ঞা ও শর্তাবলির কোনো সামঞ্জস্য নেই। প্রথম কথা হল, এই নীতি সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয়, যে স্বেচ্ছায় কোনো কাজ করে। এক্ষেত্রে তাকে যে জোর করা হয়েছে এবং তার আর কোন উপায় বা ক্ষমতা নেই- সেই প্রমাণ থাকতে হবে। সাধারণত, ভোটের ক্ষেত্রে বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মুসলমানদেরকে জোর জবরদস্তি করা হয় না। বরং এভাবে দাওয়াত দেয়া হয়- 'স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটে অংশগ্রহণ করুন'; কিংবা এ ধরণের স্লোগান শুনা যায়-'আমার ভোট আমি দিব, যাকে খুশি তাকে দিব।'। এসব কথাই ইঙ্গিত করে যে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণকে কোনো কিছু করতে বাধ্য করা হয় না।

ইকরাহ (জোর জবরদস্তি)-এর শর্তের ব্যাপারে ইবনে হাযর রহ. বলেন, "ইকরাহর চারটি শর্ত রয়েছে। যেমন:
১) যে জোর করছে তার ঐ হুমকি বাস্তবায়নের ক্ষমতা রয়েছে, সেই সাথে যাকে জোর করা হচ্ছে, সে সেটি ঠেকাতে এমনকি পালাতেও অক্ষম।
২) এব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে যে, সে যদি অসম্মতি প্রকাশ করে তাহলে ঐ হুমকি তার উপর পড়বে।
৩) তাকে যে হুমকি দেয়া হচ্ছে তা অতি নিকটে।
৪) যাকে জোর করা হয়েছে তার থেকে এমন কিছু প্রকাশ পাবে না যা দ্বারা বোঝা যায় যে সে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করছে।" (ফতহুল বারী, খণ্ড ১২ ,পৃ:৩১১)

সুতরাং আমরা বলতে পারি, 'জোর জবরদস্তি বা নিপীড়নের ক্ষেত্রে কুফুরী ক্ষমার যোগ্য'- এই নীতিটি কমপক্ষে গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রজোয্য নয়।

০৭. এখন তো জিহাদ করার মতো আমাদের সামর্থ্য নেই, তাই জিহাদ করার সামর্থ্য অর্জন করার আগ পর্যন্ত কি আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনীতি চালিয়ে যেতে পারবো না??

উত্তর: এখানে কেউ এই কথা বলতে পারেন যে, আমাদের জিহাদ করার মতো সাধ্য নেই, আর সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা কি কেউ কারো উপর কখনো চাপিয়ে দিতে পারে?

তাহলে এখানে আমার প্রিয় ভাইদের কাছে একটি প্রশ্ন রাখছি...যদি ধরে নেয়া হয় যে, বাতিলদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মত শক্তি আমাদের নেই, তথাপি কি এখানে বাতিলদের সৈনিক হওয়ার এবং তাদের রঙে রঙিন হওয়ার কোন সুযোগ আছে?! বর্তমানে দুর্বলতা ও অক্ষমতার দরুন কি বাতিল শাসনব্যবস্থার অনুগত হওয়ার ও জাহিলিয়্যাতের ঝান্ডাবাহী হওয়ার কোন অনুমতি এই দ্বীন প্রদান করে? এখানে কি এই দু'টি উপায়ই আছে; হয়তো এই বাতিল শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা, আর যদি এটির সক্ষমতা না থাকে, তাহলে নিজেরাই বাতিল শাসনব্যবস্থার হাতিয়ার হয়ে যাওয়া; তার থেকে ভরপুর ফায়েদা (সুবিধা) নেওয়া, গুণগান গাওয়া, তার অনুসরণে গোমরাহীর পথে চলা, তার প্রতিরক্ষা, শক্তি যোগানো ও উন্নতি করা এবং নিজেদের সুবিধা আচ্ছামত ভোগ করা?!

প্রিয় ভাই! না, বিষয়টি কখনো এমন হতে পারে না। এটা আল্লাহর দ্বীন হতে পারে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলার দ্বীন ত্বাগুতদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ও বাতিলদের সাথে শত্রুতা পোষণ করার শিক্ষা দেয়। তাছাড়া এই দ্বীন যার যতটুকু সাধ্য-সক্ষমতা আছে, ততটুকু দ্বারাই জুলুম ও কুফরের বিরোধিতা করাকে ফরয আখ্যায়িত করেছে। শরিয়তের কোন কাজ করার শক্তি, সামর্থ্য, প্রস্তুতি, পরিবেশ নগদ না পাওয়া গেলে মূল কাজ শুরু করা পর্যন্ত এর প্রস্তুতি নেওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। আর যেমন 'অজু নাই' একথা বলে নামাজ থেকে বসে থাকা জায়েজ নেই, অজু করতে হবে। এমনিভাবে বর্তমানেও অনেক স্থানে প্রস্তুতির কারণে জিহাদের মূল কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। তাই প্রস্তুতি আবশ্যক হয়ে গেছে। যেমন ভারতবর্ষে আমরা তো এখন প্রস্তুতির কাজই করছি। বাস্তবতা হল এই প্রস্তুতি সবার উপর ফরজ; সামর্থ্যবান ও সম্ভবপর হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু আমরা অনেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করা থেকে পিছিয়ে আছি।

প্রিয় ভাই আমার!

এই দ্বীন খুবই সহজ-সরল, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন। রহমতে ভরপুর এই দ্বীন কখনো আমাদের উপর এমন কোন বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে না, যা বহন করার সাধ্য/সক্ষমতা আমাদের নেই। মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুধু ঐ সমস্ত বিষয়ের ব্যাপারেই আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, যা আমাদের সাধ্যের ভিতরে ছিল। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলার এই দ্বীন 'দাওয়াত ও জিহাদ'কে ইসলাম হেফাযত করা ও তাকে বিজয়ী করার পন্থা বলে আখ্যায়িত করেছে। দাওয়াত ও জিহাদের এই রাস্তা একটি সম্পূর্ণ প্যাকেজ ও একটি সম্পূর্ণ মানহাযের নাম। এমনিভাবে জুলুম-ফ্যাসাদ দূর করা এবং আল্লাহ তা'আলার হাকিমিয়্যাত তথা আইনের ক্ষেত্রে আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মান-সুখ্যাতি লাভ করাই এই দ্বীনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য দাওয়াত, ই'দাদ তথা প্রস্তুতি গ্রহন করা, হিজরত ও কিতাল করার নির্দেশ দিয়েছে।

দাওয়াত ও জিহাদের এই মানহায একটি পূর্ণাঙ্গ মানহায। তাতে প্রত্যেক দুর্বল ও সবলের জন্য কাজ করার সমান সুযোগ ও ময়দান বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বীন বিজয়ের সফরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চলার পূর্ণাঙ্গ নকশা হলো উল্লিখিত বিষয়গুলো। আর এটি পুরোপুরিভাবে শরীয়তের আলোকে প্রণীত নকশা। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

০৮. আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক সরকার তো নামাযে বাধা দেয় না, তাহলে কেন আমরা তার বিরুদ্ধে জিহাদ করব?

যেসকল ভাইয়েরা এই যুক্তিতে জিহাদ হতে পিছিয়ে আছেন, তারা নিম্নের হাদীসটি দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন-

وعن عَوْفِ بنِ مالكٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"خِيارُ أئمتكم الذين تُحِبُّونَهُمْ ويُحِبُّونَكُمْ، ويُصَلُّون عليكم وتُصَلُّون عليهم. وشِرارُ أئمتكم الذين تُبْغِضُونَهم ويُبْغِضُونكم، وتُلْعِنُوْنَهم ويُلْعِنُوْنُكم. قِيلِ يا رسولَ الله، أفلا نُنابِذُهم بالسيف؟ **فقال: لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاةَ**. (صحيح مسلم. رقم الحديث:1855 دار المغني).

আউফ বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে উত্তম শাসক হলো তারা, যাদেরকে তোমরা ভালোবাসবে এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসবে, তোমরা তাদের জন্য দোয়া করবে, তারাও তোমাদের

জন্য দোয়া করবে। আর তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট শাসক হলো তারা, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করবে এবং তারাও তোমাদেরকে অপছন্দ করবে, যাদেরকে তোমরা লা'নত করবে এবং তারাও তোমাদেরকে লা'নত করবে।" বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তরবারি দ্বারা তাদের মোকাবেলা করবো না? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "না, যতদিন তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করে।" (মুসলিম শরীফ, অধ্যায়-খিয়ারুল আয়িম্মাহ, হাদীস নং-৪৯১০)

প্রিয় ভাই! এই হাদীস থেকে আমরা অনেকেই এমন একটি ভাবার্থ গ্রহণ করি-

১. 'নামধারী মুসলিম শাসকশ্রেণি যা ইচ্ছা তাই করুক, তাদের যুলুমের মাত্রা যতই হোক না কেন, তারা যতই সীমালঙ্ঘন করুক না কেন, এমনকি যদি তারা কুফুরিও করে, তবুও আমরা জিহাদ করব না, যতক্ষণ না তারা আমাদেরকে নামায আদায় করতে নিষেধ করছে বা বাধা প্রদান করছে।
২. যখন বা যেদিন তারা আমাদেরকে নামায আদায় করতে দিবে না বা বাধা প্রদান করবে, তখন বা সেদিন আমরা শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামব।
৩. এককথায়, তাগুত শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার মাপকাঠি হচ্ছে- এটি দেখা যে, তারা নামায আদায়ে বাধা প্রদান করে কিনা। রক্তপাত এড়ানোর জন্য 'নামাযে বাধা দেয়া' পর্যন্ত আমরা ধৈর্য ধরে যালিমের যুলুমকে সহ্য করে যাব, যদিও সে কুফুরিতে লিপ্ত হয়, যদিও তার কর্মকাণ্ড ইরতিদাদের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, সেগুলো ধর্তব্য নয়।
৪. ইসলাম শান্তির ধর্ম। তাই ইসলাম চায় যতদূর সম্ভব রক্তপাত এড়াতে। তাই আমরাও চাই যতদূর সম্ভব রক্তপাত এড়িয়ে দাওয়াত ও প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে সমাজে শান্তির ধর্ম 'ইসলাম' কায়েম করতে।"

যুক্তিখণ্ডন:

প্রিয় ভাই! এই কথা ঠিক যে, অনেক ফুকাহায়ে কেরামের মতে, রক্তপাত এড়ানোর জন্য যালেম শাসকের যুলুমকে ততক্ষণ সহ্য করা উচিত, যতক্ষণ না তারা নামায আদায় করতে বাধা দেয়; কিন্তু এটি কখনোই সেই শাসকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যার দ্বারা কোনো প্রকাশ্য কুফর প্রকাশ পেয়েছে, যে আল্লাহর কোনো বিধানকে পরিবর্তন করেছে, যে ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়েছে, যে মুরতাদ হয়ে গিয়েছে, যে নিজেকে বিধানদাতার আসনে সমাসীন করে আল্লাহর সাথে শিরক করেছে। এর প্রমাণ-

উবাদা বিন সামেত রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

(دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ. فكان فيما أخذ علينا أَنْ بَايَعَنَا على السمع والطاعة في مَنشَطِنا ومَكْرَهِنا، وعُسرنا ويُسرنا، وَأَثَرَة علينا، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَه. قَالَ: **إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ**). (متفق عليه وهذا لفظ مسلم. رقم الحديث: 1709، تحقيق فؤاد عبد الباقي)

আমাদেরকে রাসূল ﷺ ডাকলেন এবং আমরা তাঁর হাতে বাইআত হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের থেকে যে বিষয়ে বাইআত নিলেন তা হলো, আমরা আমাদের পছন্দনীয়-অপছন্দনীয় বিষয়ে, সুখে-দুঃখে এবং আমাদের উপর যদি অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়া হয় তথাপিও (আমীরের কথা) শুনবো ও আনুগত্য করবো এবং আমরা দায়িত্বশীলের সাথে দায়িত্ব নিয়ে বিবাদে জড়াবো না। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তবে হাঁ, যদি তোমরা কোন স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও, যার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭০৯, তাহকিক: ফুআদ আব্দুল বাকী)

প্রিয় ভাই! এবিষয়ে উম্মতে মুসলিমার ইজমা রয়েছে যে, শাসক থেকে যদি ‘কুফরে বাওয়াহ’ বা সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পায় বা কুরআন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা না করে, অথবা নামাযসহ ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো প্রতিষ্ঠা না করে, তাহলে সে আর মুসলমানদের শাসক হিসাবে বাকি থাকে না; তাই তাকে অপসারণ করে এমন একজন শাসক নিয়োগ দেয়া ফরজ হয়, যে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে।

যেমন: ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন-

"قال أبو بكر بن الطيب: أجمعت الأُمَّةُ أنه **يُوجِبُ خَلْعَ الإمامِ وسُقوطَ فرضِ طاعتِه كُفرُه بعدَ الإيمانِ، وتركُه إقامةَ الصلاة والدعاءَ إليها**، واختلفوا إذا كان فاسقًا ظالماً غاصبًا للأموالِ". (معالم السنن،كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام).

“আবু বকর ইবনুত তায়্যিব বলেন, উম্মাহর এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, ঈমান গ্রহণের পর শাসক কুফরী করলে এবং নামায প্রতিষ্ঠা ও নামাযের দিকে আহবান করা ছেড়ে দিলে, তাকে অপসারণ করা ফরজ হয়ে যায় এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যায়।” (মাআলিমুস সুনান, কিতাবুল আহকাম, খণ্ড: ৮ পৃষ্ঠা: ২১৫, মাকতাবাতুর রুশদ)

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন,

"فإن أَمَرَ بمعصيةٍ فلا تَجُوْزُ طاعتُه في تلكَ المعصيَة قولاً واحدًا، **ثم إنْ كانتْ تلكَ المعصيةُ كُفرًا: وَجَبَ خَلْعُه على المسلمين كلِّهم**. **وكذلك: لو تَرَكَ إقامةَ قاعدةٍ من قواعدِ الدينِ**؛ كإقامة الصلاةِ، وصومِ رمضانَ، وإقامة الحدودِ، ومَنَعَ من ذلكَ. وكذلك لو أباحَ شُربَ الخَمرِ، والزِّنِي، ولم يَمنَعْ منهما، **لا يُخْتَلَفُ في وُجوبِ خَلْعِهِ**". المفهم كتاب الإمارة 39/4 دار إبن كثير

“শাসক যদি গুনাহের আদেশ করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে গুনাহের কাজে তার আনুগত্য করা জায়েয হবে না। এখন সেই গুনাহটা যদি কুফর হয়, তাহলে সকল মুসলমানের উপর ফরজ হলো, তাকে অপসারণ করা। এমনিভাবে সে যদি নামায, রমযানের রোযা, হুদুদ তথা দণ্ডবিধির মতো দ্বীনের মৌলিক কোন বিধান প্রতিষ্ঠা করা ছেড়ে দেয় এবং সেগুলো পালনে বাধা দেয়, তদ্রুপ সে যদি মদপান ও যিনাকে বৈধতা দান করে এবং সেগুলো থেকে বারণ না করে, তখনও তার অপসারণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।” (আলমুফহিম, কিতাবুল ইমারাহ, খণ্ড: ৪ পৃষ্ঠা: ৩৯, দারু ইবনে কাসির)

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন,

وجملةُ الأمر فيه: أن الإمامَ لو أَمَرَ بالكفر البَوَاح، يَجِبُ الخروجُ عليه وخَلْعُه عن الإمارة.

“মোটকথা, ইমাম যদি কুফরে বাওয়াহের আদেশ করে, তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা ফরজ।” (ফয়যুল বারী, কিতাবুল আহকাম: ৪/৪৯৯, মাকতাবায়ে আশরাফিয়্যাহ)

এছাড়াও আরো অনেক উলামায়ে কেরাম এ মাসআলায় ইজমা নকল করেছেন, দেখুন: আত-তাউযিহ, ইবনুল মুলাক্কিন, কিতাবুল ফিতান, খণ্ড: ৩২, পৃষ্ঠা: ২৮২, ওয়াযারাতুল আওকাফ, কাতার; দারু ইবনে কাসির; মাজমুউল ফাতাওয়া, ইমাম ইবনে তাইমিয়া: ২৮/৫০২,৫১০; আল কাশেফ, ইমাম তিবি, পৃষ্ঠা: ২৫৬০; শরহে মুসলিম, ইমাম নববী, অধ্যায় ‘উজূবু ত্বাআতিল উমারা’: ১২/২২৯, আলমাতবাআহ আলমিসরিয়্যাহ; হাশিয়াতুশ শিরওয়ানী আলা তুহফাতিল মুহতাজ: ১১/৩৪৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ; ফাতহুল বারী, কিতাবুল আহকাম: ১৩/১৫৩, দারুস সালাম, রিয়াদ; ১৩/১২৩, দারুল মা'রেফাহ এবং মাকতাবায়ে সালাফিয়্যাহ ইত্যাদি।

প্রিয় ভাই!

ইমামে আজম আবূ হানীফা রহ.-এর মত হলো, কোনো শাসক যদি জালেম হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ও তাকে অপসারণ করে নতুন খলীফা নিযুক্ত করা ফরজ; যদিও তার থেকে সুস্পষ্ট কোনো কুফর প্রকাশ না পায়। ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছাড়াও সালাফে সলেহীনের আরো অনেকেই একই মত ব্যক্ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লামের কলিজার টুকরা নাতি; জান্নাতী যুবকদের সর্দার হুসাইন রাযি. এর ঘটনা তো সকলেরই জানা। তিনি ইয়াজিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। অথচ তৎকালীন সাহাবীগণ ইয়াজিদকে কাফের মনে করতেন না। তথাপি পুরো উম্মাহ হুসাইন রাযি.-এর জিহাদকে জিহাদ বলে স্বীকার করেন, তার জিহাদ নিয়ে গর্ব করেন। জান্নাতের যুবকদের সর্দার হুসাইন রাযি.-এর উপরোক্ত আমলই এ ক্ষেত্রে অনেক বড় প্রমাণ।

হযরত যায়েদ বিন আলী রহ. ছিলেন হযরত হুসাইন রাযি.-এর নাতি, বিশিষ্ট তাবেয়ী এবং ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর উস্তাদ। তৎকালীন বনু উমাইয়ার খলীফাদের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. উক্ত জিহাদে নিজের মাল দ্বারা অংশগ্রহণ করেন। এই মর্মে মানুষকে গোপনে ফতওয়া প্রদান করতে থাকেন যে, যায়েদ বিন আলী রহ. কে সাহায্য করা এবং তার সাথে মিলে যালিম শাসকদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ফরজ। (দেখুন- আহকামুল কুরআন: ১/৭০,৮৪-৮৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)

এক বর্ণনায় এসেছে-

سُئِلَ عن الجهاد معه، فقال: خروجه يُضاهِيْ خُروجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ بَدْرٍ.

"ইমাম আবূ হানীফা রহ. কে যায়েদ বিন আলী রহ.-এর সঙ্গে মিলে জিহাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। প্রতি উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তার এই জিহাদ তো বদরের দিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিহাদ সদৃশ।" (দেখুন মানাকিবুল ইমামিল আজাম, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৬০-২৬১)

অন্যদিকে, হযরত মুহাম্মাদ রহ. ও হযরত ইবরাহীম রহ. ছিলেন হযরত হাসান রাযি.-এর নাতি হযরত আব্দুল্লাহ রহ.-এর সন্তান। তারা দুই সহোদর তৎকালীন খলীফা মানসুরের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন।

এক বর্ণনায় এসেছে,

أن أبا حنيفة كان يحُضُّ الناسَ على إبراهيم و يأمرهم باتباعه، وذُكَرَ قبلَ ذلك أنه كان يُفَضَّلُ الغزوةَ معه على خمسين حَجَّة.

"ইমাম আবূ হানীফা রহ. জনসাধারণকে ইবরাহীম রহ.-এর পক্ষে উদ্বুদ্ধ করতেন। তার আনুগত্যের আদেশ প্রদান করতেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি তার সাথে মিলে যুদ্ধ করাকে পঞ্চাশটি হজ্জের উপর প্রাধান্য দিতেন।" (মানাকিবুল ইমামিল আজাম, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৮৪)

ইমাম আবূ হানীফা রহ. নিজেও তাদের সাথে মিলে জিহাদ করার জন্য মানুষকে ফতওয়া প্রদান করতেন এবং উদ্বুদ্ধ করতেন। অথচ খলীফা মানসূর ইসলামের কোনো অকাট্য বিধানকে পরিবর্তন করেননি।

এই ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.। যিনি জালিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে বদর যুদ্ধের সাথে তুলনা করেছেন। পঞ্চাশটি হজ্বের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। মাল দ্বারা সে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। অথচ তৎকালীন শাসকরা ইসলামের কোন অকাট্য বিধানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিবর্তন বা অকার্যকর করেনি। তাদের অন্যায় অপরাধগুলো বর্তমান শাসকদের কুফর ও ইরতিদাদের ধারে কাছেও ছিল না। তাদের ব্যাপারে জান্নাতী যুবকদের সর্দার হুসাইন রাযি.

এবং ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অবস্থান যদি এই হয়, তাহলে বর্তমান সময়ের মুরতাদ শাসকদের ব্যাপারে তাদের ফতওয়া কী হতে পারে?

গণতান্ত্রিক পদ্ধতির শাসকবৃন্দ কেন মুরতাদ?

প্রিয় ভাই! 'নামায প্রতিষ্ঠা না করা বা নামায প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয়া'- এটি তাগুত শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করার একমাত্র কারণ হতে পারেনা, কিংবা একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না, কিংবা সবচেয়ে বড় কারণ হতে পারে না; বরঞ্চ এটি জিহাদ শুরু করার জন্য অন্যতম, প্রাথমিক ও ছোট একটি কারণ হতে পারে। এর চেয়ে বড় কিংবা এর উপরের পর্যায়ের কোনো কারণ পাওয়া গেলে অবশ্যই সেটিকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং সেই শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পূর্বের যামানার শাসকবৃন্দ কেবল যুলুম করলেই আমাদের আকাবীরগণ জিহাদ করেছেন, নামায প্রতিষ্ঠায় বাধা দিচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য করেননি, অথচ বর্তমান যামানায় আমাদের শাসকবৃন্দ অগণিত কুফরে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আমরা কেবল এই অজুহাতে হাত গুটিয়ে বসে আছি যে, তারা তো এখনো আমাদেরকে নামায আদায় করতে দিচ্ছে। এর একটি কারণ হতে পারে, বর্তমান যামানার শাসকবৃন্দ কিভাবে কুফুরী করছে সে বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট জ্ঞান না থাকা, কিংবা একটি কুফুরী কত বড় অপরাধ সেই বিষয়ে আমাদের উপলব্ধি না থাকা, অথবা জিহাদবিমুখতার ফলস্বরূপ আমরা নিজেদেরকে একটি বুঝ দিয়ে রেখেছি।

তাই ভাই চলুন, জেনে নেয়া যাক, বর্তমান যামানায় গণতান্ত্রিক মুসলিম দেশসমূহের শাসকদের কাফের (মুরতাদ) হওয়ার কারণগুলো কী কী:

১. ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করা, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার স্লোগান তোলা এবং ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে তারা কাফের।
২. কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন করার কারণে তারা কাফের।
৩. কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধর্মীদের তৈরিকৃত আইনের অনুসরণ করার কারণে তারা কাফের।
৪. গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানের মূল ভিত্তি করার কারণে তারা কাফের।
৫. কুরআন-সুন্নাহর আইন ছেড়ে পাশ্চাত্য বিধর্মীদের তৈরিকৃত নীতিমালা দ্বারা বিচারকার্য করার কারণে তারা কাফের।
৬. আল্লাহ তা'আলা যে সব বস্তুকে হারাম করেছেন (যেমন- সুদ, যিনা, মদপান, অশ্লীলতা ইত্যাদি) রাষ্ট্রীয়ভাবে তার অনুমোদন দেওয়া (হালাল বানানো), রাষ্ট্রীয়ভাবে সেসবের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং প্রচার-প্রসার করার কারণে তারা কাফের।
৭. আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তুকে হালাল করেছেন, (যেমন- বাল্যবিবাহ, জিহাদ ইত্যাদি) সেসব বস্তুকে নিষিদ্ধ (হারাম) করার কারণে তারা কাফের।
৮. 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' নাম দিয়ে মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সহযোগিতা করার কারণে তারা কাফের।
৯. মুজাহিদদেরকে ধরে ধরে ভারত, আমেরিকা, ইসরাঈলসহ অন্যান্য কাফেরদের হাতে হস্তান্তর করা এবং কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করার কারণে তারা কাফের।
১০. পবিত্র জিহাদের হুকুমকে 'জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ' নামে আখ্যায়িত করার কারণে এবং পাঠ্যপুস্তককে জিহাদ মুক্ত করার ঘোষণা দেয়ার কারণে তারা কাফের।

১১. মুজাহিদীনে ইসলামকে ঘৃনা ভরে 'জঙ্গী ও সন্ত্রাসী' ট্যাগ দেয়ার কারণে তারা কাফের।
১২. আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দুশমন থাবা বাবা (রাজীব) এবং এই জাতীয় অন্যান্য শাতিম হত্যাকারী মুজাহিদগণকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দোষী সাব্যস্ত করত ফাঁসি ও অন্যান্য দণ্ডে দণ্ডিত করার অপরাধে তারা কাফের।
১৩. হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফা ছিল মূলত ইসলামের মৌলিক কতগুলো বিধানের সমষ্টি। এই ১৩ দফা ও ইসলামের অন্যান্য বিধানাবলিকে নাকচ করা, তের দফাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা এবং তের দফার দাবীদার মুসলিমদের উপর রাতের আঁধারে অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করার অপরাধে তারা কাফের।
১৪. বোরকা ও হিজাব পরিহিতা পর্দানশীন নারীদেরকে 'চলন্ত তাঁবু' আখ্যায়িত করে ইসলামের একটি ফরয বিধানকে কটুক্তি করার কারণে তারা কাফের।
১৫. সর্বোপরি জিহাদকে অপছন্দ করা, জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা, যারা আল্লাহর রাজ কায়েমের জন্য জিহাদ করতে চায় তাদেরকে আটক করে নির্যাতন ও হত্যা করার কারণে তারা কাফের।
১৬. হিন্দুদের পূঁজায় অংশগ্রহণ করা এবং পূঁজা উপলক্ষে তাদেরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা, 'গজে চড়ে মা দূর্গা দেশে আসার কারণে এবার দেশের ফসল ভালো হয়েছে' এই জাতীয় আকীদার কারণে তারা কাফের।
১৭. মুসলিমদেরকে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন-কানুন মানতে বাধ্য করার অপরাধে তারা কাফের।
১৮. জাতিসংঘ নামক কুফুরী সংঘের অন্তর্ভূক্ত হয়ে তাদের উদ্দেশ্যের সাথে একমত পোষণ করা, তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথ মসৃণ করে দেয়া, বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের কাছে বিচার প্রার্থনা করা এবং তথাকথিত 'শান্তিমিশন'(?) এ সেনাবাহিনী পাঠিয়ে মুসলিম দেশগুলোতে অশান্তি সৃষ্টি করা ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করানোর অপরাধে এরা কাফের।
১৯. ইত্যাদি! ইত্যাদি!!

[বিস্তারিত পড়ুন: নেদায়ে তাওহীদ-শাইখ আবু উমার আল মুহাজির: https://bit.ly/nt22]

এককথায়, বর্তমান বিশ্বের গণতান্ত্রিক শাসকদের কুফুরি কর্মকাণ্ডের তালিকা অনেক দীর্ঘ, যা লিখে শেষ করার মত নয়!
'নামায আদায় করতে বাধা দেয়' কেবল এই কারণে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে না, এটি কোন্ যুক্তিতে মেনে নেয়া যায় ভাই? কেবল এই একটি কারণে কী তাদের রক্ত হারাম হয়ে যাবে, যেখানে শত শত কারণে তাদের রক্ত হালাল হয়ে আছে?
প্রিয় ভাই! এদের কুফরের কারণে এরা 'নামায পড়তে দিয়ে' মুসলমানদের যতটুকু উপকার করছে, তার চেয়ে লক্ষ গুণ তারা মুসলমানদের অনিষ্ট সাধন করছে?
ভাই! কেউ আমাকে একদিকে নামায পড়তে দিল, অন্যদিকে ঈমানটা কেড়ে নিল, এর দ্বারা আমার উপকার বেশি হল না ক্ষতি বেশি হল, ঈমানহীন এই নামাযের কী মূল্য আছে?
কাফের ও মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী এই কাজটিই করে থাকে। এরা একদিকে নিজেরা কুফুরি কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়, অন্যদিকে দেশের জনগণকে কুফুরি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ফেলে, কুফরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, কখনো কখনো বাধ্য করে।

আর বিশেষতঃ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসকবৃন্দ সাধারণত নামাযকে নিষিদ্ধ করবে না, কেননা এটি ব্যক্তিগত ইবাদত। আর ব্যক্তিগত ইবাদতের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রভুদের কোনো মাথাব্যাথা নেই। কেননা এর দ্বারা কুফরের রাজত্বের কোনো ক্ষতি সাধিত হয় না। গণতান্ত্রিক প্রভুদের এ্যালার্জী হল ইসলামের রাষ্ট্রীয় বিধানাবলি নিয়ে, তাদের চুলকানি হল রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের হাতিয়ার 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'কে নিয়ে। সুতরাং নামায পড়তে দেয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে না' একথা মেনে নিলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কখনোই জিহাদ ফরয হবে না, আর সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে সকল অনিষ্টের জননী গণতন্ত্রকেও আর হটানো সম্ভব হবে না, রাষ্ট্রে পরিপূর্ণরূপে ইসলামও আর কায়েম হবেনা, 'খিলাফাহ আলা মিনহাযিন্নুবুয়্যাহ'ও আজীবন স্বপ্নই থেকে যাবে।

এটিই চরম বাস্তবতা!!

০৯. হিকমাহ (!), নাকি আত্মপ্রবঞ্চনা ?

অনেক ভাই বলেন, "আরে ভাই! আমরা তো জানি গণতন্ত্র কুফর। কিন্তু এখন যেহেতু খিলাফত নেই, তাই ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে হেকমতের দাবী হিসেবে আমরা গণতন্ত্রকে বেছে নিয়েছি। আমরা ক্ষমতায় যেতে পারলে তখন খিলাফাহ কায়েম করবো।"

এখন প্রশ্ন হল, হেকমতের দাবী হিসেবে গণতন্ত্র অবলম্বন করা যাবে কি?

উত্তর: এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আমাদেরকে প্রথমে বুঝতে হবে হিকমাহ কী?

হিকমাত বা হিকমত বা হেকমত, আরবি: حكمة , ḥikma, আক্ষরিক অর্থে প্রজ্ঞা (Wisdom), দর্শন; যুক্তি, অন্তর্নিহিত কারণ ইত্যাদি বুঝায়। অর্জিত গ্রন্থগত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বাস্তবজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান ও গভীর চিন্তার সমন্বয় ঘটিয়ে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ ও ব্যবহারের ক্ষমতা হচ্ছে প্রজ্ঞা। গভীর অন্তর্দৃষ্টি, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির সমষ্টিও হিকমাহ। (উইকিপিডিয়া, https://bit.ly/wikihikma)

বিভিন্ন ইসলামিক পণ্ডিত, গবেষক ও দার্শনিকগণ এটিকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

যেমন:

ইবনে মানযুরের মতে,

"হিকমাহ হচ্ছে ভালো ও উত্তম কিছুর বৈজ্ঞানিক বা উচ্চ পর্যায়ের ধারণা রাখা, ঐ রকম চিন্তন ক্ষমতা এবং এর ফল বাস্তবে বাস্তবায়ন।" ('লিসান আল আরব', ইবনে মানযুর, পৃ. ১৫/৩০)

ইবনে ফারিসের মতে,

"হিকমাহ হচ্ছে বাস্তব জ্ঞান এবং এর মাধ্যমে বিচার-বিবেচনা।" (মু'জাম মাক্বাইস আল লুগাহ, ইবনে ফারিস, পৃ. ২/৯১)

পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, বিচারক ও ইসলামিক পণ্ডিত, শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুহাম্মাদ ত্বকি উসমানী দা. বা. এর মতে,

"হিকমাহ হচ্ছে ফিকহ শাস্ত্রের একটি দিক; যেটি যাবতীয় সব জ্ঞানের সর্বোত্তম ব্যবহারে আইন প্রণয়ন করার সময় প্রণেতারা ব্যবহার করে থাকেন।" [Usmani, Muhammad Taqi (December 1999). The Historic Judgment on Interest Delivered in the Supreme Court of Pakistan (PDF). Karachi, Pakistan: albalagh.net., paras 119-120]

ডক্টর দিপারতুয়ারের মতে-

"এটি হচ্ছে বাস্তবজ্ঞান ও গ্রন্থগত জ্ঞানের প্রয়োগ।" [Asyraf Wajdi Bin Dato' Hj. Dusuki Yang Dipertua. "The Challenge of Realizing Maqasid Shariah in Islamic Finance" (PDF). iais.org.my. Retrieved 27 November 2016.]

ইবনে আল-কাইয়ূম রহ. এর মতে,

"হিকমাহ এর সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হতে পেরেছিলেন রসূলের সাহাবারা এবং এটিই হচ্ছে আলেমদের জন্য জ্ঞানের বা পান্ডিত্যের সর্বোচ্চ স্তর।" [তাজ আল 'আরুস, পৃ. ৮/৩৫৩]

ইমাম নববী রহ: বলেন-

الحِكمةُ :عبارةٌ عن العلمِ المتَّصِفِ بالإحكامِ، المشتَمِلِ على المعرفةِ باللَّهِ تبارك وتعالى، المصحوبِ بنفاذِ البصيرةِ، وتهذيبِ النَّفسِ، وتحقيقِ الحَقِّ والعَمَلِ به، والصَّدِّ عن اتِّباعِ الهوى والباطِلِ، والحكيمُ مَن له ذلك -شرح النووي على مسلم : 2/33

"হিকমত বলা হয়: আহকাম সম্বলিত ইলমকে যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে চিনা যায়। পাশাপাশি যার সাথে প্রজ্ঞা, আত্মশুদ্ধি, সত্যের অন্বেষণ, সত্যের উপর আমল করা, কুপ্রবৃত্তি ও বাতিলের অনুসরণ থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি বিষয় পাওয়া যায়। আর যার মাঝে এগুলি পাওয়া যায় তাকে হিকমতওয়ালা বলা হয়।" (শারহুন নববী আলাল মুসলিম-২/৩৩)

কুরআন কারীমের বাণীতে 'হিকমাহ'

হিকমাহ হচ্ছে মহান আল্লাহর একটি গুণ। তিনি 'الحكيم (আল-হাকিম)' অর্থ প্রজ্ঞাময়।

সূরা লোকমানে বলা হয়েছে:

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (৩১ সূরা লোকমান, আয়াত ২৭)

কুরআন কারীম মানবজাতির জন্য দুরদর্শিতা ও হিকমাহ'র উৎস। যেমন:

يس –وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

"ইয়াসীন, প্রজ্ঞাময় কুরআনের শপথ।" (৩৬ সূরা ইয়াসীন: ১-২)

وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

"আল্লাহ পাক আপনার প্রতি আসমানী গ্রন্থ আল কিতাব (কুরআন) ও ঐশী প্রজ্ঞা আল হিকমাত নাযিল করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহ পাকের অসীম করুণা রয়েছে।" (০৪ সূরা আন নিসা: আয়াত ১১৩)

'হিকমাহ' আল্লাহ প্রদত্ত এক বিশেষ নিয়ামত। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

"তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমাহ (প্রজ্ঞা) দান করেন এবং যাকে হিকমাহ দান করা হয়েছে তাকে অবশ্যই প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে। আর বুদ্ধিমান ছাড়া আর কেউ স্মরণ রাখবে না/উপদেশ গ্রহণ করবে না।" (২ সূরা বাকারাহ :২৬৯)

'হিকমাহ' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কুরআন কারীমের এমন আরো বহু আয়াত রয়েছে।
যেমন: কুরআন কারীমে আরো বর্ণিত হয়েছে-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ করুন, যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করবে, তাদের কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবে এবং তাদের পবিত্র করবে। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (০২ সূরা বাকারাহ: ১২৯)

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

"যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যে আমার আয়াত সমূহ তোমাদের নিকট আবৃত্তি করে, তোমাদের পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়।" (০২ সূরা বাকারাহ: আয়াত ১৫১)

প্রিয় ভাই! বিভিন্ন মনীষীদের উক্তি ও কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াত থেকে আমরা 'হিকমাহ' সম্পর্কে নিচের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি-

** আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে প্রজ্ঞা দান করেন। আর তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন নবী-রাসূল, বিশেষতঃ সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রেরণ করেছেন মানবজাতিকে প্রকৃত হিকমাহ তথা প্রজ্ঞা শিক্ষা দান করার জন্য।

** তাই কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামী শরীয়ত- মানবজাতির জন্য হিকমাহ (প্রজ্ঞা) বা দুরদর্শিতার উৎস।

** কুরআন সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়ত মেনে চলাই হল প্রকৃত হিকমাহ। যে সকল কাজ শরীয়ত পরিপন্থী তা আপাতৎদৃষ্টিতে যতই বুদ্ধিদীপ্ত বলে মনে হোক না কেন তা হিকমাহ (প্রজ্ঞা) নয়। অবশ্যই তা জাহেলিয়াত (অজ্ঞতা)। সাময়িকভাবে তাকে হিকমাহ মনে হলেও একসময় অবশ্যই তা জাহিলিয়াত হিসেবে প্রমানিত হবে।

** হিকমাহ হল সঠিকভাবে ইসলাম বা রসুলের সুন্নাহ মেনে চলা। হিকমাহ একেক ক্ষেত্রে একেক রকম হতে পারে। দাওয়াতের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সত্য বলা যেমন হিকমাহ তেমনি জেহাদের ক্ষেত্রে কৌশল হিসেবে মিথ্যা বলাও হিকমাহ। অনেকে হিকমাহর ভুল ব্যাখা করে সত্যকে পাশ কাটিয়ে যান বা আড়াল রাখেন, সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেন না।

** হিকমাহ হল- আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনের বিশেষ পদ্ধতি; এ হিসেবে সুন্নাহই হল হিকমাহ।

** কুরআন, হাদীস, মনীষীদের বিভিন্ন উক্তি ও বাস্তবতার আলোকে 'হিকমাহ'র সংজ্ঞা আমরা এভাবে দিতে পারি-

১. যাবতীয় বিষয়-বস্তু, পরিস্থিতি বা অবস্থাকে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান দ্বারা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা, সেই উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং শরীয়াহ মোতাবেক বাস্তবক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করাকে হিকমাহ বলে।
২. উদ্ভূত যে কোনো পরিস্থিতিতে শরীয়াহর চাহিদা কী, তা সঠিকরূপে নির্ণয় করতে পারা বা বুঝতে পারা, এবং সে অনুযায়ী নিজেকে এবং অন্যদেরকে পরিচালনা করার নাম 'হিকমাহ'।

প্রিয় ভাই! এবার আসা যাক মূল আলোচনায়। দ্বীন কায়েমের জন্য 'হিকমাহ' হিসেবে কি গণতন্ত্রকে অবলম্বন করা যাবে?

পূর্বের আলোচনা থেকে নিশ্চয় আমরা ইতোমধ্যেই উত্তর পেয়ে গিয়েছি। তারপরো বলছি-

ক. গণতন্ত্র একটি কুফুরী ও শিরকী ব্যবস্থা, যার সাথে ইসলামী শরীয়তের দূরবর্তী সম্পর্কও নেই। তাহলে শরীয়ত বিরোধী একটি বিষয়, যা ইসলামে নেই, কিভাবে সেটি আল্লাহ তা'আলার কাছে 'হিকমাহ' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে?

খ. আমরা যদি বর্তমান বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই, আর গণতন্ত্রেরও প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারি, তাহলে অবশ্যই আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হবো যে, গণতন্ত্র দ্বারা এ উম্মাহর মুক্তি কিংবা দ্বীন কায়েম করা কোনোটাই সম্ভব নয়।

গ. বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে শরীয়তের চাহিদা বা হুকুম কী তা যদি আমরা বুঝতে ব্যর্থ হই, তাহলে আমরা 'হিকমাহ'র দাবী কী তাও বুঝতে ব্যর্থ হব। অবশ্যই বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে শরীয়তের চাহিদা তথা 'হিকমাহ'র দাবী হল 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'। জিহাদের পথকে সুগম করার জন্য যা যা করণীয়, সে সকল পন্থা আবিষ্কার করাই বর্তমানে হিকমাহ। জিহাদ থেকে পলায়ন কিংবা জিহাদকে পাশ কাটানো-বর্তমান সময়ের জন্য অবশ্যই শরীয়ত বিরোধী কাজ। আর শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ কখনো হিকমাহ হতে পারে না, যা আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। প্রকৃতপক্ষে তা জাহিলিয়াত, একসময় যা অবশ্যই প্রমাণিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

ঘ. প্রিয় ভাই! দ্বীন কায়েমের ক্ষেত্রে যদি গণতন্ত্র অবলম্বন হেকমতই হতো, তাহলে তো আল্লাহর রাসূলের ﷺ যিন্দেগীতে কিংবা সাহাবায়ে কেরামের যিন্দেগীতে এ ধরণের হেকমতের কোনো না কোনো আলামত অবশ্যই পাওয়া যেত। কিন্তু আমরা এ ধরনের কোনো নজির খুঁজে পাইনা। অথচ তখন তো দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাধা-বিপত্তি বর্তমানের চেয়েও অনেক গুণ বেশি ছিল; ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম ও মুসলমানগণ ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্বল অবস্থানে ছিল। অথচ তাঁরা দ্বীন কায়েমের জন্য কোনো প্রকার কুফর ও শিরককে হিকমাহ হিসেবে গ্রহণ করেননি, কিংবা হিকমাহ হিসেবে মক্কার কাফির-মুশরিকদের সাথে এমন কোনো সমঝোতাও করেননি যে- তোমরা আমাদের কিছু মেনে নাও, আমরাও তোমাদের কিছু মেনে নিচ্ছি। তাছাড়া, ইসলামের পরবর্তী চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসেও এধরণের হেকমত অবলম্বনের মাধ্যমে পৃথিবীর এক ইঞ্চি ভূমিতে দ্বীন কায়েম হয়েছে- এমন কোনো দৃষ্টান্ত কেউ কখনো দেখাতে পারবে না।

ঙ. সুতরাং আমরা যারা হিকমাহ মনে করে গণতন্ত্রকে সমর্থন করছি, তারা মূলত শরীয়ত পরিপন্থী কর্মকান্ডে নিজেদেরকে জড়িত করে ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস করছি। তাই আমরা বলতে পারি, "গণতন্ত্র হিকমাহ নয়, গণতন্ত্র একটি আত্মপ্রবঞ্চনা, দ্বীন মনে করে নিজেকে নিজে ধোঁকা দেয়া।" (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

চ. প্রিয় ভাই! আপনি জানেন কি, কেন সলফে সালেহীনগণ কাফেরদের সাথে সমঝোতা করেননি? কেন তাঁরা "হিকমত" হিসেবে কুফরের কিছু অংশ মেনে নেননি? অন্যদিকে কেন আমরা জিহাদ ত্যাগ করে নানা ধরনের গোমরাহীকে 'হেকমত' মনে করছি?

আসল কথা হলো, দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয় আমাদের কারো কারো উপর চেপে বসেছে, তাই আমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও জিহাদের পন্থা বাদ দিয়ে বাতিল পন্থা তালাশ করি, অপরদিকে জিহাদ করাকে আমরা অপছন্দ করি।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।" [সুরা বাকারা - ২:২১৬]

ছ. বর্তমানে আমাদের অনেকের অবস্থা হল, যেখানে মৃত্যুর ঝুঁকি নেই সেদিকেই আমরা দৌঁড় দেই। এক কথায়, "কেউ জিহাদ না করলে আমি একাই জিহাদ করবো"- আমাদের মাঝে এই মানসিকতার অপমৃত্যু হয়েছে, আর সেটির একমাত্র কারণ- মৃত্যুর ভয়!!! মৃত্যু থেকে পালানোকে আজ আমরা নাম দিয়েছি 'হিকমত'!!!

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

"তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক? অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদের নির্দেশ দেয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। এমন কি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না। (হে রসূল) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমান ও খর্ব করা হবে না।" (সূরা নিসা ৪:৭৭)

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও।" (সূরা নিসা ০৪:৭৮)

জ. আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর হুকুমই করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্বীন মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে পুরোপুরিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"আর তোমরা তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করতে থাকো, যে পর্যন্ত না সকল ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" (৮ সূরা আনফাল: ৩৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

১০. গণতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা-কতটুকু যুক্তিসঙ্গত??

** প্রিয় ভাই! সমাজে দ্বীনি মেহনত যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, মসজিদ-মাদরাসার সংখ্যা যতই বাড়ুক না কেন, তাবলিগ জামাত আরও বিস্তৃত পরিসরে মেহনত শুরু করুক না কেন, আমরা হাজারটা 'ইসলামী'(?) গণতান্ত্রিক দল একত্রিত হয়েও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মেহনত করি না কেন, কিছুতেই সমাজ থেকে ফিতনাসমূহ নির্মূল হবে না। কারণ, যে ব্যবস্থা বিজয়ী থাকবে, তারই জীবনধারা বিজয়ী থাকবে। একই সাথে যদি দ্বীন ও বদদ্বীন উভয়টিকে চলার স্বাধীনতা দেয়া হয়, তাহলে বদদ্বীনই বিজয়ী হবে, কেননা সমাজে দুষ্ট লোকদের আধিক্য সবসময়ই বেশি থাকে। ফলে দ্বীনদাররা সমাজে কোনঠাসা হয়ে যায়। দুষ্ট লোকেরা খারাবীটাকেই প্রমোট করে থাকে, আর ভালোদেরকে এমন সকল কুটকৌশল করে দমিয়ে রাখে, যেসকল কাজ একজন দ্বীনদার ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারে না। এই জন্যই 'ইসলামী'(?) গণতান্ত্রিকদলগুলো সহজে নির্বাচনে ভালো করতে পারে না। তাহলে ভাই কিভাবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের ছত্রছায়ায় ইসলাম কায়েম হতে পারে? সেই ব্যবস্থার ছায়াতলে থেকে যতই সমাজের সংশোধনের চেষ্টার করা হোক না কেন, তা কোনো সুফল বয়ে আনবে না। এ জন্যই সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

'শরিয়তের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও; যাবত্ না ফিতনা নির্মূল হয়, এবং দ্বীন সর্বোতভাবে আল্লাহর জন্যই হয়ে যায়।' (সুরা আনফাল ৮: ৩৯)

সুতরাং যতদিন গাইরুল্লাহর মতবাদের শাসন বিদ্যমান থাকবে, ততদিন সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে না। স্মতর্ব্য যে, ইসলাম প্রচার এক বিষয় আর ইসলাম প্রতিষ্ঠা আলাদা বিষয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইসলাম প্রচারও করেছেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠাও করেছেন। কুরআনে আল্লাহ তাকে পাঠানোর উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এ-ও বলেছেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

'আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি আল্লাহর দীনকে সকল দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।' (সুরা তাওবা ৯: ৩৩)

মুফতি হামিদুল্লাহ জান রহ. বলেন :

'যতদিন এই দুর্গন্ধযুক্ত গণতন্ত্র, ইংরেজপ্রদত্ত শাসনব্যবস্থা এই দেশে থাকবে, ততদিন কূপ পাক হতে পারে না। সর্বপ্রথম মৃত কুকুরকে কূপ থেকে বের করতে হবে, তবেই এই পানি পাক হবে। যতক্ষণ মরা কুকুর পানিতে পড়ে থাকবে, হাজার বালতি পানি বের করলেও কূপ পাক হবে না।'

তিনি আরও বলেন : 'ভোটের ব্যবহার মূলত পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কার্যত মেনে নেওয়া এবং সেটার সকল অন্যায়ের অংশীদার হওয়াকে সাব্যস্ত করে। এ জন্য প্রচলিত পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার অধীনে ভোটের ব্যবহার শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়িয নয়।' (আদইয়ান কি জঙ্গ : ৫৬)

প্রিয় ভাই! ভোট দেয়াকে কেউ বলেন "আমানত"; কেউ বলেন, ভোট হচ্ছে ওকালত বা প্রতিনিধিত্ব; কেউ বলেন, ভোট হচ্ছে শাহাদাত বা সাক্ষ্য। ভোট যা-ই হোক না কেন, সাক্ষ্য সর্বদা হকের ব্যাপারে দেওয়া উচিত নয়কি? একটি কুফুরী ব্যবস্থার অংশ 'আমানত' হওয়াকে কি মেনে নেয়া যায়? যে বাতিল শাসনব্যবস্থা রয়েছে, তার সমর্থনে ভোট দেওয়া আদতে সেই বাতিল ব্যবস্থাকে এভাবে মেনে নেওয়ার নামান্তর যে, এই বাতিল শাসনব্যবস্থা সঠিক, তাই নয়কি?

মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানবি রহ. বলেন:

"আফসোস তো হয় ওই সকল ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে, যারা দাবি করে, প্রচলিত রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশে সহিহ ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। অথচ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তারা ইসলামি বিধিনিষেধের তোয়াক্কা করে না এবং শরিয়ত-পরিপন্থী কৌশল অবলম্বন করে।

যখন তাদের বলা হয়, আপনারা তো ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার দাবিদার; কিন্তু আপনারা ইসলাম বাস্তবায়নের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তা তো অনৈসলামিক এবং নাজায়িয, তখন তারা প্রত্যুত্তরে বলে, যদিও এ পদ্ধতি নাজায়িয; কিন্তু তা ব্যতীত ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ জন্য এখন তো জায়িয-নাজায়িযের তোয়াক্কা না করে ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা আবশ্যক। ক্ষমতা অর্জিত হলে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম বাস্তবায়ন করব।

এটা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের নিয়তের ব্যাপারে আমরা সন্দেহ করছি না; কিন্তু তাদের কর্মপদ্ধতি এমন, যার মাধ্যমে কখনোই ইসলাম বাস্তবায়নের আশা করা যায় না। কেননা অনৈসলামিক পদ্ধতিতে দীনহীনদের জন্য তো সফলতা অর্জন করা সম্ভব; কিন্তু দীনদারদের জন্য প্রথমত সফলতা অর্জন করাই সম্ভব নয়। আর যদি বাহ্যত সফল হয়েও যায়, তবুও সেটার পরিণামে ইসলাম আসবে না; বরং ইসলাম নামের অন্য কিছু হবে। বাহ্যত যে সফলতা অর্জন করেছে, তা-ও দীর্ঘস্থায়ী হবে না। যেহেতু তার ভিত্তি দুর্বল ছিল, তো সেটার ওপর ভবন কীভাবে টিকে থাকবে?" (আহসানুল ফাতাওয়া : ৬/৪৩)

"দিফায়ে মিল্লাতে ইবরাহীম" (মিল্লাতে ইবরাহিমের জাগরণ) গ্রন্থের লেখক বলেন:

"সকল গোষ্ঠী তিনটি বিষয়কে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করায় :

ক. সদস্য-সংখ্যার স্বল্পতা

খ. বস্তুগত প্রস্তুতির অবিদ্যমানতা

গ. শত্রুর সংখ্যাধিক্য, ভয়ানক অস্ত্রশক্তি এবং অসাধারণ রণপ্রস্তুতির সামনে টিকতে না পেরে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা।

অথচ এ বিষয়গুলো কখনোই অজুহাত হতে পারে না। সদস্য-সংখ্যার স্বল্পতা তো এ জন্য অজুহাত হতে পারে না যে, মক্কায় তেরো বছর পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিরা সব ধরনের কষ্ট সয়েছেন। আমাকে বলো, তাদের সংখ্যা কত ছিল? এরপরও কি রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নীরব থাকার, সন্ধি করে নেওয়ার, বস্তুবাদী পৃথিবীর বেশি থেকে বেশি উপকার অর্জনের দিকে অভিমুখী হওয়ার এবং শত্রুদের সঙ্গে মিলে কাজ করার অনুমতি প্রদান করেছেন? তিনি কি তাদেরকে কাফিরদের ধোঁকায় রেখে তাদের গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের উৎসাহ দিয়েছেন? নাকি রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদেরকে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিকল্পনাগুলোর মতো কোনো সুদৃঢ়-সুসংহত পরিকল্পনা করে দিয়েছিলেন? পক্ষান্তরে তোমাদের পরিকল্পনাগুলোর অবস্থা তো আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করছি এবং তার ফলাফল পুরোপুরিই ভোগ করছি।

অপরদিকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাওয়াতের ফলাফল তো কোনো চক্ষুষ্মানের দৃষ্টিপটে অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। তার সাথে ছিল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সাহাবিদের এক কাফেলা, যাদের ভয়ে রোম এবং পারস্য আতঙ্কিত হয়ে উঠত—যে রোম এবং পারস্য ছিল তৎকালীন পরাশক্তি, তোমাদের এ যুগে যেমন যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া হলো দুনিয়ার পরাশক্তি। আবু সুফিয়ানের সাথে রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রশ্নোত্তর এবং তা থেকে হিরাক্লিয়াস যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল—তা থেকে সেই অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবে।

সহিহ বুখারির দীর্ঘ হাদিসে বিবৃত হয়েছে :

হিরাক্লিয়াস বলল, 'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, সম্ভ্রান্ত লোক তার অনুসরণ করে, নাকি সাধারণ লোক? তুমি বলেছ, সাধারণ লোকই তার অনুসরণ করে। আর বাস্তবেও এই শ্রেণির লোকেরাই হন রাসুলগণের অনুসারী। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি সন্ধি ভঙ্গ করেন কি না? তুমি বলেছ, না। প্রকৃতপক্ষে রাসুলগণ এরূপই সন্ধি ভঙ্গ করেন না। তুমি যা বলেছ, তা যদি সত্য হয়, তবে শীঘ্রই তিনি আমার দুপায়ের নিচের জায়গার অধিকারী হবেন। (সহিহ বুখারি : ৭)

হিরাক্লিয়াসের সুগভীর জ্ঞান এবং তার দূরদর্শিতার দিকে লক্ষ্য করো—সে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বিজয়লাভের ঘোষণা দিচ্ছে, অথচ এটা তার জানা যে, এই নবির অধিকাংশ অনুসারী নিতান্ত সাধারণ লোক। সে নবির রণপ্রস্তুতি, শক্তি এবং বাহিনী সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই করেনি।

আখের নবি ﷺ-এর দীনের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, নাকি তা হয়নি?

হ্যাঁ, দীন ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তা যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার সমকক্ষ রোম-পারস্য শাসন করেছিল।

কিন্তু তোমরা যেহেতু মিল্লাতে ইবরাহিম ত্যাগ করেছ, তার বিরোধিতায় সরব হয়েছ, ভিন্ন কোনো আদর্শ গ্রহণ করেছ, নিজেদের ধারা বদলে ফেলেছ আর মিল্লাতে ইবরাহিমের মধ্যে পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধনের প্রচেষ্টায় রত হয়েছ, তাই আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে এ কথা বলব যে, কিছুতেই তোমাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না।

যদি বলো, কেন আমাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না?

আমরা বলব, তোমরা ধোঁকার পথকে নিজেদের পরিকল্পনার অংশ বানিয়ে নিয়েছ, অথচ রাসুল ﷺ এবং তার অনুসারীরা কখনো ধোঁকার পথে হাঁটেননি।

তোমরা নিজেদের সংগঠনের জন্য তোমাদের দৃষ্টিতে বিশেষ ক্ষমতাধর শ্রেণি এবং শক্তিশালী কর্তৃপক্ষের সদস্যদের বেছে নিয়েছ, অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসারীরা ছিল দুর্বল। 'রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানুষদের মধ্যে পার্থক্যকারী'—যেমনটি সহিহ বুখারির উদ্ধৃতিতে পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। তেমনি তার সাহাবিরাও নিজ প্রতিপালককে কিয়ামতের দিন বলবে :

فارقناهم، ونحن أحوج منا إليه اليوم

'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা মানুষদের থেকে আলাদা হয়েছি এমতাবস্থায় যে, তাদের প্রতি আমাদের প্রয়োজন ছিল প্রচণ্ড।'

অথচ তোমরা সব ধরনের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে চলো, সবাই-ই তোমাদের দৃষ্টিতে মুসলমান; তাদের বিশ্বাস দৃষ্টিভঙ্গি কাজকর্মে পারস্পরিক কতটা ভিন্নতা—তা সবই তোমাদের দৃষ্টিতে অবিবেচ্য এবং গুরুত্বহীন একটি বিষয়।

একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তারা জাতীয়তার সারিতে সহাবস্থানে চলে আসুক, সম্মানজনক পদসমূহ অধিকার এবং ধোঁকার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা তোমাদের সহযোগী হয়ে যাক—যাতে তোমরা নিজেদের কল্পিত ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হও।

অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ তার প্রকাশ্য মানহাজকে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে, মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন। তার সাহাবিদের মধ্য থেকেও শহিদ হয়েছে মাত্র গুটিকয়েক প্রাণ, বন্দির সংখ্যা তো নিতান্ত স্বল্প।

তোমরা নিজেদের বিশ্বাসকে গোপন রাখো, মুশরিকদের সারিতে প্রবেশ করে ঐক্যের বন্ধনেও আবদ্ধ হও, সবধরনের চাল প্রয়োগ করো, এতদসত্ত্বেও নিজেদের কল্পিত ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হও না। অথচ এই ধোঁকার আন্দোলনে তোমাদের হাজার ব্যক্তি মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছে। বাস্তবতা হলো, তোমরা এখনো পর্যন্ত নবিজি ﷺ-এর এই বাণী হৃদয়ঙ্গম করোনি :

لا يلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين
'মুমিন এক গর্তে দুবার দংশিত হয় না।'

আমরা তোমাদের সে কথাই বলব, ইমাম মালিক রহ. যা বলেছিলেন :

لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها
'এই উম্মাহর শেষভাগের লোকেরা কিছুতেই সংশোধিত হতে পারবে না, তবে সেই উপাদানের মাধ্যমে পারবে, যার মাধ্যমে প্রথমভাগের লোকেরা সংশোধিত হয়েছিল।'

আর নবিজি ﷺ তো বলেছেন :

لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله
'আমার উম্মাহর একদল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের বিরুদ্ধাচারণ করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যাবত্ না আল্লাহর নির্দেশ আসে।' (সহিহ বুখারি : ৭৩১১; সহিহ মুসলিম : ১৯২১)

[মিল্লাতে ইবরাহিমের জাগরণ, শাইখ মুদ্দাস্সির আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আরশাদ লুধি রহ., পৃ. 51-55: https://bit.ly/mij3]

** প্রিয় ভাই! আমরা পুরো বিশ্বের ইতিহাসের দিকে একটু তাকাই! তাহলে আমরা একটি চরম বাস্তবতা দেখতে পাবো, গণতন্ত্রের ভিতরে ক্ষমতা স্থানান্তর হয় কেবল। যার কারণে ব্যক্তির চেহারা তো পাল্টায়, কিন্তু জোর-জবরদস্তি ও শক্তির উপর নির্ভরশীল পূর্ব থেকে চলে আসা চাপিয়ে দেওয়া সিস্টেমে কখনো কোন পবিরর্তন আসে না। সিস্টেমের পরিবর্তন অর্থাৎ উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সম্পূর্ণ এক নতুন সিস্টেম আনা; যার মাধ্যমে পূর্ব থেকে চেপে বসা শাসকশ্রেনী ও বুদ্ধিজীবিদের থেকে পরিত্রান হাসিল হবে, সেটা ভোটের গণনা দ্বারা কখনো হাসিল হয়নি ও কখনো হতেও পারে না। তার জন্য এমন একটি শক্তির দরকার, এমন শক্তি সঞ্চারের প্রয়োজন; যা বাতিলদের শক্তিকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলে দিবে। ইসলামের ইতিহাস আমাদের সামনে রয়েছে। সীরাত আমাদের জন্য এক আমলী নমুনা বা আদর্শ। মক্কার মুশরিকরা যখন সত্যের বিরোধিতায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ইসলাম বিজয়ের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন নবী মুহাম্মাদ ﷺ শুধু প্রজ্ঞাপূর্ণ মতামত দিয়েই মক্কা বিজয় করেননি। বরং রাসূল ﷺ প্রথমে মদীনায় শক্তি সঞ্চার করেছেন, ময়দানে বদর ও ময়দানে উহুদের মারহালা অতিক্রম করেছেন, অবশেষে মক্কা বিজয়ের রাস্তা সুগম হয়েছে, যার মাধ্যমে সকল বাঁধা-বিপত্তি দূর হয়ে যায় এবং মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে।

১১. গণতন্ত্র নিয়ে সর্বশেষ প্রশ্ন:

প্রিয় ভাই! এখানে সর্বশেষ আরেকটি প্রশ্ন রয়ে গেল, কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শতভাগ মানুষও যদি ইসলামী শরিয়াহ চায়, (অর্থাৎ সিস্টেম থাকবে গণতন্ত্র কিন্তু বিধান হবে কুরআনের) তাহলে কি সেটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে? বাস্তবে কি এটি সম্ভব? "আমরা যদি ক্ষমতায় যেতে পারি, তাহলে রাষ্ট্রে ইসলামী শরীয়াহ কায়েম করব"-এই কথাটি কতটুকু বাস্তবসম্মত??? বাস্তবতার আলোকে বুঝতে চাই।

উত্তর: এটি একটি অবাস্তব ধারণা, একটি অলীক স্বপ্ন। এই ভুল ধারণাটা আমরা অনেক দ্বীনদার ভাইয়েরা করে থাকি, আমরা মনে করি, "আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন করার পর শতভাগ শরীয়াহ কায়েম করতে চাই।"

কিন্তু ভাই, এটা কখনোই সম্ভব নয়। কেননা গণতন্ত্রের নাটাই (নিয়ন্ত্রণ) সবসময়ই একটি আন্তর্জাতিক সিন্ডিকেট মহলের কব্জায়। এরা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন নামে কাজ করে থাকে। যেমন: ব্যবীলনীয়ান ব্রাদারহুড, নাইট টেম্পলার, হাশাশিন, ফ্রী মেসন, ইলুমিনাতি, বিল্ডারবার্গ গ্রুপ, রোসিক্রুসিয়ান, স্কাল এবং বোন্স অর্ডার, বোহেমিয়ান গ্রুভ, এল্ডার্স অব জায়ন, জাতিসংঘ ইত্যাদি । যাদের নেতৃত্ব দেয় শয়তানপূজারী ইহুদী জাদুকর, শিল্পপতি এবং ব্যাংকাররা। এরা সারা বিশ্বে গণতন্ত্রের মাধ্যমে স্যাকুলার তথা ধর্মহীণ ও তাদের কদমদাস একটি মানবসমাজ গঠন করতে চায়। তারা বিশ্বব্যাপী তাদের প্রতীক্ষিত বাদশাহ দাজ্জালের জন্য একক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যাকে বলা হয় 'বৈশ্বিক নতুন শাসনব্যবস্থা' বা New World Order। [বিস্তারিত পড়ুন: https://bit.ly/3CGpNaD]

মুফতি নিজামুদ্দিন শামজায়ি রহ. বলেন :

'বিশ্বের অধিকাংশ দেশে যে দুটো রাষ্ট্রব্যবস্থা চলছে, এ দুটো রাষ্ট্রব্যবস্থাই ইহুদিদের তৈরি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা—এটাও ইহুদিদের আবিষ্কার, ইহুদিরাই এর স্রষ্টা এবং ইহুদিরাই এটাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে। তেমনিভাবে এই যে সাম্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল, সেটাকেও বিশ্বের সামনে ইহুদিরাই উপস্থাপন করেছে।' (খুতবাতে শামজায়ি : ১/১৭২-১৭৩)

প্রিয় ভাই! এদের প্রভাব বলয় প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এরা নিরলসভাবে সারা বিশ্বব্যাপী শয়তান ও দাজ্জালের রাজত্ব কায়েম করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এরা কখনোই কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে 'ইসলামী' রাষ্ট্র হতে দিবে না।

'খেলাফতে উসমানিয়ার ধ্বংসের পর পৃথিবীর বুকে আল্লাহর শরিয়ত পুরোপুরি শাসিত ও পরাভূত হয়ে গেছে। মুসলিম ভূখণ্ডসমূহে শরিয়াহব্যবস্থা শেষ করে দিয়ে ইংরেজ, ফরাসি ও অন্যান্য মিশ্র ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রি.) পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো যখন নিজেদের অধীনস্থ মুসলিম দেশগুলো ত্যাগ করছিল, তখন তারা খুব ভালোভাবেই খেয়াল রেখেছে যে, তাদের চলে যাওয়ার পরও যাতে কোনো ভূখণ্ডে মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরিয়ত বাস্তবায়িত হতে না পারে। তাই অধিকাংশ মুসলিম দেশে গণতন্ত্র চালু করা হয় এবং এ বিষয়টি আবশ্যক করে দেওয়া হয় যে, কোনো মুসলিম দেশে শরয়ি শাসনব্যবস্থা চালু করা যাবে না। এ লক্ষ্যে জাতিসংঘের চার্টারকে জীবনব্যবস্থা (ধর্ম) হিসেবে প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। সরকারগুলো এসব আইন-কানুন গুরুত্বের সঙ্গে বাস্তবায়ন করছে। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বাহিনী তা বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছে। ফলে মুসলিম সাম্রাজ্য থেকে ইসলামের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে।

যেহেতু গণতন্ত্র নামক এ নব্য কুফরে পূর্বের ধর্ম থেকে বের হয়ে যাওয়া আবশ্যক নয়, তাই অনেকে এ কুফরি ধর্মের কুফরিই বোঝে না। তারা নিজেদের ধর্ম পালনের পাশাপাশি আরেকটি নতুন ধর্মকেও জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করে নেয়। খ্রিষ্টানরা রবিবারে গির্জায় যেতে পেরেই সন্তুষ্ট। কারণ, নতুন এ ধর্ম ইবাদতের ব্যাপারে তাদের প্রতি কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি। পুরো সমাজব্যবস্থা যে ইহুদিদের তৈরি সেকুলারিজমের অধীনে চলে যাচ্ছে, সেটার প্রতি তাদের কোনো পরোয়াই নেই।

তেমনিভাবে মুসলমানদের এ ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রথমে খিলাফাতব্যবস্থা ভেঙে ফেলা হয়; যাতে কুরআন কারিমের জীবনব্যবস্থা তাদের নিজেদের জীবন থেকে বিদায় নেয় এবং তারা শুধু ব্যক্তিগত ইবাদতকেই ধর্ম মনে করে। এর জন্য প্রাচ্যবিদ, তথাকথিত প্রগতিশীল ও আধুনিকমনা বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রয়াস চালানো হয়। শরয়ি পরিভাষাসমূহের অর্থ বিকৃত করা হয়। যেমন : ফকিহগণ ধর্মীয় স্বাধীনতার এক ব্যাখ্যা দেন; কিন্তু ইংরেজ মুফতি ও কাদিয়ানিমার্কা মুফতিরা তার ব্যাখ্যা দেয় নতুন করে। তেমনিভাবে দারুল হারব ও দারুল ইসলামের রূপ, হাকিমিয়্যাত ও আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র রূপ, আল্লাহর আইন ও গাইরুল্লাহর আইনে বিচারকার্য—সবগুলোর এমন সব অর্থে দাঁড় করিয়েছে যে, ফকিহগণের কথাগুলো পুরোনো কিতাবাদিতেই রয়ে গেছে।

মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র শরয়ি পরিভাষাসমূহকে খুবই শঠতার সঙ্গে ব্যবহার করেছে। যেখানেই গণতন্ত্রের কুফরি স্পষ্ট হয়ার আশঙ্কা ছিল, সেখানেই নতুন পরিভাষা সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলামী পরিভাষাসমূহকে শঠতাপূর্ণ পন্থায় ব্যবহার করে মুসলমানদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মুসলমানদের কিছু আচার-অনুষ্ঠান ও কিছু ইবাদতের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, অথচ তাদের সামাজিক জীবন থেকে শুধু ধর্মকেই বিতাড়ন করা হয়নি; বরং সামাজিক জীবনের জন্য কুফরের স্রষ্টারা তাদের একটি নতুন ধর্ম আবিষ্কার করেছে। যে ধর্মমতে জীবন পরিচালনা করার কাজটি জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্রকে আবশ্যিকভাবে পালন করতে হয়। কুফরি আইন ও জীবনব্যবস্থাকে জোরপূর্বক মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এটা তারা অনুভব করতে পারেনি। কারণ, নামাজ-রোজা-হজ ইত্যাদির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ইসলামি নাম রাখতেও নিষেধ করা হয়নি। তাদের অনুভব না করার কারণ হলো, তাদের দৃষ্টিতে কুফর হলো ইসলাম থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে বের হয়ে যাওয়ার নাম। এককালে কেউ নতুন ধর্ম গ্রহণ করে নিজের নাম পরিবর্তন করাকেই কেবল কুফরি মনে করা হতো। নব্য কুফর তো এমন কোনো কিছুই দাবি করছে না।

গণতন্ত্র ও সেক্যুলার সিস্টেমে একটু চিন্তা করলেই এ কথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটি ইসলামের সাথে চরম সাংঘর্ষিক একটি ধর্ম; তাতে রয়েছে নিজস্ব হালাল-হারাম। রয়েছে ফরজ-ওয়াজিব। রয়েছে শত্রুতা-বন্ধুত্বের মাপকাঠি। এসব তো স্বতন্ত্র ধর্মের মধ্যেই থাকে।

প্রিয় ভাই! ইসলাম ও গণতন্ত্র- এ দুই ধর্ম এক স্থানে একত্রিত হতে পারে না। একজন মানুষ একই সময়ে দুই ধর্মের প্রতি আনুগত্য করতে পারে না। এটি অসম্ভব। শয়তানও খুশি থাকবে, আবার আল্লাহ্ তা'আলাও নারাজ হবেন না-এটা কিভাবে সম্ভব?

প্রকৃতপক্ষে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যতটা না অসম্ভব, তার চেয়েও বেশি অবাস্তব। এর সবচেয়ে বড় কারণ হল, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা ক্ষমতা লাভ করলেও, গণতন্ত্রের পশ্চিমা প্রভু ও অভিভাবকরা ততক্ষণই আমাদেরকে ক্ষমতায় রাখবে যতক্ষণ আমরা তাদের গোলামী করতে থাকব, তাদের পদলেহন করতে থাকব এবং

তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো ইসলামী বিধান সমাজে চালু না করব। যখনই আমরা তাদের স্বার্থবিরোধী কোনো কিছু করব, তখনই তারা নানা কৌশলে আমাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করবে, হয়তো দেশের ভিতর তাদের এজেন্ট দ্বারা অরাজকতা সৃষ্টি করবে, কিংবা কখনো সামরিক জান্তাকে উস্কিয়ে দিয়ে, অথবা আন্তর্জাতিক মহলের চাপ সৃষ্টি করে, কিংবা সামাজিক, অর্থনৈতিক নানাভাবে বয়কট করার মাধ্যমে। যেমনটি আমরা দেখেছি, মিশরে মুরসির সাথে করা হয়েছে। সুতরাং দেশের সকল মানুষ ইসলামী আইন চাইলেও, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার আশা দিবাস্বপ্ন বৈ নয়। হাজার বছর সাধনা করলেও আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো না। বাস্তবতা হচ্ছে: গণতান্ত্রিক পন্থায় ইসলাম কখনোই বিজয় লাভ করতে পারবে না। আর এই বাস্তবতাকে কেবল কোন অন্ধ লোকের পক্ষেই অস্বীকার করা সম্ভব। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিসর, আল-জাযায়ের, তুরস্ক, তিউনিসিয়া প্রভৃতি দেশগুলোই নয় বরং পুরো ইসলামী বিশ্ব এর বাস্তব সাক্ষী।

মুফতি নিজামুদ্দিন শামজায়ি শহিদ রহ. বলেন :

'নির্বাচন পদ্ধতি ও গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে আলিমগণ আটচল্লিশটি বছর নষ্ট করেছে। আমি জোর দাবি করে বলছি, এই ব্যবস্থায় আটচল্লিশ হাজার বছরেও ইসলাম আসবে না। কবি ইকবালের কথা অনুযায়ী—গণতন্ত্র এমন একটি শাসনব্যবস্থা, যাতে মানুষকে গণনা করা হয়; কিন্তু মাপা হয় না। সুতরাং এ কর্মপন্থায় শ্রম ব্যয় না করে তরুণদের নিয়ে মেহনত করুন। তাদের মানসিকতা তৈরি করুন। মার্কিন ও ইহুদি অভিসন্ধি তাদের বুঝিয়ে দিন। প্রথমে নিজেও বিষয়টি বুঝে নিন।' (খুতুবাতে শামজায়ি : ১/২০৩-২০৪ (সংক্ষেপিত))

অন্যত্র তিনি বলেন :

'আল্লাহ তাআলার দীন পৃথিবীতে ভোটের মাধ্যমে, পশ্চিমা গণতন্ত্রের মাধ্যমে বিজয় লাভ করতে পারবে না। কেননা পৃথিবীতে ফাসেক-ফাজের দুষ্টমতি ও দুশমনদের আধিক্য। আর গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষদের গণনা করার নাম; মাপার নাম নয়। পৃথিবীতে ইসলামকে বিজয়ী করার একমাত্র পথ হচ্ছে, যেটা রাসুলুল্লাহ ﷺ গ্রহণ করেছেন। আর তা হচ্ছে জিহাদ-কিতালের পথ।' (আদইয়ান কি জঙ্গ : ৫৮ (সংক্ষেপিত))

সুতরাং প্রিয় ভাই, এতক্ষণের আলোচনা দ্বারা এটাই কি স্পষ্ট প্রতিভাত হয় না, "আল্লাহর জমীনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের করণীয় হল- গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক প্রভুদের প্রভুত্বকে অস্বীকার করে, তাদের নাটাইয়ের বলয় হতে বের হয়ে, তাদের সিস্টেমের সাথে বিদ্রোহ করে, তাদের গোলামীর শৃঙ্খলকে চুর্ণবিচুর্ণ করে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মাধ্যমে ইসলাম কায়েম করা।"

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সঠিকভাবে বুঝার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কিছু কিছু জিহাদ সমর্থক ভাইদেরকে শয়তানের ধোঁকা

গত বেশ কয়েক বছরে তাওহীদ ও জিহাদের দাওয়াহ সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে বেশ অনেকটুকুই ছড়িয়ে পড়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। যে প্রজন্মের আগে সময় কাটতো জাহিলিয়্যাহর বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে, আজ তাদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশের কাছে এসব কিছু ছাপিয়ে জিহাদের ডাক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যারা আগে নিজেদের সালাত নিয়েই চিন্তা করতো না, আজ উম্মাহর রক্তের নদী দেখে তাদের হৃদয় প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে।। কুফফার ও তাওয়াগীত যতোই জিহাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে, যতোই জিহাদকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাচ্ছে, যতই জিহাদের ডাককে চাপা দিতে চাইছে ততোই এ ডাক আরো ছড়িয়ে পড়ছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য তাঁর স্বীয় কাজে প্রবল থাকেন যদিও অধিকাংশ লোকেরাই তা জানেন না।

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

"তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" [আত তাওবাহ ৯:৩২]

তবে চিরাচরিত সত্য হল, একটি কাজ যখন শুরু হয় তখন মান নিয়ন্ত্রন করা যতোটুকু সহজ হয়, কাজের ব্যাপ্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে তা আর ততোটা সহজ থাকে না। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, তবে এটা সাধারন ভাবে সত্য। এ কথা অনলাইন দাওয়াহ ও দা'ঈদের ক্ষেত্রেও সত্য। আমরা যদি অনলাইনে জিহাদের দাওয়াহ এবং দা'ঈদের দিকে তাকাই তাহলে এ সত্যের প্রমান পাওয়া যায়। যে মানহাজের দাওয়াহ আমরা করছি, যে মানহাজের অনুসরন আমরা করছি তার শর্ত, বৈশিষ্ট্য এবং দাবিগুলো সম্পর্কে দেখা যায় অনেক ভাই-ই ওয়াকিবহাল নন।

প্রকৃতপক্ষে, যে বিষয় বা কর্মের প্রতি আমরা অন্যদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি, আমরা নিজেরাই সেই দাওয়াহর হক আদায় করছি না, সে দাওয়াহর দাবী পুরা করছি না। কেবল অনলাইনে কিছু দাওয়াত দেয়া আর জিহাদ ও মুজাহিদ ভাইদেরকে সমর্থন করেই নিজেদের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করছি।

অথচ, রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন –

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ– كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ –إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

"মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা বল কেন? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক। আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর।" (সূরা সফ ৬১: ২-৪)

আজকাল একটি কথা খুব বেশি শোনা যায় আর তা হল "মানহাজের ভাই" বা "অমুক আমাদের মানহাজের"। এধরনের কথা দ্বারা বোঝানো হয় উদ্দিষ্ট ব্যক্তি জিহাদের মানহাজের অনুসারী।

প্রিয় ভাই! মুসলিম হিসেবে আমাদের 'মুসলিম' পরিচয়ে সন্তুষ্ট থাকাই যথেষ্ট। 'আমভাবে এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই, এক মুসলিমের সম্পদ, রক্ত, সম্মানকে তার মুসলিম ভাই হেফাযত করবে। পরিচয় হিসেবে এটাই

যথেষ্ট হওয়া উচিত। সেখানে আলাদা করে "মানহাজের ভাই" বা এধরনের শব্দাবলীর প্রয়োগ কতোটা যৌক্তিক সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ, তার উপর এ ধরনের শব্দাবলী ব্যবহৃত হয় সম্পূর্ণ বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন ভাবে। খোঁজ নিলে হয়ত দেখা যাবে, যাকে বা যাদেরকে "মানহাজের ভাই" বলা হচ্ছে তিনি না কোন জিহাদী তানযীমের সাথে যুক্ত, আর না সক্রিয়ভাবে কোন ধরনের জিহাদী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। এবং এই ভাইদের বিশাল একটা অংশকে যখন জিহাদের কাজের দিকে আহবান করা হয় তখন তারা বিভিন্ন অজুহাতে তা এড়িয়ে যান। বিশেষ করে যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে সেলিব্রিটি হিসেবে এবং "জিহাদী সেলিব্রিটি, মানহাজের ভাই" ইত্যাদি হিসেবে পরিচিত তাদের জন্য এটা প্রায় ১০০% ক্ষেত্রে সত্য।

বাস্তবতা হল, আমরা জিহাদের দাওয়াত দিচ্ছি, জিহাদের মহব্বতও অন্তরে লালন করি, জিহাদ করা দরকার-তাও বুঝি; কিন্তু নিজেরা জিহাদের কণ্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসর হই না। জিহাদের জন্য যে সকল ভাইয়েরা জান ও মাল দ্বারা কুরবানী করে যাচ্ছেন, তাদের সাথে মিলিত হওয়ার ফিকির করিনা, বর্তমান সময়ে জিহাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করি না কিংবা এজেন্ডাসমূহ বাস্তবায়ন করি না, হক মানহাজের ভাইয়েরা যেভাবে জিহাদ করছেন বা জিহাদের ময়দান প্রস্তুত করছেন, তাদের সাথে এক হয়ে কাজ করি না। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাইয়েরা আমাদেরকে দাওয়াত দিলে তাও নানা অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করি। এত কিছুর পরেও আমরা নিজেদেরকে 'মানহাজী' মনে করি। তাহলে ভাই, এখানে কোন মানহাজের কথা বলা হচ্ছে?

প্রকৃতপক্ষে, যারা এরকম বলে থাকেন তাদের মধ্যে প্রচলিত ধারনাটা হল, যে ব্যক্তি জিহাদ সমর্থন করে, কিংবা তানযীম আল-ক্বা'ইদাকে সমর্থন করে, যারা জিহাদ সমর্থন করেন, যারা ৯/১১ সমর্থন করেন, শাতিম হত্যা করা সমর্থন করেন, জিহাদ করা উচিত সমর্থন করেন, তারা হল "মানহাজের ভাই", তারা হল আমাদের "মানহাজের"। কিন্তু আসলে কি মানহাজ বলতে এটাকেই বোঝানো হয়, মানহাজ বলতে কি নিছক কোন তাত্ত্বিক ও নিষ্ক্রিয় সমর্থনের মনোভাবকে বোঝানো হয়? আর এটা কি বৈশ্বিক জিহাদ তথা তানযীম আল-কায়েদার মানহাজ?

• প্রিয় ভাই! এ দ্বীন তাত্ত্বিকতার না, এ 'মানহাজ' নিষ্ক্রিয়তার মানহাজ না!!!

মানহাজ বলতে আসলে কি বোঝানো হয়? কোনো প্রকারের অ্যাকাডেমিক আলোচনায় না গিয়ে সাধারণভাবে বলা যায়, মানহাজ হল কর্মপদ্ধতি। যদিও মানহাজের সবচেয়ে প্রচলিত সংজ্ঞা হলঃ মানহাজ হল 'ইলম, গ্রহন, বিশ্লেষন ও বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি, তথাপি একথা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত যে, মানহাজের পরিধি শুধুমাত্র 'ইলম অর্জন ও বাস্তবায়নের মধ্যে সীমিত না, বরং তা আরো ব্যাপক। আধুনিক সময়ে মানহাজের সর্বাধিক প্রচলিত অর্থ হল 'দ্বীন কায়েমের জন্য কর্মপদ্ধতি'। যেমন ধরুন, কেউ যদি বলে দ্বীন কায়েমের পন্থা হল দাওয়াত ও তাযকিয়্যাহ এবং এ বিশ্বাসের উপর কাজ করে, তবে তার মানহাজ হল দাওয়াহ ও তাযকিয়্যাহর মানহাজ। যেমন তাবলীগ জামাত। কেউ যদি বলে দ্বীন প্রতিষ্ঠার উপায় হল, ইসলামী সমাজ বিনির্মান ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়া, এবং সে এই তত্ত্বের উপর আমল করে তবে এটা তার মানহাজ। যেমন - জামায়াতে ইসলামী বা ইখওয়ানুল মুসলিমীন। কেউ যদি মনে করে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ হল কেবল আক্বীদার দাওয়াহ দেওয়া, এবং সে এই বিশ্বাসের উপর কাজ করে, তবে তার সেটাই তার মানহাজ, যেমন শায়খ আলবানীর সালাফি দাওয়াহ। কেউ যদি মনে করে উম্মাহর উত্তরনের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল তারবিয়্যাহ, তাসফিয়াহ, তা'লীম, দাওয়াহ, এবং সে এই বিশ্বাসের উপর 'আমল করে তবে সেটাই তার মানহাজ।

এখানে লক্ষনীয় হল, মানহাজ 'সরাসরি আমলের' সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়। মানহাজ 'বাস্তবায়নের' সাথে সম্পর্কিত, নিছক সমর্থন বা সহমর্মিতার সাথে না। একারনে শুধুমাত্র সমর্থনের সাথে মানহাজের যোগসূত্র খোঁজা হাস্যকর। নির্দিষ্ট কোন একটি আদর্শ ধারন ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই একটি মানহাজের অনুসরন সম্ভব।

তবে জিহাদের ক্ষেত্রে যখন এটা বলা হয় তখন এটা আরো বেশি গুরুতর একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কারন জিহাদ হল একটি ইবাদাত, যা আমাদের সময় একটি ফরয ইবাদাত। ইবাদাতের ক্ষেত্রে সমর্থনের কোন ধারনা সাহাবায়ে কেরামদের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত দ্বীন ইসলামে কখনই ছিল না।

প্রিয় ভাই! কোন সুস্থ মস্তিকের দ্বীনের বুঝ সম্পন্ন ব্যক্তিকে আপনি কখনো বলতে দেখবেন না, "আমি মাগরিবের তিন রাকাত সালাত" সমর্থন করি। নিজে আদায় করি না।" তার চেয়েও বড় কথা হল এই ব্যক্তিকে কেউ কখনো আমার "নামাজী ভাই" বলে কিন্তু সম্বোধন করবে না, আর সে নামাজী হিসেবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য হবে না শার'ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে কিংবা সাধারণ মানবিক বিচার-বিবেচনার দৃষ্টিকোণ থেকে, যতক্ষণ না সে ফরয সালাত আদায় করছে। একইভাবে কেউ কিন্তু কখনো বলে না "আমি রামাদ্বানের সিয়াম সমর্থন করি, ফরয মনে করি, যারা সিয়াম পালন করছে তাদের সমর্থন করি, তারা খুব ভালো কাজ করছে, তবে আমি নিজে সিয়াম পালন করি না। আর এই সমর্থনের কারণেই আমি রোযাদার।" তবে শার'ঈ ভাবে এ ধরনের কথার কোন ভিত্তি নেই, এবং ফরয আমল থেকে বিনা ওজরে বিরত থাকার কারনে এই ব্যক্তি ফাসিক্ব বলে গন্য হবে।

প্রিয় ভাই! এই দ্বীন তাত্ত্বিকতার দ্বীন না, দ্বীনের আবশ্যক বিষয়ে 'কেবল সমর্থনের অবস্থান' আল্লাহ আমাদেরকে দেননি। ইবাদাতের বিষয়গুলো আমাদের সমর্থন সাপেক্ষ নয়, বরং এগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক হল শোনার ও মানার। আমরা যখন জানলাম ফযরের দুই রাকাত সালাত ফরয, এখন আমরা বাধ্য এই দুই রাকাত সালাত আদায় করতে। আমরা যদি তা না করি তাহলে আমরা আল্লাহর অবাধ্যতা করলাম এবং আমাদের এ অবস্থানের কোন শার'ঈ যৌক্তিকতা বা জাস্টিফিকেশান নেই। এখানে আমরা কেবল সমর্থনের কথা বলে পার পাবো না।

প্রিয় ভাই! এখন চিন্তা করুন জিহাদের কথা। সালাফদের, সকল মাযহাবের ইমামদের অবস্থান অনুযায়ী বর্তমানের জিহাদ ফারযুল আইন। অর্থাৎ বর্তমানে জিহাদ প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয যেভাবে প্রতিটি ব্যক্তির উপর ফযরের দুই রাকাত সালাত ফরয। [বিস্তারিত জানতে দেখুন, "কিতাবুত তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল: দ্বিতীয় পর্ব: তাওহীদ ও জিহাদ" কিতাবটি]। একই সাথে শাহ আব্দুল আযীযের বিখ্যাত ফাতাওয়া (যা রদ করা কিংবা অপনোদন করা এখনো সম্ভব হয়নি, সেটি) অনুযায়ী হিন্দুস্তান দারুল হারব, যেখানে জিহাদ ফরয। এবং আমরা যেসব "জিহাদ সমর্থক মানহাজের ভাই" আছি তারাও জিহাদ যে 'ফারযুল আইন' তা স্বীকার করি। তাহলে প্রশ্ন হল কেউ যদি এটা স্বীকার করে তবে তার করণীয় কি? অবশ্যই তার জন্য আবশ্যক এই ফরয কাজে শামিল হওয়া। এখানে মাঝামাঝি কোন কিছু নেই। দ্বীনের যে কোন ফরয বিধান সম্পর্কে ব্যক্তি অবগত হওয়া মাত্র তার উপর ওই বিধান ফরয। অর্থাৎ সে বাধ্য তখন তা পালন করতে। এখানে নিছক সমর্থনের কোন সুযোগ নেই। আর মুসলিম মাত্রই জিহাদ সমর্থন করে, শাহবাগী ফরিদউদ্দীন মাসউদও জিহাদ সমর্থন করে, কারন জিহাদ অস্বীকার করা কুফর। সমস্যাটা জিহাদ সমর্থন নিয়ে কখনোই ছিল না, যে 'আলিমরা সালাহ আদ-দ্বীনকে বলেছিল ক্রুসেডারদের সাথে মিত্রতা করতে তারাও কিন্তু জিহাদ সমর্থন করতেন।

কিন্তু তারা কী সমর্থন করতেন না? তারা কিসের বিপক্ষে ছিলেন? তাদের সমস্যাটা কী নিয়ে ছিল? তাদের সমস্যা ছিল ওই মূহুর্তে জিহাদ করা নিয়ে। তাদের সমস্যা ছিল তাত্ত্বিকভাবে যা দ্বীনের ফরয বিধান হিসেবে স্বীকার তারা করছেন তার উপর সঠিক ভাবে আমল করা নিয়ে। নিজে জিহাদ করা নিয়ে। যতক্ষণ জিহাদ একটি দূরবর্তী, তাত্ত্বিক বিষয় থাকে ততক্ষণ সবাই এর পক্ষেই কথা বলে। কিন্তু যখনই তাগুতের সামনে আজ, এখন, এখানে জিহাদ করার কথা আসে, তখন সমস্যাটা ব্যাপক ভাবে দেখা দেয়। দুঃখজনক ভাবে এই হাজার বছরের পুরনো ব্যাধি এখনো প্রবল বিক্রমে বিদ্যমান, এবং আজ শুধুমাত্র উলামায়ে সু'রাই এ ব্যাধিতে আক্রান্ত না।

এতো গেল ফরয জিহাদের কথা, আর জিহাদের মানহাজ অর্থাৎ দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি হিসেবে জিহাদকে বেছে নেওয়া এবং তার অনুসরণ করার অর্থ কি? এ ব্যাপারে আল ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

"সুতরাং, এই মানহাজ, যা আমাদের সামনে সুবাহের ন্যায় স্বচ্ছ, তা কিছু সুনির্দিষ্ট গুণাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা শারী'আহ্-এর দালীলে পাওয়া যায়। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের থেকে যে কেউই তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করে, তবে আল্লাহ্ অপর এক ক্বওম নিয়ে আসবেন, যাদেরকে আল্লাহ্ ভালোবাসবেন, এবং যারা আল্লাহকে ভালোবাসবে, তারা ঈমানদারদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং কুফফারদের প্রতি অতি কঠোর, তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, এবং নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন, আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞ।' [আল-মাইদাহঃ৫৪]

সুতরাং, এই আয়াতটি আমরা যে অবস্থার মধ্যে আছি সেই সম্পর্কে বলছেঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের থেকে যে কেউই তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করে,..."

যখন রিদ্দাহ্/দ্বীন-ত্যাগ সংঘটিত হয়, তখন মানুষকে দ্বীন ইসলামে ফিরিয়ে আনার জন্য কী কী গুণাবলীর প্রয়োজন? তো এখানে ৬টি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার বানী হতে আমরা পাই,

"...যাদেরকে আল্লাহ্ ভালোবাসবেন, এবং যারা আল্লাহকে ভালোবাসবে, তারা ঈমানদারদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং কুফফারদের প্রতি অতি কঠোর,..."। সুতরাং, এই গুণাবলী অর্জন করা আমাদের জন্য খুবই জরুরীঃ

[১] আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি একান্ত ভালোবাসা
[২] ঈমানদারদের প্রতি বিনয় ও সহানুভূতি
[৩] কল্যাণের সাথে সাহায্য করা এবং তা করা সর্বোত্তম পদ্ধতিতে
[৪] কুফফারদের প্রতি কঠোরতা, আর এটা ইসলামের সবচাইতে শক্তিশালী বন্ধনঃ আল-ওয়ালা' ওয়াল-বারা' (আনুগত্য এবং সম্পর্কচ্ছেদ)-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, আমরা ঈমানদারদের সাথে আনুগত্য ও কর্তব্যপরায়ণতার সম্পর্ক স্থাপন করি, এবং আমরা কুফফারদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করি, আর তাদের সাথে খুব কঠোর আচরণ করি।

[৫,৬] এরপর ৫ম এবং ৬ষ্ঠ গুণাবলী হলঃ "...তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, এবং নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করে না..."।

আর, মানুষদেরকে দ্বীনে ফিরিয়ে আনার জন্য, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, এবং নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া না করা – এ বৈশিষ্ট্য দু'টির গুরুত্ব অত্যাধিক।

সুতরাং, যারা এমন মনে করে যে, মানুষকে দ্বীনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব (এই গুণাবলী অর্জন ব্যতীত) এবং একটি ইসলামিক ভূমি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যখন কিনা ইসলামের ছায়া পৃথিবীর বুক থেকে অপসারিত হয়েছে, তবে এমন মানুষেরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার মানহাজ উপলদ্ধি করতে পারেন নি। কারণ এই আয়াতটি সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ এবং স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান একটি আয়াত। [মানহাজের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা, আস সাহাব মিডিয়া]

অতঃপর শায়খ উসামা রাহি. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিমোক্ত হাদীসটি উল্লেখ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনার পর বলেন –

عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللهُ أَمَرَنِى بِهِنَّ اَلْجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

হযরত হারেস আল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: আমি তোমাদের (দ্বীন কায়েমের) জন্য পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে ঐগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। (সে কাজগুলো হচ্ছে-)
ক. আল জামা'আহ (সংগঠন/ঐক্য): একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।
খ. আস্ সামউ': আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা।
গ. আত-ত্ব-আহ্: আমীরের নির্দেশ পালন করা।
ঘ. আল হিজরাহ: হিজরত করা।
ঙ. আল জিহাদ: আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা।
(তিরমিযি ২৮৬৩, আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন; মুসনাদে আহমদ ১৭২০৯; জামেউল আহাদীস ৪৪; সহীহ ইবনে হিব্বান ৬২৩৩; সহীহ ইবনে খুযাইমা ১৮৯৫; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৫১৪১)

এখানে বিষয়টি হল, প্রথম পাঁচটি বিষয় যা হল ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ, এগুলোকে অপর পাঁচটি বিষয় ব্যতীত মানবজাতির জন্য একটি শাসনব্যবস্থা বা কর্মপদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। একইভাবে একজন ব্যক্তির পক্ষে কমপক্ষে এবং অন্তরের দিক দিয়ে মুসলিম হওয়া সম্ভব নয়, যখন সে মানবরচিত বিধানের দ্বারা শাসন করে এবং পৃথিবীতে ইসলামের কর্তৃত্ব থাকে না। আর আমরা যদি এই পাঁচটি বিষয়কে মনযোগ দিয়ে দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন গোত্রের প্রতি রসূল ﷺ-এর দা'ওয়াহ্-এর বাস্তবতার সাথে এই পাঁচটি বিষয় সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ এবং দৃঢ়সমর্থক।

আর আমরা যখন আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রসূলের ﷺ সুন্নাহর অনুসরণের চেষ্টা করি, তখন আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, একটি ইসলামিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং দ্বীনের সম্প্রসারণের পদ্ধতি হিসেবে এ পাঁচটি বিষয়ের কথা জোর দিয়ে বলা হচ্ছে।

সুতরাং, যারা হিজরাহ করার এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত ইসলামের জন্য কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে এরূপ মানুষেরা মুহাম্মাদের ﷺ মানহাজ উপলদ্ধি করতে পারেনি। আর যদি তারা বুঝে থাকে, তবে তারা এর উপর 'আমল করেনি, বরং তারা অন্যান্য ধরনের আনুগত্য ও 'ইবাদাতের দ্বারা নিজেদেরকে

ব্যস্ত রাখছে। সুতরাং, এরূপ মানুষেরা এ সকল বড় 'ইবাদাতসমূহের ভারী ফলাফল থেকে পলায়ন করছে, কারণ নিশ্চয়ই জিহাদ একটি কষ্টকর 'আমল, যা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং, এখন পর্যন্ত যা বলা হয়েছে, তা থেকে এটা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে যে, জামা'আহ্ ও জিহাদের গুরুত্ব অত্যাধিক।" [মানহাজের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা, আস সাহাব মিডিয়া]

সুতরাং, কিছু সুনির্দিষ্ট গুনাবলী বা বৈশিষ্ট্য এ মানহাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। শায়খ উসামা বিন লাদিনের ভাষায় একজন ব্যক্তি তখন এ মানহাজের অনুসরণকারী হবে যখন সে মানহাজের আবশ্যক শর্তাবলীর উপর আমল করবে। অর্থাৎ সে জামা'আবদ্ধ হবে, শুনবে ও মানবে, হিজরাহ ও জিহাদ করবে। অর্থাৎ মানহাজের বিষয়টি আমলের সাথে সম্পর্কিত কোন একটি মনোভাব ধারন করার সাথে না, এবং এটাই স্বাভাবিক। এবং শায়খ উসামা বিন লাদিনের রাহিমাহুল্লাহর কথা থেকে স্পষ্ট যে এ মানহাজ সমর্থনের মানহাজ না, বরং এ মানহাজ হল জামা'আবদ্ধ হওয়া, শোনা ও মানা, হিজরাহ ও জিহাদের মানহাজ। এবং এখানে জামা'আবদ্ধ হবার উল্লেখ দেখে অস্বস্তি বোধ করার কিছু নেই, কারণ জিহাদ মূলত একটি জামা'আবদ্ধ ইবাদাত। [আমরা এক্ষেত্রে জামা'আবদ্ধ হওয়া বলতে একটি খাস মুক্বাতীল জামা'আকে বোঝাচ্ছি, এবং নিজেদের জামা'আর ব্যাপারে 'আম অর্থ প্রয়োগ করে নিজেদের জামা'আহকেই খাওয়ারিজদের মতো মুসলিমদের একমাত্র বৈধ জামা'আ মনে করি না]

তাহলে কিভাবে একজন ব্যক্তি যে এ কাজগুলো উপযুক্ত ওজর ছাড়া ছেড়ে দেয়, কিন্তু বলে সে এ মানহাজের সমর্থন করে তাকে "মানহাজের ভাই/মানহাজী" বলা যেতে পারে? শার'ঈ বিচারে, মানহাজের অর্থগত বিচারের এবং বর্তমান সময়ে যারা জিহাদের মানহাজকে আল্লাহর ইচ্ছায় পুনরুজ্জীবিত করেছেন তাদের বিবৃত মাপকাঠির আলোকে, কোন বিবেচনাতেই তো এরকম একজন ব্যক্তিকে - সে যতোই অন্তরঙ্গ বন্ধু বা শ্রদ্ধাভাজন দ্বীনি ভাই হোন না কেন – এই মানহাজের অনুসারী বলা যায় না। সমর্থনের কোন মানহাজ এ দ্বীনের মধ্যে নেই। এ দ্বীন তো ভাই মাদ্রিদ-বার্সেলোনার এল ক্লাসিকো না, বা ভারত-পাকিস্তান খেলা না, যে জার্সি পরে সমর্থন করলেই হয়ে গেল। এটাতো এমন হয়ে গেল যেন কেউ বলছে "আমি প্রাউড নন-প্র্যাক্টিসিং মুসলিম" আর তারপর আরেকজন এসে বললো "হ্যা উনি সাচ্চা মুসলিম"! দ্বীন ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এরকম কথার, এরকম অবস্থানের কোন ভিত্তি কি আদৌ আছে?

বরং শায়খ উসামা তো যথার্থই বলেছেন এ মানহাজ কিছু সুনির্দিষ্ট গুণাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমনি ভাবে প্রতিটি মানহাজের কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী রয়েছে। যার আদর্শ ও আমলে যে মানহাজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে তিনি সে মানহাজের। এতো নিছক মৌখিক দাবির বিষয় নয়। যদি প্রশ্ন করা হয় বাংলাদেশে ইসলামের জন্য, দ্বীনের সুরক্ষার জন্য, খেদমতের জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্য উম্মাহর জন্য, হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদের দিকে তাকিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজটি করা উচিত, আপনি কোন কাজটি করবেন? জবাবে কেউ যদি বলেন বাংলাদেশে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ঈমান ও আমলের মেহনত তাহলে সেটা তার মানহাজ - যদি কেউ বলেন বাংলাদেশে কাজ আক্বিদা সহীহ করা, শিরক-বিদ'আ দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে দূর করা তবে সেটা তার মানহাজ - যদি কেউ বলেন ক্রিটিকাল থিংকিং করা, শরীয়াহ নিয়ে নতুন ভাবে চিন্তা করা, ইসলামের সংস্কার করা, তবে সেটাই তার মানহাজ - যদি কেউ বলে বাংলাদেশে কাজ ইসলামী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, সমাজ সেবা করা, তবে সেটাই তার মানহাজ - কারো উত্তর যদি হয় বাংলাদেশে কাজ হল 'ইলম চর্চা, তাজভীদ শেখা, আরবী শেখা ও শেখানো তবে সেটাই তার মানহাজ - যদি কেউ বলে বাংলাদেশে কাজ হল মিডিয়া সেল তৈরি করে মিডিয়া দাওয়াহ করা তবে সেটাই তার মানহাজ।

কিন্তু এর কোনটিও তাওহীদ ওয়াল হাদীদের, দাওয়াহ ওয়াল জিহাদের মানহাজ না। কারণ উপরোক্ত মানহাজের উপর আমলকারীরা এ কাজগুলো করেন কিন্তু তারা জিহাদ করেন না। শুধুমাত্র মুক্বাতীল জামা'আর সদস্যদের মধ্যেই ক্বিতালের এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, একারনে ক্বিতালের এ ফারযিয়্যাত একমাত্র মুক্বাতীল জামা'আর সদস্যরাই পালন করছেন অন্যান্য কাজগুলো করার পাশাপাশি। এবং এজন্য জরুরী নয় যে জামা'আর সকল সদস্যই ক্বিতাল করুক, বরং মুক্বাতীল জামা'আর সদস্য হিসেবে যে ভাই মিডিয়ার কাজ করছেন তিনি ক্বিতালের সহায়ক ও সম্পূরক হিসেবেই তাই করছেন। তিনি ক্বিতাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মিডিয়ার কাজ করছেন না। একই কথা সে দা'ঈ ভাইয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যিনি আল্লাহর ইবাদাত ও তাগুত বর্জনের প্রতি দাওয়াহ দিচ্ছেন, এবং ব্যাক্তি যাতে এ নীতির উপর আমল করতে পারে, যাতে করে ব্যাক্তি মিল্লাতে ইব্রাহীমের উপর চলতে পারে সে পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন, এ নীতির উপর ভিত্তি করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছে এমন জামা'আর সাথে তিনি নিজে আবদ্ধ হয়েছেন এবং অন্যকে আহবান করছেন। অন্যদিকে উপরোক্ত মানহাজ সমূহের উপর আমলকারীরা নিজেরা জিহাদের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকেন, এবং অন্যদেরকেও নিষ্ক্রিয় হবার শিক্ষা দেন, আর তাদের সক্রিয়তা থাকে শুধু নিষ্ক্রিয় সমর্থনের ক্ষেত্রে। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা ক্বুআতা ইল্লাহ বিল্লাহ।

উহুদের দিন যারা যুদ্ধে যায় নি তারা জিহাদ সমর্থন করতো কি করতো না, তা নিয়ে কিন্তু সৃষ্টি জগতের কারো আগ্রহ নেই। খন্দকের দিনগুলোতে কে জিহাদ সমর্থন করে আর কে করে না এ হিসাব কিন্তু করা হয় নি। তাবুকের সময় যারা পেছনে বসে ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কি জিহাদ সমর্থন করতো কি না– সে বিষয় কুর'আনের কোন আয়াতই নাযিল হয় নি। পরিমাপ করা হয়েছে আমল। যারা মু'মিন তাদের বিশ্বাসের প্রমাণ তারা কাজের মাধ্যমেই দিয়েছে। আর যারা ওজরবিহীন ভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকেছে তাদের সমর্থন থাকা বা না থাকা গুরুত্ব পায় নি। গুরুত্ব পেয়েছে ফরয ইবাদাতের ব্যাপারে তাদের নিষ্ক্রিয়তা, যার ভিত্তিতে তাদের মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং কুর'আনে বিভিন্ন জায়গায় কড়া ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে। কারণ, এ দ্বীন নিষ্ক্রিয়তার দ্বীন না। ঈমান থেকে শুরু করে জিহাদ, এ দ্বীনের কোন কিছুই মুখে বুলি আওড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ না বরং প্রতিটি আমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে আমরা বাধ্য। অর্থাৎ আমল করতে আমরা আদিষ্ট। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন –

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" [আত তাওবাহ, ৯:১৬]

আমরা কি মনে করছি, আল্লাহর দ্বীনের বিধিবিধানগুলো এতটাই ঠুনকো! কিছু যখন চাইলাম মানলাম, যখন চাইলাম সমর্থনসাপেক্ষে ছেড়ে দিলাম? এমন বিভ্রান্তি থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। প্রকৃতপক্ষে এধরনের ব্যক্তির অবস্থান তাই, যে অবস্থা ফরয ত্যাগ কারীর হয়, আল ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

"...অন্তরগুলো আজ কেবলই দোদুল্যমান এবং যাদের উপর আল্লাহ দয়া করেছেন তারা ব্যতীত সকলেই আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করার বদলে বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যুবকদের বুঝতে হবে যে, জিহাদের সাথে সম্পর্কহীন

নেতৃত্বে বড় আকারের ঘাটতি রয়েছে, আর আমাদের এরূপ মানুষদের কথাকে সেভাবেই উল্লেখ করতে হবে যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা উল্লেখ করেছেন। এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যে কোন গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত জিহাদ না করে বসে রয়েছে, তবে তার অবস্থার বর্ণনা কুরআনে খুবই পরিষ্কার এবং অবশ্যম্ভাবীঃ আর তা হল "ফিসক্"।

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

"আর যদি তারা বের হবার ইচ্ছা পোষণ করতো, তবে কিছু সরঞ্জাম তো প্রস্তুত করতো, কিন্তু আল্লাহ তাদের বের হওয়াকে অপছন্দ করলেন, আর তাই তাদেরকে বলা হলঃ 'বসে থাকো তোমরা, যারা বসে থাকে তদের সাথে।"

[সূরা আত-তাওবাহ: ৪৬]

[মানহাজের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা, আস সাহাব মিডিয়া]

প্রিয় ভাই! কোন মুসলিম ভাইয়ের মনে কষ্ট দেওয়া, কাউকে ছোট করা আমাদের উদ্দেশ্য না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ থেকে হেফাযত করুন। মুসলিম ভাই হিসেবে প্রতিটি ভাই আমাদের কাছে প্রিয়। আমরা তাওহীদের কালেমা পড়া যে কোনো মুসলিম ভাই-বোনের জন্য নিজের বুকের রক্ত ঢালতে সদাপ্রস্তুত, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হেদায়েত করুন তাদেরকে এবং আমাদেরকে, আল্লাহ আর রাহমানুর রাহীম একত্রিত করে দিন আমাদের জান্নাতে। মুসলিম ভাই পরিচয়টাই যথেষ্ট, এর বেশি আর কোন পরিচয় আমাদের জন্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যদি মানহাজের ভাই বলতেই হয় তবে হেলাফেলার সাথে কাউকে বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। রক্ত, রিমান্ড, জেল, যুলুম, বুলেট, ফাঁসির পথ, আর নিস্তরঙ্গ নিষ্ক্রিয় সমর্থনের পথ এক না। আমরা ভুলে যেতে পারি না তাগুতের কারণে ঘর ছাড়া আমাদের ভাইদের কথা, আমরা ভুলে যেতে পারি না আল্লাহর দ্বীনের জন্য দুনিয়াকে তালাক দিয়ে দেওয়া আমাদের ভাইদের কথা, আমরা ভুলে যেতে পারি না দিনের পর দিন রোদ-বৃষ্টি-ঝড় উপেক্ষা করে সুযোগের অপেক্ষায় আল্লাহর শত্রু ও আমাদের শত্রুদের শিকারী বাঘের মতো অনুসরণ করতে থাকা মুজাহিদিনের কথা, আমরা ভুলে যেতে পারি না তাগুতের কারাগারে বন্দী আমাদের ভাইদের কথা, আমরা ভুলে যেতে পারি না ঠিক এ কথাগুলো লেখার সময় মুরতাদীনের হাতে রিমান্ডে বন্দী আমাদের ভাইদের কথা, (ইয়া আল্লাহ আপনি আপনার এ বান্দাদের হেফাযতকারী হয়ে যান, আপনি তাদের কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করুন); আমরা ভুলে যেতে পারি না তাগুতের হাতে নিহত আমাদের ভাইদের কথা যাদের রক্তের বদলা নেওয়া আমাদের উপর আজ ওয়াজিব, রাহিমাহুমুল্লাহু ওয়া তা'আলা।

এ ভাইরা কোন নির্দিষ্ট ক, খ, গ, তানযীমের হওয়া আবশ্যক না, বরং আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করতে গিয়ে আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত এরকম যতো ভাই আছে, পৃথিবীর যে কোন কোণায়, তারা সকলেই আমাদের মানহাজের ভাই, এরাই আমাদের রক্তের ভাই। এদের রক্তই আমাদের রক্ত, এদের কষ্টই আমাদের কষ্ট, এদের অশ্রুই আমাদের অশ্রু – হে আল্লাহ আপনি আপনার দুর্বল বান্দাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি ছাড়া আমাদের আর কোন সহায় নেই। এসব কিছু ভুলে গিয়ে এসব ত্যাগ তিতীক্ষাকে ভুলে গিয়ে লাইক-কমেন্ট দিয়ে অ্যাক্টিভ থাকা, সাপ্তাহিক হালাকা আর নিষ্ক্রিয় সমর্থনকে আমরা এক করে ফেলতে পারি না। নিশ্চয় প্রথম দলটি দ্বিতীয় দলটির মত নয়। নিশ্চয় যে সমুদ্রে ঝড় নেই সে সমুদ্র আমাদের নয়।

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই হিযবিয়্যাহ থেকে, স্বীয় স্বার্থের কারনে মুসলিমের অন্তরে আঘাত করা থেকে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হকের উপরে

তাঁর সৃষ্টির হককে প্রাধান্য দেওয়া থেকে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই "পাছে লোকে কিছু বলে" এ চিন্তায় হক প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা থেকে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, মুজাহিদিনের হকের উপরে মুজাহিদিনের সাথে ওয়ালার উপরে, মুজাহিদিনের বক্তব্যকে তুলে ধরার উপরে, বসে থাকা ব্যক্তিত্বদের স্থান দিতে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, মুহাজির ওয়াল আনসারদের অধিকার বিস্মৃত হওয়া থেকে, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই তাগুতের কারাগারে বন্দী আমাদের শুয়ুখ ও ভাইদের কথা ভুলে যাওয়া থেকে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই তাঁর দ্বীনের ফারযিয়্যাতের কথা নিছক কসমেটিক ঐক্যের অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়া থেকে। আর অতি কঠোরতার অভিযোগ উত্থাপনকারীদের প্রতি জবাব হিসেবে আল ইমাম আল মুজাদ্দিদ শায়খ উসামা বিন লাদিনের রাহিমাহুল্লাহ এ উক্তিটিই যথেষ্ট-

"যদি একজন ব্যক্তি জিহাদ না করে বসে থাকে এবং রাস্তা থেকে কাঁটা বা তার সদৃশ কোন বাঁধা সরানোর কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে, যেটি কিনা ঈমানেরই একটি প্রশাখা, যখন কিনা অপরদিকে জিহাদ ব্যক্তিগতভাবে ফরয কর্তব্যে পরিণত হয়েছে, তখন তার সেই কর্মের ব্যাপারে এরূপ বলা হবে না যেঃ "আল্লাহ যেন তাকে উত্তম পুরস্কার দান করেন," বরং, আমাদের দ্বীনের মাঝে সে একটি ফাসিক্ব ব্যক্তি হিসেবেই বিবেচিত হবে, যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"-কে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দ্বীনকে সাহায্য করার ফরযে আইন/ (বাধ্যতামূলক) কর্তব্য থেকে পলায়ন করেছে। সুতরাং, এই প্রধান বিষয়টির ব্যাপারে সচেতন থাকা অতি জরুরী বিষয়, যেটির কিছু ব্যতিক্রম স্থান ব্যতীত প্রায় সমগ্র মুসলিম ভূখন্ডেই অনুপস্থিতি আজ সকলের চোখের সামনে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ।" [মানহাজের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা, আস সাহাব মিডিয়া]

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে বুঝবার এবং তদনুযায়ী আমল করবার তাওফীক দান করুন। আমীন।

[সূত্র: 'দাওয়াহ ইলাল্লাহ' ফোরামের একটি পোস্ট "এ দ্বীন তাত্ত্বিকতার না, এ মানহাজ নিস্ক্রিয়তার মানহাজ না" অনুসারে। পোস্ট লিংক: https://bit.ly/dawah1000]

জিহাদের মেহনত-ই তুলনামূলকভাবে অধিক পরিপূর্ণ মেহনত

প্রিয় ভাই! পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামে যত রকমের মেহনত আছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ চারটি প্রকার হচ্ছে-

০১. ইলমী মেহনত (তা'লীম ও তরবিয়ত),

০২. তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি),

০৩. দাওয়াত এবং

০৪. জিহাদ।

রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন,

وأمَّا ذُرْوَةُ سَنَامِهِ فَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ الله

"সকল আমলের চূড়া হলো 'আল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা।"

(মুসতাদরাকে হাকেম ২৪০৮ হাদীসটি সহীহ, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী। মুসনাদে আহমদ ৫/২৩, ২২০৬৪, সুনানে বাইহাকী ১৮২৫৩, সুনানে তিরমিযী-২/৮৯, মুসতাদরাকে হাকেম-২/৩৯৪)

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :ذَرْوَةُ سَنَامِ الْإِسْلَامِ اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، لَا يَنَالُهُ اِلَّا أَفْضَلُهُمْ

হযরত আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন- "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। এ আমল সর্বোত্তম ব্যক্তিরা ব্যতীত অন্য কেউ সম্পাদন করতে পারবে না।" (মু'জামে কাবীর, তাবরানী-৮/২২৪; মাশারিউল আশওয়াক্ব ইলা মাসারিয়লি উশশাক ১৩৩/১৬৯)

এখন আমরা দেখব, 'জিহাদ ইসলামের চূড়া' এই কথা দ্বারা আমরা কী বুঝি-

১. ইসলামের সবচেয়ে দামী কাজ হল 'জিহাদ'।

২. ইসলামের সবচেয়ে 'উঁচা কাম' হল 'জিহাদ'।

৩. ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল 'জিহাদ'।

৪. ইসলামের সবচেয়ে 'শানদার' কাজ হল 'জিহাদ'।

৫. ইসলামের সবচেয়ে কঠিন কাজ হল 'জিহাদ'। (তবে আল্লাহ পাক যার জন্য সহজ করে দেন তার কথা ভিন্ন)।

৬. ইসলামের সবচেয়ে বড় নবীওয়ালা কাজ হল 'জিহাদ'।

৭. তুলনামূলক ইসলামের সবচেয়ে পরিপূর্ণ কাজ হল 'জিহাদ'।

৮. ইসলামের বাকী সকল কাজ 'জিহাদের' নিচে।

৯. ইসলামের বাকী সকল কাজ 'জিহাদের' পরে।

১০. যে চূড়ায় থাকে সে সকলের উপরে থাকে।

১১. যে সকলের উপরে থাকে, তার মর্যাদা সবচেয়ে বেশি হয়।

১২. যে আল্লাহ্ পাকের কাছে অধিক মর্যাদাবান, সে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ পাকের মহব্বতের বান্দা।

১৩. আর যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ পাকের মহব্বতের বান্দা, সে-ই সবচেয়ে বড় অলী-আল্লাহ, সে-ই সবচেয়ে বড় আল্লাহ্‌ওয়ালা বা বুযুর্গ।

• 'জিহাদ' তুলনামূলকভাবে অধিক 'পরিপূর্ণ' মেহনত। কিভাবে?

জিহাদী মেহনতের মৌলিক কাজ মূলত তিনটি-

১. দাওয়াত,
২. প্রশিক্ষণ/প্রস্তুতি/ ই'দাদ (ব্যক্তি গঠনমূলক কার্যক্রম তথা-ইলম চর্চা, তাযকিয়া, শরীরচর্চা ও অস্ত্রপ্রশিক্ষণ ইত্যাদি) ও
৩. ক্বিতাল তথা যুদ্ধ- এটি জিহাদী মেহনতের সর্বশেষ স্তর।

প্রিয় ভাই! উপরের আলোচনা হতে এটিই কি প্রতীয়মান হয় না যে- জিহাদের সাথে দ্বীনী অন্যান্য মেহনতগুলো (ইলমী মেহনত, তাযকিয়ার মেহনত, দাওয়াত ইত্যাদি) ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থাৎ জিহাদ তুলনামূলক অধিক পরিপূর্ণ মেহনত। আলহামদুলিল্লাহ।

তাছাড়া জিহাদের মাধ্যমে যখন আল্লাহ্ পাক বিজয় দান করেন, তখন সমাজে পরিপূর্ণরূপে ইসলামী বিধি-বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়। এভাবেই জিহাদের মধ্যে রয়েছে 'পূর্ণ দ্বীন'। আলহামদুলিল্লাহ।

তাই, আমাদেরকে পরিপূর্ণ মুসলিম তথা 'আল্লাহর হুকুমের সামনে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী' হতে হলে অবশ্যই জিহাদ করতে হবে ইনশাআল্লাহ। আমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জানের বাজি লাগাতে হবে ইনশাআল্লাহ্। আর আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে, আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে আমাদের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। তার হুকুম পালনের জন্য আমরা জীবনও দিতে পারি। তাহলেই তো আমরা 'রহমানের সত্যবাদী বান্দা' হিসেবে সাব্যস্ত হতে পারবো, প্রকৃত সাদেকীনদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারবো, ইনশাআল্লাহ। (আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুন, আমীন।)

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন-

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡرِي نَفۡسَهُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ رَءُوفُۢ بِٱلۡعِبَادِ

"আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণির লোক রয়েছে-যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে। আল্লাহ্ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।" (০২ বাকারা: ২০৭)

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ

"তারাই তো মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি এবং তাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারাই সত্যবাদী।" (সূরা হুজুরাত ৪৯:১৫)

আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (০২ বাকারা: ২০৮)

প্রিয় ভাই! জিহাদ ব্যতীত দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ হতে পারে কি?? জিহাদ না করে কি আমরা বলতে পারি যে, আমার দ্বীন পরিপূর্ণ বা আমি পরিপূর্ণ দ্বীনের অনুসারী? যদি তা না পারি, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার বানী "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর"-এই হুকুমটি কি আমাদের মানতে হবে না ভাই?..........

عَنْ اِبْنِ عُمَر قَالَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْل، اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتىّ تَرْجِعُوْا اِلىٰ دِيْنِكُمْ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যখন তোমরা 'ঈনাহ' পদ্ধতিতে (এক ধরনের সুদ ভিত্তিক ব্যবসা) ক্রয় বিক্রয় এবং ব্যবসা বাণিজ্যে পুরাপুরি মশগুল হয়ে যাবে এবং গরুর লেজ ধরে খেত খামারে মগ্ন হয়ে যাবে আর জিহাদ করা ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দিবেন, যা ততক্ষণ পর্যন্ত দূর হবে না যতক্ষণ না তোমরা আপন দ্বীনের (জিহাদের) দিকে ফিরে আসবে।" (আবু দাউদ ৩৪৬২, বায়হাকী ১০৪৮৪, জামেউল আহাদীস ১৬০৩, কানযুল উম্মাল ১০৫০৩, বুলুগুল মারাম ৮৪১)

সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহর রাসূল ﷺ উক্ত হাদীসটিতে জিহাদকে দ্বীনের সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এ থেকেই জিহাদের গুরুত্ব বুঝে আসে। জিহাদ যে পরিপূর্ণ দ্বীনের সমার্থক তাও বুঝে আসে। বর্তমানে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে লাঞ্ছনা ও অশান্তির কারণ কী তাও বুঝে আসে। দ্বীনের অস্তিত্ব জিহাদের সাথে কিভাবে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, তাও এ হাদীস থেকে বুঝা যায়।

সুতরাং প্রিয় ভাই! আসুন, আমরাও মুজাহিদীনে ইসলামের মত (জিহাদ করার মাধ্যমে) পরিপূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হওয়ার চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ্ এবং শয়তান ও তার অনুসারীদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা আর বিভ্রান্তিতে পড়ে জিহাদের মত মোবারক মেহনত পরিত্যাগ না করি বা পিছিয়ে না থাকি। আমাদের প্রকাশ্য শত্রু শয়তান তো এটিই চায় যে, আমরা জিহাদ পরিত্যাগ করে ঘরে বসে থাকি আর আমাদের উপর তার বন্ধুদেরকে দিয়ে আক্রমণ করিয়ে আমাদের সমূলে ধ্বংস করে দিক।

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۚ.........ﺻﻠﮯ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ

"কাফেররা চায় যে, তোমরা কোনরূপে (অস্ত্র/জিহাদ থেকে) অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে।........আর তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর।" (০৪ সূরা নিসা: ১০২)

আর মুফাস্সিরীনে কেরামের মতে, এখানে সতর্কতা অবলম্বনের অর্থ হচ্ছে- "আর তোমরা আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা হিসেবে অস্ত্র ধারণ কর (তথা জিহাদ কর)।"

আল্লাহ্ পাক আমাদের জন্য সহজ করুন, কবুল করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

যুগে যুগে মুনাফিক

প্রিয় ভাই! আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআন কারীমে অনেক হুকুম আহকাম প্রদান করেছেন। আর হুকুমটি কিভাবে আদায় করতে হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় হাদীসের কিতাবসমূহে। যেমন: আল্লাহ পাক কুরআন কারীমে আদেশ করেছেন-

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ

"আর তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।" (সূরা বাকারা ০২:৪৩)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোযা রাখাকে ফরয করা হল"। (সূরা বাকারা ০২:১৭৩)

কিন্তু নামায কিভাবে কায়েম করতে হবে, কয় ওয়াক্ত পড়তে হবে, কোন্ ওয়াক্তে কত রাকাত নামায পড়তে হবে, কোন্ রাকাত কিভাবে পড়তে হবে-এসবের বর্ণনা কুরআন কারীমে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। তেমনিভাবে যাকাতের বিস্তারিত মাসআলা-মাসাইলও কুরআন কারীমে আলোচনা করা হয়নি, যেমন: কতটুকু সম্পদ থাকলে যাকাত দিতে হবে, স্বর্ণের হিসাব, রূপার হিসাব ইত্যাদি এগুলো বর্ণনা করা হয়নি। অনুরূপভাবে, রোযা ও অন্যান্য ইবাদতগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা।

কিন্তু, কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ হুকুমের ক্ষেত্রে তা ব্যতীক্রম, যেগুলোকে আল্লাহ পাক কুরআন কারীমে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে জিহাদ অন্যতম। আল্লাহ্ পাক যেহেতু আগে থেকেই জানেন, তাঁর বান্দারা জিহাদের ব্যাপারে গাফলতি করবে, জিহাদ থেকে পালানোর জন্য জিহাদের নানান অর্থ আর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দাঁড় করাবে, একদল লোক অন্তরে কুফর ও বক্রতা লালন করা সত্ত্বেও মুসলমান বেশ ধারণ করে জিহাদের বিরোধিতা করবে, আল্লাহর দ্বীন ও মুসলমানদের দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কুফ্ফারদের এজেন্ডাই বাস্তবায়ন করবে, তাই তিনি কেবল كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ "তোমাদের উপর যুদ্ধ (ক্বিতাল)-কে ফরয করা হল" (সূরা বাকারা ২:২১৬)- এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি; বরং জিহাদ এমন একটি আমল যার বিস্তারিত হুকুম-আহকাম, শর্ত-শরায়েত, ফাযায়েল-মাসায়েল, এমনকি 'সালাতুল খওফ' (যুদ্ধকালীন নামায) কিভাবে আদায় করতে হবে, কোন্ রাকাত কিভাবে আদায় করতে হবে, তাও বিস্তারিতভাবে খোলে খোলে বর্ণনা করেছেন। সুবহানাল্লাহ! (দেখুন- সালাতুল খওফ আদায় করার পদ্ধতি: সূরা নিসা ০৪: ১০২)

জিহাদ নিয়ে কুরআন কারীমের অদ্ভূত সুন্দর এই বৈশিষ্ট্যের অন্যতম একটি দিক হল- যুগে যুগে মুনাফিকদের জিহাদবিরোধী চিন্তা-চেতনা আর কার্যক্রম কেমন হবে তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা- যেন আমরা আমাদের সমাজে মুনাফিক চরিত্রের লোকগুলোকে সহজে চিহ্নিত করতে পারি (কেননা, যুগে যুগে এদের কথা ও জিহাদ ত্যাগের অজুহাতের ধরণ মোটামুটি একই রকমের), যেন এদের থেকে সতর্ক হতে পারি, সর্বোপরি, নিজেরাও এই ধরণের কপট লেবাসধারী ঈমানদার, ব্যধিগ্রস্ত লোকগুলোর অন্তর্ভূক্ত হওয়া থেকে বাঁচতে পারি।

হায়! বর্তমানে আমরা জিহাদের মত ফরযে আইন ইবাদত না করেও নিজেদেরকে আল্লাহর ওলী, আল্লাহ ওয়ালা, দ্বীনদার, হক্কানী, বুযুর্গ, অনেক কিছু মনে করি, অনেক কিছু দাবী করি, কিংবা আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা

করি। অথচ আমরা "মুনাফিক" হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে একটুও ভয় করি না। সাহাবায়ে কেরামের যামানায় মুনাফেকরা সকল আমল-ই করত জিহাদ ছাড়া। মুনাফেক হয়ে যাওয়ার ভয়ে সাহাবায়ে কেরাম কখনো জিহাদ পরিত্যাগ করেননি।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

"নিশ্চয়ই মুনাফেকদের অবস্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তাদের জন্য তোমরা কোনো সাহায্যকারীও পাবেনা।" (০৪ সূরা নিসা: ১৪৫)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নিফাকের ব্যাধি হতে বাঁচান। আমীন।

• মুনাফিকদের মুখঃনিসৃত কিছু বানী(!):

(বি.দ্র: নিম্নোক্ত কথাগুলো কারো মুখে বলতে শুনা গেলেই আমরা তাকে মুনাফিক বলতে পারবো না। কেননা, বান্দার মনের প্রকৃত অবস্থা ও জাহেলিয়াতের পর্যায় একমাত্র আল্লাহ্ পাকই ভালো জানেন। আমরা শুধু বলতে চাই, এই ধরণের কথা ও আচরণ প্রকৃত মুনাফিকদের কথা ও আচরণের সাথে মিলে যায়। তাই, আমরা নিজেরা এই ধরণের চিন্তা-চেতনা থেকে বেঁচে থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ আর যারা এই ধরণের কথা বয়ান করেন তাদেরকে ও তাদের আদর্শকে অবশ্যই পরিত্যাগ করবো, তাদেরকে নিজের পরামর্শদাতা হিসেবে গ্রহণ করবো না, তাদের সোহবতে থাকবো না। নতুবা আমরাও গোমরাহ হয়ে যাব, আমাদের অন্তরও ব্যধিগ্রস্ত হয়ে যাবে, আর আমাদের মধ্যেও নিফাক চলে আসতে পারে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।)

১. 'এই যুগে জিহাদ হল ফিতনা-ফাসাদ। জিহাদের নামে যা কিছু চলছে তা ফিতনা-ফাসাদ ছাড়া আর কিছু না। আল্লাহর রাসূলের যামানায় যে জিহাদ ছিল সে জিহাদ বর্তমানে নেই। এখন যতটুকু ইসলাম পালন করতে পারছি, সমাজে প্রচলিত যে 'জিহাদ' তার নাম নিলে ততটুকুও পালন করতে পারবো না। তাছাড়া ইসলাম মানে 'শান্তি'। ইসলামে মারামারি, কাটাকাটি আর বিশৃঙ্খলার কোনো সুযোগ নেই।'

তাই, এই ক্যাটাগরির লোকদেরকে যখন জিহাদের দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন বলে থাকেন, ভাই! দয়া করে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ ছড়াইও না আর আমাদেরকেও এসকল ফেতনায় জড়াইও না।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّقُوۡلُ ائۡذَنۡ لِّىۡ وَلَا تَفۡتِنِّىۡ‌ؕ اَلَا فِى الۡفِتۡنَةِ سَقَطُوۡا‌ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيۡطَةٌۢ بِالۡكٰفِرِيۡنَ

"আর তাদের কেউ কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং ফিতনায় ফেলবেন না। শোনে রাখ, তারা তো পূর্ব থেকেই ফিতনাগ্রস্ত এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে।" (০৯ আত্ তাওবাহ্: ৪৯)

২. যাদের অন্তরে ব্যধি আছে, তারা জিহাদ করার জন্য কেবল আল্লাহর রাসূলের ﷺ যামানা তালাশ করে। আর বলে, 'যদি সেই যামানায় আমার জন্ম হত তাহলে অবশ্যই আমি সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিলিত হয়ে জিহাদ করতাম।' যেহেতু তার কাছে বর্তমান যামানায় জিহাদ করা মানে ফেতনা-ফাসাদ, তাই সে বর্তমান যামানায় নবীওয়ালা জিহাদ

বা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীদের যামানার জিহাদ তালাশ করে খুঁজে পান না। তাই, সেই যামানাও নেই, জিহাদও নেই। জিহাদে করতে গেলে যদি কোনো বিপদাপদ, মৃত্যু বা অন্য কোনো পরীক্ষা চলে আসে এই ভয়ে তারা জিহাদ না করার নানা অজুহাত পেশ করে থাকেন। তাদের ভাষায়, 'বর্তমানে জিহাদের ব্যাপারে মুসলমানদের নেতৃত্ব দেয়ার মতো যোগ্য নেতা নেই। তাই আমাদের তো কিছুই করার নেই। যদি এযুগে নবুওয়তের যামানার ক্বিতাল থাকত তাহলে আমরা হতাম অগ্রগামী। আমরা যদি জানতাম, বর্তমানে যেই জিহাদ চলছে তা নবীওয়ালা জিহাদ, তাহলে আমরাও জুড়ে যেতাম'।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْۖ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالٗا لَّٱتَّبَعْنَٰكُمْۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَٰنِۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَٰهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ

"এবং (যুদ্ধের ময়দানে সাময়িক বিপর্যয়ের পরীক্ষা তোমাদের উপর এজন্য এসেছিল) তাদেরকে যাতে সনাক্ত করা যায় যারা মুনাফিক ছিল। আর তাদেরকে বলা হল- এসো, আল্লাহর রাহে লড়াই কর কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত কর। তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম যে, (যুদ্ধের মত) যুদ্ধ হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সেদিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে বস্তুতঃ আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে।" (সূরা আলে ইমরান ০৩: ১৬৭)

যারা মনে করে যে, বর্তমান যামানায় কোথাও নবীওয়ালা জিহাদ নেই, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন-

لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة

"আমার উম্মতের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত একটি দল হকের উপর থেকে ক্বিতাল (যুদ্ধ) করতে থাকবে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪১২)

৩. যদি কোনো ভাই জিহাদের মেহনত করতে গিয়ে তাগুতের কাছে ধরা পড়েন, মামলা আর জেল-যুলুমের শিকার হন, কিংবা শহীদ হয়ে যান, আর এসকল কারণে যদি দুনিয়ার ক্যারিয়ার, চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হয়, আর পরিবার পরিজন কষ্টের মধ্যে পড়ে যায়, তাহলে এই সমস্ত ব্যধিগ্রস্ত অন্তরের লোকেরা ভাইদের জন্য মায়াকান্না করতে থাকেন আর ভর্ৎসনা করে বলতে থাকেন- "যদি তারা আমাদের কথা মানত আর (জিহাদের নামে) এত 'লাফালাফি' না করতো, তাহলে তাদের এমন হালত হত না। এখন কেমন হল? মনে হয় দ্বীন তারাই বুঝে! আমরা আর কিছুই বুঝি না! এখন মজা বুঝ, চৌদ্দ শিকের ভাত খেতে কেমন লাগে! নিজের জীবন, মা-বাবা আর স্ত্রী-সন্তানের প্রতি একটুও দয়ামায়া নেই। থাকলে কি আর এমন কাজ (জিহাদ) কেউ করতে পারে? আগেই সতর্ক করেছিলাম- পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বা, রোযা রাখবা, হজ্জ করবা, যাকাত দিবা, তিলাওয়াত, যিকির, তসবীহ-তাহলীল করবা- এরচেয়ে বেশি করার দরকার কী? এত বেশি বুঝা মোটেও ভালো নয়।"

এই সব লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَٰنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزّٗى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةٗ فِي قُلُوبِهِمْۗ وَٱللَّهُ يُحْيِۦ وَيُمِيتُۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٞ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা কাফের হয়েছে এবং নিজেদের ভাই-বন্ধুরা যখন কোনো অভিযানে বের হয় কিংবা জিহাদে যায়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে, যদি তারা আমাদের সাথে থাকতো, তাহলে মরতোও না, আহতও হতো না। যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে। অথচ আল্লাহ্ই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তোমাদের সমস্ত কাজই, তোমরা যা কিছুই কর না কেন, আল্লাহ্ সব কিছুই দেখেন।" (সূরা আলে ইমরান ০৩:১৫৬)

ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخۡوَٰنِهِمۡ وَقَعَدُواْ لَوۡ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْۗ قُلۡ فَٱدۡرَءُواْ عَنۡ أَنفُسِكُمُ ٱلۡمَوۡتَ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ

"ওরা হল সে সব লোক, যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্পর্কে বলে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হত না। তাদেরকে বলে দিন, এবার তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।" (সূরা আলে ইমরান ০৩:১৬৮)

৪. মুনাফিক শ্রেণির লোকগুলো জিহাদকে অদূরদর্শিতা এবং অপরিনামদর্শিতা বলে দাবী করে থাকে। তারা তাদের ভীরুতার কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে, কিন্তু নিজেদের ভীরুতা স্বীকারও করতে চায় না। তাই জিহাদ না করাকে ওরা দূরদর্শিতা হিসেবে প্রমাণ করতে চায়। উহুদ যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার পর মুনাফিকরা মাঝপথ হতে এ কথা বলে ফিরে এসেছিল,

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالا لاتَّبَعْنَاكُم

'আমরা যদি দেখতাম (যুদ্ধের মতো) যুদ্ধ হবে, তবে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম।' (সূরা আলে ইমরান ৩: ১৬৭)

আল্লামা তাকী উসমানী দা. বা. বলেন, 'তারা বলতে চাচ্ছিল যে, এটা সমানে-সমানে যুদ্ধ হলে আমরা অবশ্যই এতে শরীক হতাম, কিন্তু এটাতো অসম যুদ্ধ। শত্রুসংখ্যা তিন গুনেরও বেশি। কাজেই এটা যুদ্ধ নয়, আত্মহত্যা। এতে আমরা শরীক হতে পারি না।' (তাওযীহুল কুরআন: ১/২১৯)

যেহেতু মুনাফিকরা জিহাদকে অদূরদর্শিতা এবং অপরিনামদর্শিতা হিসেবে প্রমাণ করতে চায়, তাই মুজাহিদরা পরাজিত হলেই তারা খুশি হয় এবং একে নিজেদের দূরদর্শিতার প্রমাণস্বরূপ পেশ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ

"তোমাদের কোনো কল্যাণ লাভ হলে তাদের দুঃখ হয় আর যদি তোমাদের কোনো মুসিবত দেখা দেয়, তবে বলে, আমরা তো আগেই সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম, আর (একথা বলে) তারা বড় খুশি মনে সটকে পড়ে।" (সূরা তাওবা ৯:৫০)

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"যারা পিছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। আর আল্লাহ্ মোহর এঁটে দিয়েছেন তাদের অন্তরসমূহে। বস্তুতঃ তারা জানতেও পারেনি।" (সূরা তাওবাহ ০৯:৯৩)

৫. মুনাফিক শ্রেণির লোকগুলোর আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এরা নানাভাবে জিহাদের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যেমন, কখনো কখনো আবহাওয়ার দোহাই দিয়ে, কিংবা মুসলমানদের দুর্বলতার দিকগুলোকে সামনে তুলে ধরে, অথবা সাধারণ মুসলমানদের অন্তরে কাফেরদের শক্তিমত্তার ব্যাপারে ভয় সৃষ্টি করে দেয়, যেন কোনো মুসলমান ভয়ে জিহাদের নামও মুখে না নেয়। যেমন তারা বলে, (কুরআনের ভাষায়)-

وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ

"আর তারা (মুনাফিকরা) বলল, তোমরা গরমের মধ্যে (জিহাদের জন্য) বের হয়ো না।" (সূরা তাওবা ০৯: ৮১)

কিংবা তারা বলে, "বর্তমান যামানায় আমাদের জিহাদ করার মতো কোনো শক্তিই নেই। কাফেরদের অনেক শক্তিশালী ও অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র আছে। তাদের টেকনোলজি (প্রযুক্তি) অনেক উন্নত। তাদের গোয়েন্দা ব্যবস্থাও অনেক শক্তিশালী। তাদের গোয়েন্দাদের কান আমাদের বেডরুম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। যেমন: আমেরিকার গোয়েন্দারা আমেরিকা বসেও শুনতে পায় আমরা আমাদের দেশে কী কী আলোচনা করছি। তাই বর্তমানে জিহাদ করাটা আত্মহত্যার শামিল। তাই জিহাদ করা যাবে না। এখন জিহাদ হবে ভোটের জিহাদ। মিটিং মিছিলের জিহাদ। নফসের জিহাদ। ইত্যাদি।"

এই ক্যাটাগরির লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جَمَعُواْ لَكُمۡ فَٱخۡشَوۡهُمۡ فَزَادَهُمۡ إِيمَٰنٗا وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِيلُ ١٧٣

"যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এ কথা তাদের বিশ্বাস আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।" (সূরা আলে ইমরান ০৩: ১৭৩)

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوۡلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمۡ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ

"সে তো শয়তান। সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং ভয় কর আমাকেই, যদি তোমরা মুমিন হও।" (সূরা আলে ইমরান ০৩: ১৭৫)

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا

"আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা (জিহাদের কাজে) বাধাদানকারী এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, 'আমাদের কাছে আস'; তারা খুব কমই যুদ্ধ করে।" (সূরা আল আহযাব ৩৩: ১৮)

জিহাদ ছাড়া দ্বীনের অন্যান্য মেহনত কি তাহলে বেকার?

এতক্ষণের আলোচনায় অনেক ভাই হয়তো এমন মন্তব্য করতে পারেন, 'এই যে ভাই! আপনি তো দ্বীনের অন্যান্য সকল মেহনতকে বেকার সাব্যস্ত করে দিলেন। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, জিহাদ ছাড়া ইসলামে বুঝি আর কোন কাজই নেই।'

উত্তর: দুঃখিত, ভাই! ভুল বুঝবেন না। দ্বীনের প্রতিটি মেহনতই স্ব-স্ব স্থানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ছোট থেকে ছোট প্রতিটি ইবাদতই অত্যন্ত মূল্যবান। কেননা বলা তো যায় না, কোন্ আমল আল্লাহ পাকের কাছে কবুল হবে, আর কোন্ আমলের উসীলায় নাজাত মিলবে। তবে একটি বিষয় আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ইসলামী শরীয়ত প্রতিটি আমলের জন্য পৃথকভাবে কম-বেশি বিভিন্ন পর্যায়ের গুরুত্ব সাব্যস্ত করেছে। প্রতিটি আমলকে তার প্রাপ্য পরিমাপ অনুযায়ী গুরুত্ব দেয়াই আমাদের মহান শরীয়তের কাম্য; এটিই হিদায়াত ও 'সীরাতল মুস্তাকীম' এর মূলকথা।

প্রিয় ভাই! তাছাড়া বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর বাঁচা-মরা কিংবা অস্তিত্বে টিকে থাকা, না থাকার প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদের উপর চূড়ান্ত আঘাত আসছে। দুনিয়াব্যাপী মুসলমানদের জন্য এক মহা সঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। বিজাতিগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে জোটবদ্ধ হয়েছে। হত্যা-গুম থেকে শুরু করে যুলুম নির্যাতনেরে এহেন কোনো পন্থা নেই যা তারা মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করছে না। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শানে বেয়াদবী করা হচ্ছে, কুরআনকে পুড়িয়ে, পদদলিত করে অবমাননা করা হচ্ছে। মুসলিমদের ভূমিগুলো দখল করে, তাদেরকে উৎখাত করা হচ্ছে। মা বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে কারারুদ্ধ করে নির্যাতন করা হচ্ছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে সক্ষম সকল তবকার মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে।

প্রিয় ভাই! আমরা কি শুনতে পারছি না, আমাদের মহান দ্বীনের আহ্বান, যুগের ভাষায় যেন এই দ্বীন আমাদেরকে আহ্বান করে যাচ্ছে, যেই আহ্বান প্রতিটি মুমিনের প্রতি, বিশেষতঃ প্রতিটি দ্বীনদার ভাইয়ের প্রতি?-

مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ

"আল্লাহর পথে কে হবে আমার সাহায্যকারী ?"

এ দ্বীন যেন আরো বলছে- আমার অনুসারী কেউ আছো কি, যে জাহিলিয়্যাতের চিৎকার ও ঔদ্ধত্যতার গলা চেপে ধরবে আর ইসলামের মহান আওয়াজকে বুলন্দ করবে?

আছো কি কেউ দ্বীনের প্রকৃত অবস্থা ও মৌলিক পয়গামের ঝান্ডাকে উর্ধ্বে তুলে ধরবে?

আছো কি কেউ, যে তুফানের ন্যায় ধেয়ে আসা এই ধর্মহীনতার প্রবল স্রোতের বিপরীতে দ্বীনের প্রতিরক্ষা বিধানের নিমিত্তে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে যাবে?

আমার প্রিয় ভাই! এই মহান দ্বীন তো আমাদের ও আপনাদের সকলকেই সম্বোধন করে বলছে, কে আছো, যে এই দ্বীনের দুশমন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দুশমন, মানুষরূপী শয়তানগুলোকে ভয় না পেয়ে এদেরকে 'মাছি-পিপীলিকা' মনে করবে? তাদের আস্ফালনের উপর চরমভাবে মার দিবে? তাদের স্বার্থগুলোর উপর মারাত্মকভাবে আঘাত হানবে? তাদের গর্বকে খর্ব করে দিবে? তাদের চোখে চোখ রাখবে? তাদেরকে চরম অসম্মান ও লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করাবে? আর বিপরীতে, ইসলামের সম্মান ও শরীয়তের মর্যাদা দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করবে? আছো কি কেউ???

প্রিয় ভাই আমার!

আল্লাহর কসম করে বলছি: আজ যেভাবে দ্বীনের দাওয়াত ও তার আসল রুহ এবং চাহিদাসমূহ স্বয়ং আমাদের দ্বীনের ধারক-বাহকদের কাছে অপরিচিত হয়ে গিয়েছে, এমনটি মনে হয় ইতঃপূর্বে আর কখনো হয়নি! জিহাদওয়ালা দ্বীন কি আমাদের কাছে আজ অপরিচিত নয়?? আমরা কি এটি অস্বীকার করতে পারবো?........

দ্বীনের ধারক-বাহক আমাদের সেই ভাইয়েরা আজ কোথায় - যারা প্রলয়ঙ্করী ধর্মহীনতা ও অপকর্মের নোংরামির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে?

একত্ববাদী সেই প্রজন্ম আজ কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, যারা পশ্চিমা ও উদারপন্থীদের তুফানসম গোস্তাখীর বিরুদ্ধে লড়াই করবে?

মহান আল্লাহ তা'আলার সেই সব প্রিয় বান্দাদেরকে আমরা আজ কোথায় তালাশ করবো - যারা এই দাবী করবে যে, এই জমিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের জমিন; তাই এখানে উদারতাবাদ, পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্র নয়; বরং এখানে চলবে শুধুমাত্র ইসলাম ও ইসলামী মতবাদ?

যুগের সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আর তারিক বিন যিয়াদকে আমরা কোন মাদরাসায় খুজঁব, যে দিশেহারা মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এগিয়ে আসবে?

উম্মাহর কল্যাণকামী সেই সকল ভাইদেরকে আমরা আজ কোন খানকাহগুলোতে খুঁজে ফিরব, যারা মজলুম মুসলিমদের পাশে অস্ত্র নিয়ে দাঁড়াবে?

উম্মাহর মা বোনের ইজ্জতের হেফাযতকারী মরদে মুমিন ভাইয়েরা আজ কোন মারকাজে অবস্থান করছেন, যারা মা-বোনের গগণবিদারী আর্তনাদ শুনে ছটফট করে বিনিদ্র রজনী পার করে দিবে?

সেই সকল দ্বীনদার ভাইদেরকে আমরা আজ কোথায় খুঁজে পাব, যারা দ্বীনকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে? যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আহ্বানে চোখের পলকেই জীবন দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়?.......

প্রিয় ভাইয়েরা আমার!

আপনারাই বলুন, ইসলামের কেল্লাগুলোতে আজ কেন এত নিস্তব্ধতা? বাতিলের ক্রমবর্ধমান এই অগ্রসরতার মোকাবেলায় কেন আমাদের এত পশ্চাদ্পদতা?

দ্বীনের প্রতিরক্ষার জন্য নিখাদ প্রাচীর রচনার ক্ষেত্রে আজ কেন এত শূন্যতা?

দ্বীনকে বিজয়ী করার ক্ষেত্রগুলোতে কেন আজ সুনসান নীরবতা? কেন ভাই, কেন?.......

আজ সময় এসেছে, আমরা যার যার অবস্থান থেকে একটু চিন্তা করি এবং হিসাব কষি-

আমার দ্বীনি তৎপরতার দ্বারা সমাজে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার মেহনত কতটুকু আগে বেড়েছে? ....

রাষ্ট্রে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার মানযিলের দিকে আমি কতটুকু অগ্রসরমান হয়েছি? ....

আমার দ্বীনি মেহনতের দ্বারা দ্বীনের দুশমনরা কতটুকু পরাজিত হচ্ছে? ....

ধর্মহীনতা ও বেহায়াপনার রাজত্ব কতটুকু নিশ্চিহ্ন হচ্ছে? ....

সমাজে অসৎকাজ কতটুকু নিঃশেষ হচ্ছে? ....

জাতির দ্বীন-ধর্ম আর অস্তিত্ব বাঁচানোর ক্ষেত্রে আমার দ্বীনী কার্যক্রম কতটুকু সফলতার মুখ দেখছে? ....

ইসলামকে বিজয়ীকরনের যুদ্ধে আমি কতটুকু সফল হয়েছি? ....

আমি কি বাতিলের প্রতিদ্বন্দিতা করছি? ....

বাতিলের প্রতি কঠোর হতে পেরেছি? ....
নাকি আমি বাতিলের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রকাশের অবস্থান বেছে নিয়েছি? ....
আমি কি ধর্মহীনদের বিজয় আর ইসলামের পরাজয় মনে-প্রাণে মেনে নিয়েছি? ....
বাতিলের শক্তির মোকাবেলায় আমি কি শান্তি ও সন্ধির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছি? ....
নাকি বাতিলের ক্রমাগত আক্রমণের মুখে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছি?..................

প্রিয় ভাইয়েরা আমার! আমাদের কি এখনো সময় আসেনি আমাদের মহান দ্বীনের ডাকে সাড়া দিয়ে "লাব্বাইক" বলার; আর দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা দেয়ার-

نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ

"আমরাই হব আল্লাহর পথে সাহায্যকারী।"

সুতরাং ভাই, এখন সময়ের দাবী, অন্যসব মেহনতের পাশাপাশি আমরা সকল মুসলমান এক হয়ে জিহাদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হবো, জিহাদের কথা বলবো, জিহাদের জন্য মাথা ঘামাবো, জিহাদের জন্য দাওয়াত দিবো, জিহাদের জন্য কলম ধরবো, জিহাদের জন্য মাইক কাঁপাবো, জিহাদের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি নিবো, ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বো এবং যুদ্ধ করতে থাকবো যতদিন না উম্মতের উপর থেকে অস্তিত্বের ঝুঁকি কিংবা আশঙ্কা পুরোপুরি দূর হয়ে যাবে, বিশেষতঃ যতক্ষণ না উম্মতের উপর তরবারি উত্তোলনকারী সম্প্রদায়গুলো তাদের তরবারি না নামাবে।
হ্যাঁ, ভাই!

ততদিন জিহাদ "ফরযে আইন" থাকবে, যতদিন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দুশমনরা এই উম্মাহর উপর তরবারি উত্তোলন করে রাখবে........

ততদিন জিহাদ "ফরযে আইন" থাকবে, যতদিন এক ইঞ্চি ভূমিও (যাতে কোনো না কোনো সময় এক সেকেন্ডের জন্য হলেও আল্লাহর আইন কায়েম ছিল তা) পুনরুদ্ধার না হবে এবং তাতে পুনরায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা না করা হবে.............

ততদিন জিহাদ "ফরযে আইন" থাকবে, যতদিন দুনিয়ার সমস্ত মুসলিম বন্দীদেরকে কুফ্ফারদের হাত থেকে মুক্ত করা হবে............

ততদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের বুকের রক্ত ঝরাতে থাকব, যতদিন না এই দুনিয়ার বুক থেকে শেষ ফেতনাটি (সমস্ত কুফর ও শিরক) নির্মূল হয়ে, সর্বক্ষেত্রে ইসলাম বিজয়ী হয়ে যায়...........

সেদিন পর্যন্ত জিহাদ ফরয থাকবে, যেদিন দুনিয়ার বুক থেকে সকল বাতিল ধর্ম ও তন্ত্র-মন্ত্র বিদায় নিয়ে কেবল ইসলাম বাকী থাকবে।...................

ততদিন জিহাদ চলবেই চলবে, যতদিন না সারা দুনিয়ার প্রতিটি ইঞ্চি মাটিতে আবারো 'নবুওয়তের আদলে ইসলামী খিলাফত' পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে.......................

সুতরাং ভাই! জিহাদ থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকার সুযোগ আছে কি?
কিভাবে আমরা বিশ্রাম নিতে পারি? কিভাবে আমরা সংগ্রাম ছেড়ে দিতে পারি?.................
'জিহাদ ফরযে আইন' অবস্থায় বর্তমানে একথা বলার আর সুযোগ নেই, আমি তো একটি মেহনত করছি, বাকীগুলো করবো না, বাকীগুলোকে কেবল সমর্থন করে যাবো।

মুহতারাম ভাই!

আমরা একটি মেহনত করছি, আলহামদুলিল্লাহ! কিন্তু অন্য একটি মেহনত ফরযে আইন হয়ে গেলেও কি আমরা তা করবো না? যদি তা না করা হয়, ভয় হয়, সেটি দ্বীন হবে না, সেটি হবে মেহনতের নামে আমাদের নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদা পুরা করা।

আমি আল্লাহর জন্য আমল করছি, নাকি দ্বীনের ব্যাপারেও প্রবৃত্তির চাহিদা পুরা করছি তা বুঝার কি কোনো উপায় আছে?

জ্বী ভাই, আছে। ....

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমরা যে আল্লাহর হুকুম পালন করার জন্যে অপর একটি আমল করছি (যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করছি) বলে মনে করি, সেই আল্লাহ্ই আমাদের উপর জিহাদ ফরযে আইন করেছেন। আমল করাটা যদি খাহেশাত হয়, তাহলে যেটা আমাদের কাছে ভালো/সহজ লাগে, আমরা সেটাই করতে থাকবো। আল্লাহর অন্য হুকুমের দিকে তাকাবো না। আর যদি আল্লাহর হুকুম পালন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করাই আমাদের আমল বা মেহনতের মাকসাদ (উদ্দেশ্য) হয়, তাহলে তো আমরা সবসময় খুঁজতে থাকব, এখন আমার উপর আল্লাহর হুকুম কী? এখন কী ফরয? এখন কোন্ কাজ বা আমল করলে আল্লাহ্ জাল্লা শা-নুহু আমার উপর সন্তুষ্ট হবেন? আর সেদিকেই আমরা ঝাঁপ দিবো, যদিও নিজের জীবন বাজি লাগাতে হয়! অথবা আমরা সবসময় এই ভয়ে থাকব, কোন্ কাজটা বা আমলটা আমার থেকে ছুটে যায়, আর আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান!

প্রিয় ভাই! এটিই আল্লাহর সাথে, আল্লাহর হুকুমের সাথে সত্যবাদিতা, এটিই দ্বীন, এটিই আসল ও সরল পথ!
এটিই সীরাত্বল মুস্তাকীম!!

প্রিয় ভাইয়েরা আমার! আমি বক্ষ্যমাণ কিতাবটিতে আপনাদেরকে বারবার শুধু আমলের গুরুত্ব বুঝানোর চেষ্টা করেছি। বিভিন্নভাবে বুঝানোর চেষ্টা করেছি, বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে আর এই অবস্থায় আমাদের করণীয় কী। তাছাড়া, গুনাহের খারাপী ও ঘৃণ্যতা বুঝাবার চেষ্টা করেছি। প্রত্যেকটা আমলকে ততটুকুই গুরুত্ব দেয়া উচিত যতটুকু গুরুত্ব আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ দিয়েছেন। প্রত্যেকটি গুনাহকে ততটুকুই ঘৃণা করা উচিত, যতটুকু সেটি পাবার উপযুক্ত।

প্রিয় ভাই! আমরা মনে করি, দাওয়াত ও সশস্ত্র জিহাদ কখনোই একটি অপরটির বিরোধী নয়। তা'লীম ও তাআ'ল্লুম তথা জ্ঞান বিতরন ও জ্ঞানার্জন বা তাযকিয়ায়ে নফস তথা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা সশস্ত্র জিহাদের পথে কখনো বাঁধা নয়, বরং একটি অপরটির মুখাপেক্ষী, বরং একটি অপরটির জন্য আবশ্যক, একটি অপরটিকে গতিশীল ও শক্তিশালী করে।

তবে হ্যাঁ, যদি কারো সশস্ত্র জিহাদ করার সামর্থ্য না থাকে অথবা সশস্ত্র জিহাদের ময়দানে যাওয়ার সুযোগ ও প্রেক্ষাপট তৈরী না থাকে, তাহলে সে দাওয়াতের সাথে সাথে সশস্ত্র জিহাদের প্রস্তুতি (ই'দাদ) নেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করবে...কেননা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই দ্বীন উপস্থিত/বিদ্যমান শক্তিকে কাজে লাগানো ও অতিরিক্ত শক্তি অর্জনের রাস্তা দেখায়, কিন্তু দুর্বল মানুষকে বাতিলের বড়ত্ব মেনে নেওয়ার ও তার গুণগান গাওয়ার এবং তার থেকে সব ধরনের ফায়েদা (সুবিধা) ভোগ করার অনুমতি কখনোই প্রদান করে না। এখানেও সে জিহাদের ইচ্ছা পোষণ করবে। আর যদি জিহাদ করার মত সক্ষমতা না থাকে, তাহলেও হাতের উপর হাত রেখে বসে থাকবে না, বরং জিহাদের প্রস্তুতি নিতে থাকবে।

তাছাড়া হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব বিশ্বব্যাপী চলছে। বর্তমানে কুফরী বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমগ্র দুনিয়াতে ইসলামের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়েছে। সুতরাং কোথাও যদি অস্ত্র ধারণ করার মত পরিস্থিতি না থাকে, তাহলে অন্য কোথাও জিহাদে অংশগ্রহন করা যেতে পারে। অন্য স্থানে এই ফরয আদায় করা যায়।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন-

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً

"আর যদি তারা (জিহাদে) বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো।" (সূরা আত-তাওবা: ৪৬)

ফুকাহায়ে কেরাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) বলেছেন: যদি জিহাদ ফরযে আইন হয় এবং তার সক্ষমতা না থাকে, তাহলে তার জিম্মায় জিহাদের প্রস্তুতি নেওয়া ফরয, যাতে করে সে কাঙ্ক্ষিত শক্তি-সামর্থ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।

তাই, জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় আমাদেরকে অবশ্যই জিহাদ করতে হবে; তা করার সক্ষমতা কিংবা পরিবেশ তৈরি না হলে জিহাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি গ্রহণ করে যেতে হবে। ইসলামী শরীয়ত আমাদেরকে হাত গুটিয়ে বসে থাকার সুযোগ দেয়নি। যার যা মেহনত তার পাশাপাশি আমাদেরকে জিহাদ ও ই'দাদের মেহনত চালিয়ে যেতেই হবে ইনশাআল্লাহ।

তবে, আমাদেরকে কখনোই ভুলে গেলে চলবে না, যদি কোনো হুকুম 'ফরযে আইন' হয়ে যায়, তখন অন্যান্য ফরযে কিফায়া, ওয়াজিব, সুন্নত, মোস্তাহাব, মুবাহ কাজগুলো আদায় করার পূর্বে অবশ্যই ফরযে আইন হুকুমটিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

মনে করুন, আসরের ওয়াক্ত শেষ হতে আর মাত্র দশ মিনিট বাকী আছে। আমি এখনো আসরের নামায আদায় করিনি। এই মুহূর্তে একটি জানাযা এসে উপস্থিত। আমাকে আপনি কোনটি আগে আদায় করতে বলবেন ভাই? আসর নাকি জানাযা?........

প্রিয় ভাই! তাবুক যুদ্ধের ঘটনাটা আমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই.........

তাবুক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে, মদীনা থেকে দূরে কাফেররা মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার জন্য জড়ো হওয়ার সংবাদ মদীনায় পৌঁছা মাত্রই জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গিয়েছিল। রাসূল ﷺ ও সাহাবাগণ এমন অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন যে সামর্থ্যবান সকল বালেগ পুরুষদেরকে নিয়ে যুদ্ধের জন্য বের হয়ে যান। চাই ধনী-গরীব, যুবক-বয়স্ক, বড় আলেম-আবেদ, সম্ভ্রান্ত-সাধারণ যেই হোক না কেন। একমাত্র শারীরিকভাবে অক্ষম, নারী-শিশু এবং কিছু মুনাফিক ছাড়া অন্য কেউ পিছনে পড়েনি। শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতীত যারা পিছনে পড়েছিল তাদেরকে সমাজ থেকে বয়কট করা হয়। রাসূল ﷺ তাদের সাথে সকলের কথা বলা বন্ধ করে দেন। এই অবারিত, প্রশস্ত পৃথিবী তাদের জন্য সঙ্কীর্ণ করে দেয়া হয়েছিল।

হ্যাঁ ভাই! এটি সে সময়ের কথা, যখন মুসলিমদের জান-মাল তখনও নিরাপদ ছিল, যখন মুসলমানদের জন্য 'মদীনা' নামক একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও নিরাপদ রাষ্ট্র ছিল, যখন এই উম্মাহর মাঝে তাদের অভিভাবক, তাদের নেতা দুই জাহানের বাদশাহ্, রাসূলে আরাবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তখনও উপস্থিত ছিলেন।

তাহলে আজ পরিস্থিতি যখন এই পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, চতুর্পার্শ্বে শত্রুরা আগ্রাসন চালাচ্ছে, মুসলিম ভূমিগুলো কুফ্ফাররা দখল করে রেখেছে, দীর্ঘকাল যাবত ইসলামী শাসন বিলুপ্ত হয়ে আছে, মুসলিমদের উপর সীমাহীন হত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহর উপর ইতিহাসের সবচেয়ে নাজুকতম সময় অতিবাহিত হচ্ছে;

শতশত মুসলিম নারী-পুরুষ, উলামায়ে কেরামকে বন্দি করে রাখা হয়েছে ও হচ্ছে; আল্লাহ ﷻ, তাঁর রাসূল ﷺ, ইসলাম ও কুরআনকে অবমাননা করা হচ্ছে। তাহলে এই অবস্থায় বর্তমানে আমাদের উপর কি জিহাদ ফরজে আইন হবে না?...........

প্রিয় ভাই! একটু চিন্তা করুন তো- রাসূল ﷺ বর্তমান যামানায় থাকলে সবাইকে কি জিহাদের জন্য বের হতে বলতেন না? বর্তমান হালতে আমরা তাঁর উপস্থিতিতে জিহাদ না করে ঘরে বসে থাকতে পারতাম কি? রাসূল ﷺ বেঁচে থাকলে বর্তমানে আমাদের কেউ জিহাদের জন্য বের না হলে তাকে কি সমাজ থেকে বয়কট করতেন না? জিহাদ পরিত্যাগ করে নিজের অবস্থানের পক্ষে কোনো সদুত্তর দেওয়ার দুঃসাহস কি আমরা তাঁর সামনে দেখাতে পারতাম?..........

তাহলে ভাই! বর্তমানে 'ফরযে আইন' হওয়া সত্ত্বেও আমরা যারা জিহাদ করছি না, জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি না কিংবা জিহাদ নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনাও করছি না, উল্টো কেউ কেউ জিহাদ ও হকপন্থী মুজাহিদদের বিরোধিতা করছি, আমরা হাশরের ময়দানে আল্লাহর রাসূলের ﷺ সামনে মুখ দেখাব কিভাবে?? সেদিন কি আল্লাহ্ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ আমাদেরকে বয়কট করবেন না??............

কী হল ভাই আমাদের?..............

এরপরো কি আমরা একটুও চিন্তা করবো না???..............

وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ

"সুস্পষ্টরূপে (সত্যকে) পৌছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব।"

(সূরা ইয়াসীন ৩৬:১৭)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ- إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيۡـٔٗاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ

"৩৮. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি আঁকড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প।
৩৯. তোমরা যদি (তাঁর পথে জিহাদের জন্য) বের না হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দিবেন, তোমরা তার কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (০৯ সূরা তাওবা: ৩৮,৩৯)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمٖۚ ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, (তার জানা উচিত) অচিরেই আল্লাহ পাক এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তাঁরা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ- তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।" (০৫ সূরা মায়েদাহ: ৫৪)

দিলের মধ্যে জিহাদের মহব্বত তৈরির উপায় চারটি:

১. জিহাদ ও শাহাদাতের ফাযায়েল ও গুরুত্ব জানা
২. দুনিয়ার মহব্বত দিল থেকে বের করা
৩. মৃত্যুর ভয় দিল থেকে দূর করা
৪. জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় জিহাদ না করলে আল্লাহর সামনে দাঁড়াব কিভাবে এই কথা চিন্তা করা

****

কিতাবুত তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল
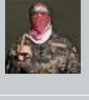
পঞ্চম পর্ব: আর কতকাল আমরা নিজেদেরকে এমনিভাবে ধোঁকা দিব?

****

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান

কিতাবুত তাহরীদ: দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হওয়ার পর **"দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্ ফোরাম"** এর মুহতারাম মুজাহিদ ভাইদের রিভিউ: নির্বাচিত কিছু স্ক্রীনশট্ (পোস্ট লিংক: https://bit.ly/tahrid5)

11-14-2023, 12:18 AM #16

যাজাকাল্লাহু খাইরান। অন্যান্য পর্বের মত এই পর্বেও বিষয়বস্তু লিখে দিলে ভালো হতো।

11-16-2023, 05:00 PM #18

আল্লাহ্ তাআলা আপনার লিখনিতে বারাকাহ দান করুন, উম্মাহ'র মধ্যকার সংশয় নিরসনের এই অক্লান্ত প্রচেষ্টা কবুল করে নাযাতের উসিলা বানিয়ে দিন, আমীন

11-20-2023, 02:49 PM #20

লেখকের হৃদয় নিসৃত কথাগুলো সবার হৃদয় ছুঁয়ে যাক।
আল্লাহ তাআলা লেখককে জাযায়ে খাইর দান করুন। আমীন

12-02-2023, 10:20 PM #23

মাশাআল্লাহ, সুন্দর একটি আলোচনা। এটাকে বিভিন্ন ভাষায় ছাপিয়ে বিভিন্ন দেশে বিতরণ করলে ভালো হবে।
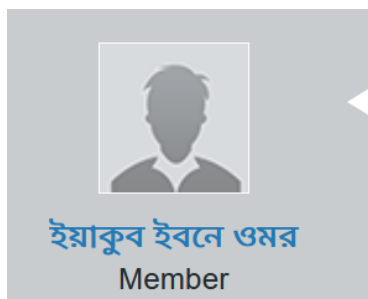
05-12-2024, 12:54 AM

মাশা আল্লাহ মুহতারাম ভাইজান!
বাকি পর্বগুলোর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রইলাম।
আপনার লেখা থেকে নতুন নতুন খোরাক পাই আলহামদুলিল্লাহ।
আপনার এই ভাইদের ভুলে যাবেন না ইন শা আল্লাহ।

কিতাবুত্‌ তাহরীদ ‘আলাল ক্বিতাল

পর্ব ০৫:

আর কতকাল আমরা নিজেদেরকে এমনিভাবে ধোঁকা দিব?

মুস‘আব ইলদিরিম

কিতাবুত্ তাহ্‌রীদ্ ‘আলাল্ ক্বিতাল
পর্ব ৬:
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ
হতে
দাবানল
মুস‘আব ইলদিরিম

উৎসর্গ:

হযরত মুআয ইবনে আমর ও মুআয ইবনে আফরা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার উত্তরসূরী হিন্দুস্তানের সকল মুসলিম কিশোর ও যুবকদেরকে, বিশেষত বাংলাদেশের সেই সকল জেন-যী (Gen-Z) সিংহশাবকদের প্রতি, যারা খালি হাতে তাগুতের বন্দুকের সামনে বুক টান করে দাঁড়িয়ে জীবন উৎসর্গ করে এক মহাকাব্যিক নির্ভীকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, পতন ঘটিয়েছে যামানার এক মুরতাদ লেডি ফেরাউনের। তোমাদের হাতেই সূচনা হোক দিল্লীর লালকেল্লা বিজয়ের সূচনার প্রথম পর্ব........

লেখকের কথা

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده- أما بعد

আমার প্রাণপ্রিয় ভাই!

একটি সুদীর্ঘ সময় পরে হলেও আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ রহমতে আপনাদের সামনে "কিতাবুত্ তাহরীদ্ 'আলাল্ ক্বিতাল্" এর ষষ্ঠ পর্ব "অগ্নিস্ফূলিঙ্গ হতে দাবানল" কিতাবটি নিয়ে হাজির হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ। ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। এর মধ্যে যা কিছু ভালো ও কল্যাণকর তা রব্বে কারীমের তরফ হতে। আমরা তো কেবল আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলারই ইবাদত করি, একমাত্র তাঁকেই ভয় করি, তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই সামনে সিজদাবনত হই।

প্রিয় ভাই! মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর ইচ্ছায় আজ দিকে দিকে জিহাদী জাগরণ দৃশ্যমান। সন্দেহ নেই বিশ্বব্যাপী "খিলাফাহ্ 'আলা মিনহাজিন্নুবুয়্যাহ" (Global Caliphate) এখন কেবল সময়ের ব্যাপার। কিন্তু পৃথিবীর বুকে এই খিলাফাহ্ কায়েম করবে কে? এই দায়িত্ব কার? কারা সেই গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিবে? হ্যাঁ ভাই, এটি আমাদের সকলের উপর ফরযে আইন একটি দায়িত্ব। এই জন্য আমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তুত হতে হবে। সেই মোবারক কাফেলায় আমাদেরকে যুক্ত হওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যারা শেষ যামানায় বাতিলের গর্বকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে, বিশেষতঃ আমাদের হিন্দুস্তানে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করবে। সেই সাথে আমাদের কিশোর ও তরুণ প্রজন্মকে (জেন যী) জিহাদের প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবতা ও ফলপ্রসূতা বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য আমাদের নিজেদেরই প্রস্তুতি কোথায়? কোথায় আমাদের ব্যস্ততা? হায়! আমরা এখনো ঘুমন্ত! আহ্বানকারীদের আহ্বান যেন নিষ্ফল, দাঈদের দাওয়াত যেন আমাদের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয়ে বারবার ফিরে আসে, আমাদের তালাবদ্ধ অন্তরে যেন তা প্রবেশ করে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন।.........

যাই হোক, আমাদের এহেন পরিস্থিতির কারণসমূহ এবং তা হতে উত্তরণের নানাবিধ পন্থা নিয়ে পূর্বের পর্বগুলোতে আলোচনা গত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। এই পর্বে আমরা আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় ভাই! জিহাদ নিয়ে আমাদের গাফলতির অন্যতম একটি কারণ হল মুমিন হিসেবে আমাদের যে আত্মমর্যাদাবোধ বা গাইরত থাকার কথা ছিল তা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমরা হারিয়ে ফেলেছি মুসলিম হিসেবে আমাদের জাত্যাভিমান, হারিয়েছি আমাদের সোনালি অতীতকে। শৌর্য-বীর্যের সেই অতীতের সাথে আমাদের নাড়ির যেন একরকম ছেদ ঘটেছে। ফলে আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের পিতৃপরিচয়। আমরা ভুলে গিয়েছি আমাদের আত্মপরিচয়। আমরা জানিনা কী ছিল আমাদের অতীত ইতিহাস! ফলে যে ইসলাম একসময় দিগ্বিজয়ী সিপাহসালার জন্ম দিয়েছে, সে ইসলাম আজ আমাদের কাছে অপরিচিত। তাই সময় এসেছে উম্মাহকে তার আসল পরিচয় স্মরণ

করিয়ে দেয়ার। তার মানসপটে সেই চিন্তাধারার বিকাশ ঘটানোর যা পূর্বপুরুষদের সাথে তার আত্মিক মিলবন্ধন তৈরি করবে, সৃষ্টি করবে এক নিশ্ছেদ্য নাড়ির বন্ধন, ছিন্ন করবে মানসিক দাসত্বের শৃঙ্খল, বান্দার গোলামী হতে আজাদ হয়ে ছুটে যাবে রবের গোলামীর দিকে, কাপুরুষতার যিন্দেগী হতে বেরিয়ে রচনা করবে বীরত্বের মহাকাব্যমালা।..................

অবশেষে বলতে চাই, আমি একজন সাধারণ মানুষ মাত্র, অবশ্যই ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নই। আলোচ্য কিতাবটিতে কারো নজরে কোনো ভুল ত্রুটি ও অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে, মেহেরবানী করে তা আমাকে অবহিত করবেন; ইনশাআল্লাহ্, আমি আপনাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান আহসানাল জাযা।

পরম করুণাময় যেন আমাদের সকলকে “জিহাদ ও শাহাদাত ফী সাবীলিল্লাহ”র জন্য কবুল ও মঞ্জুর করেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

-মুস'আব ইলদিরিম

সূচিপত্র

প্রথম অংশ

দ্বিতীয় অংশ

প্রথম অংশ

আমরা কাদের উত্তরসূরী? কী আমাদের পিতৃপরিচয়?

প্রিয় ভাই! আমরা কাদের সন্তান? আমরা কাদের উত্তরসূরী? কী আমাদের পিতৃপরিচয়? কী আমাদের রূহানী বংশপরিচয়?...

একজন মানুষের জন্য এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও পরিতাপের বিষয় যে, সে তার পিতৃপরিচয় ভুলে যায়। আপন পিতৃপরিচয় ভুলে গেলে মানুষের অবস্থা কী হয়, তা নিয়ে চলুন আপনাদের একটি কল্পকাহিনী শুনাই।

পিতৃপরিচয় হারানো রাজকুমার:

কোন এক সময় কোনো এক রাজ্যের রাজার দুইজন জমজ ছেলে সন্তান ছিল। দুইজনের চেহারা প্রায় কাছাকাছি। হঠাৎ করে দুই জনের একজন রাজকুমার ছোট বেলায় হারিয়ে গেলেন। অনেক খোঁজাখুজির পরও তাকে আর পাওয়া যায়নি। ঐ দেশেরই শহরের কোনো এক বস্তির নিঃসন্তান কিন্তু হৃদয়বান ব্যক্তি ঐ ছেলেটিকে পেয়ে বস্তিতেই তাকে লালন পালন করতে লাগল। লোকটি জানতো না যে সে যাকে পেয়েছে সে ঐ রাজ্যের রাজকুমার। আর তাই রাজকুমারকে সে বস্তিতেই বড় করতে লাগল। এভাবে সেই হারানো রাজকুমার বস্তিতেই তার শৈশব, কৈশোর আর যৌবন পার করে দিলেন। আস্তে আস্তে তার কাছে বস্তির জীবনই স্বাভাবিক হয়ে উঠল। বস্তির নোংরা পরিবেশ, বস্তির কুঁড়েঘরগুলোই এখন তার সবচেয়ে আপন। বস্তির আর দশটা বখাটে ছেলেই তার বন্ধু। তার যখন বিয়ের বয়স হল, তখন বস্তিরই আরেকটি সাধারণ ঘরের মেয়ের সাথে তার বিয়ে হল। সকাল বেলা তিনি রিযিকের সন্ধানে বেরিয়ে যান। কুলিগিরি কিংবা মজদুরি করেই তার সংসার অতিবাহিত হচ্ছে। যখন তার সন্তান-সন্ততি হল তারাও সেই বস্তির পরিবেশেই বড় হতে লাগল। এভাবেই এক অসীম গদ্যময়তার মাঝে তার জীবন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। আর এটিই হচ্ছে পিতৃ পরিচয় হারিয়ে ফেলা সেই রাজকুমারের জীবন কাহিনী।

প্রিয় ভাই! দৃশ্যপটটি একটু অনুধাবন করার চেষ্টা করি।

অন্যদিকে, হারিয়ে যাওয়া রাজকুমারের আরেক ভাই পিতার তত্ত্বাবধানেই বড় ও যোগ্য হয়ে বেড়ে উঠেছেন। তার পিতার মৃত্যুর পর যোগ্যতা বিচার করে দেশের বিজ্ঞ আলেমসমাজ ও বিশিষ্টজনেরা তাকেই রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে গ্রহণ করেছেন ও তার হাতে বাইয়াত নিয়েছেন। তিনি এখন দেশের সিংহাসনে বসেছেন, রাজপ্রাসাদে বসে রাজত্ব পরিচালনা করছেন। তার চারপাশে দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গরা অবস্থান করছে। তার যখন বিয়ের বয়স হল তখন পাশের রাজ্যের আরেক রাজার কন্যার সাথে তার বিবাহ সম্পাদিত হয়েছে। তারা তাদের সন্তান সন্ততি নিয়ে বেশ আরাম আয়েশে আর মহা দাপটে দিনাতিপাত করছেন। তিনি তার সন্তান সন্ততিকে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য যত রকম শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন তাই দিচ্ছেন। তিনি তার রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার জন্য এক মহা শক্তিধর সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছেন। আরো রাজ্য জয়ের চিন্তায় তিনি সবসময় অস্থির হয়ে থাকেন। আশেপাশের কয়েকটি রাজ্যে আক্রমন করে তিনি ইতিমধ্যে জয়ও করে ফেলেছেন। চারদিকে কেবল তার জয়-জয়কার। একজন ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তার সুনাম ও সুখ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। তার পিতার আমলে রাজ্যের একটি অংশ পাশের

দেশের অন্য একজন জালেম শাসক দখল করে নিয়েছিল। কিছুকাল আগে তিনি ঐ অঞ্চলে হামলা করে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে তার পৈত্রিক রাজত্ব উদ্ধার করে ফেলেছেন। এভাবে তিনি তার রাজ্যের একজন অতি জনপ্রিয় রাজায় পরিণত হয়েছেন।.........................

গল্পটির শিক্ষা:

প্রিয় ভাই! যদিও এটি একটি কাল্পনিক গল্প, কিন্তু বাস্তবতা এমনই হয়ে থাকে। আপন পিতৃপরিচয় ভুলে গেলে রাজার ছেলের যিন্দেগীও বস্তির নগণ্য একজন কুলি/মজুরের মতই হয়ে যায়। উপরের গল্পটিতে যে দুটি ভাইয়ের কাহিনী বলা হল, তাদের জীবন কি একই রকম? তাদের ইজ্জত-সম্মান কি একই স্তরের? তাদের উভয়কেই কি দেশের জনগণ কিংবা পৃথিবীবাসী একই চোখে দেখে? উভয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি কি একই রকম? উভয়কেই কি মানুষ একই রকমভাবে ভয় কিংবা শ্রদ্ধা করে? এককথায়, এই দুই ভাই কি কখনো সমান হতে পারে?..............

না ভাই, কখনোই এরা সমান হতে পারে না।

বর্তমান বিশ্বে আমরা মুসলিম জাতি সেই পিতৃপরিচয় হারিয়ে যাওয়া বস্তির রাজকুমারের যিন্দেগী যাপন করছি। আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন একেকজন মহা বীর, আর আমরা হলাম কাপুরুষ। তারা ছিলেন কর্মঠ, পরিশ্রমী আর আমরা হলাম অলস, বাচাল। তারা জিহাদ করে পৃথিবীতে আল্লাহর শাসন কায়েম করেছেন, একেকজন অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছেন, আর আমরা জিহাদ করবো তো দূরে থাক, জিহাদের নাম শুনলেই মূর্ছাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মত হয়ে যাই। যেই সময়ে আমার আপনার দিগ্বিজয়ী সিপাহসালার (সেনাপতি) হওয়ার কথা ছিল, রাজ্যজয়ের নেশায় যখন নির্ঘুম থাকার কথা ছিল, সারা পৃথিবী জয় করে যেখানে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার কথা ছিলো, সেই সময়ে আমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছি, ছোট্ট একটি চাকুরি কিংবা ব্যবসার পিছনে সারাটা জীবন অতিবাহিত করে ফেলছি। যখন আমাদের ঘরগুলো উচ্চ বংশীয়া, সুন্দরী দাসী-বাঁদী রমনীতে ভরপুর থাকার কথা ছিল, তখন আমরা দুয়েকটি হারাম রিলেশনের পিছনে পড়ে যিন্দেগী বরবাদ করে দিচ্ছি। যখন যুদ্ধাস্ত্রই আমাদের অহংকার ও গৌরবের বস্তু হওয়ার কথা ছিল, তখন আমরা অস্ত্রের নাম শুনলেই ভয় পাই, অস্ত্র থাকাটা 'হিকমাহ'র পরিপন্থী মনে করছি। যে 'সামরিক জীবন' হওয়ার কথা ছিল আমাদের প্রথম কাম্য, আমাদের প্রথম পছন্দ, আমাদের ইজ্জতের বিষয়, সে সামরিক জীবনকে আমরা অপছন্দ করছি।

হায়! আমরা যদি আমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদাদের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারতাম!............

প্রিয় ভাই! চলুন, ইতিহাসের পাতা থেকে দেখে আসি, আমরা কাদের উত্তরপুরুষ! তাহলেই আমরা এই বাস্তবতা কিছুটা হলেও বুঝতে সক্ষম হব যে, আমরা একেকজন মুসলমান একেকজন পিতৃপরিচয় ভুলে যাওয়া রাজকুমার।

আমাদের নবী ছিলেন যোদ্ধা নবী, রাষ্ট্রনায়ক নবী:

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" (০৯ সূরা তাওবা:৩৩)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন,

بُعِثْتُ بالسيفِ بينَ يدَي الساعةِ حتى يُعبدَ اللهُ وحدَه لا شريكَ له

"কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে আমাকে তরবারি সহকারে পাঠানো হয়েছে, যাতে করে এই যমীনে এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়, যার কোনো শরীক নেই।" (মুসনাদে আহমাদ-৫১১৪)

وَأَنَا الْحَاشِرُ ، وَنَبِيُّ الْمَلاحِمِ

"আমি একত্রকারী, আমি যুদ্ধের নবী (নাবিয়্যুল মালাহিম)"

(শামায়েলে তিরমিযি, হাদিস নং-২৮৩; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৪৯২; শারহুস্ সুন্নাহ, হা/৩৬৩১; মুস্তাদ্রাকে হাকেম, হা/৪১৮৫; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হা/৩২৩৫১; মুস্নাদুত তায়ালুসী, হা/৪৯৪)

جعل رزقي تحت ظل رمحي

"আমার রিযিক বর্শার ছায়াতলে রাখা হয়েছে।" (বুখারী শরীফ-১/৪০৮)

প্রিয় ভাই! আল্লাহর রাসূলের ﷺ দশ বছরের মাদানী যিন্দেগীর দিকে তাকাই। যেসকল যুদ্ধে/অভিযানে তিনি সশরীরে উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সেগুলোকে আমরা 'গাযওয়া' বলি, আর এমন গাযওয়ার সংখ্যা ছিল সাতাশটি। আর যেসকল যুদ্ধে তিনি পরোক্ষভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন, অর্থাৎ নিজে না গিয়ে দিক-নির্দেশনা দিয়ে অন্য কোনো সাহাবীকে নেতৃত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন সেগুলোকে আমরা 'সারিয়্যা' বলি। এরূপ সারিয়্যার সংখ্যা ছেচল্লিশটি। অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের ﷺ মাদানী দশ বছরের যিন্দেগীতে সর্বমোট যুদ্ধ/অভিযানের সংখ্যা ছিল তিয়াত্তরটি। অর্থাৎ বছরে গড়ে প্রায় সাতটির উপর যুদ্ধ/অভিযান পরিচালনা করেছিলেন আমাদের প্রিয় নবীজী ﷺ। আর নববী যিন্দেগীতেই আল্লাহর আইন কায়েম করেছিলেন এক বিস্তীর্ণ ভূমিতে যাকে 'জাযিরাতুল আরব' বলা হয়।

*** নবুওয়তের যামানার শাসনকাল- ৬২২-৬৩২ ঈসায়ী/ ১-১১ হিজরি।

*** শাসন এলাকার বিস্তৃতিঃ জাজিরাতুল আরব/আরব উপদ্বীপ। আয়তন ৬৪,০০,০০০ বর্গকিলোমিটার। (বর্তমানে- সৌদি আরব, ওমান, কুয়েত, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার ও ইয়েমেন) [যা বাংলাদেশের আয়তনের ৪৩.৩৭ গুণ ছিল।]

আল্লাহর রাসূলের ﷺ চার ঘনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন রাসূলের উত্তরসূরি চার রাষ্ট্রনায়ক:

আল্লাহর রাসূলের ﷺ পর মুসলিম জাহানের অভিভাবক হন তাঁরই প্রিয় ও সবচেয়ে নৈকট্যশীল সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আযমাঈন)।

খোলাফায়ে রাশেদার শাসনকাল: ৬৩২-৬৬১ ঈসায়ী/১১-৪০ হিজরী, ৩০ বছর।

খিলাফাতে রাশেদার খলিফাগণঃ

১. হযরত আবু বকর রাদি. : ১১- ১৩ হিজরি (৬৩২-৬৩৪ ঈসায়ী)

২. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদি. : ১৩- ২৩ হিজরি (৬৩৪-৬৪৪ ঈসায়ী)

৩. হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদি. : ৬৪৪-৬৫৬ ঈসায়ী

৪. হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রাদি. : ৬৫৬-৬৬১ ঈসায়ী

৫. হযরত হাসান ইবনে আলী রাদি. : ৬৬১ ঈসায়ী

মানচিত্র: খোলাফায়ে রাশেদার আমলে (হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খিলাফত এর সময়) মুসলিম বিশ্বের সর্বোচ্চ বিস্তৃতি। (সবুজ অংশ)

শাসন এলাকার বিস্তৃতিঃ সমগ্র আরব উপদ্বীপ, লেভান্ট থেকে উত্তর ককেসাস, পশ্চিমে মিসর থেকে বর্তমান তিউনিসিয়া ও পূর্বে ইরানীয় মালভূমি থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত।

(বর্তমানে যার অংশ ৩১টি দেশঃ আফগানিস্তান, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহরাইন, সাইপ্রাস, মিশর, জর্জিয়া, গ্রীস, ইরান, ইরাক, ইসরায়েল, ইতালি, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, ওমান, পাকিস্তান, ফিলিস্তিন, কাতার, রাশিয়া, সৌদি আরব, সুদান, সিরিয়া, তাজিকিস্তান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, তুর্কমেনিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, উজবেকিস্তান, ইয়েমেন)

উমাইয়া খিলাফত

খোলাফায়ে রাশেদার পর মুসলিম জাহানের অভিভাবক হন উমাইয়াগণ। মূলধারার উমাইয়াদের (স্পেন বাদে) মোট খলিফার সংখ্যা ১৫ জন। তাদের শাসনকাল: ৪১-১৩২ হিজরি (৬৬১-৭৫০ ঈসায়ী)। ৭১১-১০৩১ ঈসায়ী (ইউরোপের স্পেনের কর্ডোভা অংশ)
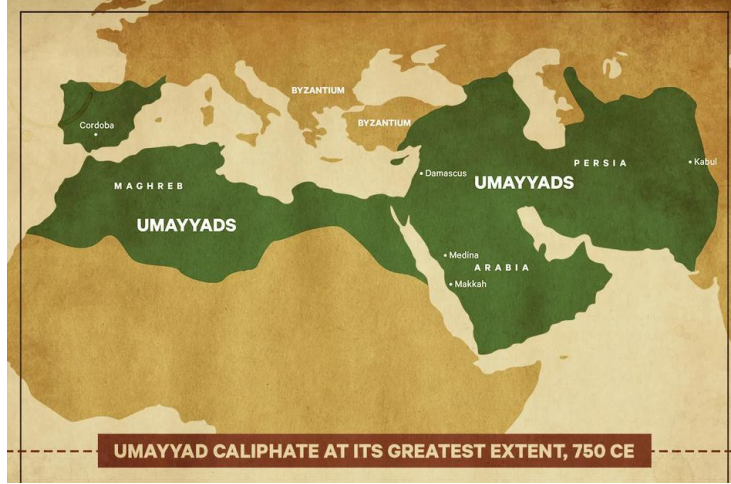
শাসন এলাকার বিস্তৃতিঃ জাযীরাতুল আরব, আফ্রিকার উত্তর অংশ, ইউরোপের বিশাল বিস্তৃত এলাকা, পূর্বে ভারতবর্ষের ও চীনের কিছু অংশ, উত্তরে শামদেশ ও রাশিয়ার কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা। আয়তন ১,৫০,০০,০০০ বর্গ কি.মি.। [যা বাংলাদেশের আয়তনের ১০১.৬৫ গুণ ছিল।]
(বর্তমানে- আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, অ্যান্ডোরা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহরাইন, চীন, সাইপ্রাস, মিশর, ইরিত্রিয়া, ফ্রান্স, জর্জিয়া (রাষ্ট্র), জিব্রাল্টার (যুক্তরাজ্য), গ্রীস, ইরান, ইরাক, ইসরায়েল, জর্ডান, কাজাখস্তান, কুয়েত, কিরগিজিস্তান, লেবানন, লিবিয়া, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, ওমান, পাকিস্তান, ফিলিস্তিন, পর্তুগাল, কাতার, রাশিয়া, সৌদি আরব, সোমালিয়া, স্পেন, সিরিয়া, তাজিকিস্তান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, তুর্কমেনিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, উজবেকিস্তান, ইয়েমেন, পশ্চিম সাহারা)

সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

হযরত আলি রাদি. এর ইন্তেকালের পর মদিনার মুসলমানগণ হযরত হাসান বিন আলি রাদি. এর হাতে খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করে। এর মাত্র ছয় মাস পর ৪১ হিজরি সনে হযরত হাসান রাদি. উম্মাহর ঐক্য ও সম্প্রীতির বৃহত্তর স্বার্থে হযরত মুয়াবিয়া রাদি. এর হাতে খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এভাবে, উমাইয়া বংশের শাসন হযরত আমির মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) কর্তৃক সূচিত হয়। তিনি দীর্ঘদিন সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। ফলে সিরিয়া উমাইয়াদের ক্ষমতার ভিত্তি হয়ে উঠে এবং দামেস্ক তাদের রাজধানী হয়।

উমাইয়ারা মুসলিমদের বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখে। পশ্চিমে তাদের অভিযান আন্দালুস পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। পূর্ব দিকে মুহাম্মাদ বিন কাসিম আস্ সাকাফির হাতে বিজিত হয়েছিল সিন্ধু অঞ্চল, কুতায়বা বিন মুসলিম আল বাহিলির হাতে বিজিত হয়েছিল ট্রান্সঅক্সিয়ানা (মধ্য এশিয়া/মাওরাউন নাহার) অঞ্চল; তার বিজয়াভিযান বিস্তৃত হয়েছিল সুদূর চীন পর্যন্ত। আর মাসলামা বিন আব্দুল মালিক আল মারওয়ানির হাতে বিজিত হয়েছিল উত্তরের ককেশাস অঞ্চল। সীমার সর্বোচ্চে পৌঁছালে উমাইয়া খিলাফত মোট ৫৭৯ মিলিয়ন বর্গ মাইল (১,৫০,০০,০০০ বর্গ কিমি) অঞ্চল অধিকার করে রাখে। তখন পর্যন্ত বিশ্বের দেখা সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে এটি সর্ববৃহৎ ছিল। অস্তিত্বের সময়কালের দিক থেকে এটি ছিল পঞ্চম। পরবর্তীতে ১৩২ হিজরি/ ৭৫০ ঈসায়ীতে আব্বাসীদের হাতে এই

খিলাফতের পতন ঘটে। আর এই পরিবারের একটি শাখা উত্তর আফ্রিকা হয়ে আন্দালুস চলে যায় এবং সেখানে উমাইয়া সাম্রাজ্য (আন্দালুস) প্রতিষ্ঠা করে। এ খিলাফত ৪২২ হিজরি (১০৩১ ঈসায়ী) পর্যন্ত টিকে ছিল এবং আন্দালুসের ফিতনার পর এর পতন হয়।

ঐতিহাসিক ইবনে কাছির বলেন, "উমাইয়া রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে জিহাদের প্রেরণা সর্বদা উজ্জীবিত ছিল। তাদের যেন জিহাদ ছাড়া অন্য কোনো ব্যস্ততাই ছিল না। তাদের শাসনামলে পৃথিবীর পূর্বে-পশ্চিমে, জলে স্থলে সর্বত্র ইসলামের কালিমা সমুন্নত হয়। তারা কুফর ও কুফুরি শক্তিকে পর্যুদস্ত করেছেন। উমাইয়া শাসনামলে কাফির মুশরিকদের অন্তরাত্মা মুসলিম জাতির প্রভাব-ভীতিতে প্রকম্পিত থাকত। মুসলিম অভিযাত্রীগণ যে অঞ্চলেই অভিযান পরিচালনা করত, তা-ই জয় করত।" (ইবনে কাছির দামিশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া,* ৯/৮৩)

উল্লেখযোগ্য বিজয়/যুদ্ধঃ ইয়ামামার যুদ্ধ, বাইজেন্টাইন (রোম) ও সাসানীয় (পারস্য) সাম্রাজ্যের পতন, মিশর জয়, জেরুজালেম জয়, আর্মেনিয়া-আজারবাইজান জয়, কাদেসিয়ার যুদ্ধ ইত্যাদি।

আন্দালুস (মুসলিম স্পেন) এর ইতিহাস:

সিউটা প্রশাসক জুলিয়ানের আহ্বানে তাঞ্জিয়ার প্রশাসক তারিক বিন যিয়াদ রাহি. ৯২ হিজরি সনে (৭১১ ঈসায়ী) মোট বার হাজার সৈন্য নিয়ে আন্দালুসে বিজয়াভিযান পরিচালনা করেন।

মানচিত্র: উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম আন্দালুস (সবুজ অংশ)

আইবেরিয়ান উপদ্বীপকেই অতীতে আন্দালুস বলা হত। আধুনিক রাষ্ট্রসীমার স্পেন, পর্তুগাল ও অ্যান্ডোরা এই তিনটি দেশের, পাশাপাশি ফ্রান্সের অংশ এই আইবেরিয়ান উপদ্বীপের অন্তর্ভূক্ত। আন্দালুসের শাসক রডারিক রাজধানী টলেডো হতে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে রওনা হয়। উভয় বাহিনী সাজুনা নগরীর নিকটবর্তী বারবাত বা লুক্কা উপত্যকায় মুখোমুখি হয়। একটানা আটদিন যুদ্ধ চলার পর রডারিক বাহিনীর পরাজয়ের মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হয়। তারিক বিন যিয়াদ বিজয়াভিযান অব্যাহত রেখে ৯৩ হিজরী সনে (৭১২ ঈসায়ী) আন্দালুসের রাজধানী টলেডো (বর্তমান স্পেনের অন্যতম প্রাচীন নগরী) জয় করেন। মুসলিম জাহানের তৎকালীন খলিফা ছিলেন ষষ্ঠ উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান।

আন্দালুসে বনু উমাইয়ার স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র একশ বছর পর ২৩৮ হিজরি থেকে ৩০০ হিজরি পর্যন্ত সময়ে ইসলামি আন্দালুস খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কয়েকটি এলাকা নিয়ে একেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গঠিত হতে থাকে এবং বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগুলো নিজেদেরকে সাম্রাজ্য দাবী করতে থাকে।

অবশেষে, ৪২২ হিজরি সনে (১০৩১ ঈসায়ী) খলিফা মুতামিদ বিল্লাহর পতনের মধ্য দিয়ে আন্দালুসে উমাইয়া সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে। আন্দালুসে মোট উমাইয়া শাসকের সংখ্যা ছিল উনিশজন।

উমাইয়াদের পতনের পর আন্দালুস আবারো খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়।

হায়! এদিকে মুসলিমদের জিহাদের ব্যাপারে গাফলতির সুযোগে তৎকালীন আন্দালুসের খ্রিস্টান অংশের প্রতাপশালী নেতা ষষ্ঠ আলফোন্সো ইসলামি ভূ-খণ্ডের প্রতি লালায়িত হয় এবং সে মুসলিমদের ভূমিতে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে একের পর এক ইসলামি দুর্গ জয় করতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ৪৭৮ হিজরি (১০৮৫ ঈসায়ী)-তে আন্দালুসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নগরী টলেডো জয় করে ফেলে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, কয়েকদিনের মধ্যেই সে পুরো ইসলামী আন্দালুস গিলে ফেলবে।

মানচিত্র: ষষ্ঠ আলফোন্সোর সময় ইসলামিক আন্দালুস (সবুজ অংশ)

*** ইউসুফ বিন তাশফীন: লাঞ্ছনার মাঝে এক টুকরো বীরত্ব-গৌরব!

এসময় মুসলিম শাসকবৃন্দ অনুভব করেন যে, প্রণালির ওপারের আফ্রিকার মুরাবিতি সাম্রাজ্যের শাসক ইউসুফ বিন তাশফিনই পারেন এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ইসলামি আন্দালুসের সহায়তায় এগিয়ে আসতে। ইউসুফ বিন তাশফিনের নেতৃত্বাধীন মুরাবিতি সাম্রাজ্য ছিল তৎকালীন মাগরিব অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র। আর তাই আন্দালুসবাসী তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ আর জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর প্রতি সহজাত আকর্ষণের দাবীতে ইউসুফ বিন তাশফিন তাদের ডাকে সাড়া দেন।

*** জাল্লাকার যুদ্ধ: (The Battle of Zallaqa/ Sagrajas):

ইউসুফ বিন তাশফিন আন্দালুসের খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য বাহিনী নিয়ে 'জাবালে তারিক' (জিব্রাল্টার) প্রণালি পাড়ি দিয়ে আন্দালুস উপকূলের জাযিরাতুল খাযরায় অবতরণ করেন।

এদিকে খ্রিস্টান অধিপতি ষষ্ঠ আলফোন্সো এক বিশাল বাহিনী গঠন করে। তার বাহিনীর বিশালতা দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজেই বলে উঠে, "এই সুবিশাল বাহিনী নিয়ে আমি জিন-মানুষ এমনকি আসমানের ফেরেশতাদের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে পারি।" তার বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে সর্বোচ্চ যে হিসাব পাওয়া যায় তা এই- তার বাহিনীর অশ্বারোহীই ছিল পঞ্চাশ হাজার, কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে আশি হাজারের উপর। পদাতিক ছিল দুই লক্ষের উপর। সব মিলিয়ে তিন লক্ষের উপর। [ইসলামী ইতিহাস, ড. রাগেব সারাজানী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২১] অন্যদিকে, মুসলিম সৈন্যদের প্রকৃত সংখ্যা জানা যায়নি। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল খ্রিস্টানদের সংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ। তবে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সম্পর্কে সর্বনিম্ন যে হিসাব পাওয়া যায় সে অনুযায়ী মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র বিশ হাজার। [https://bit.ly/zallaqa]

যাইহোক, বাতালইয়ুসের নিকটবর্তী জাল্লাকা প্রান্তরে দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়।

যখন উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের দিন নির্দিষ্ট করার জন্য পত্র বিনিময় হয়, তখন আলফোন্সো প্রতারণার আশ্রয় নেয় এবং বলে যে, "আগামীকাল শুক্রবার আর তা মুসলিমদের সাপ্তাহিক আনন্দের দিন। তাই সেদিন আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে লড়তে চাই না। তার পরের দিন শনিবার, আর তা ইহুদীদের আনন্দের দিন। যেহেতু আমাদের এ অঞ্চলে প্রচুর ইহুদী আছে, তাই আমাদের উচিত তাদের দিকটিও খেয়াল রাখা। আর এর পরদিন হলো রোববার, আমাদের

আনন্দের দিন।। সুতরাং , আসুন, আমরা এসব আনন্দের দিনগুলোর সম্মান বজায় রাখি। সোমবারেই পরস্পরের সাক্ষাৎ হবে।"

৪৭৯ হিজরি সনের ১২ রজব (১০৮৬ ঈসায়ীর ২৩ অক্টোবর) শুক্রবার বাদ ফযর ইউসুফ বিন তাশফীন যখন ফজরের নামাজের উদ্দেশ্যে বের হন, তখনই খ্রিস্টান বাহিনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশ্য আন্দালুসের খ্রিস্টানদের সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় মুসলিমরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। শুরু হয় ইতিহাসের অন্যতম আরেকটি ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী অসম যুদ্ধ। মুসলিম বাহিনী প্রবল বিক্রমে খ্রিষ্টান সৈন্যদের মুলা-গাজর আর টমেটোর মত কাটতে থাকে। মধ্যরাত পর্যন্ত কুফ্ফারদের উপর এই হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে। অবশেষে সুবিশাল খ্রিষ্টান বাহিনীর পতন ঘটে। এরপর আলফোন্সো বাহিনীর কী হল, জানেন কী? দাম্ভিক আলফোন্সো মাত্র পাঁচশ ক্রুসেডার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে সক্ষম হয়। তার মানে?

তার মানে হল, তিন লক্ষ ক্রুসেডার সৈন্য মুজাহিদদের হাতে একদিনেই নিহত হয়। অন্যদিকে মাত্র তিন হাজার মুজাহিদ শহিদ হন। সুবহানাল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য, যিনি মুজাহিদদের পাশে সব সময় থাকেন।

وَمَا ٱلنَّصۡرُ إِلَّا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ ١٢٦

"আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে।" (সূরা আল ইমরান ৩:১২৬)

فَلَمۡ تَقۡتُلُوهُمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمۡۚ وَمَا رَمَيۡتَ إِذۡ رَمَيۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ

"সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহ্ই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ।" (সূরা আনফাল ৮:১৭)

পরবর্তীতে, ইউসুফ বিন তাশফিন রাহি. এর হাত ধরে পুরো ইসলামী আন্দালুস আফ্রিকার মুরাবিতি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। মুরাবিতি শাসনের মাধ্যমে শান্তি ফিরে আসায় আন্দালুসের মুসলমানগণ সীমাহীন আনন্দিত হয়।

কালের পরিক্রমায় আন্দালুসের মুসলমানগণ ঐশ্বর্য ও বিলাসী জীবনের হাতছানিতে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারা ভুলে যায় নিজেদের পরিচয় এবং শত্রুর পরিচয়। তারা ভুলে যায় 'আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ্'র আকীদা। ভুলে যায় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর আদর্শ! ভুলে যায় যুগে-যুগে কারা তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে এবং কারা তাদের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে একজোট হয়েছে। আর তাই আন্দালুস ও ইসলামের শত্রুরা যখন তরবারিতে শান দিচ্ছিল এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, আন্দালুসের মুসলমানরা তখন মত্ত ছিল সুর ও সুরার নেশায় এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতায়। ফলাফল যা হওয়ার, তা-ই হয়েছিল। অবশেষে ৮৯৭ হিজরি সনের ২ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৪৯২ ঈসায়ীর ২ জানুয়ারি অ্যারোগানের খ্রিস্টান শাসক ফার্ডিনান্ডের বাহিনীর হাতে আন্দালুসের শেষ ইসলামি দুর্গ গ্রানাডার পতন ঘটে।

আব্বাসী খিলাফত

উমাইয়াদের পর মুসলিম বিশ্বের অভিভাবক হন আব্বাসীগণ। মোট খলিফার সংখ্যা ৩৪ জন। তাদের শাসনকাল ছিল: ১৩২-৯২৩ হিজরি (৭৪৯-১৫১৭ ঈসায়ী)।
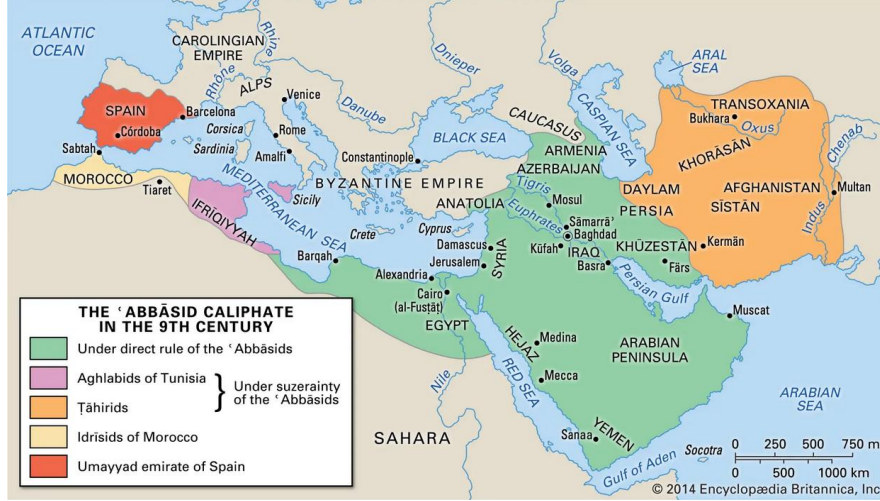
শাসন এলাকার বিস্তৃতিঃ পশ্চিমে জাযীরাতুল আরব, আফ্রিকার উত্তর অংশ, পূর্বে ভারতবর্ষের ও চীনের কিছু অংশ, উত্তরে শামদেশ ও রাশিয়ার কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা। আয়তন ১,১১,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। [যা বাংলাদেশের আয়তনের ৭৫ গুণ ছিল।]

(বর্তমানে দেশসমূহঃ অ্যান্ডোরা, আজারবাইজান, আফগানিস্তান, আর্মেনিয়া, আলজেরিয়া, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, ইসরায়েল, উজবেকিস্তান, ওমান, কাজাখস্তান, কাতার, কিরগিজিস্তান, কুয়েত, জর্জিয়া, জর্ডান, জিব্রাল্টার, তাজিকিস্তান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, তুর্কমেনিস্তান, পর্তুগাল, পাকিস্তান, ফিলিস্তিন, মাল্টা, মিশর, রাশিয়া, লিবিয়া, লেবানন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সাইপ্রাস, সিরিয়া, সৌদি আরব।)

আব্বাসী খিলাফতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

আব্বাসীয় খিলাফত নবী মুহাম্মদ ﷺ এর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের কর্তৃক ১৩২ হিজরি (৭৫০ ঈসায়ী) কুফায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আস্-সাফাহ আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আলি বিন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. এর বাহিনী উমাইয়াদের সমূলে নিঃশেষ করে উমাইয়া খিলাফতের পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশ আন্দালুস ব্যতীত পুরো মুসলিম বিশ্বে আব্বাসী খিলাফা কায়েম করেন। ৭৬২ ঈসায়ীতে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। এই যুগে মুসলিমদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়। এক পর্যায়ে খলিফারা বিলাসিতায় গা ভাসালে মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের বাগদাদ দখলের পর ১২৫৮ ঈসায়ীতে (৬৫৬ হিজরি) আব্বাসীয় খিলাফত বিলুপ্ত হয়। এর পর মামলুক শাসিত মিশরে অবস্থান করে তারা ১৫১৭ ঈসায়ী সাল পর্যন্ত নামে মাত্র ধর্মীয় ব্যাপারে কর্তৃত্ব থাকে। ১৫১৭ সালে (৯২৩ হিজরি) মিশরে উসমানীয়দের দ্বারা মামলুকদের পতন ঘটলে আব্বাসী খিলাফাতের চূড়ান্ত বিলুপ্তি ঘটে ও উসমানী খেলাফত শুরু হয়।

ক্রুসেড যুদ্ধ ও আইয়ুবী রাষ্ট্র:

মুসলিম ভূ-খণ্ডে খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের হিংস্র ও বর্বর আগ্রাসন আব্বাসী খিলাফতের প্রতি অনুগত দুটি মহান রাষ্ট্রের প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়- জিনকি রাষ্ট্র ও আইয়ুবি রাষ্ট্র। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই দুটি রাষ্ট্রকে যেন সৃষ্টিই করেছিলেন- ইসলামি প্রাচ্যে ইউরোপীয়দের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে এবং তাদের এই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে ছয়শ বছরেরও অধিক সময় পিছিয়ে দিতে।

৪৯২ হিজরি সনের শাবান মাসে (১০৯৯ ঈসায়ীর জুলাই মাসে) প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধে বাইতুল মুকাদ্দাসের পতন ঘটে। খ্রিষ্টানরা মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে একের পর এক নয়টি ক্রুসেড যুদ্ধ পরিচালনা করে। আল কুদস ও শামের বিভিন্ন অঞ্চল জবরদখল করার পর খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা দামেশকসহ অবশিষ্ট শাম এবং পরে মিশর জয়ের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু তাদের স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করতে সুলতান ইমাদুদ্দিন জিনকি রাহি. এক অব্যাহত জিহাদের ধারা শুরু করেন। ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় অনন্যসাধারণ ভূমিকা রাখেন সুলতান ইমামুদ্দিন জিনকি ও তার বংশধরগণ। ইরাকের মসুল, জাযিরা ও শামের বিজিত এলাকাগুলোতে ইমাদুদ্দিন জিনকির হাতে সূচিত হয় জিনকি রাষ্ট্র।

সুলতান নুরুদ্দিন জিনকির মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য শিষ্য সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এক সুবিশাল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন যার ব্যাপ্তি ছিল উত্তর ইরাক (কুর্দিস্থান), শাম, মিশর ও বারকা অঞ্চলজুড়ে। এটিই ইতিহাসে 'আইয়ুবি রাষ্ট্র' হিসেবে পরিচিত।

চিত্র: আইয়ুবী সাম্রাজ্য।

৫৮৩ হিজরি সনে (১১৮৭ ঈসায়ী) সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে দামেশক থেকে বের হন। এদিকে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির বিস্তৃত পরিকল্পনা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সমকালীন খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সৈন্য সমাবেশ শুরু করে। উভয় বাহিনী হিত্তিন নামক স্থানে পরস্পর মুখোমুখি হয়। মুসলিম বাহিনী পূর্বেই যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশের পানির উৎসগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করায় ক্রুসেডার বাহিনী এসময় প্রচণ্ড পানির স্বল্পতার সম্মুখীন হয়।

উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের পর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেন। চরমভাবে পরাজিত ক্রুসেডার বাহিনীর একজন সদস্যও পালিয়ে যেতে পারেনি। তারা হয়তো নিহত হয়, নতুবা বন্দী হয় । যুদ্ধে নিহত ক্রুসেডার সৈন্য সংখ্যা ছিল দশ হাজার।

অবশেষে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবী ৫৮৩ হিজরি (১১৮৭ ঈসায়ী)-তে বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করেন।

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রাহি. পবিত্র নগরী আল কুদস পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে তাকে চূড়ান্ত লক্ষ্যপানে একধাপ এগিয়ে নেন। আর এর সফল পরিসমাপ্তি ঘটে চার মামলুক সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ, রুকনুদ্দিন বাইবার্স, সাইফুদ্দিন কালাউন ও আল আশরাফ খলিলের মাধ্যমে।

উসমানী খিলাফত:

উসমানী খিলাফতের শাসনকাল: ৬৯৮-১৩৪২হিজরি (১২৯৯-১৯২৪ ঈসায়ী)

সুলতান ও খলিফাগণ: উসমানি সাম্রাজ্যের প্রথম সুলতান ছিলেন প্রথম উসমান। ০৯ নং সুলতান প্রথম সেলিমের সময় ৯২৩ হিজরি/১৫১৭ সালে উসমানি সালতানাত খিলাফতে রূপান্তরিত হয়। তাই প্রথম সেলিম উসমানী খিলাফতের প্রথম খলিফা। সর্বশেষ খলিফা ছিলেন দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ (৩৭ তম সুলতান)।

শাসন এলাকার বিস্তৃতি:

আমাদের পূর্বপুরুষ উসমানীরা পৃথিবীর এমন সব ভূ-খণ্ডে ইসলামকে বিজয়ী করেছিল, যা দ্বিতীয় কোনো মুসলিম শাসকের শাসন করার সৌভাগ্য হয়নি।

হ্যাঁ! একমাত্র উসমানিরাই পেরেছিল ইউরোপের হৃদপিণ্ডে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করতে। তারা জয় করেছিল- গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া (বর্তমান সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো ও ক্রোয়েশিয়া), বসনিয়া, হার্জেগোবিনা, আলবেনিয়া, মেসিডোনিয়া, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, মালদোভা, ইউক্রেন, সাইপ্রাস, রাশিয়ার বিরাট অংশ, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া,

ইতালী। তথা তৎকালীন অর্ধ ইউরোপ ছিল উসমানিদের পদানত। এদিকে সম্পূর্ণ এশিয়া মাইনর তথা আধুনিক তুরস্ক, আর্মেনিয়া, জর্জিয়াসহ সমগ্র ককেশাস অঞ্চল, আফ্রিকার উত্তর অংশ, জাজিরাতুল আরব, ইরাক, শাম উসমানীদের শাসনের আওতাধীন ছিল। আয়তন ছিল ৫২,০০,০০০ বর্গকিলোমিটার। অবশেষে উসমানিদের বিজয়যাত্রা ভিয়েনার দুর্গপ্রাচীর পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়ায়।

** কনস্টান্টিনোপল বিজয়:

উসমানিদের গৌরবের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সপ্তম উসমানী সুলতান ২৩ বছর বয়সী (দ্বিতীয়) মুহাম্মাদ আল ফাতিহর হাতেই ৮৫৭ হিজরি (১৪৫৩ ঈসায়ী) সনে কনস্টান্টিনোপল বিজিত হয়েছিল এবং এরই মাধ্যমে উসমানিরা বাইজেন্টাইন (রুম) সাম্রাজ্য উচ্ছেদ করে। অথচ সুদীর্ঘ ৭০০ বছর বহু মর্দে মুজাহিদ অসংখ্যবার চেষ্টা করেও এই নগরীটির চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারেনি। সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রিয় নবীজি ﷺ-এর এই ভবিষ্যদ্বানী যথেষ্ট:

(لَتُفْتَحَنَّ القُسطَنْطِينِيَّةُ فلنعمَ الأميرُ أميرُها ولنعمَ الجيشُ ذلك الجيش) -رواه أحمد (١٨٩٧٩)، والحاكم في "المستدرك(٤ / ٥٨٤)

"কনস্টান্টিনোপল অচিরেই বিজয় হবে। কতই না উত্তম তার বিজেতা, আর কতই না উত্তম সেই বাহিনী।"

(আহমাদ- ১৮৯৭৯, মুসতাদরাকে হাকেম- ৪/৫৮৪)

কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) বিজয়ের পর সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ তার বিজয়াভিযানে মনোনিবেশ করেন। এরপর তিনি সার্বিয়া, মুরা (দক্ষিণ গ্রীস), ওয়ালাচিয়া (বর্তমান রোমানিয়ার অংশ), বসনিয়া, ক্রিমিয়া, ক্রোয়েশিয়ার কিছু অংশ, মন্টেনিগ্রো, আলবেনিয়ার কিছু অংশ, ট্রান্সসিলভানিয়া (প্রাচীন পশ্চিম রোমানিয়া), ইতালীর অটারেন্ট শহর, আনাতোলিয়ার সর্বশেষ খ্রিস্টান রাজ্য ট্রাবজোন, কিরমান রাজ্য ইত্যাদি জয় করেন।
এই মহান সুলতান জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি একের পর এক রাজ্য জয় করেছিলেন। এজন্য তার উপাধি হয়ে যায় আল-ফাতিহ বা বিজেতা। ইসলামের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র দিগ্বিজয়ী যিনি এই উপাধি লাভ করেন। সর্বশেষ তিনি ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র ইতালি জয় করারও প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাকদীরের ফয়সালা ছিল ভিন্ন। তিনি রবের সান্নিধ্যে গমন করেন। আল্লাহ পাক তাকে মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

মুসলিম তাতারী শাসন:

প্রিয় ভাই, তাতার কিংবা মোঙ্গল নাম শুনলেই আজ আমাদের কল্পনায় পাশবিকতা, ধ্বংসলীলা ও নির্মমতার এমন সব চিত্র ভেসে ওঠে- যার সাথে মানবতার ন্যূনতম সম্পর্কও নেই। কিন্তু আমরা জানি কি, মুসলমানদের ভূ-খণ্ডে প্রবেশের পঁয়ত্রিশ বছর পর মোঙ্গলদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে এবং একশ বছরের মধ্যে আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে তাতাররা প্রায় সকলেই কলেমা পড়নেওয়ালা আমাদের ভাই-বোন হয়ে যান??? তারা এসেছিল মুসলমানদের উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে মুসলিম ভূমিগুলোকে জয় করতে, কিন্তু তার আগেই 'ইসলাম' তাদের সকলের অন্তর জয় করে নেয়! আলহামদুলিল্লাহ!!!

আমরা তো শুধু তাতারদের উত্থানকালের বর্বরতা আর আইনে জালুতের প্রান্তরে মুসলমানদের হাতে তাদের পরাজয়ের ইতিহাসই জানি। কিন্তু আমরা কি জানি, তাতারদের এর পরের ইতিহাস? চেঙ্গিস খান, হালাকু খান আর তৈমুর লং-এর পরের ইতিহাস?? শোষণ আর হত্যা ছাড়া মুসলমানদের ইতিহাসে মোঙ্গলদের আর কোনো অবদান ছিল কি?? অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, ইতিহাসে অদ্বিতীয় নিপীড়ন ও রক্তক্ষরণের ইতিহাস সৃষ্টির ক্ষণকালের মধ্যেই মোঙ্গল ভাইয়েরা সর্বোচ্চ মানবতা ও সম্প্রীতির এক অধ্যায় রচনা শুরু করে। আমাদের অনেক তাতার ভাইদের দিয়ে আল্লাহ্ পাক ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। বহু ভূ-খণ্ড বিজয় করে তারা সেখানে মুসলমানদের ভিত মজবুত করেছেন, যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত অক্ষত ছিল। বরং তাদের অনেকে ইসলামের খাতিরে স্বজাতির সঙ্গে যুদ্ধও করেছেন।
মুসলিম তাতার সাম্রাজ্যকে আমরা পাঁচটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা
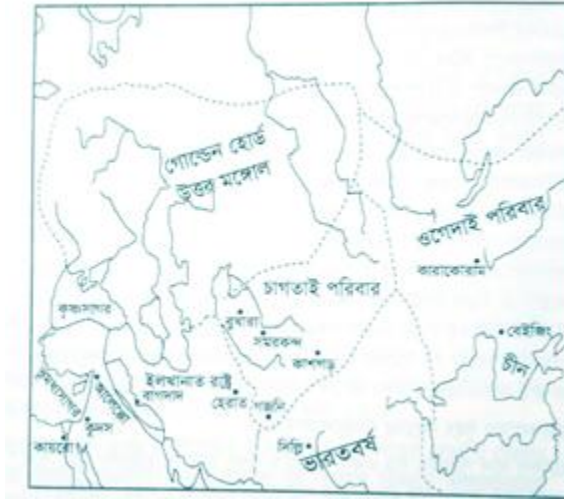
তাতার সাম্রাজ্যের প্রথম ভাগ:

পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম সাইবেরিয়ায় মোঙ্গল শাসন
*** চেঙ্গিস খানের বড় ছেলে জোচি খানকে প্রদেয় রাশিয়া, বুলগেরিয়া, ককেশাস অঞ্চল, পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম সাইবেরিয়া । এই অঞ্চলকে গোল্ডেন হোর্ড-ও বলা হয়। এর রাজধানী ছিল সারাই শহর।
*** গুরুত্বপূর্ণ শাসকবৃন্দ: বাতু খান, বারকে খান (প্রথম মুসলিম তাতার শাসক), মাংকো তৈমুর, তোদান মাংকো, গিয়াসউদ্দিন মুহাম্মাদ উজবেক, মাহমুদ জানি বেগ, মুহাম্মাদ বারদি বেগ ইত্যাদি।

তাতার সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় ভাগ:

ইলখানিয়া সাম্রাজ্য তথা পারস্য, খোরাসান এবং আরব ও এশিয়া মাইনর অঞ্চল। চেঙ্গিস খানের পুত্র তুলুইকে এই অংশ দেয়া হয়।
*** শাসকবৃন্দঃ হালাকু খান, আবাকা খান (হালাকু খানের পুত্র), তেকুদার (হালাকু খানের আরেক পুত্র ও প্রথম মুসলিম শাসক), আরগুন, গাজান (মুসলিম ছিলেন এবং তার পরবর্তী ইলখানাত শাসকবৃন্দ মুসলমান ছিলেন), উলজাতু, আবু সাইদ ইত্যাদি। আবু সাইদ ছিলেন ইলখানিয়া সাম্রাজ্যের শেষ শাসক।

তাতার সাম্রাজ্যের তৃতীয় ভাগ:

অঞ্চলসমূহ: চেঙ্গিস খানের পুত্র ওগেদাইয়ের শাসিত অঞ্চলসমূহ তথা চীন, মোঙ্গল ও পূর্ব তুর্কিস্তান (উইঘুর অঞ্চল)

শাসকবৃন্দ: ওগেদাই, গুয়ুক খান। গুয়ুক খানের পর ওগেদাইয়ের সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

প্রথম ভাগে, মঙ্গোলিয়া ও পূর্ব তুর্কিস্তানে (উইঘুর অঞ্চল) ওগেদাইদের শাসন চলে। পরবর্তীতে এ অঞ্চলের শাসনে চাগতাই পরিবার প্রবেশ করে। এ অঞ্চলের রাজধানী ছিল কারাকোরাম।

অন্যদিকে বিশাল চীনা অঞ্চলের শাসক হন কুবলাই খান। তার রাজধানী ছিল বেইজিং।

তাতার সাম্রাজ্যের চতুর্থ ভাগ:

অঞ্চলসমূহ: পুরো তুর্কিস্তান, উইঘুরদের রাজ্য কাংসু এবং মা-অরাউন নাহার (ট্রান্স অক্সিয়ানা)

শাসকবৃন্দ: চাগতাই, মোবারক শাহ (এ অঞ্চলের প্রথম মুসলিম শাসক), বুরাক খান, মুহাম্মাদ খান, তুঘলক খান, তৈমুর লং। তৈমুরের মৃত্যুতে সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দেয়। এরপর আসে মোঙ্গল শাইবানি ও জানিয়া বংশের শাসন। এরপর রুশ আগ্রাসনের শিকার হয় প্রায় সমগ্র তুর্কিস্তান।

কম্যুনিস্ট বিপ্লবের পর ১৩৩৮ হিজরি (১৯২০ ঈসায়ী) সনে রুশ বাহিনীর হাতে বুখারার পতন হয়। ইসলামের প্রাচীনতম শহরটিতে কম্যুনিস্ট লাল পতাকা উড্ডীন হয়।

তাতার সাম্রাজ্যের পঞ্চম ভাগ:

ভারতবর্ষের মোঙ্গল বা মোঘল সাম্রাজ্য।

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন:

ভারতীয় উপমহাদেশ (হিন্দুস্তান/ হিন্দ) বর্তমান ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ নিয়ে গঠিত। ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন ঘটে বণিক, দাঈ আর সৈনিকদের হাত ধরে। হযরত উমর রাদি. এর সময় ভারতমুখী কিছু প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও ব্যাপক পরিসরে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে উমাইয়া শাসনামলে; ৯২ হিজরিতে (৭১১ ঈসায়ী সনে) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক প্রেরিত তার ভাতিজা ও জামাতা বীর মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে। আব্বাসীয় আমলে সিন্ধের গভর্নর হিশাম বিন আমর তাগলিবি মুলতান ও কাশ্মির জয় করেন।

আফগানিস্তানের গজনি কেন্দ্রিক গজনবী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সুবুক্তগিন হিন্দুস্তানের পাঞ্জাব পর্যন্ত জয় করেন। তার পুত্র সুলতান মাহমুদ গজনবি ১৭ বার ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন এবং সিন্ধু অঞ্চলের এলাকাগুলো জয় করতে সক্ষম হন।

গজনবি শাসনের পর ভারতের সিংহাসন অলঙ্কৃত করে মুসলমানদের ঘুরি শাসন, মামলুক শাসন, খলজি শাসন, তুঘলক শাসন, মোঘল/মোঙ্ঘল শাসন। এই মোঘলরাই মোঙ্ঘল বা তাতার নামে পরিচিত। মোঘল শাসকদের নাম: বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গির, শাহজাহান, আউরঙ্গজেব (আলমগীর)।

ভারতবর্ষে মুসলমানরা প্রায় ছয়শত বছর শাসন করে। ইসলামের আগমনের পূর্বে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজারা একে অপরের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হত। ইসলামের আগমনে হিন্দুস্তানে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় ভারতীয় সমাজে জাতপ্রথা ছিল প্রবল। ইসলামের আগমন হিন্দুদের জীবনে বিশেষ করে নিচু জাতের হিন্দুদের জন্য বয়ে আনে আশীর্বাদ ও রহমত। সকল জাতের হিন্দুরা নির্বিঘ্নে তাদের ধর্ম পালন করতে থাকে। সেই সময় ভারত ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রগুলোর একটি। শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্যবিদ্যা সকল ক্ষেত্রেই ভারতের সুনাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল।

এদিকে ডাচ, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, আর্মেনিয়ান, ইংরেজ ও ফরাসী-এ সকল ইউরোপীয়ানরা প্রত্যেকেই ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করার স্বপ্ন লালন করত। কিন্তু ইংরেজরাই সবচেয়ে সফল হয়। ইংরেজরা প্রথমে অবতরণ করে মাদ্রাজে (বর্তমান নাম চেন্নাই)। প্রথমে তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে। এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উপমহাদেশজুড়ে জমি কিনে দুর্গ নির্মাণ করে। এরপর একে একে সমগ্র ভারতবর্ষই দখল করে নেয়। মীর জাফর, জগৎশেঠ আর রাজবল্লভের গাদ্দারীর ফলে ১৭৫৭ সালে বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পলাশির যুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমে ইংরেজরা বাংলা দখল করে নেয়।

সিদ্ধান্ত:

প্রিয় ভাই! উপরের আলোচনা থেকে এটি কি প্রতীয়মান হয় না যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার এক বিশাল অংশ রাজত্ব করেছিলেন? এ আরব আমাদের, এ চীন আমাদের, এ রাশিয়া আমাদের, আফ্রিকা আমাদের, ইউরোপ আমাদের, এ উম্মাহ্ এসকল ভূমির উত্তরাধিকারী! আমাদের বীর পূর্বপুরুষেরা এসকল ভূমিতে আল্লাহর আইন কায়েম করেছিলেন। তারা এসকল ভূমির শাসনকর্তা ছিলেন। আমরা তাদের সন্তান, তাদের রূহানী উত্তরসূরী, রূহানী রাজকুমার। সুতরাং তাদের সন্তান হিসেবে আমাদের উপর ফরযে আইন দায়িত্ব হল আমাদের পিতৃভূমিগুলো কুফ্ফারদের হাত হতে উদ্ধার করে সেগুলোতে পুনরায় আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

الشيخ عبد الله عزام -رحمه الله:

ولذلك الجهاد فرض عين الآن على الأمة الإسلامية جمعاء، ليس من الآن، بل من يوم سقطت الأندلس، من ١٤٩٢ ميلادي، قبل خمس قرون صار فرض عين، وخلال خمس قرون الأمة كلها آثمة، لأنها لم ترجع الأندلس، الآن الجهاد فرض عين، ولا ينتهي بتحرير أفغانستان، ولا بتحرير فلسطين، ينتهي فرض العين عندما نرجع كل بقعة، كانت في يوم من الأيام تحت راية لا إله إلا الله، فالجهاد فرض عين عليك حتى تموت، كما أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان إلا إذا مات فالجهاد لا يسقط على الإنسان إلا إذا مات أبدا، احمل سيفك وامض في الأرض، لا ينتهي فرض العين أبدا حتى تلقى الله، وكما أنه لا يجوز أن تقول صمت العام الماضي هذه السنة أريد أن أستريح، أو صليت الجمعة الماضية وهذه الجمعة أريد أن أستريح، كذلك لا يجوز أن تقول جاهدت السنة الماضية وهذه السنة أريد أن أستريح.

শাইখ আব্দুল্লাহ্ আয্যাম রাহিমাহুল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

"……জিহাদ গোটা মুসলিম উম্মাহর উপর ফরযে আইন হয়ে আছে। আর তা কেবল এখন থেকে নয় বরং যেদিন ইসলামী আন্দালুস তথা স্পেনের পতন ঘটেছে, সেই ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ তথা আজ থেকে পাঁচ শতাব্দী ধরে ফরযে আইন হয়ে আছে। আর গোটা এই পাঁচশত বছর যাবত মুসলিম উম্মাহ সামগ্রিকভাবে গুনাহগার হয়ে আছে কারণ আন্দালুস এখনো পুনরুদ্ধার হয়নি।

আজ যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে আছে তখন তা কেবল আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিন স্বাধীন হবার মাধ্যমেই আমাদেরকে দায়িত্বমুক্ত করবে না। বরং ফরজ দায়িত্ব তখনই পুরোপুরি পালিত হবে যখন এমন প্রতিটি ভূ-খণ্ড পুনরুদ্ধার হয়ে যাবে, একদিনের জন্য হলেও যেখানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পতাকা উচ্চকিত ছিল।

অতএব আপনার উপর জিহাদ ফরয থাকবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, যেমনিভাবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষ নামাজের ফরজ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে না। অতএব মৃত্যু অবধি সকল মানুষের উপর জিহাদ ফরজে আইন। অতএব আপনি আপনার তরবারি হাতে নিন এবং জমিনের উপর বিচরণ করতে থাকুন। আল্লাহর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটবার আগ পর্যন্ত এই ফরজে আইন দায়িত্ব শেষ হবে না।

আর যেমনিভাবে কারো জন্য এ কথা বলা জায়েজ নেই যে, আমি গত বছরের সিয়াম পালন করেছি, তাই এ বছর আমি বিশ্রাম নিতে চাই অথবা আমি গত সপ্তাহের জুমার সালাত আদায় করেছি অতএব এই সপ্তাহে আমি বিশ্রাম নিতে চাই। একই ভাবে এ কথা বলাও জায়েজ হবে না যে, আমি গত বছর জিহাদ করেছি তাই এ বৎসর আমি বিশ্রাম নিতে চাই।" (نصيحة الأمة الموحدة بحقيقة الأمم المتحدة : শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ, পৃ. ১৬, ১৭)

[বি.দ্র: জিহাদ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসাইল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন: **কিতাবুত তাহরীদ্ 'আলাল ক্বিতাল: দ্বিতীয় পর্ব- তাওহীদ ও জিহাদ**: https://archive.org/details/kitabuttahrid২ ;

ইসলামের ইতিহাস নিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যবহুল আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে অধম (লেখক) কর্তৃক লিখিত "**কালজয়ী ইসলাম**" কিতাবটিতে। আমরা ইনশাআল্লাহ কিতাবটি পড়ে নিতে পারি। পিডিএফ লিংক: https://bit.ly/kaljoie-islam; টেক্সট লিংক: https://justpaste.it/3ppxx]

কী আমাদের আত্মপরিচয়? কেমন ছিলেন আমাদের পূর্ববর্তী সালাফ/আকাবীরগণ?

আত্মপরিচয় ভুলে যাওয়া এক সিংহশাবকের কাহিনী

প্রিয় ভাই! এই অধ্যায়টি আমরা আরেকটি কল্পিত গল্প দিয়ে শুরু করতে চাই। আর সেটি হল আত্মপরিচয় ভুলে যাওয়া এক সিংহশাবকের কাহিনী। চলুন, কাহিনীটি শুনা যাক.................

একদা এক বনে এক সিংহ বাস করত। সিংহটির দুটি সিংহশাবক ছিল। একবার একটি সিংহশাবক হারিয়ে গেল। সিংহশাবকটিকে এক রাখাল পেয়ে তার ভেড়ার পালের সাথে পালতে শুরু করে। সিংহশাবকটিও ভেড়ার পালের মধ্যে বড় হতে থাকে। যখন তার কিছুটা জ্ঞান বুদ্ধি হয়, তখন সে নিজেকে 'ভেড়ার বাচ্চা' ভাবা শুরু করে। শুধু তাই নয়, সে নিজেকে অন্যান্য ভেড়া থেকে আলাদা আবিষ্কার করে এবং ভাবতে থাকে- সে বোধ হয় অন্যান্য ভেড়া থেকে দুর্বল এবং বিকৃত চেহারার অধিকারী; এমনকি সে অনেক চেষ্টা করেও ভেড়ার মতো ডাকতে পারে না। অন্যান্য ভেড়ার মতো সে ঘাসও খেতে পারে না। ফলে সে কম খেয়ে খেয়ে দুর্বল হতে থাকে। এরকম নানাবিধ কারণে সে নিজেকে অসহায় মনে করে এবং অন্যান্য ভেড়ার বাচ্চারা তাকে গুতো দিলেও সে কিছু বলেনা বা প্রতিবাদ করার সাহস পায়না। সে সবসময় চুপচাপ থাকে এবং নিজের নিয়তি ভেবে সব কিছু মাথা পেতে নেয়।

একদিন ঐ রাখাল তার ভেড়ার পাল এবং ঐ সিংহ শাবককে নিয়ে বনে চড়াতে নিয়ে যায়। এদিকে হারিয়ে যাওয়া ঐ সিংহশাবকের মা তার আরেক সিংহশাবককে নিয়ে ঐ বনের এক পাশ হতে একজন মানুষ এবং তার সাথে একটি পশুর পাল আসতে দেখে। হঠাৎ করে সিংহমাতার দৃষ্টি তার হারিয়ে যাওয়া শাবকের উপর পড়ে। দৃষ্টি পড়া মাত্রই সে এবং আরেক শাবক ঐ পালের উপর হামলা করে বসে। আর উদ্ধার করে ভেড়ার পালের মধ্যে আটকে পড়া সেই সিংহশাবককে। রাখাল তার ভেড়ার পাল নিয়ে দ্রুত বন ত্যাগ করে।

এদিকে উদ্ধার হওয়া সিংহশাবক মৃত্যুর ভয়ে কাঁপতে থাকে। সে বলতে থাকে, "আমাকে মেরো না! আমাকে খেয়ো না! আমি একজন প্রতিবন্দী, দুর্বল ও অসহায় ভেড়ার বাচ্চা। আমাকে ক্ষমা কর তোমরা। প্লিজ আমাকে মেরো না!" সিংহমাতা বুঝতে পারলো ব্যাপারটা কী; সে বুঝতে পারল তার শাবকটি মানসিকভাবে প্রতিবন্দী হয়ে গিয়েছে। তাই সে তাকে বুঝাতে লাগল, "আরে বেটা! তুমি তো ভেড়ার বাচ্চা নও। তুমি একজন সিংহের বাচ্চা। এই যে আমি তোমার মা আর এ তোমার আরেক ভাই। তুমি ছোট সময় হারিয়ে গিয়েছিলে। আহ! তোমাকে কতই না খুঁজেছি! খোদার শোকর যে তোমাকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছি।"

তার আরেক ভাইটি বলল, "দেখ ভাই! তুমি কেন নিজেকে ভেড়া ভাবছ? দেখ দেখ, আমি যেমন দেখতে তুমিও তেমনি। আমার যেমন কেশর আছে, তোমারও আছে। আমার যেমন নখ আছে, তোমারও আছে। আমার দেহের গঠন যেমন, তোমারও তেমনি। তাহলে তুমি ভেড়ার বাচ্চা কিভাবে হলে, তুমি হলে সিংহের বাচ্চা। আমি যেমন গর্জন করতে পারি তুমিও পারবে। চেষ্টা করো তুমিও পারবে।" একথা বলে সে গর্জে উঠল।

উদ্ধার হওয়া সিংহশাবকটি প্রথমে গর্জন শুনে একটু ভয় পেয়ে গেলেও সাথে সাথে সেও চেষ্টা করতে লাগল। দেখল যে সেও গর্জন করতে পারছে। এইবার তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, সে আসলেই সিংহশাবক, সাচ্চা সিংহের বাচ্চা। এইবার তার যত ভয় এবং হীনমন্যতা সে ভুলে গেল।

কিছুদিন পর সিংহী মা তার বাচ্চাদের নিয়ে সেই ভেড়ার পালের উপর হামলা করে বসল। এইবার ভেড়াগুলো দেখতে পেল, তাদের মধ্যে বেড়ে উঠা সেই সিংহশাবকটি (যে কিনা আগে ভেড়ার পালের মধ্যে অসহায় হয়ে পড়ে থাকত) বীরদর্পে হুঙ্কার দিয়ে আক্রমণ করছে। সে বেশ কয়েকটি ভেড়ার বাচ্চাকে হত্যা করে তাদের খাবারে পরিণত করে। সিংহ মাতা তার সন্তানের বীরত্ব দেখে 'বাহ্ বাহ্' দিয়ে উঠে।

গল্পটির শিক্ষা:

প্রিয় ভাই! আমরা মুসলিম, আমরা বীরের জাতি, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে মাথা নত করিনা, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো পরোয়া করি না, আর কাউকে ভয় করিনা, বুলেট-বোমা, জেল-জুলুম কিংবা জালিমের রক্তচক্ষু আমাদেরকে সত্য মানতে ও দুনিয়ার বুকে তা প্রতিষ্ঠা করতে বাধা দিতে পারে না। এইতো আমাদের পরিচয় ছিল। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ আমাদের অবস্থা সেই হারিয়ে যাওয়া কিংবা নিজেকে 'ভেড়ার বাচ্চা' ভাবা সেই সিংহশাবকের ন্যায়। আমাদের যিন্দেগী আর আমাদের পূর্ববর্তী সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী আর অন্যান্য সালাফ ও আকাবীরগণের যিন্দেগী মিলিয়ে দেখি। আমাদের যিন্দেগী কি একই রকম? তাদের সীরাত মানেই বীরত্ব আর শৌর্য-বীর্যের উপাখ্যান। আমাদের যিন্দেগীগুলো কাপুরুষতার বিভীষিকায় ছেয়ে আছে। কাপুরুষতার অভিশাপে আমরা ব্যধিগ্রস্ত। হায়! অথচ আমরা তাদের রূহানী সন্তান যাদের নাম শুনলে কিসরা-কায়সারের সাম্রাজ্যগুলোতে কাঁপন ধরত। যাদের নাম নিয়ে ভয় দেখিয়ে বাচ্চাদেরকে কুফ্ফার জননীরা তাদের বাচ্চাদের ঘুম পাড়াত। যাদের ভয়ে কুফ্ফার সেনাপতিরা সবসময় দৌঁড়ের উপর থাকত। যাদের ভয়ে কুফ্ফাররা তাদের কাপড় নষ্ট করে ফেলত। যাদের আতঙ্কে তারা কখনো আমাদের মা-বোনদের দিকে চোখ তুলে তাকাবারও সাহস পেত না।

হায়! আজ আমরা কোটি কোটি মুসলমান বর্তমান রয়েছি। অথচ আমরা আজ বানে ভেসে আসা খড়-কুটোর মতো মূল্যহীন। প্রতিটি ভূমি থেকে আজ আমরা উৎখাত হচ্ছি। গণহত্যা আর নির্যাতনের শিকার হচ্ছি। মা-বোনদের ইজ্জত আর সম্ভ্রমের হেফাজত করতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। এগুলো কেন হচ্ছে ভাই? কারণ আমরা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছি। মৃত্যুর ভয়ে আমরা কাপুরুষতার যিন্দেগী বরণ করে নিয়েছি। আমরা আমাদের আত্মপরিচয় ভুলে গিয়েছি। সুতরাং প্রিয় ভাই! আসুন আমরা আমাদের রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম, সালাফ/আকাবীরগণ, পূর্বপুরুষ বাপ-দাদাদের বীরত্ব দেখি, নিজেদেরকে তাদের উত্তরসূরি হিসেবে নতুন করে আবিষ্কার করি এবং বীরত্বের সে খুনরাঙা পথে পা বাড়াই। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করেন। আমীন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্ভীকতা ও বীরত্ব:

- বীরত্ব ও বাহাদুরির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্থান ছিল সকলের উপরে। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। কঠিন পরিস্থিতিতে বিশিষ্ট বীর পুরুষদের যখন পদস্খলন হয়ে যেত, তখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকতেন। তিনি সে সুকঠিন সময়েও পশ্চাদপসরণ না করে সামনে অগ্রসর হতেন। তাঁর দৃঢ়চিত্ততায় এতটুকু বিচলিত ভাবও আসত না।

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লহ আনহুমা বলেছেন,

مَا رَأَيْتُ أَشْجَعَ وَلَا أَنْجَدَ وَلَا أَجْوَدَ ولا أرضى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা না কোনো বীর, সরল ও উদারপ্রাণ ব্যক্তি দেখেছি এবং না অন্যান্য চরিত্র গুণেও তাঁর চাইতে পছন্দনীয় কাউকে দেখেছি।" (নশরুত্তীব) [https://shamela.ws/book/23645/225#p3]

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

إِنَّا كُنَّا إِذَا حَمِيَ الْبَأْسُ- وَيُرْوَى اشْتَدَّ الْبَأْسُ- وَاحْمَرَّتِ الحدق، اتقينا برسول الله صلّى الله عليه وسلم فَمَا يَكُونُ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ. وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا

"যে সময় যুদ্ধের বিভীষিকা দেখা যেত এবং সুকঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো, সে সময় আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ছত্র ছায়ায় আশ্রয় নিতাম। কারণ, তখন তিনিই থাকতেন কাফেরদের সবচেয়ে নিকটবর্তী। বদর যুদ্ধে আমরা তাঁর আড়ালে আশ্রয় নিতাম। তাঁর চেয়ে বেশি দৃঢ়তার সাথে অন্য কেউ শত্রুর মোকাবিলা করতে পারতো না।" (শাফী, কাজী আয়ায, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৯) [https://shamela.ws/book/২3645/২২৫#p4]

হুনাইনের যুদ্ধের দিনও রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা অধিক দুঃসাহসী, বীর ও নির্ভীক কাউকে দেখা যায়নি। (মাদারেজুন্নবুওয়ত)
এভাবে প্রতিটি যুদ্ধে তিনি ﷺ-ই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"আমাকে অন্য লোকের উপর চার বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে: দানশীলতা, বীরত্ব, পৌরুষশক্তি ও বিপক্ষের উপর প্রাধান্য। তিনি নবুয়তের পূর্বে এবং নবী থাকা কালেও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন।" (নশরুত্তীব)

- একদিন কুরাইশ প্রধানগণ কাবা ঘরের হাতিমের ভিতরে বসে গল্প করছিলো। তারা পরস্পর বলাবলি করছিলো, 'মুহাম্মাদ ﷺ এর ব্যাপারে আমরা যতখানি ধৈর্য ধারণ করেছি, ইতিপূর্বে আর কারো জন্য তা করতে হয়নি। আমাদের সে মূর্খ নির্বোধ বলে। আমাদের পূর্বপুরুষদের সে মন্দ বলে। আমাদের ধর্মের সমালোচনা করে। আমাদের ঐক্যের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করেছে। আমরা এই সববিছু সহ্য করেছি।' এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা প্রাঙ্গণে এসে হাজরে আসওয়াদ পাথরকে চুম্বন করলেন। বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে শুরু করলেন। তাওয়াফের সময় কুরাইশদের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে তারা নবীজী ﷺ-কে কটুকথা বলে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগলো।

নবীজী ﷺ-এর পবিত্র চেহারায় তাদের বিদ্রুপের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেলো। তিনি কাউকে কিছু না বলে তাওয়াফ করতে লাগলেন। দ্বিতীয়বার তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রমকালে তারা আবারো বিদ্রুপ করলো। এবারো নবীজী

ﷺ চুপচাপ সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। তৃতীয়বারও তারা নবীজী -ﷺকে কটু কথা বললে তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন,

أتسمعون يا معشر القريش، أما والذى نفس محمد بيدة لقد جئتكم بذبح

"হে কুরাইশের দল, তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? ঐ সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে আমি মুহাম্মাদের জীবন! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে জবাই করতে এসেছি।"

নবীজী ﷺ-এর মুখে এমন কঠোর কথা শুনে কাফেররা ভয় পেয়ে গেলো। তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, হে আবুল কাসেম, আপনি চলে যান। আল্লাহর কসম! আপনি তো অন্যদের মতো নির্বোধ লোক নন।

নবীজী ﷺ সেখান থেকে চলে গেলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা: ৩২০)

- একরাতে অজানা একটি আওয়াযে মদীনা বাসীদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। সবাই আওয়ায অনুসরণ করে ছুটতে লাগল। পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে দেখা হল। সকলেই বুঝলেন, তিনিই ﷺ সবার আগে সে আওয়াযের উৎস জানতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। নবীজী ﷺ কোলাহল লক্ষ্য করে অগ্রসর হলেন। সে সময় তিনি হযরত আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি ঘোড়ার খালি পিঠে সওয়ার হয়ে ছিলেন। তাঁর ﷺ গলায় তরবারি ঝুলানো ছিল। তিনি ﷺ লোকদের বলছিলেন, ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না। (সহীহ মুসলিম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.২৫২)

- একদিন প্রচণ্ড রোদ থেকে ফিরে তিনি একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। ক্লান্তির দরুন তিনি নিদ্রায় ঢলে পড়লেন। তাঁর তলোয়ার ঝুলিয়ে রেখেছিলেন গাছের ডালে। এক লোক এসে তরবারিটি হাতে নিয়ে কোষমুক্ত করে চিৎকার করে বলল, কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? নবীজী ﷺ শান্ত কণ্ঠে বললেন, আল্লাহ! লোকটির হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ল। তিনি ﷺ তরবারি হাতে নিয়ে বললেন, এবার তোমাকে কে আমার হাত হতে রক্ষা করবে? লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! তুমি তরবারির সদ্ব্যবহার করো। তিনি ﷺ লোকটিকে ছেড়ে দিলেন।

- উহুদ যুদ্ধের পরের ঘটনা। আবু সুফিয়ান (তখনও তিনি মুসলমান হননি) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বদরের প্রান্তরে দ্বিতীয়বার যুদ্ধের আহ্বান করেন। নবীজী ﷺ তার এই আহ্বানকে সানন্দে গ্রহণ করেন। এদিকে আবু সুফিয়ান কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে বলেন, তিনি সৈন্য পাঠানোর আগে মুসলমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতে চান। তিনি এ লক্ষ্যে ইহুদীদের হাত করেন এবং দ্বিগুণ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে তাদেরকে মদীনায় পাঠান। তাদের দায়িত্ব ছিল, মদীনায় গিয়ে এই গুজব ছড়ানো যে, কুরাইশরা বিশাল এক বাহিনী নিয়ে বদরে আসছে, যা ইতোপূর্বে মুসলমানরা দেখেনি। মদীনার মুসলমানরা এই গুজবকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। ফলে তাদের চেহারায় এক মারাত্মক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। শেষ পর্যন্ত এই গুজব এবং তাতে সাহাবায়ে কেরামের ভীতির কথা নবীজী ﷺ-এর পবিত্র দরবারে পৌঁছলে, তিনি সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন-

والذي نفسي بيده، لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد

(হে সাহাবীরা! তোমরা যদি মূর্তি-পূজারী মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে ভয় পেয়ে থাক, তাহলে শুনে নাও!) যে সত্তার হাতে আমি মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর নামে শপথ করে বলছি, কেউ না গেলেও আমি একাই তাদের মোকাবেলার জন্য বদরে যাবো।"

নবীজী ﷺ-এর এক কথাতেই সাহাবায়ে কেরামের মাঝে গোজবের প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়। পরের দিনই মুসলমানরা বদরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। ঐদিকে আবু সুফিয়ানও প্রথমে তার বাহিনী নিয়ে বের হয়েছিলেন, কিন্তু অজানা ভীতির কারণে, মাঝপথ থেকে তিনি তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ না করেই মক্কায় পালিয়ে যান। (আল মাগাযি লিল ওয়াকিদি, ৩৮৭/১)

- হুনায়ন যুদ্ধের সময় কাফেররা অবিশ্রান্ত তীর বর্ষণ করে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একপ্রকার অস্থিরতা ও চিত্ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে দিয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের অবস্থান একটুও পরিবর্তন করেননি। তিনি একটি ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলেন এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। কাফেররা সরাসরি তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং এক মুঠো মাটি হাতে নিয়ে শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করেন। তখন শত্রুপক্ষের এমন কেউ ছিল না, যার চোখে সে ধূলিকণা প্রবেশ করেনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন:

أنا النبي لا كذب– أنا ابن عبد المطلب

"আমি নবী; এতে সন্দেহ নেই। আমি বীর আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান।"

সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা অধিক দুঃসাহসী, বীর ও নির্ভীক কাউকে দেখা যায়নি। (মাদারেজুন নবুওয়ত)

- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ ফরমান,

والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل

"সে সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জান! অবশ্যই আমি আশা করি: আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাব এবং এতে শহীদ হয়ে যাব, এরপর আবার জিহাদে যাব এবং আবার শহীদ হবো, এরপর আবার জিহাদে যাব এবং আবার শহীদ হয়ে যাবো।" (বুখারী-৩১২৩ এবং মুসলিম-১৮৭৬)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: وَلَوَدِدْتُ أَنِّيْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيِيْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ - البخاري، المشارع الأشواق ٦٦٥- ١٠٨٨

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুলাহ ﷺ ইরশাদ করেন- আমি পছন্দ করি যে, আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করে শহীদ হব। অতঃপর পুনরায় জীবিত করা হবে, আবার শহীদ হবো, আবার জীবিত করা হবে, আবার শহীদ হব, আবার জীবিত করা হবে আবার শহীদ হব। (সহীহ বুখারী, মাশারিউল আশওয়াক্ব)

সাহাবায়ে কেরামের নির্ভীকতা ও বীরত্ব:

ৠ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্ভীকতা ও বীরত্ব:

• হযরত আলী রাদিয়াল্লহু আনহু বলেন, সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বীর ছিলেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। বদর যুদ্ধের দিন যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য একটি ছাপড়া তৈরি করলাম তখন আমরা বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কে থাকবে? যাতে কোনো মুশরিক তাঁর দিকে আসতে না পারে? আল্লাহর কসম, তখন কেউই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে থাকার সাহস করে নাই, একমাত্র হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুই ছিলেন, যিনি খোলা তরবারি হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার নিকট দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন কোনো দুশমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করত, তিনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ইনিই হলেন লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় বীর ও বাহাদুর ব্যক্তি। (মাজমা)

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জিহাদী জযবা:

• রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর প্রথম খলীফা নিযুক্ত হলেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। আশেপাশের মুনাফিকরা একত্রিত হতে লাগল। চারদিকে ইসলাম ত্যাগের হিড়িক পড়ে গেল। অবাধ্য, বিদ্রোহীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ফেতনা, ফাসাদ, দাঙ্গা, হাঙ্গামা দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ল। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু সকল আনসার ও মুহাজির সাহাবীদেরকে একত্রিত করলেন। তাদের সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি বললেন, "আরবের লোকেরা যাকাত স্বরূপ তাদের উট এবং বকরী দিতে অস্বীকার করেছে এবং তারা বলছে যে, ঐ ব্যক্তি (নবীজী ﷺ), যার কারণে তোমাদেরকে সাহায্য করা হতো, সে মৃত্যু বরণ করেছে। এখন তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, আমিও তো তোমাদের মতো একজন মানুষ।" হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমার মতামত হলো, তাদের থেকে নামায কবুল করা হোক এবং তাদের থেকে যাকাত মাফ করে দেয়া হোক। কেননা, তারা তো অজ্ঞতা যুগের কাছাকাছি। (অর্থাৎ নও মুসলিম।)" হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত লোকদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে, সকলেই হযরত উমরের কথায় সন্তুষ্ট। তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ স্থান হতে দাঁড়ালেন এবং মিম্বরে আরোহন করলেন। প্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলেন। অতঃপর তিনি সিংহের মতো গর্জে উঠলেন, নিজের ঈমানী চেতনা প্রকাশ করলেন এবং বললেন,

"হে লোক সকল! আমি সেই সময় পর্যন্ত আল্লাহ তা' আলার একটি আদেশের জন্য জিহাদ করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন এবং আমাদের মধ্য থেকে জিহাদকারী জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যাবে এবং জান্নাতের হকদার হয়ে যাবে। আমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা খলিফা হয়ে জমিনের মালিক হয়ে যাবে। আল্লাহর শপথ! এ লোকেরা (যাকাত অস্বীকারকারীরা) যদি একটি রশিও যা নবীজী ﷺ-এর যামানায় তারা দিত, আমাকে দিতে অস্বীকার করে, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো। যদিও তাদের পক্ষে বৃক্ষ, পাথর এবং সমগ্র জীন ও ইনসান লড়াই করে। আর এ যুদ্ধে আমার ডান হস্ত আমার সঙ্গ না দিলে বাম হস্ত দিয়েই (অর্থাৎ কেউ আমার সাথে না থাকলেও) আমি (একাই) তাদের (মুর্তাদদের) বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাবো।"

এ কথা শুনে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জোরে তাকবীর দিয়ে উঠলেন, "আল্লাহু আকবার", "আল্লাহু আকবার"। অতঃপর বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি বুঝতে পেরেছি, একথা সত্য।" (হায়াতুস্ সাহাবাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৩-৭১)

꧁ হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্ভীকতা ও বীরত্ব:

- ইসলাম গ্রহণের পর হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজী ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমি যে সকল মজলিসে কুফুরির অবস্থায় বসতাম, সে সকল মজলিসে আমার ঈমানকে অবশ্যই প্রকাশ করবো। তারপর তিনি দারুল আরকাম থেকে বেরিয়ে বাইতুল্লাহ আসলেন এবং তাওয়াফ করলেন। তাওয়াফ শেষে কুরাইশদের মজলিসে গেলেন। কুরাইশরা তার অপেক্ষাতেই ছিল। সেখানে তিনি সবার সামনে উচ্চস্বরে বললেন,

'اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَه' وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه' وَرَسُوْلُه

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

কুরাইশরা এই কালেমা শুনামাত্রই তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়লো। তিনি একাই সবার সাথে লড়াই করলেন এবং উতবাকে মাটিতে ফেলে তার বুকের উপর চড়ে বসলেন। তারপর তাকে বেদম মারতে লাগলেন। তার চোখে এত জোরে আঘাত করলেন যে উতবা চিৎকার করা শুরু করলো। উতবাকে সেখানে ফেলে রেখে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠে দাঁড়ালেন এবং সেখান থেকে কুরাইশদের অন্য এক মজলিশে গেলেন। সেখানেও নিজের ঈমানকে প্রকাশ করে সেখানকার সর্দারকে পিটালেন। এভাবে কুরাইশদের প্রত্যেক মজলিশে গিয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সর্দারদেরকে পিটিয়ে আসলেন এবং নিজের ঈমানকে প্রকাশ করে আসলেন। তারপর তিনি নবীজী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, "আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনার আর কোনো ভয় নেই।" তখন নবীজী ﷺ ঘর হতে বের হলেন। হযরত উমর ও হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁর সম্মুখে চললেন, মুসলমানরাও পিছে পিছে চললেন। তারা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং নিশ্চিন্ত মনে সেখানে নামায আদায় করলেন।
তারপর সকলে যার যার ঘরে ফিরে গেলেন।

- হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মদীনায় হিজরতের সময় সকল সাহাবীই গোপনে হিজরত করেছেন। একমাত্র হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুই এমন ব্যক্তি যিনি প্রকাশ্যে হিজরত করেন। তিনি যখন হিজরত করার ইচ্ছা করলেন তখন নিজের তলোয়ার গলায় বাঁধলেন এবং ধনুক কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন এবং তীরদান হতে কয়েকটি তীর হাতে নিয়ে বাইতুল্লাহর নিকট আসলেন। কুরাইশদের কয়েকজন সর্দার সেখানে বসেছিল। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইতুল্লাহর সাত চক্কর তাওয়াফ করে মাকামে ইবরাহীমের নিকট এসে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। এরপর মুশরিকদের একেকটি মজলিশের নিকট গিয়ে বললেন, এই সমস্ত চেহারা অপদস্ত হোক! (আমি হিজরত করার জন্য বের হয়েছি।) যে ব্যক্তি চায়, তার মা পুত্র-হারা হোক, তার সন্তানরা এতীম হোক আর তার স্ত্রী বিধবা হোক, সে যেন এই ময়দানের অপর পাশে এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে।

(অতঃপর তিনি সেখান হতে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন) কুফ্ফারদের একজনও তার পিছু নিতে সাহস পায়নি। (মুন্তাখাবুল কানয)

ꙮ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্ভীকতা ও বীরত্ব:

- হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট এসে এ কবিতা আবৃত্তি করেন,

اَفَاطِمُ هَاكِ السَّيْفَ غَيْرَ ذَمِيْمٍ - فَلَسْتُ بِرِعْدِيْدٍ وَلَا بِلَئِيْمٍ

"হে ফাতিমা, দোষত্রুটিমুক্ত এই তরবারি নাও। (অর্থাৎ ইসলামের শত্রুনিধনে এই তলোয়ার কোনরূপ ত্রুটি করেনি।); আর না আমি ভয়ে প্রকম্পিত, আর না আমি হীন, না অহংকারী।" (হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫৬)

- খন্দকের যুদ্ধের দিন আমর ইবনে আব্দে উদ্দ যুদ্ধের জন্য পরিখা অতিক্রম করে মুসলমানরা যে পাশে ছিল সে পাশে চলে আসল এবং 'মোকাবেলার জন্য কে প্রস্তুত আছে?' বলে বলে চিৎকার করতে লাগল। সে ছিল বিশাল বপুধারী, দৈত্য সমতুল্য। ফলে আরবরা তাকে মানুষ নয়, অসুর শক্তির অধিকারী বলে মনে করত। এ কথা সবাইকে বলতে শুনা যায় যে, আমর শক্তিশালী ঘোড়াকে পর্যন্ত অতি সহজভাবে কাঁধে তুলতে পারে এবং পাঁচশ অশ্বারোহীকে সে একাই পরাজিত করতে পারে।

মুসলমানরা জানত, তার মোকাবেলা করা মানে 'আত্মহত্যার' শামিল। ফলে কেউ সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহস পাচ্ছিল না। ইতোমধ্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন, বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি প্রস্তুত আছি।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই ব্যক্তি আমর, বসে যাও।

এদিকে আমর হুঙ্কার দিয়েই যাচ্ছিল, মুসলমানদেরকে তিরস্কার করে বলতে লাগল, কোথায় তোমাদের সেই জান্নাত যার ব্যাপারে তোমাদের ধারণা যে, তোমাদের যে কেউ কতল হয় সে তাতে প্রবেশ করে? তোমরা আমার মোকাবেলায় কি কাউকে পাঠাতে পারো না?

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনবার অনুমতি চাইলেন, নবীজী ﷺ তিনবারই বললেন, সে আমর, বসে যাও। এবার আলী রাদিয়াল্লাহু বললেন, হোক না সে আমর (আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট)! অবশেষে রাসূল ﷺ তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে স্বীয় পাগড়ি মাথা হতে খোলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথায় স্বহস্তে বেঁধে দেন। নিজের তরবারিটিও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে তুলে দেন। এসময় রাসূল ﷺ এর যবান মুবারক থেকে বের হয়ে যায়- "আলীর সাহায্যকারী একমাত্র তুমিই হে আল্লাহ।"

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এগিয়ে গেলেন। এসময় তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করছিলেন-

لاَ تَعْجَلَنَّ فَقَدْ اَتَاكَ - مُجِيْبُ صَوْتِكَ غَيْرَ عَاجِزْ

তাড়াহুড়া করো না, তোমার ডাকে সাড়া দেওয়ার লোক চলে এসেছে, যে অক্ষম নয়।

فِيْ نِيَّةٍ وَبَصِيْرَةٍ - وَالصِّدْقِ مَنْجٰى كُلِّ فَائِزْ

সে বুঝেশুনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়েই এসেছে, সত্যই প্রত্যেক সফলকাম ব্যক্তির জন্য নাজাতের উপায়।

إِنِّيْ لَأَرْجُوْ اَنْ أُقِيْمَ - عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْجَنَائِزْ

আমি পরিপূর্ণ আশা রাখি যে, মৃতদের জন্য বিলাপকারিনী মহিলাদেরকে তোমার উপর খাড়া করে দিব।

مِنْ ضَرْبَةٍ نَجْلَاءَ- يبقى ذكرُها عِنْدَ الْهَزَاهِزْ

আমি তোমার উপর তলোয়ারের এমন লম্বা চওড়া আঘাত করব যার আলোচনা বড় বড় যুদ্ধের সময় হতে থাকবে।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আমরকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, সে প্রত্যাখ্যান করলো। আমর বলল, "হে আমার ভাতিজা, আমাকে মোকাবেলার জন্য তুমি কেন এসেছো? আল্লাহর কসম, আমি তো তোমাকে কতল করতে পছন্দ করি না।" হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে কতল করতে ভালোবাসি। একথা শুনে আমর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে অগ্রসর হলো। উভয়ে আপন আপন সওয়ারী হতে নেমে পড়ল এবং একে অপরকে আক্রমণ করার জন্য যুদ্ধের ময়দানে চক্কর দিতে লাগল। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু চামড়ার ঢাল নিয়ে আমরের সামনে আসেন। আমর সেই ঢালের উপর তলোয়ারের এমন আঘাত হানল যে, ঢাল কেটে তরবারি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা পর্যন্ত পৌঁছল এবং মাথায় আঘাত লাগল। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আমরের কাঁধের উপর তরবারির এমন শক্তিশালী আঘাত করলেন যে সে একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং এর ফলে ধুলা উড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি শুনে বুঝতে পারলেন যে, আমর নিহত হয়েছে। এভাবে অবশেষে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে এই দৈত্যের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন। (হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫৭-২৫৮)

- খায়বারের যুদ্ধের দিন ইহুদী পালোয়ান মুরাহহাব স্বগর্বে আপন তরবারি নাড়িয়ে নাড়িয়ে বাহির হয়ে এলো এবং এই কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল-

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ اَنِّيْ م مرَحَّبُ

شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبْ

إِذَا الْحُرُوْبُ اَقْبَلَتْ تَلَهَّبْ

"সমস্ত খায়বার বাসী ভালো করে জানে,
আমি মুরাহহাব, অস্ত্রসজ্জিত, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাহাদুর,
(আমার বাহাদুরী তখন দেখা যায়)
যুদ্ধের অগ্নিশিখা যখন প্রজ্জ্বলিত হয়।"

তাকে মোকাবেলা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম হযরত আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর নবীজী ﷺ বললেন, আজ আমি এমন এক ব্যক্তিকে ঝাণ্ডাদান করব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে মহব্বত করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে ঝাণ্ডা তুলে দিলেন। মুরাহহাব পূর্বের ন্যায় কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ময়দানে হুঙ্কার দিচ্ছিল।

তার মোকাবেলায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বাহির হয়ে আসলেন

اَنَا الَّذِىْ سَمَّتْنِىْ أُمِّى حَيْدَرَه - كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْظَرَه - اُوْفِيْهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَه

"আমি সেই ব্যক্তি, যার মা তার নাম রেখেছে হায়দার (আল্লাহর সিংহ)'

আমি জঙ্গলের বিভৎসদর্শন সিংহের ন্যায়।

আমি দুশমনকে পরিপূর্ণ মাপ দিব,

যেমন প্রশস্ত দাড়িপাল্লায় পূর্ণরূপে মেপে দেয়া হয়।

(অর্থাৎ অতিমাত্রায় শত্রুনিধন করবো।)"

অতঃপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তরবারির এমন আঘাত হানলেন যে, মালাউন মুরাহহাবের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে তাকে হত্যা করে ফেললেন।

খায়বারের যুদ্ধের দিন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দূর্গের দরজা তুলে ধরলেন। মুসলমানরা সেই দরজার উপর আরোহন করে দূর্গের ভিতর প্রবেশ করলেন এবং দূর্গ জয় করলেন। পরবর্তীতে সেই দরজা উত্তোলন করতে চল্লিশ জন (আরেক বর্ণনায় সত্তর জন লোক) প্রয়োজন হয়েছিল। (হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫৯-২৬৪)

ঌ হযরত যুবাইর বিন আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্ভীকতা ও বীরত্ব:

- ইসলামের ইতিহাসে হযরত যুবাইর মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর তরবারীই সর্বপ্রথম তরবারী যা আল্লাহর খাতিরে ক্রোধান্বিত হয়ে উত্তোলিত হয়েছিল।

তখন তাঁর বয়স মাত্র বার বছর। একদিন দুপুরবেলা তিনি কাইলুলাহ অর্থাৎ বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন, মক্কার কেউ নবীজী ﷺ-কে শহীদ করে দিয়েছে। এই আওয়াজ শুনামাত্রই তিনি খোলা তরবারি হাতে বের হয়ে গেলেন। পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সামনা সামনি দেখা হয়ে গেল। নবীজী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, হে যুবায়ের, তোমার কী হয়েছে? তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমি শুনতে পেয়েছি, আপনাকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। নবীজী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী ইচ্ছা করেছিলে? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমার ইচ্ছা ছিল যে, সমস্ত মক্কাবাসীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। তখন নবীজী ﷺ তার জন্য ও তাঁর তরবারির জন্য দোয়া করলেন। (মুন্তাখাবে কানয, হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬৮)

- ওহুদের যুদ্ধের দিন মুশরিকদের ঝাণ্ডাবহনকারী তালহা বিন আবি তালহা আবদারী মুসলমানদেরকে তার মোকাবেলা করার জন্য আহ্বান জানাল। প্রথমতঃ মুসলমানরা তার সাথে মোকাবেলা করতে ঘাবড়িয়ে গেলেন। এদিকে হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মোকাবেলার জন্য বের হলেন এবং এক লাফে তালহার উটের উপর উঠে তার সাথে যেয়ে বসলেন। উটের উপরই লড়াই আরম্ভ হলো। হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তালহাকে উটের পিঠ হতে মাটিতে ফেলে দিয়ে আপন তরবারি দ্বারা জবাই করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রশংসা করলেন এবং বললেন, প্রত্যেক নবীর জন্য (জীবন উৎসর্গকারী) হাওয়ারী (সাহায্যকারী) থাকে। আর আমার হাওয়ারী হলো যুবাইর। তিনি আরো বলেন, যেহেতু আমি দেখেছি, লোকেরা তালহা আবদারীর মোকাবেলায় পিছু হটছে, সেহেতু যদি যুবাইর তার মোকাবেলার জন্য না যেত তবে আমিই স্বয়ং যেতাম। (বিদায়াহ, হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬৮)

- ইবনে ইসহাক রহ. বর্ণনা করেন যে, নওফল ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুগীরাহ মাখযূমী খন্দকের যুদ্ধের দিন শত্রুদের কাতার হতে বের হয়ে মুসলমানদেরকে তার মোকাবিলার জন্য আহ্বান জানাল। তার মোকাবিলার জন্য হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু বের হয়ে আসলেন। এরপর তিনি তরবারি দ্বারা এমন আঘাত করলেন যে, তাকে দুই টুকরা করে দিলেন। উল্লেখ্য, এই আঘাতের দরুন তার তরবারির ধার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। (হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬৯)

- ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, আপনি যদি কাফেরদের উপর হামলা করতেন, তাহলে আমরাও আপনার সাথে কাফেরদের উপর হামলা করতাম। হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি যদি হামলা করি তবে তোমরা তোমাদের কথা রক্ষা করতে পারবে না। তাঁরা বললেন, আমরা এমনটি করবো না। (বরং আমরা আপনার সাথেই থাকব।) তারপর হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাফেরদের উপর এমন জোরদার হামলা করলেন যে, তাদের কাতার ভেদ করে অপরদিকে বের হয়ে গেলেন
অথচ সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে কেউই তার সঙ্গে ছিলেন না। তিনি পুনরায় শত্রুর কাতার ভেদ করে ফিরে আসার সময় কাফেররা তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে তাঁর কাঁধের উপর তরবারীর দুটি আঘাত করলেন, যা তাঁর বদরযুদ্ধে লাগা আঘাতের ডানে বামে দুই দিকে লাগল।

হযরত ওরওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ছোটসময়ে সেই সমস্ত জখমের গর্তগুলোতে আঙ্গুল ঢুকিয়ে খেলা করতাম।

আলবিদায়ার রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবা (রাঃ) দ্বিতীয়বার হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পূর্বের ন্যায় অনুরোধ জানালে তিনি প্রথমবারের মত আবার একইভাবে আক্রমণ করে দেখালেন।
(হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭০-২৭২)

֍ হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বীরত্ব:

ইমাম যুহরী রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হেজাযের রাবেগ এলাকার দিকে এক জামাত প্রেরণ করেন। উক্ত জামাতে হযরত হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ তীরন্দাজ। মুশরিকরা মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেদিন হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু আপন তীর দ্বারা মুসলমানদের হেফাযত করেছিলেন। আল্লাহর রাস্তায় তিনিই সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। আর এই যুদ্ধই ইসলামের সর্বপ্রথম যুদ্ধ ছিল। (হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭২)

ওহুদ যুদ্ধে একই তীরে তিন কাফেরকে হত্যা করা:

এটি এভাবে হয়েছিল যে, দুশমনরা তার প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করলে তিনি সেই তীর কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন এবং একজনকে হত্যা করলেন। কাফেররা সেই তীর পুনরায় তার প্রতি নিক্ষেপ করলে তিনি আবার তীরটিকে কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করে দ্বিতীয় আরেকজন কাফেরকে হত্যা করেন। কাফেররা পুনরায় সেই তীর তাঁর প্রতি তৃতীয়বারের মত নিক্ষেপ করলে তিনিও পুনরায় সেই তীর কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করে তৃতীয় আরেক

কাফেরকে হত্যা করলেন। হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই কৃতিত্বে মুসলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এই তীর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে উঠিয়ে দিয়েছেন। সেইদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّيْ

'আমার পিতা-মাতা তোমার উপর কোরবান হইক।'

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বদর যুদ্ধের দিন হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে কখনও সওয়ার হয়ে আবার কখনও পদাতিকভাবে যুদ্ধ করেছেন। অথবা অর্থ এই যে, তিনি তো পদাতিকই ছিলেন, কিন্তু আরোহী যোদ্ধার ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে যুদ্ধ করেছেন। (হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭২-২৭৩)

❁ হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বীরত্ব:

বদর যুদ্ধের দিন হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু উটপাখির পালক দ্বারা নিশান লাগিয়ে নিয়েছিলেন।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উমাইয়া ইবনে খালাফ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, বদরের দিন বুকের উপর উটপাখির পালক দ্বারা নিশান লাগানো ব্যক্তিটি কে ছিল? আমি বললাম, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চাচা হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। তিনিই তো আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু করেছেন। (বাযযার, হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৩)

❁ হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বীরত্ব:

তায়েফের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হানযালা ইবনে রাবী' রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তায়েফবাসীদের নিকট পাঠালেন। তিনি তায়েফবাসীদের সাথে আলাপ আলোচনা করলেন। তারা হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ধরে দূর্গের ভিতর নিয়ে যেতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কে আছে যে হানযালাকে এদের নিকট থেকে উদ্ধার করে আনতে পারে? যে তাকে উদ্ধার করে আনতে পারবে সে আমাদের এই যুদ্ধের সওয়াবের ন্যায় পূর্ণ সওয়াব লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই এরশাদ শুনে একমাত্র হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠলেন। তায়েফের লোকেরা হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে দূর্গের ভিতরে প্রবেশ করার উপক্রম হল। হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের নিকট পৌঁছে গেলেন। হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। তিনি হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিজের কোলে উঠিয়ে নিলেন। তায়েফের লোকেরা হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপর দূর্গের উপর হতে পাথর বর্ষণ করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জন্য দোয়া করতে লাগলেন। অবশেষে হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট পৌঁছে গেলেন। (কানয, হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৯)

ঞ্জ হযরত মুআয ইবনে আমর ও মুআয ইবনে আফরা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নির্ভীকতা ও বীরত্ব: আবু জেহেলের হত্যাকাণ্ড

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি যুদ্ধের কাতারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় আমি দেখলাম, আমার ডানে ও বামে অল্পবয়স্ক দুইজন আনসারী বালক দাঁড়িয়ে আছে। আমার মনে খেয়াল আসল, যদি আমার পাশে দুইজন শক্তিশালী পুরুষ থাকতো (তবে কতই না ভালো হতো)! হঠাৎ তাদের একজন আমার হাত ধরে চুপিসারে বললো, চাচাজান, আপনি কি আবু জেহেলকে চিনেন?

আমি বললাম, হ্যা, চিনি। তাকে দিয়ে তোমার কী প্রয়োজন?

সে বলল, আমি শুনেছি, সে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে গালাগালি করে। সেই পাক যাতের কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি তাকে দেখতে পাই, তবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট থেকে আমি পৃথক হবো না, যতক্ষণ না আমাদের উভয়ের মাঝে একজনের মৃত্যু হয়।

আমি তার মুখে বীরত্ব ব্যঞ্জক এমন কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলাম।

এমন সময় দ্বিতীয়জনও আমার হাত ধরে চুপিসারে একই প্রশ্ন করলো এবং প্রথমজন যা বলেছিল, দ্বিতীয়জনও তা-ই বলল। ইতিমধ্যে আবু জেহেলকে দেখলাম ময়দানে লোকদের মধ্যে ছুটে বেড়াচ্ছে। আমি তাদের উভয়কে বললাম, ঐ যে তোমাদের শিকার, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে। একথা শুনামাত্র উভয় আনসার বালক ক্ষুধার্ত বাজপাখির মতো আবু জেহেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তার উপর তরবারি চালাতে লাগলেন। অবশেষে তাকে কতল করে ফেললেন। এরপর তাঁরা উভয়ে নবীজী ﷺ-এর নিকট আসলেন এবং তাঁকে সংবাদ দিলেন।

নবী করীম ﷺ বললেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে কে আবু জেহেলকে হত্যা করেছ? প্রত্যেকেই বললেন, আমি তাকে হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি তোমাদের নিজ নিজ তরবারি মুছে ফেলেছ? তারা বললেন, না। অতঃপর তিনি তাদের উভয়ের তরবারি দেখে বললেন, তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছো। এরপর তিনি আবু জেহেলের সামানপত্র হযরত মুআয ইবনে আমর ইবনে জামূহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রদান করলেন। অপরজন হযরত মুআয ইবনে আফরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন।

মুআয ইবনে আমর ইবনে জামূহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আবু জেহেল কাফেরদের তীর-তলোয়ারের দুর্ভেদ্য পাহারার মাঝে অবস্থান করছিল। কাফেররা বলছিল, আবু জেহেলের কাছে কেউ যেন ঘেষতে না পারে। একথা শুনে আমি তার কাছাকাছি অবস্থান করতে লাগলাম এবং তাকেই আমার একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে নিলাম এবং আবু জেহেলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলাম।

যখন সে আমার আয়ত্তের ভিতর আসল, তখন তার উপর আক্রমণ করলাম এবং এমনভাবে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করলাম যে, তার পায়ের অর্ধেক হাঁটুর নিচ দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ঝরে পড়া খেজুরের ন্যায় তার পা উড়ে গেল। এদিকে আবু জেহেলকে আমি আঘাত করলাম আর অন্যদিকে তার পুত্র ইকরামা আমার হাতে আঘাত করলো। এতে যুদ্ধ করতে আমার অসুবিধা হচ্ছিল। আমি তখন হাতের কাটা অংশ পায়ের নীচে রেখে এক ঝটকায় হাত থেকে আলাদা করে ফেললাম। এরপর আবু জেহেলের নিকট মুআয ইবনে আফরা উপনীত হলেন। তিনি ছিলেন আহত।

তিনি আবু জেহেলের উপর এমন আঘাত করলেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন সেখানেই ঢলে পড়লো। আবু জেহেলের শেষ নিঃশ্বাস তখনো বের হয়নি। শ্বাস-প্রশ্বাস তখনও চলছিল।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নবীজী ﷺ বললেন, আবু জেহেলের পরিণাম কে দেখবে, দেখে আস। সাহাবারা তখন আবু জেহেলের সন্ধান করতে লাগলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু জেহেলকে এমতাবস্থায় পেলেন যে, তার নিঃশ্বাস তখনও চলাচল করছিল। তিনি আবু জেহেলের ধড়ে পা রেখে মাথা কাটার জন্য দাঁড়ি ধরে বললেন, ওরে আল্লাহর দুশমন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তোকে অপমান অপদস্ত করলেন তো? আবু জেহেল বললো, কিভাবে আমাকে অসম্মান করলেন? তোমরা যাকে হত্যা করেছ তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আর কোনো মানুষ আছে নাকি? আহ! আমাকে কিশোর ছাড়া অন্য কেউ যদি হত্যা করতো!

এরপর বলতে লাগল, আজ কারা বিজয়ী হয়েছে? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু জেহেলের কাঁধে পা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। আবু জেহেল তাকে বলল, ওরে বকরির রাখাল! তুই অনেক উঁচু স্থানে পৌঁছে গিয়েছিস। উল্লেখ্য, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় বকরি চরাতেন।

এ কথোপকথনের পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু জেহেলের মাথা কেটে নবীজী ﷺ-এর সামনে হাজির করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ হচ্ছে আল্লাহর দুশমন আবু জেহেলের মাথা। নবী করীম ﷺ বললেন, "হ্যাঁ সত্য, সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, হ্যাঁ সত্য, সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, হ্যাঁ সত্য, সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ তা'আলা সুমহান। সকল প্রশংসা তাঁরই জন্যে নিবেদিত, তিনি তাঁর ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন। নিজের বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং একাকীই সকল দলকে পরাজিত করেছেন।" (হায়াতুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৯-২৮১)

❁ হযরত আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারাশাহ্ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বীরত্ব

হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি তরবারি সাহাবায়ে কেরামের সামনে পেশ করে জিজ্ঞেস করলেন, কে এই তরবারির হক আদায় করতে পারবে? হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এর হক আদায় করব। কিন্তু এর হক কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, এর হক হচ্ছে তুমি এটি দ্বারা কোনো মুসলমানকে হত্যা করবে না আর তুমি এটি নিয়ে কোনো কাফের থেকে পলায়ন করবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই তরবারিটি হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে প্রদান করলেন। হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধ করার পূর্বে মাথায় লাল পট্টি বেঁধে নিতেন। যদিও এটি এক প্রকারের অহংকারের নিদর্শন, কিন্তু যুদ্ধের ময়দানের জন্য এতে কোনো দোষ নেই। তাঁর লাল পট্টি বাঁধা দেখে আনসারগণ বলতেন, আবু দুজানা মৃত্যুর পট্টি বেধেঁ নিয়েছে।

যাইহোক, হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি মনে মনে বললাম, আমি আজ আবু দুজানাকে দেখব, তিনি কী করেন। সুতরাং দেখলাম, তার সম্মুখে যে কাফেরই পড়ত, তাকেই তিনি লাঞ্ছিত করে ছাড়তেন এবং দ্বিখণ্ডিত করে ফেলছিলেন। (বিদায়াহ, হাকেম)

মুশরিকদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যে আমাদের আহতদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করছিল। হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও এই মুশরিক উভয়ে একে অপরের নিকটবর্তী হতে লাগল। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে দুআ করতে লাগলাম যেন তাদের উভয়ের মাঝে মোকাবিলা হয়। তারা উভয়ে মুখোমুখী হল এবং উভয়ে একে অপরের উপর তরবারি চালালো। মুশরিক হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর তরবারি দ্বারা আঘাত করলে তা হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু ঢাল দ্বারা প্রতিহত করলেন এবং নিজেকে বাঁচালেন। আর মুশরিকের তরবারি হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঢালে আটকে গেল। অতঃপর হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু তরবারির আঘাতে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন।

হযরত কা'ব ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমিও মুসলমানদের সাথে ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। যখন মুশরিকদেরকে দেখলাম, তারা মুসলমানদেরকে শহীদ করে দিয়ে তাদের নাক কান কেটে দিচ্ছে তখন দাঁড়িয়ে গেলাম। মুসলমানদের লাশের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অস্ত্রধারী এক মুশরিককে বলতে শুনলাম, সে বলছে, হে মুসলমানগণ, তোমরা (কতল হওয়ার জন্য) একত্রিত হও যেমন বকরীর দল (জবাই হওয়ার জন্য) একত্রিত হয়। হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অপরদিকে একজন অস্ত্রধারী মুসলমান সেই মুশরিকের অপেক্ষা করছিলেন। আমি অগ্রসর হয়ে সেই মুসলমানের পিছনে পৌঁছে গেলাম এবং দাঁড়িয়ে মুসলমান ও কাফের উভয়ের ব্যাপারে অনুমান করতে লাগলাম। সুতরাং আমার মনে হল, কাফেরের নিকট অস্ত্র ও যুদ্ধের প্রস্তুতি বেশি। আমি উভয়ের মুকাবিলার অপক্ষোয় রইলাম। অবশেষে তারা উভয়ে মুখোমুখী হল এবং মুসলমান ব্যক্তিকে দেখলাম, এমন জোরে কাফেরের কাঁধের উপর তরবারি দ্বারা আঘাত করলেন যে, কাফের কোমরের নিচ পর্যন্ত চিরে দুই টুকরা হয়ে পড়ে গেল। অতঃপর সেই মুসলমান ব্যক্তি নিজ চেহারা হতে নেকাব সরিয়ে বলল, হে কা'ব, কেমন দেখলে! আমি আবু দুজানা। (হায়াতুস সাহাবাহ, খণ্ড ২, পৃ. ২৮২-২৮৭)

꧁ হযরত কাতাদাহ ইবনে নো'মান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বীরত্ব

হযরত কাতাদাহ ইবনে নো'মান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ধনুক হাদিয়া স্বরূপ পেলেন। ওহুদের যুদ্ধের দিন তিনি সেই ধনুক আমাকে প্রদান করলেন। আমি সেই ধনুক দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে দাঁড়িয়ে এত পরিমান তীর নিক্ষেপ করলাম যে, ধনুকের মাথা ভেঙ্গে গেল। আমি অনড়ভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চেহারা মুবারকের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম এবং নিজ চেহারার উপর তীরের আঘাত লইতে লাগলাম। যখনই কোনো তীর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চেহারা মুবারকের নিকট আসত তখনই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চেহারা রক্ষা করার জন্য নিজের মাথা ঘুরিয়ে তীরের সামনে তুলে ধরতাম। (আর আমার ধনুক ভেঙে যাওয়ার দরুন) আমি নিজে কোন তীর নিক্ষেপ করতে পারছিলাম না। অবশেষে একটি তীর এসে এমনভাবে লাগল যে, আমার চোখের পুতলি খুলে হাতের উপর এসে পড়ল। আমি তাকে হাতের তালুতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে হাজির হলাম। আমার হাতে চোখের পুতলি

দেখে তাঁর চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠল এবং তিনি আমার জন্য এই দুআ করলেন, হে আল্লাহ! কাতাদাহ আপন চেহারা দ্বারা আপনার নবীর চেহারা রক্ষা করেছে, অতএব তার চোখকে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সর্বাধিক তীক্ষ্ণ করে দিন। সুতরাং তাঁর সেই চোখ অপর চোখ অপেক্ষা বেশি সুন্দর ও অধিক তীক্ষ্ণ হয়ে গেল। (তাবারানী)

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চেহারা মুবারকের হেফাজত করছিলাম। আর হযরত আবু দুজানা সিমাক ইবনে খরাশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ পিঠ মুবারক দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পিঠ মুবারকের হেফাযত করছিলেন। হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিঠ সেদিন তীর দ্বারা ভরে গিয়েছিল। আর এই ঘটনা ওহুদের যুদ্ধের দিন ঘটেছিল। (হায়াতুস সাহাবাহ, খণ্ড ২, পৃ. ২৮৭-২৮৮)

֍ হযরত বারা ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বীরত্ব

ইয়ামামার যুদ্ধের দিন মুসলমানগণ ধীরে ধীরে মুশরিকদের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। অবশেষে মুশরিকদেরকে একটি বাগানের ভিতর আশ্রয় নিতে বাধ্য করলেন। উক্ত বাগানের ভিতর আল্লাহর দুশমন (ভণ্ডনবী) মুসাইলামাতুল কায্যাবও অবস্থান করছিল। এমতাবস্থায় হযরত বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে মুসলমানগণ! আমাকে দেয়ালের উপর দিয়ে উঠিয়ে দুশমনদের মাঝে ফেলে দাও। তিনি একটি ঢালের উপর বসে বললেন, তোমরা আমাকে বর্শা দ্বারা উঠিয়ে মুশরিকদের ভিতর ফেলে দাও। অতঃপর তাকে ধরে দেয়ালের উপর উঠানো হল। যখন তিনি বাগানের দেয়ালের উপর উঠলেন তখন তিনি নিজেকে বাগানের ভিতর ফেলে দিলেন এবং বাগানের ভিতর দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে মুসলমানদের জন্য বাগানের দরজা খুলে দিলেন। মুসলমানরা বাগানের ভিতর ঢুকে পড়লেন, আর আল্লাহ তা'আলা মুসাইলামাকে কতল করিয়ে দিলেন। এদিকে মুসলমানরা বাগানে প্রবেশ করে দেখেন যে, তিনি ইতিমধ্যে দশজন মুশরিককে কতল করে ফেলেছেন। (ইবনে ইসহাক, বাইহাকী)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ. বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এই মর্মে চিঠি লিখলেন যে, হযরত বারা ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে যেন মুসলমানদের কোনো জামাতের আমীর বানানো না হয়। কেননা, তিনি স্বয়ং এক ধ্বংস (নিজের জানের পরওয়া করেন না। মুসলিমদের আমীর হয়ে তাদেরকেও এমন স্থানে নিয়ে যাবেন যেখানে বিপদের আশংকা বেশি হবে।) (মুন্তাখাবে কানয) [হায়াতুস্ সাহাবাহ্, খণ্ড ২, পৃ. ২৯৮-৩০০]

֍ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বীরত্ব

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ইয়ামামার যুদ্ধের দিন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে অত্যন্ত জোরে মুসলমানদেরকে এই বলে আওয়াজ দিতে দেখেছি যে, হে মুসলমানগণ, তোমরা জান্নাত হতে পলায়ন করছ? আমি আম্মার ইবনে ইয়াসির, আমার দিকে আস। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তাকে দেখেছি যে, তার কান কেটে গিয়েছিল এবং তা নড়ছিল। এমতাবস্থায় তিনি পূর্ণ শক্তিতে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। [হায়াতুস্ সাহাবাহ্, খণ্ড ২, পৃ. ৩০৩-৩০৪]

ঔ হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব যুবাইদী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বীরত্ব

হযরত মালেক ইবনে আব্দুল্লাহ খাছআমী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ঐ ব্যক্তি হতে সম্মানী ব্যক্তি আর দেখি নাই, যিনি ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন মুসলমানদের পক্ষ হতে ময়দানে বের হয়ে আসলে একজন অত্যন্ত শক্তিশালী অনারব কাফের তার মুকাবিলার জন্য আসল। তিনি তাকে কতল করে দিলেন। তারপর কাফেররা পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে লাগল। তিনি কাফেরদেরকে পিছন দিক হতে ধাওয়া করলেন। অতঃপর তিনি পশমের তৈরি একটি বিরাট তাঁবুতে প্রবেশ করে বড় বড় (খাবারের) পেয়ালা আনালেন এবং আশেপাশের সকল মুসলমানদেরকে খাওয়ার জন্য ডাকলেন। (অর্থাৎ তিনি যেমন বীর তেমনি দানশীলও ছিলেন।) বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম তিনি কে ছিলেন? হযরত মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তিনি হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন।

হযরত কায়েস ইবনে আবি হাযেম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন। হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের কাতারের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যেতেন আর বলতেন, হে মুহাজিরবৃন্দ! তোমরা শক্তিধর সিংহের মত হয়ে যাও। (এমন প্রচণ্ড হামলা কর যেন বিপক্ষের আরোহী সৈন্য তার বর্শা ফেলে দিতে বাধ্য হয়।) কারণ আরোহী সৈন্য যখন তার বর্শা ফেলে দেয় তখন সে নিরাশ হয়ে যায়। এমন সময় একজন পারস্য সর্দার তার প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করল যা হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ধনুকের মাথায় লাগল। তিনি পাল্টা তার উপর বর্শা দ্বারা এমন আঘাত করলেন যে, তার কোমর ভেঙ্গে গেল। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সওয়ারী হতে নেমে সেই সর্দারের সামানপত্র নিয়ে নিলেন।

ইবনে আসাকির রহ. এই ঘটনাকে আরো দীর্ঘাকারে বর্ণনা করেছেন। এর শেষাংশে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, হঠাৎ একটি তীর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জিনের অগ্রভাগে এসে লাগল। তিনি তীর নিক্ষেপকারীর উপর আক্রমণ করলেন এবং তাকে এমনভাবে ধরলেন যেমন মানুষ ছোট মেয়েকে ধরে থাকে। অতঃপর (মুসলমান ও কাফের) উভয় পক্ষের কাতারের মাঝখানে শুইয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন এবং আপন সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললেন, এইভাবে কর। (অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমনদেরকে এইভাবে ধরে জবাই কর।)

ওয়াকেদী রহ. এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ঈসা খাইয়াত রহ. বলেন, কাদেসিয়ার যুদ্ধের দিন হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একাই দুশমনের উপর আক্রমন করে বসেন এবং তাদের উপর অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তরবারি চালনা করতে লাগলেন। তারপর মুসলমানরাও তার কাছে পৌঁছে গেলেন এবং দেখলেন যে, দুশমনরা হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চতুর্দিক হতে ঘিরে রেখেছে, আর তিনি একাই কাফেরদের উপর তরবারি চালাচ্ছেন। মুসলমানরা সেই কাফেরদেরকে হযরত আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট হতে সরিয়ে দিলেন।

তাবারানীর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সালাম জুমাহী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখেন যে, আমি তোমার সাহায্যের জন্য দুই হাজার লোক পাঠাচ্ছি। একজন হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অপর জন হযরত তালহা ইবনে খুয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। (অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকে এক এক হাজারের সমান।)

হযরত আবু সালেহ ইবনে ওজীহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হিজরী একুশ সনে নেহাওয়ান্দের যুদ্ধে হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হওয়ার পর প্রথমতঃ মুসলমানদের পরাজয় হল। পরে হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন জোরদার লড়াই করলেন যে, পরাজয় বিজয়ে পরিবর্তন হয়ে গেল। আর তিনিও মারাত্মকভাবে আহত হলেন। অবশেষে রুযা নামক গ্রামে তার ইন্তেকাল হল। (এসাবাহ), [হায়াতুস্ সাহাবাহ্, খণ্ড ২, পৃ. ৩০৬-৩০৭]

꧁ হযরত আবু মেহজান সাকাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বীরত্ব

হযরত আবু মেহজান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে প্রায়ই শরাব পান করার জন্য চাবুকাঘাত করা হত। যখন অত্যধিক পরিমাণে শরাব পান করতে লাগলেন তখন মুসলমানরা তাকে বেঁধে বন্দী করে রাখেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধের দিন তিনি (বন্দী অবস্থায়) কাফেরদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের দৃশ্য দেখছিলেন। তাঁর মনে হল মুশরিকরা মুসলমানদের বিরাট ক্ষতি সাধন করে যাচ্ছে। তিনি মুসলমানদের আমীর হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাঁদী অথবা স্ত্রীর নিকট এই মর্মে খবর পাঠালেন যে, আবু মেহজান বলছেন যে, তাকে বন্দীখান হতে মুক্ত করে একটি ঘোড়া ও হাতিয়ার দেয়া হোক। তিনি দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করবেন। যুদ্ধশেষে তিনি সকল মুসলমানদের পূর্বে ফিরে আসবেন, তখন তাকে আবার বন্দীখানায় বেধে রেখো। অবশ্য যদি আবু মেহজান সেখানে শহীদ হয়ে যায় তবে ভিন্ন কথা।
অতঃপর তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন-

كفى حزنا أن تلتقى الخيل بالقنا۔ وأترك مشدودا على وثاقيا

"দুঃখ ও বেদনার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, ঘোড় সওয়ার তো বর্শা দ্বারা যুদ্ধ করছে আর আমাকে বেড়ী পরিয়ে বন্দীখানায় আবদ্ধ রাখা হয়েছে।"

إذا قمت عنانى الحديد وغلقت۔ مصارع دونى قد تصم المناديا

"যখন আমি দাঁড়াই তখন লোহার শিকল আমার পা আটকিয়ে রাখে, আর আমার শহীদ হওয়ার সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং আমার পক্ষ হতে আহ্বানকারীকে বধির করে দেয়া হয়েছে।"

বাঁদী যেয়ে হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রীকে বিষয়টি জানাল। হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী তার শিকল খুলে দিলেন এবং তাকে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রও দিলেন। হযরত আবু মেহজান রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোড়া ছুটিয়ে বের হলেন এবং মুসলমানদের সাথে মিলিত হলেন। তিনি যে কোনো দুশমনের উপর আক্রমণ করতেন তাকে কতল করে দিতেন এবং তার কোমর ভেঙ্গে ফেলতেন। তিনি উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বলে হামলা করছিলেন। তিনি যেদিকেই হামলা করতেন, আল্লাহ তা'আলা সেদিকের মুশরিকদেরকে পরাজিত করে দিচ্ছিলেন। তার প্রচণ্ড হামলা দেখে মুসলমানরা বলাবলি করতে লাগলেন যে, এই ব্যক্তিকে তো কোনো ফেরেশতা মনে হচ্ছে।
হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তাকে দেখলেন তখন খুবই আশ্বর্যান্বিত হলেন এবং জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে, এই অশ্বারোহী কে? অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে পরাজিত করলেন। হযরত আবু

মেহজান রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে অস্ত্রপাতি ফেরত দিলেন এবং নিজের পায়ে নিজেই শিকল পরে নিলেন।

হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন যুদ্ধশেষে নিজের অবস্থানের জায়গায় ফিরে আসলেন, তখন তাঁর স্ত্রী অথবা তাঁর বাঁদী জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের যুদ্ধ কেমন হল? হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিস্তারিতভাবে যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে বললেন, আমরা পরাজিত হতে যাচ্ছিলাম, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা সাদাকালো বর্ণের ঘোড়ার পিঠে একজন ঘোড়সওয়ার পাঠালেন। যদি আমি আবু মেহজানকে শিকলে বাঁধা অবস্থায় না রেখে যেতাম তবে আমি নিশ্চিত বলতাম যে, এটি আবু মেহজানেরেই কৃতিত্ব। তাঁর স্ত্রী বললেন, তিনি আবু মেহজানই ছিলেন। অতঃপর তিনি আবু মেহজান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা বিস্তারিতভাবে তাঁকে শুনালেন।

হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু মেহজান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে তার সমস্ত শিকল খুলে দিলেন এবং বললেন, (আজ যেহেতু তোমার কারণে মুসলমানদের পরাজয় বিজয়ে পরিবর্তন হয়েছে সেহেতু) আগামীতে তোমাকে আর কখনও শরাব পান করার উপর চাবুক মারব না। হযরত আবু মেহজান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম, আমিও আগামীতে আর কখনও শরাব পান করব না। এতদিন আপনার চাবুক মারার কারণেই আমি শরাব পরিত্যাগ করা পছন্দ করতাম না। এরপর হযরত আবু মেহজান রাদিয়াল্লাহু আনহু আর কখনও শরাব পান করেননি। (ইস্তিআব, এসাবাহ) [হায়াতুস্ সাহাবাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু খণ্ড ২, পৃ. ৩০০-৩০৩]

ꙮ 'আল্লাহর তরবারি'র বীরত্ব:

অষ্টম হিজরি, মোতাবেক ৬২৯ ঈসায়ী। পূর্ব রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ মুসলিম ফৌজ। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর প্রথম যুদ্ধ। নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর জীবদ্দশায় রোমানদের বিরুদ্ধে একমাত্র যুদ্ধ। একদিকে দুই লক্ষ খ্রিস্টান সেনা, অপরদিকে মাত্র তিন হাজার মুসলিম যোদ্ধা। খ্রিস্টান বাহিনীর প্রথম আঘাতেই শহীদ হয়ে যান মুসলিম বাহিনীর প্রথম সেনাপতি হযরত যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু। এরপর শহীদ হয়ে যান দ্বিতীয় কমান্ডার হযরত যাফর বিন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু। অতঃপর শহীদ হয়ে যান তৃতীয় কমান্ডার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুও।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এই তিনজনকেই কমান্ডার হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তাদের প্রত্যেকের শাহাদাতে সৃষ্টি হয় নেতৃত্বের শূন্যতা। মুসলিম ফৌজ দাঁড়িয়ে যায় খাদের কিনারায়। পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে দ্রুত মুসলিম বাহিনীর পতাকা তুলে নেন হযরত সাবিত বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু। এক মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে তিনি পতাকা তুলে দেন দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এক যোদ্ধার দিকে আর বলেন, হে ওয়ালিদের পুত্র! আপনি আমাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

হযরত সাবিত বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকে নেতৃত্বের প্রস্তাব দিলেন, তিনি সবেমাত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এর আগে মুসলিম বাহিনীর পক্ষে কোনো যুদ্ধেই অংশ নেননি তিনি। বরং একাধিক যুদ্ধে কুফুরি শক্তির পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছেন ইসলামের বিপক্ষে। নওমুসলিম ঐ ব্যক্তি সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে

বলেন, "আমি সবেমাত্র আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। আমি কী করে আল্লাহর নবীর এত এত বিশ্বস্ত সাহাবীর উপর নেতৃত্ব দিতে পারি? এ আমার কাছে এক স্পর্ধার বিষয়।" সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "ওহে সুলাইমানের পিতা! এ ময়দানে আপনার চাইতে যোগ্য কোনো যোদ্ধা নেই। অযথা সময় নষ্ট না করে পতাকা হাতে তুলে নিন, আর বিপর্যস্ত মুসলিম বাহিনীর উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করুন।" নিরুপায় হয়ে মুসলিম ফৌজকে নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইসলাম ধর্মে নবদিক্ষিত এই ব্যক্তি।

নতুন কমান্ডার দায়িত্ব নেয়ার পর বদলে যায় যুদ্ধের দৃশ্য। মাত্র তিন হাজার রণক্লান্ত মুসলিম যোদ্ধা নিয়ে ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েন দুই লক্ষ রোমান সৈন্যের উপর। যুদ্ধক্ষেত্রের গোটা অগ্রভাগে ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম বাহিনী আর রচনা করে প্রচণ্ড আক্রমণ। অপ্রতিরোদ্ধ তরঙ্গের ন্যায় তারা আছড়ে পড়ে বিশাল এক বাহিনীর উপর। পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে থাকা মুসলিম বাহিনীর হঠাৎ এই তীব্র আক্রমণে হতচকিত হয়ে পড়ে শত্রুপক্ষ। তারা বুঝতেই পারে না মুসলিম বাহিনী হঠাৎ এতটা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে কিসের শক্তিতে! তাদের বিস্ময়ের ঘোর কেটে উঠার আগেই যুদ্ধের পরিস্থিতি বদলে দেন নতুন এই মুসলিম কমান্ডার। তার আক্রমণ এতটাই প্রচণ্ড ছিল যে, আঘাতের ধকল সইতে না পেরে তাঁর হাতে থাকা তলোয়ারটি ভেঙে যায়। তিনি আরেকটি তলোয়ার হাতে নেন। আর একই তীব্রতায় শত্রুর উপর আঘাত করেন। দ্বিতীয় তলোয়ারটিও ভেঙে যায়। তিনি আরেকটি তলোয়ার হাতে তুলে নেন। তৃতীয় তলোয়ারটিও ভেঙে যায়। এরপর তিনি আরেকটি তলোয়ার হাতে নেন। এভাবে একে একে নয়টি তলোয়ার ভেঙে তিনি যখন দশম তলোয়ারটি হাতে তুলে নিয়েছেন, ততক্ষণে রোমান বাহিনীর হুশ ফিরেছে। তারা উপলব্ধি করে এই নতুন কমান্ডারকে মোকাবেলা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কোনো তলোয়ার যেমন তার হাতে অক্ষত থাকার সামর্থ রাখে রাখে না, তেমনি কোনো প্রতিপক্ষও তার সামনে অক্ষত থাকতে পারে না। নিশ্চিত মৃত্যু এড়াতে পিছু হটতে বাধ্য হয় খ্রিস্টান রোমান বাহিনী। ভয়াবহ এই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব ছিল- মাত্র বারজন মুসলিম সৈন্য শাহাদাত লাভ করেন, অন্যদিকে কুফফারদের হতাহতের সংখ্যা ছিল সীমাহীন। আর তা আমরা কিছুটা আন্দাজ করতে পারি এই নতুন কমান্ডারের হাতে নয়টি তরবারি ভাঙ্গার কাহিনী থেকে।

জর্ডানের মুতায় সংগঠিত এই যুদ্ধই ছিল ইসলামের ছায়াতলে তাঁর প্রথম যুদ্ধ। মুসলিম বাহিনীর পরাজয় এড়িয়ে যুদ্ধের ফলাফল অমীমাংসিত রেখে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। আর এভাবেই এক অমীমাংসিত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটে এক অজেয় সেনাপতির। ইসলামের ছায়াতলে আবির্ভূত হন এক অপ্রতিরোধ্য যোদ্ধা। সত্য দ্বীনের বিজয়যাত্রায় পদার্পন ঘটে আরেক মহানায়কের। ইতিহাসে সূচনা ঘটে আরেকটি নতুন অধ্যায়ের।

মদীনায় ফিরে গেলে তাঁর অভূতপূর্ব বীরত্ব আর সাহসের কথা জেনে নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর উপাধি দেন 'সাইফুল্লাহ্', তথা 'আল্লাহর তরবারি'। আল্লাহর এই তরবারি যতবার উন্মুক্ত হয়েছে, প্রতিপক্ষের ভাগ্যে পরাজয়, মৃত্যু আর পলায়ন ব্যতীত আর কিছুই জুটেনি। এই তরবারির সামনে বানের স্রোতের মত ভেসে যায় ভণ্ডনবীদের ফেতনা। এই তরবারির ঝলকানিতে ভস্ম হয়ে যায় হাজার বছর ধরে পৃথিবী শাসন করে আসা পারস্য সাম্রাজ্য। এই তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে দিশেহারা হয়ে রাজত্ব ছেড়ে ইউরোপে পালিয়ে যায় রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস। পারস্যের দুর্ভেদ্য শিকলের প্রাচীর আর রোমানদের লৌহ বর্ম সবকিছু খানখান হয়ে যায় এই একটি তরবারির আঘাতে। তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন

একই সাথে শত্রুর বিনাশ আর নিজের শাহাদাতের তামান্না নিয়ে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোনো যোদ্ধার জন্ম হয়নি যে তাকে পরাস্ত করতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই দুর্ধর্ষ যোদ্ধার নাম হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। আরবের সংস্কৃতি অনুযায়ী আরবরা তাকে "ওয়ালিদের পুত্র" কিংবা "সুলাইমানের পিতা" বলে ডাকত। কিন্তু পৃথিবীবাসী তাঁকে চিনেছে "আল্লাহর তরবারি" হিসেবে।

তিনি ছিলেন এক অজেয় যোদ্ধা, অতুলনীয় মহাবীর। প্রতিটি যুদ্ধের শুরুতে দ্বৈত লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়ে তিনি এগিয়ে যেতেন। প্রতিপক্ষের সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা এগিয়ে আসলে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে খতম করতে সাধারণত এক মিনিটের বেশি সময় নিতেন না। ওয়ালাজার যুদ্ধে এক বিশালদেহী পারস্য সেনা দ্বৈত যুদ্ধের জন্য এগিয়ে এসেছিল। পারসিয়ানরা অপেক্ষা করছিল খালিদের শেষ দেখার জন্য। কেননা তারা জানত এই পারস্য সেনা একাই এক হাজার পুরুষের শক্তি ধারণ করে। তারা তার নাম দিয়েছিল "হাজার মর্দ"। লড়াই শুরু হওয়ার আগে পার্সিয়ানরা উল্লাস করতে থাকে। কিন্তু কয়েক মিনিটের ব্যবধানে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করেন। সেদিন সেই "হাজার মর্দের" স্পন্দনহীন বুকের উপর বসে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দুপুরের খাবার খেয়েছিলেন। আর বিস্ময়াভিভূত পারসিয়ানদের দিকে তাকিয়ে তিনি মিটিমিটি হেসেছিলেন।

এই যুদ্ধের কয়েক বছর পর হিমসের যুদ্ধে অনুরূপ এক বিশাল দেহের অধিকারী জেনারেল খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। তবে সে পার্সিয়ান ছিল না, সে ছিল রোমান সেনাপতি। সে সিংহের মত গর্জন করতে থাকে আর খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে তেড়ে আসে। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বশক্তি দিয়ে তার বর্ম পরিহিত মস্তকের উপর আঘাত হানেন। আল্লাহর তরবারির আঘাতে দুই টুকরা হয়ে যায় লোহার বর্ম। অতঃপর তলোয়ার ফেলে দিয়ে প্রতিপক্ষকে দুই হাত দিয়ে নিজের বুকের সাথে নির্দয়ভাবে চেপে ধরেন খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। রোমান সেনাপতির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় আর থেমে যায় তার গর্জন। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু অবশ্য তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে রোমান ঐ সেনাপতির পাজরের হাড় ভেঙে গিয়েছে এবং তা মাংস ভেদ করে বাহিরে বের হয়ে এসেছে।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন অপরাজেয় সেনাপতি। তার সমগ্র জীবনে প্রায় একশত আটটি যুদ্ধ তিনি করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে মুসলমানরা কখনো পরাজয়ের মুখ দেখেননি। ভণ্ডনবী তুলায়হা থেকে শুরু করে মিথ্যাবাদী মুসায়লামা, পারস্যের এক লক্ষ দিরহামের মুকুট পরিহিত সেনাপতি হরমুয থেকে শুরু করে রোমান সর্বাধিনায়ক মাহান, সমকালের সব সেরা যোদ্ধা, সব সেরা কমান্ডার, রাজা-মহারাজা, রথি-মহারথি, সম্রাট-মহাসম্রাটদের কাছে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন এক মূর্তমান আতঙ্কের নাম। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘোড়া দাপিয়ে বেড়িয়েছে বুজাখার সমতল ভূমি থেকে ইয়ামামার বিশাল প্রান্তর, কুয়েতের কাজিমা থেকে শুরু করে ইরাকের হীরা, আনবার থেকে শুরু করে পারস্যের শেষ দুর্গ ফিরোজ, ফিলিস্তিনের আজনাদাইন থেকে শুরু করে জর্দানের ফাহল, সিরিয়ার দামেস্ক থেকে শুরু করে ইমেসা, ইয়ারমুক, আলেপ্পো, একের পর এক দুর্গ, একের পর এক শহর, একের পর এক সাম্রাজ্য হাঁটু গেড়ে বসেছিল তার সামনে। ন্যায়ের পতাকাধারী মুসলিম ফৌজের অগ্রযাত্রায় যেখানেই বাধার সম্মুখীন হয়েছেন, সেখানেই নিজের রুদ্রমূর্তি দেখিয়েছেন খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। দোযখের

তাণ্ডব চালিয়েছেন পারস্যের ওয়ালাজায়, রক্তের স্রোত বইয়েছেন খোরাসানের কাশাফ নদীতে। পারস্যের দর্প চূর্ণ করে তিনি যখন রোমান সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হন, সেদিন নয় হাজার যোদ্ধাকে সাথে নিয়ে পায়ে হেঁটে তিনি পাড়ি জমান একশ বিশ মাইল পানিশূন্য মরুভূমি, যা ইতিহাসে আর কেউ কখনো করে দেখানোর সাহস পায়নি। হিরাক্লিয়াসের মত মহাসম্রাট, যিনি নিজের অতুলনীয় যোগ্যতা আর দক্ষতা দিয়ে ভেঙে যাওয়া রোমান সাম্রাজ্যকে পুনরায় একত্র করেছিলেন, তিনি সিরিয়া ছেড়ে কন্সট্যান্টিনোপল পালিয়ে গিয়েছিলেন খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে।

এককথায়, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ইসলামের সেই তরবারির নাম যা কুফ্ফারদের বিরুদ্ধে চিরদিন খোলা থাকে, কখনো খাপবদ্ধ হয়না। আলহামদুলিল্লাহ! ইসলাম এমন এক ধর্ম যা একসাথে, অতি ক্ষুদ্র সময়ে মানবেতিহাসের সবচেয়ে চৌকষ, বহু সমরনায়কের জন্ম দিয়েছে যাদের অবদানে ইসলামের আলো স্বল্প সময়ে দূর-দূরান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। তন্মধ্যে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অন্যতম। তার রণকৌশল, তুখোর নেতৃত্ব, সমরপ্রজ্ঞা, প্রত্যুৎপন্নমতীত্ব, বিচক্ষণতা এবং বীরত্ব, সবই ছিল অসাধারণ, ইতিহাসে অতুলনীয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই তরবারির হাতে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য তছনছ করে দেন। তিনি কুফ্ফার বাহিনীর সামনে হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন,

انا فارس الضديد
انا خالد بن الوليد

"আমি মহান যোদ্ধা,
আমি খালিদ বিন ওয়ালিদ।"

তিনি কাফেরদের জন্য সাক্ষাত যমদূত হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কোনো কোনো যুদ্ধে প্রায় লক্ষাধিক কাফেরকে একসাথে কোনোরূপ ভিসা ছাড়াই সরাসরি জাহান্নামে পাঠিয়েছেন। যেমন: ফিহলের যুদ্ধে প্রায় আশি হাজার কাফেরকে হত্যা করা হয়, ইয়ারমুকের যুদ্ধে প্রায় সত্তর হাজার (মতান্তরে একলক্ষ বিশ হাজার) কাফেরকে হত্যা করা হয়, বুআইবের যুদ্ধে প্রায় দেড় লাখ কাফেরকে হত্যা করা হয়, তাঁর নির্দেশে কাশাফ নদীতে প্রায় সত্তর হাজার কাফেরকে গলা কেটে হত্যা করে রক্তের নদী প্রবাহিত করা হয়। তিনি এজন্য এত পরিমাণ কাফের নিধন করেছিলেন যে, এই কুফ্ফাররা এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আবারো নতুন করে সংগঠিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আরেকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। তাই তিনি কুফ্ফারদের মূল কর্তন করে দিতে চেয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন যুদ্ধ-প্রেমী। যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর প্রতি তাঁর মোহ ছিল না। নারীর মোহ কিংবা দুনিয়ার মহব্বত তাঁকে কোনো দিনই আকৃষ্ট করেনি, এসব ব্যাপারে তিনি ছিলেন পাথরসম নিস্পৃহ। তিনি বলতেন, "বাসর রাত, কিংবা যে রাতে আমাকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়, তা আমার নিকট সেই কনকনে শীতের রাতের চেয়ে অধিক প্রিয় নয়, যে রাতে আমি মুহাজিরদের সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।"

তিনি তাঁর সমস্ত যিন্দেগী কাটিয়েছেন রণাঙ্গনে। ইসলামের জন্য তিনি তার যিন্দেগীকে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তাঁর এক বন্ধুকে তিনি নিজের শরীরের বিভিন্ন অংশ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন, "আমার শরীরের এমন কোনো স্থান তুমি কি দেখেছ যেখানে তীর, তরবারি কিংবা বর্শার ক্ষত নেই?" তাঁর বন্ধু শরীরের এমন কোনো স্থান খুঁজে পাননি যেখানে কোনো ক্ষতচিহ্ন ছিল না। তাঁর বন্ধু অবাক বিস্ময়ে তাঁর শরীরের সবখানের

এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। "তুমি কি জান আমি কত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি?" বন্ধুকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এরপরও আমি শহীদ হলাম না কেন? লড়াই করতে করতে আমার মৃত্যু হল না কেন? আহ! আমি এক বৃদ্ধ উটের মত মরছি। শয্যায় মারা যাওয়া আমার জন্য লজ্জাজনক। আল্লাহ তা'আলা ভীরু কাপুরুষদের চোখে ঘুম না দেন!" "আপনি যুদ্ধের ময়দানে নিহত হতে পারেন না, আবু সুলাইমান!" বন্ধুবর তাকে আশ্বস্ত করে জানান, "আপনাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'সাইফুল্লাহ' তথা 'আল্লাহর তরবারি' আখ্যা দিয়েছেন। এটা নবীজীর ভবিষ্যদ্বানী ছিল যে, আপনি যুদ্ধের ময়দানে মারা যাবেন না। যদি আপনি রণক্ষেত্রে মারা যেতেন, তাহলে সবাই বলতো যে, 'এক কাফের আল্লাহর তরবারি ভেঙ্গে ফেলেছে।' অথচ এমনটি হতে পারে না।....আপনি ইসলামের নাঙ্গা তলোয়ার ছিলেন।" এরপর খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেন। (হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. এর জীবনী "আল্লাহর তলোয়ার"- মেজর জেনারেল এ আই আকরাম, লিংক- https://archive.org/details/KhalidbinwalidRa)

নারী সাহাবীদের নির্ভীকতা ও জিহাদ প্রেম:

প্রিয় ভাই! কেবল পুরুষ সাহাবীগণই ইতিহাসে বীরত্বের সাক্ষর রেখেছেন এমনটি নয়। বরং নারী সাহাবীগণও সৃষ্টি করেছেন জিহাদ প্রেমের অতুলনীয় ইতিহাস। চলুন, এরকম কয়েকজন নারী সাহাবীর ঘটনাও শুনা যাক।

֍ হযরত ছফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহার নির্ভীকতা ও জিহাদপ্রেম:

কে সেই সেরা বুদ্ধিমতী নারী, পুরুষরা যার কারণে হাজার রকম হিসাবনিকাশ করতে বাধ্য হতো?
কে সেই নির্ভীক সাহাবিয়া, যিনি ছিলেন সর্বপ্রথম এক মুশরিক হত্যাকারিণীর গৌরবে ভূষিত?
কে সেই বিচক্ষণ মহিলা, যিনি সৃষ্টি করেন আল্লাহর পথে সর্বপ্রথম তরবারির খাপমুক্তকরণের ইতিহাস?
তিনিই হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সম্মানিতা ফুপু, আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা, হযরত ছফিয়্যাহ হাশেমী ও কুরাইশী রাদিয়াল্লহু আনহা।

চলুন দেখি, তিনি ওহুদের ময়দানে কী করলেন?

"জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ"র উদ্দেশ্যে ওহুদের যুদ্ধে তিনি ছোট্ট একটি মহিলা দল নিয়ে মুসলিম সৈনিকদের সাথে যোগ দেন। সেখানে তিনি আত্মনিয়োগ করেন পানির ব্যবস্থাপনায়, তৃষ্ণার্ত মুজাহিদদের পানি পান করিয়ে তৃপ্ত ও উজ্জীবিত করলেন, তীর চেঁছে তীক্ষ্ম করলেন, ত্রুটিপূর্ণ ধনুক মেরামত করলেন।

তিনি যখন দেখতে পেলেন অল্প কয়েকজন ছাড়া মুসলিম বাহিনীর সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একা ফেলে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে.....

এবং দেখতে পেলেন মুশরিকরা আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর কাছাকাছি এবং প্রায় তাঁর উপর আক্রমনে উদ্যত, তখন তিনি হাতের পানির পাত্রটি ছুঁড়ে ফেললেন জমিনের উপর আর আক্রান্ত শাবকের 'মা সিংহী'র মতো লাফিয়ে উঠলেন, ছিনিয়ে নিলেন এক পরাজিত সৈনিকের বর্শা, তা দিয়ে সৈনিকদের সারি ভেদ করতে করতে ছুটে চললেন, বর্শার

তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে এদিক-ওদিক আঘাত করতে লাগলেন, মুসলিম সৈনিকদের লক্ষ্য করে গর্জে উঠলেন "আরে ও কাপুরুষের দল! আল্লাহর রাসূলকে ফেলে পালাতে চাও? নিজেদের জান বাঁচাতে চাও?"

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখলেন, তাঁর আশঙ্কা হলো যে, তিনি (ছফিয়্যাহ) তাঁর মৃত ভাই হযরত হামযা রাদিয়াল্লহু আনহুর লাশ দেখে ফেলবেন, মুশরিক বাহিনী অত্যন্ত কুৎসিতরূপে যার বিকৃতি ঘটিয়েছে। তাই তাঁর পুত্র হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবীজী ﷺ বললেন,

-মাকে ফিরাও যুবাইর, তাড়াতাড়ি.....

যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেদিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন,

মা, থামো, মা এদিকে এসো।

-সরে যা, খবরদার মা মা করবি না।

-আল্লাহর রাসূল ঐ দিকে যেতে নিষেধ করেছেন।

-কিন্তু কেন? আমি তো জানি আমার ভাইয়ের লাশ বিকৃত করা হয়েছে।

তাঁর এ কুরবানি আল্লাহর জন্য।.....

এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, যেতে দাও।

যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পথ ছেড়ে দিলেন।

যুদ্ধ শেষ হলে হযরত ছফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর আপন ভাই (নবীজী ﷺ-র আপন চাচা) হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিকৃত লাশ দেখে বললেন-

এ সবই আল্লাহর খাতিরে হয়েছে। আমার কোনো অসন্তুষ্টি নেই। আল্লাহর ফয়সালায় আমি তুষ্ট। সম্পূর্ণ সমর্পিত। আল্লাহর কসম। আমি সবর করবো। আমি মনে করবো এ বিপদ আল্লাহর দ্বীনের জন্য এবং সে কারণে এর পূর্ণ প্রতিদান আমি অবশ্যই পাবো। ইনশাআল্লাহ।

এবার দেখি, খন্দকের যুদ্ধে তিনি কী ঘটালেন?

খন্দকের যুদ্ধে তাঁর অবস্থান, সে তো বীরত্ব গাঁথা এক রুদ্ধশ্বাস কাহিনী, যার পরতে পরতে তাঁর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা প্রস্ফূটিত, সাহসিকতা ও সঙ্কল্প প্রকাশিত.....

তাহলে চলুন, কান পেতে শুনি ইতিহাসের সেই বিখ্যাত কাহিনি.....

রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলে নারী ও শিশুদের সুরক্ষিত দুর্গে রেখে যাওয়া ছিল তাঁর অভ্যাস। কেননা, প্রহরীদের অবর্তমানে কোনো বিশ্বাসঘাতক মদীনার ওপর আক্রমণ করে বসতে পারে। এবারও তিনি তাই করলেন। মুসলমানরা যখন খন্দকের আশপাশে কুরাইশ ও তার মিত্রদের মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করছিলেন, নারী ও শিশুদের শত্রুর আক্রমন নিয়ে ভাবার সুযোগ তাদের ছিল না। মদীনার সীমান্তবর্তী এলাকায় ছিল পরিখা আর মদীনার ভিতরে একটি দূর্গের অভ্যন্তরে অবস্থান করছিল নারী ও শিশুরা ।

আর এদিকে মদীনার ভিতরে কিন্তু দূর্গের বাহিরে অবস্থান করছিল বনু কুরাইযার ইহুদী সম্প্রদায়। এদের সাথে মুসলমানদের শান্তিচুক্তি ছিল।

তখন ফযরের অন্ধকার। হযরত ছাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, এক ব্যক্তি দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে, দুর্গের চারপাশে উঁকিঝুকি করছে, আঁড়ি পেতে শুনতে চাচ্ছে কারা আছে এর ভিতরে.....

হযরত ছাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বুঝে ফেললেন, নিশ্চয়ই এ লোক ইহুদী, কেননা মদীনায় এখন ইহুদী ছাড়া আর কেউ নেই। নিশ্চয়ই এর সাথে আরো লোক আছে। তাহলে নিশ্চয়ই এরা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছে। কুরাইশদের সাথে হাত মিলিয়েছে। নিশ্চয়ই এরা এখন জানতে এসেছে, এখানে আক্রমন প্রতিরোধকারী পুরুষ মানুষ আছে, না শুধু নারী আর শিশু অবস্থান করছে। এ মুহূর্তে এরা যদি আমাদের উপর আক্রমন করে তাহলে তা ঠেকানোর জন্য কোনো একজন মুসলিম পুরুষ আমাদের পাশে নেই।....

এ অবস্থায় আল্লাহর ওই দুশমন যদি আমাদের প্রকৃত পরিস্থিতির খবর তার কওমের কাছে পৌঁছাতে সফল হয়, তাহলে ইহুদীরা নারীদের করবে বন্দী-বাঁদী আর শিশুদের বানাবে দাস-দাসী, সেটা হবে মুসলমানদের জন্য ভয়াবহ বিপদ ও বিপর্যয়ের কারণ।.....

এসব ভেবে তিনি নিজের ওড়না খুলে জড়ালেন মাথায়। কোমরে শক্ত করে গামছা বেঁধে কাঁধে তুলে নিলেন একটি বড় লৌহদণ্ড। নেমে এলেন দুর্গের প্রধান ফটকের কাছে। খুব ধীরে ও সাবধানে সেখানে তৈরি করলেন একটি ছিদ্র। সেই ছিদ্রপথ দিয়েই আল্লাহর দুশমনকে নিরীক্ষণ করতে থাকলেন সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টিতে। একসময় তিনি লোকটির অবস্থান দেখে নিশ্চিত হলেন। এবার তার উপর চূড়ান্ত আক্রমন চালানো সম্ভব.....

নিশ্চিত হয়েই চালিয়ে দিলেন চরম হামলা। সর্বশক্তি দিয়ে লৌহদণ্ডের আঘাত হানলেন তার মাথায়। একদম নির্ভুল নিশানা। এমন ভয়াবহ আঘাত সহ্য করা ছিল অসম্ভব। লোকটি ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে।....

অবিলম্বে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আঘাত হেনে তার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিলেন.....

প্রাণহীন নিথর দেহের কাছে নেমে এলেন দ্রুত। নিজের সঙ্গে রাখা ছুরি দিয়ে মাথা কেটে দেহ থেকে আলাদা করে ফেললেন। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মাথাটি দুর্গের উঁচু স্থান থেকে ছুঁড়ে মারলেন নিচের দিকে.....

ঢাল বেয়ে সেটি গড়াতে গড়াতে গিয়ে থামল সেই ইহুদীদের সামনে, যারা অপেক্ষা করছিল ওই সঙ্গীর সবুজ সংকেতের....

তারা সঙ্গী ইহুদীর কর্তিত মস্তক দেখে পরস্পর বলাবলি করতে থাকল,

আরে এটা আমরা নিশ্চিতরূপেই জানতাম, মুহাম্মাদ কখনোই নারী ও শিশুদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না করে যাবার মানুষ নয়.....

এখন তো নিজের চোখেই দেখলাম....

এসব বলতে বলতে তারা ফিরে গেল নিজেদের গন্তব্যে।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! বলুনতো, ইতিহাসের এমন এক গুরুত্বপূর্ণ হত্যাকাণ্ড যখন ঘটালেন, তখন হযরত ছাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স কত ছিল?

ষাট বছর........(!!!)

কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই হত্যাকাণ্ডটি, একটু চিন্তা করুন! আল্লাহ তা'আলাই ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাযতকারী! সেদিনের এই হত্যাকাণ্ডটি না ঘটলে হয়ত আজ আমি, আপনি মুসলমান হতে পারতাম না। ইহুদীরা যদি নারী

শিশুদের আক্রমন করতো, মুসলমানদের মনোবল ভেঙে যেত, মদীনার বাহির এবং ভিতর দু'দিক দিয়ে আক্রমনের শিকার হয়ে মুসলমান জাতি ইতিহাস থেকে হারিয়ে যেতে পারতো!

আল্লাহ তা'আলা তাঁর আপন শান অনুযায়ী নবীজী ﷺ-এর ফুপু আম্মাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

[সুওয়ারুম মিন হায়াতিস্ সাহাবিয়্যাত, ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা]

҉ হযরত নাসিবাহ আল্ মাযেনিয়া (উম্মে উমারা) রাদিয়াল্লাহু আনহার নির্ভীকতা ও জিহাদপ্রেম:

তিনি ছিলেন সেই দুইজন আনসারী সাহাবিয়্যাহর অন্তর্ভূক্ত, যারা আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের দিন বাহাত্তর জন পুরুষের পাশাপাশি নবীজী ﷺ-এর কাছে বাইয়াত হন।

বাইয়াত শেষে হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা ফিরে এলেন মদীনায়, আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সম্মান বুকে নিয়ে.....

বাইয়াতের শর্তসমূহ পূরণ করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে.......

এরপর পেরিয়ে গেল বহু সময়, বহু দিন ও মাস.......

তারপর একদিন এসে গেল ওহুদের যুদ্ধ। সে যুদ্ধে হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহার রয়েছে এক বিরাট ভূমিকা, আহ্! কী যে উজ্জ্বল ও সমুন্নত সে কাহিনী!!! তাঁর বীরত্বের কাহিনী শুনলে পুরুষের পৌরুষত্বও লজ্জা পায়!!! হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা ওহুদের উদ্দেশ্যে বের হলেন নিজের পানির পাত্রটি নিয়ে, উদ্দেশ্য তাঁর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের তৃষ্ণা নিবারণ করা। আরও নিয়েছেন যখমের একগুচ্ছ পট্টি (ব্যান্ডেজের প্যাকেট)...... আশ্চর্যের কিছু নেই! কেননা, ময়দানে থাকবেন তাঁর স্বামী আর কলিজার তিনটি অংশ-

এক অংশ হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আর অপর অংশ হলো তাঁর দুই পুত্র হাবীব ও আব্দুল্লাহ......

তাছাড়া আল্লাহর দ্বীন হেফাযতের জন্য দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াইকারী অন্যান্য মুসলমান ভাইয়েরাও তাঁর প্রিয় মানুষ। ওহুদের যুদ্ধে ঘটে গেল যা ঘটার ছিল......

হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের দুচোখে দেখলেন, কীভাবে মুসলিম বাহিনীর সুনিশ্চিত বিজয় 'মহা বিপর্যয়ে' রূপান্তরিত হয়ে গেল.....

তিনি দেখলেন কিভাবে মুসলিম বাহিনীর কাতারে হত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞ তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়ল এবং একের পর এক তাঁদের লাশ পড়তে থাকল......

চলুন না, এই ভয়াবহ কঠিন মুহূর্তের বর্ণনার ভার ছেড়ে দেই খোদ হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহার ওপর, কারণ তিনিই পারবেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওই সময়ের সঠিক বিবরণ দিতে। তিনি বলেন-

"খুব সকালে আমি ওহুদের ময়দানে গেলাম, আমার হাতে ছিল একটি পানির মশক, যা থেকে আমি মুজাহিদ ভাইদের পানি পান করাব।

একসময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছাকাছি পৌঁছলাম। শক্তি, বিজয় ও সাহায্যের পাল্লা তখন তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের দিকে ঝুঁকে ছিল.....

একটু পরেই মুসলিম বাহিনী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো, ফলে তিনি পড়ে রইলেন সামান্য কয়েকজনের প্রহরার মধ্যে যাঁদের সংখ্যা দশের উপরে নয়.....

ফলে আমি, আমার স্বামী ও পুত্র দ্রুত এগিয়ে গেলাম তাঁর নিকট.....

বালা যেমন কব্জিকে ঘিরে রাখে ঠিক তেমনি আমরা তাঁকে ঘিরে রাখলাম আর আমাদের সকল শক্তি ও অস্ত্র দিয়ে তাঁর উপর থেকে আক্রমন প্রতিরোধ করতে থাকলাম.....

মহানবী ﷺ আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন মুশরিকদের আক্রমন থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কোনো ঢাল আমার কাছে নেই।

এরপর তাঁর দৃষ্টি পড়লো পলায়নপর একজনের উপর যার হাতে ঢাল ছিল। তিনি তাকে ডেকে বললেন, "তোমার ঢালটি এমন কাউকে দিয়ে যাও যে লড়াই করছে।" লোকটি নিজের ঢাল ফেলে রেখে চলে গেল।

আমি সেটা তুলে নিলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আক্রমন ঠেকাতে লাগলাম।

আমি প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতিরক্ষায় তরবারি চালিয়ে, তীর ছুঁড়ে আমার সর্বশক্তি ব্যয় করতে করতে এক পর্যায়ে অক্ষম হয়ে পড়লাম। আমার শরীরের গভীর ক্ষতগুলো আমাকে অপারগ করে দিল।

এমন এক কঠিন মুহূর্তে উত্তেজিত উটের মতো চিৎকার করে 'ইবনে কামিআ' বলতে লাগল, কোথায় মুহাম্মাদ? গেল কোথায়.......

আমি আর মুছআব ইবনে উমায়ের আগলে দাঁড়ালাম তার পথ, তখন সে তরবারির আঘাতে মুছআবকে ভূপাতিত করলো, আরেক আঘাতে তাকে শহীদ করে ফেলল.....

এরপর ভয়াবহ আঘাত করলো আমার কাঁধে, যাতে সৃষ্টি হলো গভীর ক্ষত....

তারপরও আমি তার উপর উপর্যুপরি আঘাত করলাম, কিন্তু আল্লাহর দুশমনের গায়ে ছিল দুটি বর্ম......

যে মুহূর্তে আমার পুত্র রাসূলের ওপর থেকে অবিরাম আক্রমন প্রতিহত করে যাচ্ছিল হঠাৎ তাকে ভীষণ আঘাত করে বসল এক মুশরিক,

যাতে তাঁর বাহু কেটে বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম হলো........

ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে থাকল........

আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম, সেখানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলাম।

কোমল সুরে তাঁকে বললাম 'আমার বেটা, আল্লাহর জন্য ওঠে পড়ো, আল্লাহর দুশমনদের খতম করতে এগিয়ে যাও....ওঠো বেটা....ওঠো....'

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে ফিরে তাকালেন আর বললেন, 'তুমি যা করতে পারলে এমনটি আর কে পারবে হে উম্মে উমারা?'

এরপর সেখানে এগিয়ে আসতে লাগল সেই লোকটি যে আমার পুত্রকে আঘাত করেছিল, তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে বললেন, 'উম্মে উমারা, এই দেখো, এটাই তোমার পুত্রের ঘাতক।'

দৌঁড়ে আমি এক লাফে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, তরবারি দিয়ে সজোরে আঘাত করলাম তার পায়ের নলায়, ধপাস করে পড়ে গেল সে মাটিতে.....

আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম। তরবারি ও বর্শার উপর্যুপরি আঘাতে তাকে শেষ করে দিলাম। প্রিয় নবী ﷺ আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'তুমি তো তার কেসাস নিয়ে ফেললে, উম্মে উমারা .....

আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি তোমাকে কেসাস গ্রহণে সফল করলেন....
তোমাকে নিজের চোখেই তার পতন দেখিয়ে দিলেন।'

*****

হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহার দুই পুত্রের বীরত্বও কম ছিল না, তাঁদের ত্যাগ ও কুরবানীও পিতা-মাতার চেয়ে কোনো অংশে তুচ্ছ ছিল না.....

কারণ সন্তান তো পিতা-মাতার আদর্শই পেয়ে থাকে, তারা হয় মা-বাবারই দৃষ্টান্ত।

তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "ওহুদের যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ময়দানে হাজির হয়েছিলাম। লোকেরা যখন তাঁর নিকট থেকে দূরে সরে পড়ল, আমি আর আমার মা তাঁর নিকটবর্তী হলাম তাঁর উপর থেকে আক্রমন ঠেকাতে......

নবীজী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি উম্মে উমারার পুত্র?

-হ্যাঁ।

-মারো, আঘাত করো......

তাঁর সামনে এক মুশরিককে লক্ষ্য করে প্রচণ্ড শক্তিতে একটি পাথর নিক্ষেপ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে লোকটি পড়ে গেল, আমি পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে তার উপর পাথরের স্তূপ বানিয়ে ফেললাম। নবীজী ﷺ আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি দিলেন।

দৃষ্টি একটু ফিরাতেই তাঁর চোখে পড়ল আমার মায়ের কাঁধের যখম, সেখান থেকে ফোটায় ফোটায় রক্ত ঝরছিল। তিনি সচকিত হয়ে বললেন, 'তোমার মাকে দেখো...... তোমার মা....... ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দাও। আল্লাহ তোমাদের পরিবারের মধ্যে বরকত দান করুন....... তোমার মায়ের মর্যাদা অমুক অমুকের চেয়ে ঊর্ধ্বে........ আল্লাহ রহম করুন তোমাদের সকলের উপর।'

আমার মা তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন-

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য এই দুআ করুন- আমরা যেন জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে পারি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন, 'ইয়া আল্লাহ, জান্নাতে ওদের আমার সঙ্গী বানিয়ে দাও'।

এই দুআ শুনে আমার মা বললেন, 'এরপর আমি আর কোনো কিছুরই পরোয়া করি না, দুনিয়াতে আমার যা হয় হোক। আমার কিছু যায় আসে না।'

উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা ওহুদের ময়দান থেকে গভীর ক্ষত আর তাঁর জন্য রাসূলের বিশেষ সেই দুআ নিয়ে ফিরে এলেন।

আর প্রিয়নবী ﷺ ওহুদের ময়দান থেকে ফিরলেন এই কথা বলে, 'আমি যখনই ডানে, বামে তাকিয়েছি, দেখেছি উম্মে উমারা আমার প্রতিরক্ষায় লড়াই করছে।'

******

উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা ওহুদের প্রান্তরে লড়াইয়ের প্রথম প্রশিক্ষণ নিলেন, যুদ্ধের ব্যাপারে দক্ষতা লাভ করলেন.......

স্বাদ উপভোগ করলেন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর, ফলে জিহাদ থেকে দূরে সরে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।
তাঁর নামে লিপিবদ্ধ রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে অধিকাংশ যুদ্ধে শামিল থাকার বিরল গৌরবগাঁথা.......
তিনি হাজির ছিলেন হুদাইবিয়াতে, খাইবারে.... উমরাতুল কাযা-তে, হুনাইনে........ বাইয়াতে রিযওয়ানে.....
তিনি অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন ইয়ামামার প্রান্তরে......
আল্লাহ তা'আলা হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি যেন খুশি হয়ে যান এবং তাঁকে খুশি করে দেন, কারণ তিনি ছিলেন মুমিন নারীদের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত......
অটল, অবিচল জিহাদকারিনীদের মাঝে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া.....
এরকম অসংখ্য, অগণিত ঈমানদীপ্ত কাহিনীতে ইসলামের ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহ সমৃদ্ধ। আলহামদুলিল্লাহ।

[সুওয়ারুম মিন হায়াতিস্ সাহাবিয়্যাত, ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা]

শহীদ জননীদের সন্তান কুরবানীর ঈমানদীপ্ত কাহিনী:

প্রিয় ভাই! এই উম্মাহর মা-বোনেরা এই উম্মাহর গর্ব ও অহংকার। যুগে যুগে তারা সৃষ্টি করেছেন ত্যাগ-তিতিক্ষা আর কুরবানীর এমনসব ইতিহাস যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আমরা ধন্য এমন মায়েদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। আমরা ধন্য এমন বোনদের পেয়ে। তাদের জন্য আমাদের জান কুরবান হোক।

চলুন ভাই, ইসলামের জন্য আমাদের মায়েদের সন্তান কুরবানীর এমন কয়েকটি অনুপ্রেরণামূলক কাহিনী শুনা যাক।

࿇ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহার কুরবানী:

ইতিহাস হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহার সকল অবদান ও কৃতিত্বের কথা ভুলে যেতে পারলেও পুত্রের সর্বশেষ সাক্ষাতের সময় তাঁর ঈমানের দৃঢ়তা, অবিচল প্রত্যয় আর বিচক্ষণতার কথা কখনোই ভুলতে পারবে না।

ঘটনাটি ছিল এই- ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার মৃত্যুর পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লহু আনহুকে খলীফা মেনে তাঁর পক্ষে যখন বাইয়াত নেওয়া হলো, হেজাজ, মিশর, ইরাক, খুরাসান ও সিরিয়ার প্রায় সকল অঞ্চল তাঁর পক্ষ নিল।

এদিকে বনু উমাইয়া অনতিবিলম্বে হাজ্জাজ বিন ইফসুফের নেতৃত্বে একদল দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াল..... দুই দলের মাঝে সঙ্ঘটিত হলো ভয়াবহ যুদ্ধ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লহু আনহু সে যুদ্ধে দুর্দান্ত, দুঃসাহসী যোদ্ধার আক্রমণ পরিচালনা করে চূড়ান্ত বীরত্বের প্রকাশ ঘটালেন। তবে তাঁর সহযোদ্ধারা একটু একটু করে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকল। অবশেষে তিনি বাইতুল্লাহ বা কাবা শরীফে আশ্রয় নিলেন, তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা কাবার প্রতিরক্ষার সাহায্যে আত্মরক্ষা করলেন....

তাঁর চূড়ান্ত শাহাদাতের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তিনি সাক্ষাৎ করতে গেলেন মায়ের সঙ্গে, ততদিনে তিনি দৃষ্টি হারানো অতিবৃদ্ধা এক নারী, তিনি মাকে সালাম দিলেন-

আস্সালামু আলাইকুম ইয়া উম্মাহ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু..... (মা, তোমার প্রতি সালাম.......)

- ওয়া আলাইকাস্ সালাম ইয়া আব্দাল্লাহ....(বেটা! তোমাকেও সালাম) বেটা, যে সময় হাজ্জাজের কামান তোমার বাহিনীর বিরুদ্ধে হারামের মধ্যে বিশাল বিশাল পাথর নিক্ষেপ করছে, যা মক্কা নগরীর বাড়ি-ঘরকে প্রকম্পিত করে তুলছে, এমন নাজুক পরিস্থিতিতে তুমি এখানে কেন?

- তোমার সঙ্গে পরামর্শের জন্য এসেছি মা।

- আমার সঙ্গে পরামর্শ! কী বিষয়ে?!

- মা! লোকে আমাকে নিরাশ করে দিয়েছে, তারা হাজ্জাজের ভয়ে অথবা তার প্রতি মোহে আমার নিকট থেকে দূরে সরে গিয়েছে। এমনকি আমার নিজের পরিবারের ও আপন লোকেরাও আমাকে ফেলে দূরে সরে গেছে, এমন ছোট্ট একটি দলের সামান্য কয়েকজন মানুষ ছাড়া আমার সঙ্গে কেউ নেই। তাঁরা যত বড়ই কষ্ট সহিষ্ণু হোক না কেন, এক ঘণ্টার বেশি টিকতে পারবে না.....

বনু উমাইয়ার দূতেরা আমার নিকট বলাবলি করছে যে, আমি অস্ত্র ত্যাগ করে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের হাতে বাইয়াত হলে তারা আমাকে পৃথিবীর যা চাইব তাই দেবে, এ ব্যাপারে তোমার কী মত মা?

তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন- সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে হে আব্দুল্লাহ! তোমার মনের কথা তুমিই ভালো জানো।

যদি তোমার আস্থা থাকে যে, তুমি প্রতিষ্ঠিত আছো হকের উপর আর প্রয়াস চালাচ্ছ হক প্রতিষ্ঠার জন্য, তাহলে তুমি অবিচল থাকো, যেভাবে অবিচল ছিল তোমার সেই সঙ্গীরা, যাঁরা তোমার পতাকাতলে লড়াই করে শহীদ হয়েছে.....

যদি দুনিয়ার কিছু অর্জনের আশা তুমি পোষণ করে থাকো তাহলে কত যে খারাপ মানুষ তুমি......

তুমি নিজের জীবনটাও বরবাদ করেছ আর বরবাদ করেছ তোমার সঙ্গীদেরও।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন- কিন্তু আমি তো আজকেই নিহত হয়ে যাবো।

- সেটা তোমার জন্য অনেক ভালো স্বেচ্ছায় নিজেকে হাজ্জাজের হাতে তুলে দিয়ে নিজের কর্তিত মস্তক বনু উমাইয়ার বালকদের খেলতে দেওয়ার চেয়ে......

- আমি নিহত হওয়ার ভয় পাচ্ছি না। আমি ভয় পাচ্ছি, আমার মৃতদেহকে বীভৎসরূপে বিকৃত করা হবে।

- নিহত হওয়ার পর ভয় পাওয়ার আর কি আছে? যবাইকৃত ছাগল চামড়া ছিলার কষ্ট পায় না।

মমতাময়ী মায়ের মুখে বেদনাময় বাস্তব কথাগুলো শুনে, নিজের কর্তব্য স্থির করতে পেরে তাঁর চেহারা ঝলমল করে উঠল। তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন-

মাগো, রহমত ও বরকতপ্রাপ্তা হও তুমি, তোমার সুমহান মর্যাদার আরও বৃদ্ধি ঘটুক। শুধু তোমার মুখের এই কথাগুলো শুনতেই ছুটে এসেছিলাম তোমার কাছে। আমার আল্লাহ জানেন, আমি শক্তিহীন, দুর্বল ও ক্লান্ত হইনি। এই দেখো মা, আমি এখন যাচ্ছি তোমার পছন্দনীয় পথে, আমি শহীদ হলে আমার জন্য দুঃখ করো না মা!

- বেটা, তোমার জন্য দুঃখ করতাম যদি তুমি বাতিলের জন্য জীবন দিতে। আলহামদুলিল্লাহ! প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে পরিচালিত করেছেন সেই পথে যা তাঁর পছন্দনীয় এবং যা আমারও পছন্দনীয়..... তুমি একটু আমার কাছে এসো বেটা, আমি একটুখানি তোমার ঘ্রাণ নেব, তোমার শরীরটা একটু ছুঁয়ে দেখব। কারণ, এটাই যে তোমার সাথে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ!

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিচু হয়ে মায়ের হাতে ও পায়ে চুমু দিয়ে ভরে দিলেন আর মা পুত্রের মাথায় ও ঘাড়ে নাক ঘষে ঘষে ঘ্রাণ নিলেন আর চুমু দিয়ে মমতা মাখিয়ে দিলেন......

দুই হাত সচল রাখলেন তাঁকে স্পর্শ করতে। হঠাৎ হাত গুটিয়ে নিয়ে বললেন-

-আব্দুল্লাহ এটা কী পরেছ?

- লৌহ বর্ম।

- যে ব্যক্তি শহীদ হতে চায় এটা তার পোশাক হতে পারে না বেটা।

- মা, এটা তো বরং তোমাকে খুশি করার জন্য পরেছি।

- ওটা খুলে ফেলো, তোমার ওই ভারী বর্মমুক্ত শরীরটাই হবে সাহসী ভূমিকার বেশি সহায়ক। সামনে-পিছে নড়াচড়ার জন্য সহজ...... তবে ওটার পরিবর্তে তুমি দ্বিগুণ পাজামা পরে নাও, যেন মাটিতে পড়ে গেলে তোমার ছতর উন্মুক্ত না হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু লৌহবর্ম খুলে ফেললেন, কয়েকটি সালোয়ার পরলেন, এগিয়ে গেলেন হারামের দিকে, চিৎকার করে বলতে থাকলেন- মা, আমার জন্য তোমার দুআ বন্ধ করো না।

মা দু' হাত উর্ধ্বে উঠিয়ে বললেন- হে আল্লাহ, নামাযে তাঁর দীর্ঘ কিয়ামের প্রতি রহম করো, রহম করো গভীর রাতে জসৎবাসীর নিদ্রাবিভোর মুহূর্তে তাঁর বুক ফাটা ক্রন্দনের প্রতি.....

হে আল্লাহ, মক্কা-মদীনার গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের দিনে নফল রোযা রেখে তার ক্ষুধা আর পিপাসার যন্ত্রণা সহ্য করার প্রতি রহম করো, করুণা করো....

হে আল্লাহ, পিতা-মাতার প্রতি তাঁর আনুগত্যের ওপর রহম করো...

হে আল্লাহ, আমি ওকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছি তোমার জন্য, তুমি যা ফয়সালা করবে আমি তাতে সন্তুষ্ট, সুতরাং তাঁর ব্যাপারে আমাকে দান করো ধৈর্যশীলদের প্রতিদান......

ওই দিনের সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লহু আনহু পৌঁছে গেলেন আপন প্রভুর সান্নিধ্যে......

তাঁর শাহাদাতের দশ-পনের দিন পরই তাঁর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন তাঁর মা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা......

এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল একশ বছর অথচ তাঁর একটি দাঁতও পড়েনি, তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি একটুও হ্রাস পায়নি।

আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উভয়কে সর্বোত্তম জাযা দান করুন। আমীন।

[সুওয়ারুম মিন হায়াতিস্ সাহাবিয়্যাত, ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা]

۞ হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহার কুরবানী:

হযরত উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহার পুত্র হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দূত হিসেবে ভণ্ড নবী মুসাইলামাতুল কাযযাব- এর নিকট পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ.........

মুসাইলামা বিশ্বাসঘাতকতা করে হযরত হাবীব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এমন নিষ্ঠুর-নির্দয়ভাবে হত্যা করে, যা শুনলে লোম শিউরে উঠে।

বিষয়টি ছিল এমন, মুসাইলামা প্রথমেই হযরত হাবীব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বন্দী করে জিজ্ঞাসা করে-

তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল?

- হ্যাঁ।

- তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল?

- আমি শুনতে পাচ্ছি না, কী বলছ?

মুসাইলামা তাঁর ডান হাত কেটে দিল........

এভাবে সে বার বার একই প্রশ্ন করতে থাকল আর হযরত হাবীব রাদিয়াল্লহু আনহু একই উত্তর দিতে থাকলেন। প্রত্যেকবার উত্তরের পর পাষণ্ড তাঁর একেকটি অঙ্গ কেটে ফেলছিল। দুই হাত, দুই পা কেটে ফেলার পরও তাঁর অবিচলতা দেখে মিথ্যুক মুসাইলামা তাঁর জিহ্বা কেটে আবার জিজ্ঞাসা করলো- তুমি কি আমাকে রাসূল বলে বিশ্বাস কর?

হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মাথা নেড়ে অস্বীকার করলেন তার নবুওয়তকে।

'পাষাণ গলে যাবে' এমন কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করেও অটল, অনঢ় ঈমান নিয়ে অবশেষে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। ইন্না.. লিল্লা..হি ওয়া ইন্না...ইলাইহি রা..জিঊ....ন।

হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভয়াবহ এই শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছানো হলো তাঁর মা হযরত নাসীবা আল মাযেনিয়া (উম্মে উমারা) রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে। তিনি সব শুনে বেশি কিছু বললেন না। ছন্দে ছন্দে বললেন সামান্য একটু কথা-

مِنْ أَجْلِ مِثْلِ هٰذَا الْمَوْقِفِ أَعْدَدْتُهُ
وَعِنْدَ اللهِ احْتَسَبْتُهُ
لَقَدْ بَايَعَ الرَّسُوْلَ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ صَغِيْرًا
وَوَفّٰى لَهُ الْيَوْمَ كَبِيْرًا

"এমন একটি ভূমিকার জন্যই আমি তাকে দুগ্ধ পান করিয়েছিলাম...
আমি আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট, আমি প্রতিদান চাই তাঁর কাছেই....
শৈশবে সে 'আকাবার রাতে' শপথ নিয়েছিল প্রিয় নবীজীর হাতে....
অনেক বড় হয়ে আজ সে সেই অঙ্গীকারের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ঘটাল।"

[সুওয়ারুম মিন হায়াতিস্ সাহাবিয়্যাত, ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা]

❀ উম্মে ইবরাহীমের ঘটনা:

তারীখের কিতাবে বর্ণিত আছে, বসরা শহরে অনেক আল্লাহভীরু নেককার মহিলা ছিল। তাদের মধ্য থেকে অন্যতম একজন হলেন উম্মে ইবরাহীম আল হাশিমিয়্যাহ। তার সময়ে শত্রুরা মুসলিম ভূমিতে আক্রমণ করে বসল এবং মুসলমানদেরকে হত্যা করার জন্য সামনে অগ্রসর হতে লাগল। তখন বসরার অলিতে-গলিতে "হাইয়্যা 'আলাল জিহাদ", "হাইয়্যা 'আলাল জিহাদ" বলে মানুষদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছিল। উদ্বুদ্ধকারীদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন, সেই সময়কার বিশিষ্ট আলেম আব্দুল ওয়াহেদ যায়েদ আল বসরী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বসরার অলিতে-গলিতে ঘুরে ঘুরে ভাষণ দিচ্ছিলেন আর মানুষদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছিলেন।

একদিন কোনো এক মজলিসে তিনি মানুষদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে ভাষণ দিতে লাগলেন আর সেই বরকতময় মজলিসে বিশিষ্ট নেককার মহিলা উম্মে ইবরাহীমও উপস্থিত ছিলেন। আব্দুল ওয়াহেদ জিহাদ ও শাহাদাতের ফযীলত বর্ণনা করতে করতে জান্নাতের হুরদের আলোচনা শুরু করলেন। তিনি একের পর এক জান্নাতের হুরদের গুণাগুণ বর্ণনা করতে লাগলেন। তাদের সৌন্দর্যতার বিবরণ দিতে লাগলেন। সকল শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনছিল। তারা একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিল।

মজলিসের মাঝখান থেকে উম্মে ইবরাহীম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সোজা হেঁটে আব্দুল ওয়াহিদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি আব্দুল ওয়াহিদকে সম্বোধন করে বললেন, "হে আবু উবায়েদ! আপনি তো আমার ছেলে ইবরাহীমকে ভালো করেই চিনেন। বসরার অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা আমার ছেলের সাথে তাদের মেয়েকে বিবাহ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাদের কারো ব্যাপারেই সন্তুষ্ট নই। এবং আমি মনে করি তাদের কেউই ইবরাহীমের জন্য উপযুক্ত নয়। কিন্তু আপনি এই মাত্র যেই মেয়েটির কথা বললেন, এই মাত্র যেই মেয়েটির বর্ণনা দিলেন, তাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি এই মেয়েটির সাথে ইবরাহীমকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করাতে পারলে খুব খুশি হব। আমি এই জান্নাতী মেয়েটিকে আমার ছেলের বউ বানাতে চাই। আপনি কি ইবরাহীমের সাথে এই জান্নাতী রমনীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দিতে পারবেন? হে আবু উবায়েদ! আমার ঘরে দশ হাজার দিনার আছে। আপনি এটাকে বিবাহের মোহরানা হিসেবে নিয়ে নিন। এবং ইবরাহীমকেও আপনাদের সাথে জিহাদে নিয়ে নিন, যেন আল্লাহ তা'আলা তাকে শাহাদাত নসীব করেন। এবং সে যেন আমার জন্য এবং তার বাবার জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করতে পারে।"

আব্দুল ওয়াহিদ একথা শুনে বললেন, "আপনি যদি একাজ করেন, তাহলে এটি আপনার জন্য, আপনার ছেলের জন্য, এবং তার বাবার জন্য মহাসাফল্য হবে। আল্লাহর কসম, এটা মহাসাফল্য।"

উম্মে ইবরাহীম সকলের মধ্য হতে তার ছেলেকে ডাকলেন। ইবরাহীম বলল, মা, আমি উপস্থিত।

তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার আদরের সন্তান! তুমি কি জিহাদের ময়দানে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়ার শর্তে এই মেয়েটিকে বিবাহ করতে রাজী আছ?

সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি সন্তুষ্ট।

উম্মে ইবরাহীম আল্লাহর দিকে ফিরলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক! হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক! আমি এই মেয়েটিকে আমার ছেলের সাথে বিবাহ দিচ্ছি এই শর্তে যে, সে নিজেকে জিহাদের ময়দানে কুরবানী করবে,

সে নিজেকে জিহাদের ময়দানে উৎসর্গ করবে। এবং কখনোই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। এবং কখনোই যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করবে না। সুতরাং তাকে কবুল করে নাও, ইয়া রব্বাল আলামীন!"

এই দুআ করার পর তিনি দ্রুত বাড়িতে গেলেন এবং বাড়ি থেকে দশ হাজার দিনার নিয়ে আসলেন। যুদ্ধে যাবার জন্য তার আদরের সন্তানকে একটি ভালো ঘোড়া এবং অস্ত্র কিনে দিলেন।

ইবরাহীম যুদ্ধে যাবার জন্য রণসাজে সজ্জিত হল। কুরআন তিলাওয়াতকারীরা তাকে ঘিরে তিলাওয়াত করতে লাগল-

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুমিনের জান ও মালকে ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।" (৯ সূরা তাওবা: ১১১)

উম্মে ইবরাহীম তার কলিজার টুকরা সন্তানকে বিদায় জানাতে এলেন। তিনি তার ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেন, "হে আমার আদরের পুত্র! তোমাকে সাবধান করছি, এই যুদ্ধে কোনো গাফলতি নয়, তুমি তোমার সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করবে, তুমি তোমার সর্বস্বকে উজাড় করে দিবে।"

তিনি তাকে একটি কাফনের কাপড় দিলেন, এবং তার কপালে চুমু খেয়ে বললেন, "ও আমার আদরের পুত্র! আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে আর কখনোই দুনিয়াতে পুনরায় একত্রিত না করেন। শেষ বিচারের দিনে মহামান্বিত ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর রহমতের ছায়াতলেই যেন আমাদের পুনরায় দেখা হয়।"

মুজাহিদীনগণ যাত্রা শুরু করলেন। আব্দুল ওয়াহিদ বর্ণনা করেন, "আমরা শত্রুদের এলাকায় পৌঁছলাম এবং শত্রুদের মুখোমুখি হলাম। শত্রুদের সাথে আমাদের তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। ইবরাহীম প্রথম সারিতে থেকে শত্রুদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে লাগল। কেননা, সে তো দুটি পুরস্কারের একটির অপেক্ষায় ছিল- হয়ত বিজয়, নয়ত শাহাদাত। তার মায়ের শেষ উপদেশ ছিল, এই যুদ্ধে কোনো গাফলতি নয়। তুমি তোমার সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করবে। তুমি তোমার সর্বস্বকে উজাড় করে দিবে। তাই, ইবরাহীম তার সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করতে লাগল। ইবরাহীমের তেজোদ্দীপ্ত ঘোড়া যেদিক দিয়েই যাচ্ছিল সেদিক দিয়েই কাফেররা পরাজিত হচ্ছিল। ইবরাহীমের ধারাল তলোয়ারের আঘাতে কাফেরদের গর্দানগুলি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছিল। ইবরাহীম ছিল কাফিরদের শরীরে কাঁটার মতো।

শত্রুরা বুঝতে পারলো এবং এই যুবক যোদ্ধার সাহসিকতা লক্ষ্য করল। তারা বুঝতে পারলো, যেভাবেই হোক, তাকে থামানো দরকার। তারা চতুর্দিক থেকে ইবরাহীমকে ঘিরে ফেলল। এবং সম্মিলিতভাবে আক্রমন করে ইবরাহীমকে শহীদ করে দিল। ইবরাহীম শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করল।"

আব্দুল ওয়াহিদ বর্ণনা করেন, যুদ্ধে জয়লাভ করার পর আমরা বসরায় ফিরে এলাম। বসরার লোকজন আমাদেরকে স্বাগতম জানাতে লাগলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন উম্মে ইবরাহীম। তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, "ও আবু উবায়েদ! যদি আল্লাহ আমার উপহারকে কবুল করে থাকেন তাহলে আমাকে অভিনন্দন জানান। নতুবা আমাকে সান্ত্বনা দিন।"

আব্দুল ওয়াহিদ বললেন, হে ইবরাহীমের মা! আল্লাহ তা'আলা আপনার উপহারকে গ্রহণ করেছেন। ইবরাহীম আল্লাহ তা'আলার নিকট জীবিত আছে। ইবরাহীম শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করেছে। সে শহীদদের মধ্য থেকে একজন।"

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না; বরং তারা তাদের রবের কাছে জীবিত এবং রিযিকপ্রাপ্ত।" (৩ সূরা আলে ইমরান: ১৬৯)

উম্মে ইবরাহীম আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্যে যিনি আমার সন্তানকে শহীদদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।"

পরের দিন সকালে তিনি মসজিদে দৌঁড়ে গেলেন এবং বললেন, হে আবু উবায়েদ! বুশরা! বুশরা! (সুসংবাদ গ্রহন করুন! সুসংবাদ গ্রহণ করুন!) আমি গতরাতে আমার ছেলেকে স্বপ্নে দেখেছি, সে সবুজ মিনার সমৃদ্ধ খুব সুন্দর একটি বাগানে ছিল। সাদা মুক্তার তৈরি একটি বিছানায় শুয়ে ছিল। তার মাথায় একটি মুকুট ছিল। সে আমাকে বলল, হে মা! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার দেয়া মোহরানা গৃহীত হয়েছে। এবং আমরা জান্নাতে আমাদের বিয়ে উদযাপন করছি।"

[https://archive.org/details/hd_20200327]

ꕥ এক মায়ের হাফেয ছেলেকে জিহাদে পাঠানোর কাহিনী

আবু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ, আমাদের সালাফদের মধ্য হতে তিনি একজন বড় মুজাহিদ ছিলেন। জিহাদের ময়দানে তার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে। বিশেষ করে রোমানদের বিরুদ্ধে তিনি অনেক যুদ্ধ করেছেন। আবু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ একবার মসজিদে নববীতে বসে তার আরব বন্ধুদের সাথে গল্প করছিলেন। তখন তার বন্ধুরা বলল, আবু কুদামা! তুমি তো তোমার সারাটি জীবন জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছ, জীবনে অনেক জিহাদ করেছ, আজকে তুমি আমাদেরকে জিহাদের ময়দানের এমন একটি ঘটনা শুনাও, যে ঘটনাটি তোমাকে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যান্বিত করেছে।

আবু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বললেন, আচ্ছা শুন! রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সময় আমরা একবার ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত দিকা নামক শহরের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে, আমি একটি উট কিনার জন্য এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করলাম। আমাদের অবস্থানের খবর শুনে একজন মহিলা আসল। সে আমার সাথে দেখা করল এবং বলল, আমার স্বামী জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছেন। আমার কয়েকজন ছেলেও জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছেন। আমার কয়েকজন ভাই ছিল, তারাও জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে গিয়েছেন। এখন শুধুমাত্র আমার একটি ছেলে বাকী আছে, আর ছোট্ট একটি মেয়ে। আমার ছেলেটির বয়স পনের বছর। সে হাফেযে কুরআন, হাদীসের ব্যাপারে ভালো জ্ঞান রাখে, দক্ষ অশ্বারোহী, দেখতেও খুব সুশ্রী। আমার খুব ইচ্ছা ছেলেটিকে জিহাদে পাঠাব। কিন্তু সে একটি কাজে শহরের বাইরে গেছে। এখনো পর্যন্ত ফিরে আসেনি। অপেক্ষায় আছি, সে আসলে আপনার সাথে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিব। আর এখন আপনাকে দেয়ার মত আমার কাছে কিছুই নেই। আফসোস, এত মহান একটি জিহাদ হচ্ছে আর আমি এটা থেকে বঞ্চিত থাকব, এটা তো কিছুতেই হতে পারে না! তখন তিনি ধুলায় মাখা কয়েকটি চুল দিয়ে বললেন, এই চুল গুলোকে আপনি ঘোড়ার লাগাম হিসেবে ব্যবহার করবেন, যাতে এই বরকতময় জিহাদে অংশগ্রহণ করা হতে আমি যেন কিছুতেই বঞ্চিত না হই।

আবু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি তার চুলগুলো নিলাম এবং তার ছেলেকে দেখার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু তার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে আমরা আমাদের গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলাম, পিছন দিক থেকে একজন অশ্বারোহী ধুলো উড়িয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। কাছে আসার পর যুবকটি আমাকে চাচা বলে ডাকল আর বলল, আমি ঐ মহিলার সন্তান যিনি আপনাকে জিহাদের জন্য চুল দান করেছিলেন। আমি আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চলে এসেছি।

আবু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি লক্ষ্য করলাম, এই ছেলেটি একেবারেই ছোট। চোদ্দ-পনের বছর হবে মাত্র। আর জিহাদ তো তার জন্য আবশ্যকও নয়। তাই আমি তাকে লক্ষ্য করে বললাম, বাবা, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। বাড়িতে গিয়ে তুমি তোমার মায়ের পাশে থাক, মায়ের খেদমত কর, মায়ের সেবা কর। তুমি আপাতত ফিরে যাও। তুমি বড় হয়ে এরপর জিহাদে অংশগ্রহণ করো।

ছেলেটি বলল, চাচা, আমার মা আমাকে শেষ বিদায় দিয়েছেন, তিনিই আমাকে আপনার সাথে থেকে জিহাদ করতে বলেছেন। আর আমি ভালো ঘোড়সওয়ার, দক্ষ তীরন্দাজ। আপনি আমাকে সাহসী যোদ্ধা হিসেবে পাবেন। কখনো জিহাদ হতে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারীরূপে পাবেন না। আপনি আমাকে সাথে নিন।

অনেক কাকুতি মিনতি করার পর আমি তাকে সাথে নিয়ে চললাম। আমরা কিছু পথ অতিক্রম করে এক জায়গায় তাঁবু গাড়লাম, এবং যাত্রা বিরতি করলাম। মুজাহিদীনরা সবাই রোযা রেখেছিলেন। তাই সফর করে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বিকাল বেলা আবার রান্না করতে হবে।

ছেলেটি বলল, চাচা, আপনারা সবাই রোযা রেখেছিলেন, সবাই খুব ক্লান্ত। তাই দেন, রান্না বান্নার কাজটা আমিই করি। সে জোর করে বলল। তাই রান্নাবান্নার কাজটা তাকেই দেয়া হল। মুজাহিদীনরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। রান্না করে এক পর্যায়ে সেও ঘুমিয়ে পড়ল।

আবু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ঘুমন্ত ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঘুমের মাঝে সে মিটমিট করে হাসছে। আমি অন্যান্য মুজাহিদ সাথীদেরকেও বিষয়টি দেখালাম। ছেলেটির ঘুম ভাঙার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি হাসছিলে কেন? সে বলতে চাইল না।

অনেক জোরাজুরির পর সে বলল, আমি দেখলাম, স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা নির্মিত বিশাল একটি প্রাসাদ। প্রাসাদটি দেখতে মনে হচ্ছে চাঁদের মত উজ্জ্বল। অনেকগুলো সুন্দর মেয়ে সে প্রাসাদ থেকে বের হয়ে আমাকে অভিভাদন জানাতে লাগল। আমাকে তারা অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। তাদের মধ্য থেকে একটি মেয়ে আমাকে ডাক দিয়ে বলল, 'হে মার্জিয়ার স্বামী! মার্জিয়া উপরে আছে।'

আমি উপরে চলে গেলাম। উপরে গিয়ে দেখি, অত্যন্ত সুন্দর একটি মেয়ে বসে আছে। যার উজ্জ্বলতা সূর্যের আলোকেও হার মানায়। আমি তাকে স্পর্শ করার জন্য তাড়াহুড়া করছিলাম। সে আমাকে বলল, 'ধৈর্য ধর, এখনো সময় হয়নি। আগামীকাল দুপুরে তুমি আমার সাথে সাক্ষাত করবে।' এরপর আমার ঘুম ভেঙে গেল।

আবু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পরের দিন রোমানদের বিরুদ্ধে আমরা তুমুল যুদ্ধ শুরু করলাম। এক পর্যায়ে আমরা বিজয় লাভ করলাম। রোমানরা পরাজিত হল। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল, আমাদের অনেক সাথী আহত হয়ে ময়দানে পড়ে আছে। সাথীরা আহতদের খুঁজছে। আমিও আহতদের মধ্যে মনে মনে ঐ ছেলেটিকে তালাশ করতে লাগলাম।

চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, সে কোথায় আছে। কিন্তু তাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ দেখতে পেলাম সে ছেলেটি রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে আছে। আমি দৌড়িয়ে ওর কাছে গেলাম। সে আমাকে লক্ষ্য করে বলল, 'চাচা, আমিতো শহীদ হয়ে যাচ্ছি। আমার এই রক্তমাখা জামাটা আমার মাকে গিয়ে দিবেন। আর বলবেন, আপনার ছেলে তার ওয়াদা পূর্ণ করেছে। সে লড়াই করতে করতে বিজয় এনেছে, পিছু হটে নি। এতে করে আমার মা সান্ত্বনা পাবেন। আর বাড়িতে আমার ছোট একটি বোন আছে। বাড়িতে তো কেউ ছিল না, তাই ও আমার কাছে থাকত। আমি ওকে অনেক আদর করতাম। ও আমাকে বাড়ি হতে বের হতে দিত না। সবসময় 'ভাইয়া' 'ভাইয়া' বলে ডাকত। আপনি যখন আমার বাড়িতে যাবেন, তখন আমার ছোট্ট বোনটাকে একটু সান্ত্বনা দিবেন। আর আমার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলবেন, আমি শহীদ হয়েছি। আপনি সৌভাগ্যবান শহীদের মা। আর চাচা, আমি যে আপনাকে আমার স্বপ্নে দেখা মার্জিয়ার কথা বলেছিলাম, মার্জিয়া আমার মাথার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।' এই বলে ছেলেটি শহীদ হয়ে গেল।

আবু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পরবর্তীতে যখন আমরা বাড়ি ফিরছিলাম, তখন আমরা সে ছেলেটির বাড়িতে গেলাম। বাড়িতে গিয়ে দেখি, ওর ছোট বোনটি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওকে বললাম, তোমার মাকে ডাক। ছেলেটির মা আসল এবং আমাকে বলল, আপনি কি আমাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছেন, না সুসংবাদ দিতে এসেছেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সান্ত্বনা কোনটা আর সুসংবাদ কোনটা? তিনি বললেন, আমার ছেলে যদি সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসে তাহলে আমাকে সান্ত্বনা দিন, আর আমার ছেলে যদি শহীদ হয়ে থাকে তাহলে এটা হবে আমার জন্য সুসংবাদ। আবু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, আপনার ছেলে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়েছে, সে পিছু হটেনি।' তখন ঐ মহিলা বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা ঐ সত্তার যিনি আমার এই ছেলেকে পরকালে আমার নাজাতের উসীলা বানালেন।'

[https://archive.org/details/hd_20200327]

মুসলিম উম্মাহর সম্মানিতা মা-বোনদের প্রতি একটি উন্মুক্ত পত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আস্সালামু আলাইকুন্না।

মুহতারাম মা আমার! প্রিয় বোন আমার!

আল্লাহ পাক আপন সত্তা ও গুণাবলিতে সকল কিছু থেকে পবিত্র এবং তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান ও স্নেহশীল। তিনি তাঁর হাবীব ﷺ-কে পুরো সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, যাকে সঠিক ও সত্য দ্বীন সহকারে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে যেন অপরাপর সকল দ্বীনের উপর তা জয়যুক্ত হয়ে যায়। যিনি ছিলেন তাঁর উম্মতের প্রতি অত্যন্ত রহমদিল ও স্নেহশীল। আল্লাহ পাক তাঁর হাবীব ﷺ -কে এমন পুরস্কার দান করার ওয়াদা করেছেন যা তাঁর হাবীবকে খুশি করে দিবে। হে আল্লাহ, আপনার হাবীবের প্রতি আমাদের সকলের পক্ষ থেকে দরূদ ও সালাম পৌঁছে দিন। সালাম বর্ষিত করুন আহলে বাইত সকল "আম্মাজানদের" প্রতি এবং সকল সাহাবায়ে কেরামের প্রতি। আম্মা বা'দ।

আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান,

وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

"আল্লাহ তোমার কোন ক্ষতি করতে চাইলে তিনি ছাড়া কেউ তা সরাতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ করতে চান, তবে তো সব কিছু করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে।" (সূরা আন'আম ৬:১৭)

আমরা মুসলমান, আল্লাহ তা'আলার কথার উপর এবং তাঁর হাবীবের ﷺ প্রদত্ত খবরের উপর আমাদের বিশ্বাস ও ভরসা থাকা চাই। যদি আমরা পরিপূর্ণরূপে দ্বীনের উপর থাকি, আল্লাহ পাককে সবসময় সাথে পাবো ইনশাআল্লাহ্। আর যদি পরিপূর্ণরূপে দ্বীনের উপর না থাকি, তাহলে যতই সতর্কতা অবলম্বন করা হোক না কেন, আল্লাহ পাককে সাথে পাবো না। তখন আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত সবই বৃথা হয়ে যাবে।

আমরা প্রিয় নবীজী ﷺ-এর সেই বিখ্যাত হাদীসটি স্মরণ করি যেখানে তিনি ﷺ ইরশাদ ফরমান,

بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

"ইসলাম শুরুতে অপরিচিত ছিল, আবার শীঘ্রই তা অপরিচিত হয়ে যাবে। তখন সেই অপরিচিত ইসলামের উপর যারা টিকে থাকবে তাদের জন্য সুসংবাদ।" (সহীহ মুসলিম-১৪৫)

আমার প্রিয় মা! আমার প্রিয় বোন!

দয়া করে আমরা এমন মনে না করি যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমজান মাসের সিয়াম পালন, কুরআন কারীম তিলাওয়াত করা, বাচ্চা দেখা-শুনা করা, রান্নাবান্না করা, স্বামীর খেদমত করা আর পর্দায় থাকা ছাড়া ইসলামে আমার আর কোনো কাজ নেই; হায়, ইসলাম তো এমন নয়!

আমরা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, আজ পৃথিবীতে আমাদের মহান ধর্ম ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্ কী অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছে! আজ কুফুরিশক্তিগুলো মুসলমানদের উপর হত্যাযজ্ঞ ও গণহত্যা চালাচ্ছে। মুসলমানদের জন-জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। আজ যেন মুসলিমরা নিজ ভূমিতে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। দুনিয়ার সকল কুফ্ফার শক্তি এক হয়ে আজ ইসলাম ও মুসলিম নিধনের উন্মত্ত খেলায় উন্মাদ হয়ে গেছে। মুসলমানদের রক্ত

নিয়ে আজ 'জোয়া' খেলায় মত্ত হয়েছে। মা-বোনদের ইজ্জত আব্রু হরণ করাকে ক্রীড়ার বিষয়ে পরিণত করেছে। মুসলিমদের ভূমিগুলোকে একের পর এক দখল করে যাচ্ছে। জায়নবাদ, খ্রিস্টবাদ আর হিন্দুত্ববাদের কালো থাবা কী ভয়ানক রূপে এই উম্মাহকে আজ গ্রাস করছে! এমতাবস্থায় উম্মাহর একজন দরদী মা কিংবা বোন হিসেবে কি আমাদের কিছুই করনীয় নেই? আমাদের দায়িত্ব কি কেবল ঘর-সংসার করার মাঝেই সীমাবদ্ধ?

মুসলিম উম্মাহর সকল মাযহাব ও মতাদর্শের উলামায়ে হক এই ব্যাপারে একমত যে, বর্তমান যামানাই সেই যামানা যখন চলমান বিশ্বপরিস্থিতিতে সক্ষম সকল মুসলিম নর-নারীর উপর জিহাদ ফরযে আইন, যেমনভাবে নামায-রোযা-হজ্জ-জাকাত ফরয। এমনকি বর্তমান পরিস্থিতিতে সন্তানের জন্য পিতামাতার নিকট কিংবা স্ত্রীর জন্য স্বামীর নিকট হতে জিহাদের কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য অনুমতি গ্রহনের প্রয়োজনীয়তাও নেই। (এই ব্যাপারে বক্ষ্যমাণ কিতাবের দ্বিতীয় পর্ব 'তাওহীদ ও জিহাদ' নামক কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখান থেকে দেখে নেয়া যায় ইনশাআল্লাহ।)

আমার প্রিয় মা! আমার প্রিয় বোন!

আল্লাহ পাক তার প্রত্যেক বান্দাকে তার অবস্থানে রেখে পরীক্ষা করেন এবং কাউকে এমন কোনো পরীক্ষায় ফেলেন না কিংবা এমন কোনো দায়িত্ব অর্পন করেন না যা সামাল দেয়া বা বহন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۚ

"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে দেন না।" (সূরা বাকারা ২: ২৮৬)

পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের উপরও এই মহান শরীয়ত জিহাদের হুকুম অর্পন করেছে। সুবহানাল্লাহ! আর এ ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ববর্তী (সালাফ) নারীগণ আমাদের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন, কিভাবে তারা জিহাদকে ভালোবেসেছেন, কিভাবে তারা নিজেদের সাধ-আহ্লাদকে আল্লাহর ইচ্ছার সামনে কুরবানী করেছেন, কিভাবে তারা নিজেদের স্বামী-সন্তান-ভাইদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাদেরকে ময়দানে পাঠিয়েছেন, কিভাবে তারা কলিজার টুকরা সন্তান ও প্রিয়জনদের শাহাদাতে সবর করেছেন, পরকালের প্রতিদানের আশায় আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি প্রদর্শন করেছেন, কিভাবে তারা দুনিয়ার দুঃখ কষ্টগুলো হাসিমুখে, মুখবুজে সয়ে গেছেন, কিভাবে অনেকে আবার জিহাদের ময়দানে সশরীরে উপস্থিত হয়ে লড়াইও করেছেন আর এভাবেই তারা তাদের উপর অর্পিত জিহাদের ফরয দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে গিয়েছেন! আল্লাহু আকবার!

সুতরাং জিহাদের ক্ষেত্রে আমাদের করণীয়গুলো ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে ইনশাআল্লাহ। নতুবা আমরাও ফরয তরককারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।

প্রিয় মা! প্রিয় বোন!

প্রশ্ন করতে পারেন, বর্তমান যামানায় আমরা নারীরা কিভাবে জিহাদের ফরযিয়াত আদায় করব?

আমরা অনেক উপায়ে জিহাদের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারি ইনশাআল্লাহ। যেমন: আমাদের স্বামী-সন্তান আর ভাইদেরকে দাওয়াত, ই'দাদ ও জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা, তাদের মনে জিহাদী চেতনা ও মানসিকতা গড়ে তোলা, জিহাদের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করা, তাদেরকে জিহাদের ময়দানে পাঠানো, অর্থ-সম্পদ দিয়ে মুজাহিদ ভাইদেরকে

সহযোগিতা করা ও জিহাদের কাজকে বেগবান করা, মুজাহিদ ভাইদেরকে আশ্রয় দেয়া, নিজেদের বাড়িতে মুজাহিদ ভাইদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা, সর্বাত্মক সহায়তা করা, তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করা ইত্যাদি।

আমাদের স্বামী-সন্তান-ভাইয়েরা জিহাদের প্রয়োজনে আমাদেরকে সাথে করে কিংবা একাকী হিজরত করলে তাদের সঙ্গ দেয়া কিংবা তাদের বিচ্ছেদে সবর করা। এক্ষেত্রে আমরা কিভাবে চলবো, আমাদের রুজী-রোজগারের কী হবে, এই চিন্তায় যেন আমরা চিন্তিত না হই! যদি এই চিন্তায় আমরা ধৈর্যহারা হয়ে যাই, তাহলে আমাদের যিন্দেগীতে আল্লাহ কোথায় আছেন, তাঁর স্থান কোথায়?

আমার স্বামী-সন্তান-ভাই কি আমার রব (প্রতিপালক)? বিয়ের আগে আমার পিতা আমাকে পালেননি, পেলেছেন আমার আল্লাহ!

বিয়ের পরে আমার স্বামী-সন্তান আমাকে পালছেন না, পালছেন আমার আল্লাহ! তারা যদি জিহাদে চলে যায়, শহীদ হয়ে যায়, কিংবা ঘরে পড়ে আজকেই মারা যায়, তবুও যিনি আমাকে পালবেন তিনি তো আর কেউ নয়, আমার আল্লাহ!

তারা যদি আমাদেরকে রেখে যায়, কিংবা সাথে নিয়ে হিজরত করে, সেখানেও আমাদের পালবেন আমাদের আল্লাহ! তিনিই তো রিযিকদাতা! আমাদের পালনকর্তা হিসেবে তিনিই কি যথেষ্ট নন?...............

প্রিয় মা! প্রিয় বোন!

বর্তমানে আমাদের উপর সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো, স্বামী-সন্তান ও ভাইয়ের বিচ্ছেদে সবর করা। জিহাদের প্রয়োজনে তারা হিজরত করলে, কিংবা কারারুদ্ধ হলে, কিংবা আহত হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেললে, অথবা আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করলে প্রতিদান লাভের আশায় ধৈর্য ধারণ করা। এতে ঘরে বসেও আমরা পরিপূর্ণ জিহাদের সওয়াব পাবো, ইনশাআল্লাহ।

আমরা হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রীর কথা স্মরণ করি। কিভাবে তিনি সবর করেছিলেন, যখন তাঁর স্বামী তাকে বাসর রাতে ফরয গোসলের হালতে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ময়দানে আর সেদিনই শহীদ হয়ে যান!

আমরা হযরত হাযেরা আলাইহাস্ সালাম ও তাঁর সন্তান হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামের কথা স্মরণ করি। কিভাবে তাঁরা আল্লাহর হুকুমের সামনে নিজেদেরকে কুরবানী করেছিলেন, আল্লাহর জন্য সবর করেছিলেন, যখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাদেরকে আল্লাহর হুকুমে জনমানবহীন ধু ধু মরুভূমির বুকে খাদ্য-পানীয়বিহীন অবস্থায় ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন! আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ধ্বংস করেননি, বরং তাদেরকে ইজ্জতের সাথে দুনিয়াতে রেখেছেন এবং জান্নাতকে তাদের দ্বারা সম্মানিত করেছেন।

সুতরাং আল্লাহর হুকুম পালনার্থে যদি আমাদের স্বামী-সন্তান-ভাইয়েরা আমাদেরকে রেখে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও ধ্বংস করবেন না, দুনিয়া ও আখিরাতে তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। তিনিই পরকালে আমাদেরকে নাজাত দিবেন ও জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নির্ঝরিনীসমূহ প্রবাহিত!

আরেকটি বিষয় চিন্তা করি!

আমাদের স্বামী-সন্তান ও ভাইয়েরা যদি শহীদ হয়, তাহলে আমরাও তাদের সাথে সাথে শহীদের মর্তবা পাবো ইনশাআল্লাহ্। কিভাবে? কেন নয়, আমাদের মৃত্যুর পর কি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সেই জান্নাতে পাঠিয়ে দিবেন না, যে জান্নাত তারা শাহাদাত লাভ করে পেয়েছে? সেই জান্নাতে কি তাদের সাথে আমাদেরকে একত্রিত করে দিবেন না, যেই জান্নাত তারা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে লাভ করেছে? সুবহানাল্লাহ!

একটু চিন্তা করুন, আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের উপর কী পরিমাণ মেহেরবান!
আমরা ঘরে বসে থেকে একটু সবর করে কত নিয়ামত লাভ করলাম!
আর আমাদের দুনিয়ার এই বিচ্ছেদ চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ নয়, অনন্তকালের বিচ্ছেদ নয়; এই বিচ্ছেদ সাময়িক, ক্ষণকালের। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যা দিবেন, তাতে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যাবে, দিল্ ভরে যাবে। এরপর আমরা আর পৃথক হবো না ইনশাআল্লাহ।
সুতরাং প্রিয় মা! প্রিয় বোন! আমাদের স্বামী-সন্তান কিংবা ভাইয়েরা জিহাদে গিয়ে যদি আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেন, কিংবা তাগুতের কারাগারে বন্দী হন কিংবা মহাসৌভাগ্যবান শহীদী কাফেলার সাথী হয়ে যান, তাহলে প্রিয় মা আমার, প্রিয় বোন আমার, আমরা কি পারি না একটু সবর করতে? একটু কষ্ট করে দুনিয়ার যিন্দেগীতে নিজের চাহিদাগুলোকে আখিরাতের জন্য রেখে দিতে? নিজের আরাম-আয়েশ আর সুখ-আহ্লাদগুলোকে কবর, হাশর আর জান্নাতের জন্য রেখে দিতে? একটু চিন্তা করি, আমার স্বামী কি শখের বশবর্তী হয়ে জিহাদে গিয়েছে? সে তো আল্লাহর জন্যই তার যিন্দেগীর সকল সাধ-আহ্লাদ, আনন্দ-সুখ আর প্রেম-ভালোবাসাকে কুরবানী করেছে, এবং আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে। এদিকে, আমিও কি পারবো না, জিহাদের জন্য তার এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের আশায় সবর করতে? পরকালে আমাকে যে 'একজন মুজাহিদের স্ত্রী' কিংবা 'একজন শহীদের স্ত্রী' হিসেবে আমার স্বামীর সাথে একজন মুজাহিদ/শহীদের জান্নাতে স্থান দেয়া হবে, পিতামাতাকে তার শহীদ সন্তানের সাথে স্থান দেয়া হবে, যা একশত স্তর বিশিষ্ট হবে আর প্রতিটি স্তরের বিস্তৃতি হবে আসমান যমীনের সমান (সুবহানাল্লাহ!), সেই জান্নাতের আশায় বুক বেঁধে আমরা কী ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারবো না?
আরেকটু চিন্তা করি, আমার স্বামী, যে আমাকে রেখে আল্লাহর হুকুমকে বাস্তবায়ন করতে ময়দানে চলে গেছেন, সে কি খুব আরামে আছে? সে কি না খেয়ে, না ঘুমিয়ে কষ্ট করছে না? বুলেটের আঘাতে, বোমার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে না? ব্যথায়-কষ্টে ছটফট করছে না? সে কি এখন চিন্তা করছে না, 'এখন যদি আমার প্রেমময়ী, সোহাগিনী স্ত্রী আমার কাছে থাকতো, তাহলে সে আমার সেবা-শুশ্রুষা করতো, একটু আদর করতো, একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দিত, কষ্টের দিনগুলোতে একটু সান্ত্বনা দিত, যেমনটি সে বাড়িতে থাকতে আমি অসুস্থ হয়ে গেলে করতো?'
আহ্! আপনার স্বামী কি আপনার বিচ্ছেদে কান্না করছে না? আপনার জন্য কি তার বুক ফেটে যাচ্ছে না? আপনাকে কাছে পেতে, আপনার একটু ভালোবাসা ও প্রেম পেতে তার মন কেমন বেচাইন হয়ে আছে, একটু চিন্তা করুন তো! একটু চিন্তা করুন তো, তিনি কেন এই কষ্টের যিন্দেগী বরণ করে নিয়েছেন? হ্যাঁ, শুধুমাত্র, কেবলমাত্র আল্লাহর একটি ফরয বিধান তার ও আপনার মাঝে সাময়িক বিচ্ছেদের একটি রেখা টেনে দিয়েছে। হায়! তিনি তো আল্লাহর একটি বিধানের জন্যই সবকিছু কুরবানী করেছেন। সুতরাং যদি আমিও তার মত ধৈর্য ধারণ করতে না পারি, তাহলে কি দয়াময় আল্লাহ আমাকে পরকালে তার সাথে নেয়ামতে ভরা, সুউচ্চ জান্নাতে থাকার সৌভাগ্য দান করবেন?
প্রিয় বোন আমার! আমাদের জীবনে কষ্ট-মুসীবত আর পরীক্ষা আসবেই, আসতেই থাকবে। এটিই আল্লাহর চিরাচরিত বিধান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ -وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

"মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে।" (২৯ সূরা আনকাবূত: ২-৩)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

'আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, জান-মালের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। আর সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।' (সুরা আল-বাকারা : ১৫৫)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জিহাদকারীদেরকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থান সমূহ যাচাই করি।" (৪৭ সূরা মুহাম্মাদ: ৩১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

'তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে; অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করোনি, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের ওপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর তাদের এমনই শিহরিত হতে হয়েছে, যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য! তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।' (সুরা আল-বাকারা : ২১৪)

এ আয়াতে আল্লাহ মুমিনদের কঠিন পরীক্ষা দিয়ে তবেই জান্নাতে যাওয়ার আশা করার কথা বলেছেন। পরীক্ষা তাও যেই সেই নয়, নবীদের উপর যেমন পরীক্ষা এসেছে! আর নবীদের উপর পরীক্ষার ধরণ এতটাই কঠিন ছিল যে, নবী ও তাঁর উম্মত সবাই পেরেশান হয়ে গেছেন এই ভেবে যে, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : مَا لعَبدِى المُؤْمِنِ عِنْدِى جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إلا الجَنَّةَ

'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি যদি কোনো মুমিনের প্রিয়জনকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যাই, আর সে সওয়াবের আশায় সবর করে, আমার কাছে তার প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।' (সহিহুল বুখারি : ৮/৯০, হা. নং ৬৪২৪)

আমার প্রিয় বোন! আমার প্রিয় মা! বলুন, মুসলিম উম্মাহর-

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা আল্লাহর রাস্তায় সন্তান কুরবানী করার জন্য আল্লাহর কাছে সন্তান কামনা করতো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা তাদের সন্তানদেরকে মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তুলতো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা তাদের সন্তানদেরকে শহীদ হিসেবে দেখার জন্য ছোট্ট সময় দুগ্ধপান করাতো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যাদের মাতৃদুগ্ধে এই পরিমাণ ধার ছিলো যে, তাদের সন্তানরা কিসরা কায়সারের সাম্রাজ্যগুলোকে তছনছ করে দিয়েছিলো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা নিজের হাতে অস্ত্র ক্রয় করে সন্তানের হাতে তুলে দিতো, এই আশায় যে, তার সন্তান আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত লাভ করবে?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা তাদের পুত্র বধূ হিসেবে জান্নাতের হূরদের দেখতে বেশি ভালোবাসতো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা তাদের সন্তানদের সাথে হূরের বিবাহের জন্য দুনিয়াতে মোহরানা আদায় করে দিতো?

সেই মায়েরা আজ কোথায়, যারা তাদের সন্তানদের শাহাদাতের উপর গর্ববোধ করতো?

আজ কোথায় সেই মায়েরা, যাদের সন্তান শহীদ হলে তার বাড়িতে বিয়ে বাড়ির আমেজ চলে আসতো? আনন্দ মিছিল বের হতো? আজ কোথায় তারা?

কোথায় আজ ছফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব?

কোথায় আজ উম্মে উমারা?

কোথায় আজ আসমা বিনতে আবু বকর?

(রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না আযমাঈন)

সেই মায়েরা আজ কোথায়?

সেই স্ত্রীরা আজ কোথায়, যারা বাসর ঘর থেকে তাদের স্বামীদেরকে জিহাদের ময়দানে শাহাদাতের জন্য পাঠিয়ে দিতো?

কোথায় আজ তারেক বিন যিয়াদ আর মুহাম্মাদ বিন কাসীমের বোনেরা?

পরম মমতাময়ী, সোহাগিনী, প্রেমময়ী কিন্তু পাহাড়ের মতো অটল-অবিচল ঈমানওয়ালী; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মহব্বতকারিনী, প্রিয়তমের বিচ্ছেদে সবরকারিনী আমার সেই বোনেরা আজ কোথায়?

কেন আমরা আবারো বুকে পাথর বেঁধে ধৈর্য ধারণ করছি না?

কেন আমরা আজ আরো লাখো মুসলিম মা-বোনের উপর অত্যাচার-নির্যাতন আর ধর্ষণের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আমাদের স্বামী- সন্তান-ভাইদেরকে ময়দানে পাঠাচ্ছি না?

আল্লাহ তা'আলা আমার হাবীব ﷺ-এর উম্মতের মা-বোনদের প্রতি রহম করুন। তাদের ইজ্জত-আব্রুর সর্বোচ্চ হেফাযত করুন। আমীন।

মাআস্সালাম।

পিতা মাতার প্রতি একটি বিদায়ী চিঠি

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ!

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বে কারীমের যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, পথ দেখিয়েছেন, তাঁর হুকুম মানাকে আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। আশাকরি, তাঁর আনুগত্য করে আমরা কখনো ব্যর্থ মনোরথ হবো না, কেননা তিনি ওয়াদা করেছেন, মুমিনদের নেক আমলগুলোকে তিনি কখনো বিনষ্ট করবেন না, উপরন্তু পরিপূর্ণ বদলা দিবেন।

সালাম ও দরুদ সেই মহান হাবীবের ﷺ প্রতি যিনি বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ ছিলেন, যিনি ছিলেন পৃথিবীর বুকে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মহানায়ক, আমাদের দুই জাহানের নেতা, যার ভালোবাসায় আমরা আমাদের সর্বস্ব কুরবানী করে দিতে সদাপ্রস্তুত।

পরম শ্রদ্ধেয় মা-বাবা আমার!

আল্লাহ তা'আলা হুকুম করেছেন যেন আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনি, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করি এবং যেন পিতা মাতার অনুগত থাকি, আপনাদের মহব্বত করি, আপনাদের খেদমত করি। এগুলো সন্তান হিসেবে আমার উপর ফরয (অবশ্য করণীয়) দায়িত্ব। এগুলো আমাকে করতেই হবে। একই সাথে বিশ্বজগতের পালনকর্তা মহান আল্লাহ তা'আলা আমাকে হুকুম করেছেন, যেন আমি তাঁকে, তাঁর রাসূলকে এবং তাঁর পথে জিহাদ করাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, ইসলামের জন্য নিজের জান-মাল দিয়ে যুদ্ধ করি। এটিও আমার উপর ফরয করেছেন। তাই আমি আজ আল্লাহ তা'আলার হুকুমকে বাস্তবায়ন করতে জিহাদের ময়দানে যাচ্ছি।

উলামায়ে কেরাম বলেন, "ঈমান আনার পর প্রথম ফরয হচ্ছে, মুসলিমদের ভূমিকে প্রতিরক্ষা করা। যদি মুসলিমদের ভূমির এক বিঘত পরিমাণের জায়গাও কুফফাররা দখল করে নেয়, তখন প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় (জিহাদ করতে সক্ষম সকলের উপর ফরয হয়ে যায়)। ঐ মুহূর্তে জিহাদে বের হওয়ার জন্য পিতা-মাতার কাছ থেকে তার সন্তানের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না এবং স্বামীর কাছ থেকে তার স্ত্রীরও অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।"

আর বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে জিহাদ অবশ্যই ফরযে আইন, যেমন নামায-রোযা ফরয আইন। এ বিষয়ে সকল মত আর মাযহাবের ইমামগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর তাই জিহাদের প্রয়োজনে দাওয়াত ও ই'দাদ, হক জিহাদী তাঞ্জীমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, আমীরের হুকুম বা নির্দেশনা অনুযায়ী জিহাদের সকল তাকাজা পুরা করা, প্রয়োজনে জিহাদের জন্য হিজরত করা- এসবই বর্তমানে ফরযে আইন। আর শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী, জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় এসকল কাজের জন্য পিতামাতার অনুমতির প্রয়োজন নেই। এজন্য জিহাদে সম্পৃক্ত হওয়া কিংবা জিহাদের জন্য হিজরত করার ব্যাপারে আপনাদের অনুমতির অপেক্ষা আমি করিনি। আপনাদেরকে না জানিয়েই চলে যাচ্ছি।

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

"আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে যালেম (অত্যাচারী)! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। যারা ঈমানদার, তারা জিহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে। সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাকো শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।" (সূরা নিসা ৪:৭৫,৭৬)

তিনি আরো ইরশাদ করেন,

وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ

"আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে।" (সূরা বাকারা ২:১৯০)

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ۚ

"আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পুরোপুরি ও সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" (সূরা আনফাল ৮:৩৯)

প্রিয় আম্মা-আব্বা আমার!

আপনারা দয়া করে একটু চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। সিরিয়া, ইরাক, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, মায়ানমার, কাশ্মীর, আসাম, চেচনিয়া, উইঘুর সর্বত্র কেবল মুসলিম নিধনের মহড়া চলছে। মুসলিম মায়ের বুক খালি করা হচ্ছে, বাবার সামনে সন্তানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। দুনিয়ার বুক থেকে ইসলামকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য বাতিল তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মা! আমি বেঁচে থাকব আর এ পৃথিবীতে ঈমান, নামায, রোযা, হজ, যাকাত থাকবে না তা কী করে হতে পারে? বাবা! আমি বেঁচে থাকবো আর দীন ইসলাম দুনিয়া হতে মিটে যাবে তা কী করে মেনে নেয়া যায়? আমি যদি ঘরে বসে থাকি, আর এই হালতে আমার মৃত্যু চলে আসে, হায়! এই মুখ আমি কিভাবে আল্লাহকে দেখাব, আমার রাসূলের ﷺ সামনে আমি কিভাবে দাঁড়াব? আমি কিভাবে ঘরে বসে থাকব, অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"৩৮. হে ঈমানদারগণ! এ কি হলো তোমাদের! যখন তোমাদের আল্লাহ তা'আলার পথে (কোনো অভিযানে) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা যমীন আঁকড়ে ধরো; তোমরা কি আখেরাতের (স্থায়ী কল্যাণের) তুলনায় (এ) দুনিয়ার

(অস্থায়ী) জীবনকে নিয়েই বেশি সন্তুষ্ট? (অথচ) পরকালে (হিসাবের মানদন্ডে) দুনিয়ার ভোগসামগ্রী নিতান্তই কম। ৩৯. তোমরা যদি (তাঁর পথে) না বের হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দিবেন, তোমরা তার কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (০৯ সূরা তাওবা: ৩৮-৩৯)

قُلۡ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ وَإِخۡوَٰنُكُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ وَعَشِيرَتُكُمۡ وَأَمۡوَٰلٌ ٱقۡتَرَفۡتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرۡضَوۡنَهَآ أَحَبَّ إِلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٖ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা (ক্ষতি বা) বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর, এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত (দেখ, তোমাদের পরিণতি কী হতে যাচ্ছে), আর আল্লাহ তা'আলা ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" (০৯ সূরা তাওবাহ: ২৪)

আপনাদের উসীলায় আল্লাহ তা'আলা আমাকে ঈমান দিয়েছেন, আপনারা আমাকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে চিনিয়েছেন। আমি যা করেছি তা তো আল্লাহ তা'আলার হুকুম আর তাঁর রাসূলের তরীকা ও সুন্নত, তাঁর যিন্দেগীর আদর্শ।

আপনাদের সন্তান হিসেবে যেভাবে আপনাদের খেদমত করার কথা ছিল, সেভাবে খেদমত করতে পারিনি। আজীবন আপনারা আমার জন্য কষ্ট করে গিয়েছেন। আজীবন আপনাদের থেকে খেদমত নিয়েছি। কিন্তু জীবনে আপনাদের তেমন কোনো খেদমত করতে পারিনি, আপনাদের সুখের জন্য তেমন কিছুই করতে পারিনি। আপনাদের অনেক আশা ও স্বপ্ন ছিল, আপনাদের সন্তান অনেক বড় মানুষ হবে, পড়াশুনা শেষ করে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হবে, জায়গা-জমি ক্রয় করে বাড়ি করবে, গাড়ি করবে, নাতি নাতনীদের নিয়ে সুখ-শান্তিতে বসবাস করবে আর আপনারা আপনাদের সন্তানকে নিয়ে গর্ব করবেন। আহ্! আমি তো পারলাম না আপনাদের সে স্বপ্ন-কে বাস্তবায়ন করতে, আপনাদের চোখে-মুখে হাসি ফুটাতে, আপনাদের সারাজীবনের কষ্টকে ফলপ্রদ করতে।

বলুন মা! আমি কিভাবে আপনার স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়ন করব যখন দেখি, লাখো মায়ের স্বপ্নগুলোকে হিন্দু-বৌদ্ধ খ্রিস্টান-ইহুদী-নাস্তিক-মুরতাদরা পদদলিত করে অঙ্কুরে হত্যা করছে?

বলুন বাবা! আমার রক্তে কেন আগুন জ্বলবে না, যখন দেখি লাখো বোনের সম্ভ্রম নিয়ে জারজের বাচ্চারা তামাশা করছে, ছিনিমিনি খেলছে? এসব দুনিয়ার ডিগ্রি-চাকরী-ব্যবসার কী মূল্য আছে আল্লাহ তা'আলার কাছে, যদি আমি আল্লাহর জন্য নিজের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করতে না পারি, আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মেহনত করতে না পারি?

হ্যাঁ, দুনিয়াতে আপনাদের স্বপ্ন আমি বাস্তবায়ন করতে পারিনি, তাই বলে কখনো আপনাদের মুখে হাসি ফুটাতে পারবো না এমনটি নয়। আশা করি, আমার রব আমাকে ব্যর্থদের অন্তর্ভূক্ত করবেন না, না-কামিয়াব করবেন না। হাদীসে এসেছে, একজন শহীদ তার পরিবারের সত্তর জন সদস্যদের জান্নাতে নেয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করবে। আপনারা দুআ করেন যেন আমি তাদের শামিল হতে পারি। তাহলে, ইনশাআল্লাহ, কথা দিলাম, আপনাদেরকে

ছেড়ে আমি কখনোই জান্নাতে যাবো না। আপনারা আমার জন্য এতো কষ্ট করেছেন, আর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আপনাদের শুধু কষ্টই দিয়ে গিয়েছি, আর মৃত্যুর পর আমি একাকী সুখ ভোগ করবো আর আপনারা মৃত্যুর পরও কষ্ট করবেন, এটা কখনোই হতে পারেনা। ইনশাআল্লাহ, আমার রব কখনোই আপনাদের দুটি কষ্টকে একত্র করবেন না।

আপনারা গর্বিত হোন এজন্যে যে, আপনারা এমন কোনো কাপুরুষকে জন্ম দেন নি, যে জিহাদের তপ্ত ময়দানের লু হাওয়ার চেয়ে ঘরে বসে স্ত্রীর আঁচলে লুকিয়ে থাকাকে বেশি পছন্দ করে।

আপনারা এজন্য গর্ববোধ করুন যে, আপনারা এমন এক সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, যে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত মুসান্না বিন হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত তারিক বিন যিয়াদ রহ., হযরত সালাউদ্দিন আউয়ুবী রহ., হযরত সাইফুদ্দিন কুতয. রহ., হযরত মুহাম্মাদ বিন কাসিম রহ., হযরত ড. আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ., হযরত উসামা বিন লাদেন রহ. এর পদাঙ্ক অনুসারী।

আপনারা আমার জন্য দুআ করুন যেন আমি তাদের কাতারে শামিল হতে পারি।

জনম দুখী মা আমার!

একজন মা-ই জানেন তার বুক খালি হওয়ার কষ্ট কী! আপনার বুক খালি করে আমি চলে যাচ্ছি। অনন্তের পথে বিদায় নিচ্ছি। জানিনা, দুনিয়াতে আর কখনো আমাদের দেখা হয় কিনা!

আপনাকে সান্তনা দেয়ার ভাষা আমার নেই, মা! দয়া করে আপনি পরকালের লাভের আশায় ধৈর্য ধরুন। আপনি আমার কামিয়াবীর জন্য দুআ করবেন, যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে ময়দানে দৃঢ়পদ রাখেন, কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ধ্বংস না হয়ে যাই, মৃত্যুকে যেন কখনো ভয় না পাই। হয়তো শরীয়ত, নয়তো শাহাদাত- এ দুটোর একটা যেন অবশ্যই আমি লাভ করতে পারি। আমিও আপনাদের জন্য সবসময় দুআ করতে থাকব, ইনশাআল্লাহ।

চির স্নেহময় বাবা আমার!

আপনার কাছ থেকেও বিদায় নিচ্ছি। হয়তো এরপর আপনাদের সাথে আর কখনো দেখা বা কথা নাও হতে পারে। ইনশাআল্লাহ হাশরের ময়দানে আবার দেখা হবে এবং জান্নাতে আমরা আবারো একসাথে বাস করব। তখন আপনাদেরকে আমি আর কষ্ট দিব না, কথা দিচ্ছি। আমার পক্ষ থেকে আমার ভাই-বোনদের সালাম দিবেন। তাদের কাছ থেকেও আমি বিদায় নিচ্ছি।

আপনাদের সকলকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে খুব ভালো রাখুন, ইজ্জত ও সম্মানের সাথে রাখুন। আল্লাহুম্মা আমীন।

ইতি-

আপনাদের অতি আদরের সন্তান।

গাযওয়াতুল হিন্দের ডাক:

প্রিয় ভাই! কিয়ামতের আগে ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদীদের সাথে তাওহীদবাদীদের এক ভয়ানক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হবে, হাদীসের ভাষায় একে 'গাযওয়াতুল হিন্দ' বলা হয়। যে সকল ভাইয়েরা হিন্দুস্তান তথা বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে আছেন, তাদেরকে বলছি! এই উপমহাদেশে মালাউন হিন্দুত্ববাদীদের দৌরাত্মের কথা একটু চিন্তা করি।

মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসন আজকের নতুন কথা নয়। সে ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। ঐতিহাসিকভাবেই হিন্দুত্ববাদীদের হাতে মুসলিমরা নির্যাতিত হয়ে আসছে। আর এমনটি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক!!

কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

"মানবজাতির মধ্যে তুমি ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে মুসলিমদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবে।" (সূরা মায়েদা ৫:৮২)

প্রশ্ন হল, কেন হিন্দুস্তানে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক দিন দিন অবনতি হচ্ছে?

তার উত্তর হচ্ছে-

ক. হিন্দু-জাতীয়তাবাদী দলগুলির বিস্তার, যেগুলি "রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের" তথা আরএসএস- এর রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বা তার অধীনে কাজ করে। আরএসএস ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), ভারতীয় হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি), বজরং দল, ইসকন (ISKCON) ইত্যাদি।

খ. হিন্দুত্ববাদীদের চরম মাত্রার ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ।

গ. উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনা, যার একটি বিশেষ রূপ হল হিন্দুত্ববাদী 'অখণ্ড ভারত' তথা 'রাম-রাষ্ট্রে'র দাবী উত্থাপন, যার মাধ্যমে মুসলিম নিধনের উন্মাদনা দানা বাঁধতে থাকে। ফলে তারা প্রকাশ্যে মুসলিম গণহত্যা ও জাতিগত নিধনের জন্য আহ্বান জানাতে শুরু করে।

আগস্ট ১৪, ২০২১ ভারতের মানচিত্রে বাংলাদেশকে যুক্ত করে পাশের মানচিত্রটি (দুটি শ্লোগানসহ) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেইসবুকে পোস্ট দেয় মালাউন দিলীপ ঘোষ নামের এক বিজেপি নেতা। (লিংক: https://bit.ly/dilipmap)। তাতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শীলঙ্কা, মিয়ানমারের মতো ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন দেশগুলোকে ভারতের অংশ হিসেবে দেখানো হয়। এমনকি, মুসলিমদের নীরবতা আর দূর্বলতার সুযোগে মালাউন হিন্দুত্ববাদীরা এতটাই উন্মাদ ও আত্মঘাতী হয়ে উঠেছে যে, মুসলিমদের সব অধিকার থেকে বঞ্চিত করে 'হিন্দু রাষ্ট্রের' নতুন 'সংবিধান' পর্যন্ত

তৈরী করে ফেলেছে তারা। হিন্দু রাষ্ট্রের সংবিধানের খসড়া অনুসারে, অহিন্দুরা বিশেষতঃ মুসলিমরা তথাকথিত ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। [https://bit.ly/3AvWrZM]

অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্রের সংবিধান তৈরি করেছে মালাউন হিন্দুত্ববাদীরা

পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশগুলোকে বিশেষত বাংলাদেশকে স্বাধীন সিকিম কিংবা হায়াদ্রাবাদের মত গিলে ফেলার খোয়াব দেখছে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীরা। তাদের এই খোয়াবই ঠিক করে দেয় বাংলাদেশসহ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে তার আচরণবিধি আর পররাষ্ট্রনীতি।

ঘ. হিন্দুত্ববাদী নেতৃবৃন্দের উস্কানীমূলক বক্তব্য:

ভারতের কংগ্রেস নেতা হিন্দুত্ববাদী ডক্টর মুনজী হিন্দু মহাসভার **১৯২৩** সালের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ঘোষণা দেয়, "ইংল্যান্ড যেমন ইংরেজদের, ফ্রান্স যেমন ফরাসীদের, জার্মানী যেমন জার্মানদের, তেমনি ভারতও হিন্দুদের।"

হিন্দুত্ববাদী মহারাষ্ট্র নেতা বালগংগাধর তিলক, তার রায়গড় বক্তৃতায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দেয়, "এ উপমহাদেশে মুসলিমরা হচ্ছে বিদেশী লুটেরা। সুতরাং তাদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।"

'ধর্ম সংসদ' এর অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা মালাউন যতি নরসিংহানন্দ ঘোষণা করে, "মুসলিমদেরকে হত্যা করার জন্য তরবারি যথেষ্ট নয়। আমাদের তরবারির চেয়েও ভাল অস্ত্র চাই।"

মালাউন প্রবোধানন্দ গিরি মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের জাতিগত নিধনের উদাহরণ দিয়ে ঘোষণা করে, "সময় আর বাকি নেই। এখন কেবল দুটো অপশন আছে। হয় নিজেরা মরার জন্য তৈরি হও অথবা মুসলিমদেরকে হত্যা করার প্রস্তুতি গ্রহণ কর। এছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। এ কারণে এখানেও (ভারতেও) মিয়ানমারের মত স্থানীয় পুলিশ, রাজনীতিবিদ, সেনাবাহিনী এবং প্রত্যেক হিন্দুর জন্য উচিত হল, তারা অস্ত্র বহন করবে এবং উচ্ছেদ অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। এছাড়া সমাধানের কোনো পথ নেই।"

হিন্দু মহাসভার জেনারেল সেক্রেটারি পূজা শাকুন পাণ্ডে নামক নারী মুসলিমদেরকে গণহারে হত্যার প্রকাশ্য আহ্বান জানিয়ে বলে,"অস্ত্র ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। আপনাদের যদি তাদের (মুসলিমদের) জনগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন করতে হয়, তাদের হত্যা করুন। তাদের হত্যা করতে প্রস্তুত হন এবং জেলে যেতে প্রস্তুত হন। যদি আমাদের মাত্র ১০০ সৈন্যও থাকে এবং তাদের ২০ লাখকে যদি আমরা হত্যা করি, আমরা বিজয়ী হব।"

আরেক হিন্দুত্ববাদী মালাউন আনন্দস্বরূপ হিন্দুদেরকে অস্ত্র ক্রয়ের জন্য উৎসাহিত করে বলে, "আমি বারবার বলছি, যদি মোবাইল প্রয়োজন হয় তাহলে ৫০০০ রাখ, কিন্তু অস্ত্রের জন্য খরচ কর ১ লাখ রুপি।"

ফলাফল:

উপর্যুক্ত কারণসমূহের অনিবার্য ফলাফল হিসেবে হিন্দুস্তানে একের পর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এগুলোর মধ্যে ১৯৪৬ এর কলকাতা ম্যাসাকার, ১৯৪৭ এর দেশ বিভাজনের সময় মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের গণহত্যা, ১৯৪৭ সালে জম্মুতে মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞ, হায়দরাবাদে অপারেশন পোলোর পরে মুসলমানদের ব্যাপকহারে হত্যা, ১৯৫০ সালে বরিশাল দাঙ্গা ও ১৯৬৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তান দাঙ্গার পরে কলকাতায় মুসলিম দাঙ্গা, ১৯৬৯ সালের গুজরাট দাঙ্গা, ১৯৮৪ ভীভান্দি দাঙ্গা, ১৯৮৫ গুজরাত দাঙ্গা, ১৯৮৯ সালের ভাগলপুর দাঙ্গা, বোম্বাই দাঙ্গা, ১৯৮৩ সালে নেলি, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর 'বাবরি মসজিদ' শহীদ করার পর পরিচালিত দাঙ্গা এবং ২০০২ সালে গুজরাতের দাঙ্গা, ২০১৩ সালে মুজাফফরনগর দাঙ্গা ও ২০২০ সালে দিল্লি দাঙ্গা ইত্যাদি। তাছাড়া যুগ যুগ ধরে চলমান কাশ্মিরী মুসলিমদের উপর চলমান আগ্রাসন ও গণহত্যা তো রয়েছেই।

চিত্র: মালাউন গেরুয়া সন্ত্রাসী।

এসকল দাঙ্গায় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের শহীদ করে দেয়, মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করে, আগুনে পুড়িয়ে মারে। শত শত বালিকা ও মহিলাদের গণধর্ষণ করা হয় এবং পরে তাদের পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। বাচ্চাদের জোর করে পেট্রোল খাওয়ানো হয় এবং তারপরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। গর্ভবতী মহিলাদের আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়। মহিলাদের পেটে অনাগত সন্তানের পোড়া দেহ দেখা যাচ্ছিল। উগ্র হিন্দুরা মুসলমানদের অনেক বাড়ি ঘেরাও করে এবং ঘরের পুরো পরিবারকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে। মহিলাদের উলঙ্গ করে ধর্ষণ করেছিল এবং হত্যা

করেছিল। মহিলাদের পেট চিরে নবজাতক বের করে ত্রিশুলের আগায় গেঁথে আনন্দ মিছিল করেছিল হিন্দুরা। পিতার সম্মুখে তার সন্তানকে হত্যা আর মায়ের সম্মুখে তার মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে।

প্রিয় ভাই! এই হল মালাউন হিন্দুত্ববাদীদের আসল চেহারা। তারা আমার আপনার প্রতি এমনই বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে থাকে। হিন্দুত্ববাদী মালাউনদের সাথে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক একটি যুদ্ধ অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী। একটু ভাবুনতো, এরা যখন আপনার আমার ঘরে ঢুকবে 'অখণ্ড ভারত' আর 'রামরাজত্ব' কায়েম করার মিশন নিয়ে তখন আমাদের সাথে এরা কেমন ব্যবহার করবে, কেমন আচরণ করবে আমাদের সন্তানদের সাথে, আমাদের মা-বোনদের সাথে???

গাযওয়াতুল হিন্দের পথে হিন্দুত্ববাদীরা:

প্রিয় ভাই! ১৪০০ বছর পূর্বে প্রিয়নবী ﷺ শেষ যামানায় হিন্দুস্তানের হিন্দুত্ববাদী কর্তৃক মুসলমানদের উপর এক প্রলয়ঙ্করী গণহত্যা ও মহাযুদ্ধের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বানী করে গিয়েছেন। সেটিকে হাদীসের ভাষ্যমতে 'গাযওয়াতুল হিন্দ' বলা হয়। পুরো হিন্দুস্তান অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

মালাউন হিন্দুত্ববাদীরা এই যুদ্ধের জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিওতে আমরা দেখতে পাই, শিশু-কিশোর ও পূর্ণবয়স্কদের নানা জায়গায়- স্কুলে, গ্রামের ক্ষেত-খামার ও ময়দানে, এমনকি এয়ার কন্ডিশন কনফারেন্স রূমে- লড়াই করা, হত্যা করা, অখণ্ড হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যুবরণ করা এবং শত্রুকে হত্যা করার মর্মে শপথ করানো হচ্ছে। এমনিভাবে মুসলিমদেরকে আর্থ-সামাজিকভাবে বয়কট করারও অঙ্গীকারু করানো হচ্ছে। মুসলিমদের সঙ্গে সর্বপ্রকার লেন-দেন পরিহার করার কথাও বলা হয়। এমনকি পার্লামেন্টের কতক সদস্য পর্যন্ত মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা অথবা তাদেরকে এলাকা থেকে মেরে পিটিয়ে বের করে দেয়ার উপর জোরারোপ করে।

এককথায়, মুসলিম বিদ্বেষ বর্তমানে থার্মোমিটারের সর্বোচ্চ পয়েন্টে পৌঁছে গিয়েছে। ভয়াবহ 'ইসলামোফোবিয়া' গোটা হিন্দুস্তানের সমাজে ছড়িয়ে গিয়েছে।

ভারতের সকল স্তরের মালাউন যুবকেরা হিন্দুত্ববাদীদের জাতিগত নিধনের বিরাট প্রকল্পে পুরোপুরি অংশ নিচ্ছে, তারা অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, শারীরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

মুসলিমদেরকে বিশেষত মুসলিম মা-বোনদেরকে পশুর চেয়েও অধম প্রমাণ করায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে, নানাভাবে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও কটাক্ষ করছে। তারা মুসলিমদেরকে মানবিক গুনাবলী থেকে অবমুক্ত করে 'জন্তু-জানোয়ার' থেকেও নিকৃষ্ট আখ্যা দিচ্ছে। বিজেপি ও আরএসএস কর্মীরা দীর্ঘদিন যাবত মুসলিমদেরকে বোঝানোর জন্য 'উইপোকা' ট্যাগ ব্যবহার করছে; যারা নাকি ভারতের সম্পদ নষ্ট করছে এবং মালাউন হিন্দুত্ববাদীদেরকে তাদের ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।

বিভিন্ন মোবাইল এ্যাপ্স, ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়াতেও হিন্দুত্ববাদীরা নির্বিঘ্নে ও খোলাখুলিভাবে মুসলিম সাধারণ যুবকদের হত্যা করা এবং মুসলিম মা-বোনদের সঙ্গে দলগত অনাচারের আহ্বান জানাচ্ছে। এমনকি, হিন্দু যুবকরা মুসলিম সেজে মুসলিম বোনদেরকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাদের সতীত্ব নষ্ট করছে, কিংবা পাচার করে দিচ্ছে, অনেককে হত্যা করছে। এটি 'গেরোয়া লাভ ট্র্যাপ' নামে পরিচিত।

সাধারণ মুসলিমদেরকে 'জিহাদী' ট্যাগ দিচ্ছে। তাদেরকে 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করছে। গরু জবাই করার অপরাধে মুসলিমদের পিটিয়ে হত্যা করছে।

এছাড়া সরকারিভাবেও বিজেপি, আরএসএস এর লক্ষ লক্ষ কর্মী ও সমর্থক অত্যন্ত দক্ষভাবে নানা প্রোপাগান্ডা তৈরি করছে। অত্যন্ত সুনিপুণ ও সংগঠিতভাবে ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। তাতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো ও গণহত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাঠ প্রস্তুত করা হচ্ছে। বলিউড ম্যুভি আর সংবাদপত্রের মাধ্যমে হিন্দুদের ব্রেইন ওয়াশ করছে, জাতিগত নিধনের পালে হাওয়া দিয়ে এই আহ্বানকে ব্যাপক করা হচ্ছে।

এককথায়, মুসলিমদের ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে জাতিগত নিধনের পরিকল্পনা সফল করার জন্য তৃণমূল থেকে শুরু করে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত, অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদী সমাজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সুনিপুণ ও গভীরভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

তারা তাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে আমাদেরকে এই বার্তাই দিচ্ছে যে, হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের জাতিগত নিধনের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত মনে করছে। তারা অতি শীঘ্রই এই মহা হত্যাযজ্ঞের চূড়ান্ত অংশকে বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে।

(ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের সর্বশেষ আপডেট পেতে Tor Browser দিয়ে ভিজিট করুন-
লিংক 01: https://bit.ly/3PXKzWd
লিংক 02: https://gazwah.net/?cat=634
লিংক 03: https://dawahilallah.com/)

ভারতীয় মুসলিমদের জন্য "জেনোসাইড ইমারজেন্সি এলার্ট"

জেনোসাইড ওয়াচ-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর গ্রেগোরি এইচ্ স্ট্যান্টোন (Gregory H Stanton) জাতিগত নিধনের দশটি পর্যায় বিন্যাস করেছেন। (https://bit.ly/3R1usZ0)

তার মতে, "ভারত জাতিগত নিধনের অষ্টম স্তরে পৌঁছে গেছে। তা হল পশ্চাদ্ধাবন ও নির্যাতন-নিপীড়নের স্তর। (এর পরের ধাপই মূলোচ্ছেদ তথা পরিকল্পিত সংঘবদ্ধ গণহত্যা করা, যাতে উক্ত সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সার্বিকভাবে নিশ্চিহ্ন করা যায়।)

১০ ই জানুয়ারি ২০২২ এ তারা ভারতের জন্য জেনোসাইড ইমারজেন্সি এলার্ট জারি করে। একটি অনলাইন কনফারেন্সে সকলকে সম্বোধন করে বলে যে, "ভারত আজকে অষ্টম স্তরে পৌঁছে গেছে। নিজেদের টার্গেট গ্রুপ তথা মুসলিমদেরকে চূড়ান্তভাবে উচ্ছেদের স্তরে যেতে তাদের কেবল এক কদম দূরত্ব রয়েছে।"

এককথায়, হিন্দুত্ববাদী বাহিনী মুসলিমদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলার জন্য দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে।

(ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম নিধনের বিভিন্ন পর্যায়: https://bit.ly/3CEdjQL ;
হিন্দুস্তান ক্রমাগত ধ্বংসের পথে: https://bit.ly/3qNUjbv)

হায়! আমাদের প্রস্তুতি কোথায়?

প্রিয় ভাই! এই 'মহাবিপর্যয়' প্রতিরোধের জন্য আমার আপনার প্রস্তুতি কতটুকু??? হিন্দুত্ববাদীরা যখন আমাকে আপনাকে, আমাদের সন্তানদেরকে হত্যার প্রকাশ্য ঘোষণা দিচ্ছে, আমাদের মা-বোনদের ইজ্জতের উপর আক্রমণের

সর্বাত্মক প্রস্তুতি শেষ করে ফেলেছে, সেখানে আমি আপনি এই মহাপ্রলয় প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা শুরু করেছি কি?

বাংলা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত, আসাম থেকে দিল্লী পর্যন্ত, গুজরাট থেকে অযোদ্ধা পর্যন্ত, আমাদের দৃষ্টির সামনে চলমান হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন, যেখানে প্রতিনিয়ত লক্ষ হাজার মুসলিমের তাজা খুন ঝরছে, যেখানে লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত হানি করা হচ্ছে, হিন্দের ভূমি থেকে মুসলিমদের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে, মুসলমানদের সমূলে উৎখাত করার মিশন এগিয়ে যাচ্ছে সীমাহীন গতিতে, এর বিপরীতে আমাদের প্রতিরোধ প্রচেষ্টা আশানুরূপ এগিয়েছে কি?? হায়! আমাদের গাফলতি, আমাদের অলসতা দেখে হয়ত শয়তানেরও হাসি পায়!! কবি বলেন-

أغاية الدين أن تحفوا شواربكم　يا أمة ضحكت من جهلها الأمم

আল্লাহর দ্বীনের লক্ষ্য কি এটাই যে, তোমরা নিজেদের গোঁফ ছাঁটাই করবে,
হে জাতি! তোমাদের অজ্ঞতায় অন্যান্য জাতিরা হেসেছিল!!

প্রিয় ভাই! একটু চিন্তা করুনতো- যদি পাড়ার কোনো মাস্তান আপনাকে হত্যার হুমকি দেয়; আপনার আদরের সন্তানকে জবাই করার ঘোষণা দেয় বা আপনার অতি স্নেহের কন্যা সন্তানকে অপহরণ করে ধর্ষণের বার্তা পাঠায়; অথবা আপনার পরমা সুন্দরী স্ত্রীকে ধর্ষণ করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার পরিকল্পনার কথা আপনি কোনোভাবে জেনে যান; কিংবা ধরুন আপনি জানতে পারলেন যে, এলাকার বখাটে লোকজন বা আপনার কোনো এক শত্রু আগামীকাল আপনার বাড়ি আক্রমণ করে আপনার সারাজীবনের কষ্টে গড়া বাড়িটি বোলডোজার দিয়ে ভেঙে দিবে বা আগুন জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিবে; এবং আপনি দেখলেন যে, আপনার দুশমন সেই দুষ্কৃতিকারীগণ আপনার উপর হামলা করার জন্য আপনার চোখের সামনেই প্রস্তুতি নিচ্ছে, আপনাকে হত্যার সরঞ্জাম আপনার চোখের সামনে দিয়েই সংগ্রহ করছে, ও আমার ভাই, আপনি তখন কী করবেন??? একটু চিন্তা করে জবাব দিন।

আপনি কি তখন এটা চিন্তা করবেন, যা হবার আগে হোক, যা কিছু ঘটার আগে ঘটুক, আগে আক্রমণ হোক পরে দেখা যাবে; নাকি ভাববেন, আরে ধুর, এগুলো নিছক হুমকি-ধমকি, ওরা আমার কিছুই করতে পারবে না; নাকি ভাববেন, আমার শাইখ, আমার পীর, কিংবা আমার উপর যত উলামায়ে কেরাম আছেন তারা যখন বলবেন -তুমি এ বিপদ থেকে বাঁচার চেষ্টা করো, তখন আমি এ বিপদ থেকে বাঁচার চেষ্টা করবো। না! ভাই এগুলোর একটাও তখন আমি বা আপনি কেউ করবো না।

তাহলে তখন কী করব?? হয়তো আত্মগোপন করব, নতুবা পুলিশকে খবর দিব, থানায় জিডি করব, পরিবার পরিজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলব ইত্যাদি। এককথায় এই বিপদ থেকে বাঁচার বা মোকাবিলা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবো।

তাহলে ভাই!

আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না, মালাউন হিন্দুত্ববাদীরা আমাকে, আপনাকে হত্যা করার জন্য প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে? আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না, মালাউন হিন্দুত্ববাদীরা কেবল আমাকে আর আপনাকেই নয়, আমাদের সন্তান-সন্তুতি, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, এমনকি বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের সকল মুসলমান নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সকলকেই হত্যা করে 'জাতিগত নিধনের' মাধ্যমে হিন্দুস্তানের মাটি থেকে চিরতরে মিটিয়ে দিতে চাচ্ছে?? মালাউন হিন্দুত্ববাদীরা ইতোপূর্বে আমাদের মা-বোনদের সাথে কেমন আচরণ করেছিল সেকথা কি আমরা ভুলে

গিয়েছি?? তারা কি এখন এর চেয়ে উত্তম আচরণ করবে আমাদের শ্রদ্ধেয় মা-বোনদের সাথে, আমাদের নয়নের মণিদের সাথে???

আমরা কি আমাদের চোখের সামনে মালাউনদের প্রস্তুতি গ্রহণ করার দৃশ্য দেখছি না??? আফসোস! আমাদের প্রস্তুতি কোথায়??? কোনরূপ প্রস্তুতি ছাড়া আমরা কিভাবে এই প্রলয়ঙ্করী আগ্রাসনের মোকাবেলা করব ভাই???

আমরা কি ভাবছি, আগে আক্রমণ হোক, পরে দেখা যাবে, বা পরে জিহাদ করব?? কেন ভাই এই আত্মপ্রবঞ্চনা??? কেন ভাই নিজেকে এই ধোঁকা দেওয়া??? প্রস্তুতি ছাড়া যুদ্ধ জয় হয়, এমন কথা শুনেছেন কোথাও?? এটা তো আল্লাহ পাকের সুন্নাহ না!!!

নাকি আমরা ভাবছি, গাযওয়াতুল হিন্দ অনেক দূরে, বহু দূরে, কমপক্ষে আমার জীবদ্দশায় আমি পাব না???

ভাই, একটি যুদ্ধ বাঁধতে কি হাজার বছর সময় লাগে, নাকি শত বছর??

সত্তর বছরের আগের ফিলিস্তিনের কথা চিন্তা করুন; চিন্তা করুন, সেসময়ের মুসলিমদের দুনিয়াদারীর কথা। সেই রঙিন স্বপ্নগুলো আজ কোথায়?? অভিশপ্ত ইহুদীবাদের আগ্রাসন নিমিষেই কি সব শেষ করে দেয়নি???

বেশি দূর যাবার দরকার নেই। বিশ বছর আগের ইরাক কিংবা সিরিয়ার কথাই স্মরণ করুন। কোথায় গেল তাদের ক্যারিয়ারের স্বপ্ন, 'সোনার হরিণ' একটি চাকুরির অভিলাষ, কোথায় গেল শহরের একটি ফ্ল্যাট কিংবা একটি বাড়ির জন্য আজীবনের সাধনা??? সব কিছুই কি এক পলকেই নিঃশেষ হয়ে গেল না??? ক্রুসেডার আক্রমণের মুখে সকল স্বপ্নই কি দুঃস্বপ্নে পর্যবসিত হয়ে গেল না?? আর এগুলো হতে কি হাজার বছর সময় লেগেছে, নাকি শত বছর?? কয়েক দিন আগের সাজানো গোছানো ফিলিস্তিন, ইরাক, সিরিয়া চোখের পলকেই কি জাহান্নামে রূপ নেয়নি??

আপনি কি বোন ফাতিমা নূর আর আফিয়া সিদ্দিকীর আর্তনাদ শুনেননি??

আমরা কি ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস পড়িনি?? জিহাদী দুর্বলতার সুযোগে যুগে যুগে আমরা কিভাবে গণহত্যার শিকার হয়েছি??

হিন্দুস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে চুপচাপ বসে থাকা, জিহাদের প্রস্তুতি না নেয়া, 'গাযওয়াতুল হিন্দ'কে দুরবর্তী মনে করা 'অপরিণামদর্শিতা' ও 'অদুরদর্শিতা'র পরিচায়ক। এটা যেন সেই ডাহুকের অবস্থা, যে শিকারী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে চোখ বন্ধ করে রাখে, আর মনে করে, আমি যেহেতু কাউকে দেখছি না, বোধ হয় আমাকেও কেউ দেখছে না। আমরা যতই চুপচাপ বসে থাকি, বা জিহাদ থেকে হাত গুটিয়ে ছলনাময় আত্মতৃপ্তিতে ভুগতে থাকি, হিন্দুত্ববাদীরা কিন্তু বসে নেই; তারা কিন্তু ঠিকই প্রতিনিয়ত 'গাযওয়াতুল হিন্দ' এর ডাক দিয়ে যাচ্ছে। তারা ইতোমধ্যেই মুসলিমদের উপর সর্বাত্মক আগ্রাসন শুরু করে দিয়েছে, প্রতিদিনই ভারতের আনাচে কানাচে মুসলিমদেরকে হত্যা, গুম, অত্যাচার আর মা-বোনের সম্ভ্রমহানির খবর কানে আসছে।

বাংলাদেশে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানের' মাধ্যমে ০৫ আগস্ট, ২০২৪ ঈসায়ী তারিখ স্বৈরাচারী, ফ্যাসিস্ট, লেডি ফেরাউন, মোদির কেনা বান্দী শেখ হাসিনার পতন হয়। বাংলাশের অকুতোভয় ছাত্রসমাজের হাত ধরে এই আন্দোলন শুরু হয়ে অবশেষে তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে বন্দুকের সামনে খালি হাতে বুক

টান করে দাঁড়িয়ে জীবন উৎসর্গ করার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশের আবু সাঈদের মতো হাজারো ছাত্রজনতা। যেখানে বাংলাদেশকে দখল করার সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করে ফেলেছিল, এই অবস্থায় বাংলাদেশে দিল্লীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত এজেন্ট শেখ হাসিনার পতনে ভারতের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশ-ভারতের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, পারস্পরিক উত্তেজনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা বুঝতে পেরেছে, যুদ্ধ ছাড়া বাংলাদেশ দখলের আর কোনো পথ অবশিষ্ট নেই। সম্প্রতি ভারতের স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রি রাজনাথ সিং বাংলাদেশের সাথে সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য সে দেশের সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। এদিকে বাংলাদেশের হিন্দুদেরকে ব্যবহার করে, বিশেষত ইসকন নামক সন্ত্রাসী সংগঠনকে ব্যবহার করে ভারত চাইছে বাংলাদেশে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে, বিশেষ করে একটি হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধাতে। তারা তাদের পরিকল্পনায় সফল হলে হিন্দুদেরকে বাঁচানোর কথা বলে বাংলাদেশে আক্রমন করা তাদের জন্য সহজ হবে। বিশ্বকে তারা দেখাতে পারবে বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, আফগানিস্তানের মত বাংলাদেশেও মৌলবাদীরা ক্ষমতা দখল করে ফেলেছে। তাই হিন্দু নিধন চলছে। তাই হিন্দুদের বাঁচাতে বাংলাদেশে হামলা করতে হবে।

এহেন পরিস্থিতিতে আমরা বলতে পারি, গাযওয়াতুল হিন্দ আমাদের দোরগোড়ায় চলে এসেছে। (আল্লাহু আ'লাম)

অন্যদিকে, আমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছি।

হ্যাঁ ভাই, আমরা ঘুমাচ্ছি। আর আমরা যদি এখনো সচেতন না হই, তাহলে জেনে রাখুন, আমাদের এই অপ্রস্তুতির পরিণামে আমাদেরকে অবশ্যই হিন্দুত্ববাদীদের 'বলির পাঠা' হতে হবে। নিজেদের ধ্বংস নিজেদের চোখে দেখতে হবে। (আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।)

এখন প্রশ্ন হল, আমরা কিভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করব বা কী প্রস্তুতি নিব???

হ্যাঁ ভাই, এখন আমাদেরকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।" (সূরা আল আনফাল ০৮:৬০)

আর আমাদের জন্য এই শক্তি সঞ্চয়ের প্রথম ও প্রধান ধাপ হল- জামাতবদ্ধ হওয়া। এরপর জামাতবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকা। হিন্দুস্তানের সকল মুসলিমকে জিহাদের এক পতাকার নীচে চলে আসতে হবে, ইনশাআল্লাহ। এটাই এখন আসল কাজ। তাই আমাদেরকে মুজাহিদ ভাইদের সেই হক জামাত তালাশ করতে হবে, যারা এই মালাউনী আগ্রাসন থেকে উম্মাহকে বাঁচাতে দিনরাত ছটফট করছেন, যারা উম্মাহর মা-বোনের হেফাযতের জন্য দিন-রাতকে একাকার করে দিচ্ছেন, যারা এই হিন্দের ভূমিকে নাপাক শিরকমুক্ত করার মিশন নিয়ে দিবানিশি ফিকির ও প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন দুর্বার গতিতে, যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর শক্তির উপর ভরসা করে অহর্নিশি জনশক্তি ও অস্ত্রশক্তি বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। আসুন! আমরা সততা ও সত্যবাদীতার সাথে সেই মোবারক কাফেলার

সন্ধান করি এবং জুড়ে যাই। ভাইদের শক্তিবৃদ্ধি করি, ভাইদের জামাত ভারী করি, ভাইদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করি, নিজেদেরকে আল্লাহর সৈনিক হিসেবে পেশ করি, শাহাদাতের শপথ নেই। মুজাহিদ ভাইয়েরা আমাদের যেভাবে গড়ে তোলেন আমরা সেভাবে গড়ে উঠি। এটি এখন সময়ের নাজুকতার দাবী!

যারা এখনো হক জামাত তালাশ করে খোঁজে পাইনি তাদের করনীয় সম্পর্কে নিচের কিতাবটি পড়তে পারেন- কিতাবুত তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল, দ্বিতীয় পর্ব: তাওহীদ ও জিহাদ; "তাহলে বর্তমানে আমরা কিভাবে জিহাদ করব বা জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত হবো?" অধ্যায় দ্রষ্টব্য। কিতাবের লিংক: https://bit.ly/tahrid2

প্রিয় ভাই, হিন্দুত্ববাদী মালাউনরা যদি 'মিথ্যা' ও চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাওয়ার জন্য নিজের জীবন বাজি লাগাতে পারে, মৃত্যুর শপথ নিতে পারে, তাহলে আমরা কেন 'সত্য' ও অনন্তকালের জান্নাতের জন্য মওতের বাইয়াত হতে পারবো না?

হ্যাঁ ভাই! যদিও আমরা প্রস্তুতির দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছি, তথাপি আমাদের হতাশ হবার কিছু নেই। সাধ্যমত সর্বাত্মক প্রস্তুতি চালিয়ে যেতেই হবে, ইনশাআল্লাহ। হতাশ হয়ে বসে পড়লে আমরা হেরে যাব। অন্যথায় শিরক ও তাওহীদের এই লড়াইয়ে বিজয় আমাদেরই হবে ইনশাআল্লাহ।

'গাযওয়াতুল হিন্দ' সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ভবিষ্যদ্বানী:

রাসূলে আরাবী ﷺ চৌদ্দশত বছর আগেই এই যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বানী করে গিয়েছেন; শির্কপন্থীদের সাথে তাওহীদপন্থীদের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী, সর্বশেষ সিদ্ধান্তমূলক একটি যুদ্ধের। যার শেষ হবে- অভিশপ্ত হিন্দুদের হাত থেকে মুজাহিদ বাহিনী কর্তৃক ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার, দিল্লীর লালকেল্লায় কালিমার পতাকা উড্ডয়ন আর ভারতবর্ষকে হিন্দু ও হিন্দুয়ানী শিরকমুক্ত করার মাধ্যমে। কিন্তু এর আগে হয়ত রক্ত দিতে হবে কোটি কোটি তাওহীদপন্থীদের, নাম লিখাতে হবে শেষ যামানার সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদদের খাতায়। ....

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হিন্দুস্থানের জিহাদের (ভারত অভিযানের) ওয়াদা দিয়েছেন। যদি আমি তা (ঐ যুদ্ধের সুযোগ) পাই, তা হলে আমি তাতে আমার জান-মাল ব্যয় করব। আর যদি আমি তাতে নিহত হই, তাহলে আমি শহীদের মধ্যে উত্তম সাব্যস্ত হব। আর যদি আমি ফিরে আসি, তা হলে আমি হবো আযাদ বা জাহান্নাম হতে মুক্ত আবূ হুরায়রা।" (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৭৩, ৩১৭৪)

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ :عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোলাম ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের দুটি দল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দান করবেন। একদল যারা হিন্দুস্থানের জিহাদ করবে, আর একদল যারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ)-এর সঙ্গে থাকবে।" (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৭৫)

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وذكر الهند: " يغزو الهند بكم جيش يفتح الله عليهم حتى يأتوا بملوكهم مغللين بالسلاسل يغفر الله ذنوبهم، فينصرفون حين ينصرفون فيجدون ابن مريم بالشام ".

- نعيم- كتاب كنز العمال - نزول عيسى عليه الصلاة والسلام-

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ হিন্দুস্থানের আলোচনায় বলেছেনঃ "তোমাদের একটি দল হিন্দুস্থানে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিজয় দান করবেন, এমনকি তারা সেখানের শাসকদেরকে গলায় বেড়ি পড়িয়ে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন, অতঃপর তাদের ফিরে আসার সময় হলে তারা ফিরে আসবে ও শামে ঈসা ইবনে মারইয়ামকে পাবে।" (সহীহ কানযুল উম্মাল)

সুতরাং প্রিয় ভাই! আর ঘুম নয়, এবার জেগে উঠার পালা। আল্লাহর রাসূলের সুসংবাদকে বুকে ধারণ করে শ্রেষ্ঠ শহীদ কিংবা শ্রেষ্ঠ গাজীর হওয়ার তামান্নায় কেবলেই এগিয়ে যাওয়ার পালা। সময় এখন শুধুই সামনে এগিয়ে যাওয়ার। গাযওয়াতুল হিন্দে 'আল্লাহর সৈনিক' হওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হোক এখন থেকেই.............

আল কুদসের মুক্তি কোন পথে?

আল কুদসের মুক্তির ব্যাপারে বাস্তবতা উপলব্ধি করা কাম্য:

আমিরুল মুমিনীন সাইয়েদেনা উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সময়কার কথা। পারস্যের বিখ্যাত সেনাপতি গর্ভনর হুরমুজান মুসলিমদের হাতে বন্দি। তাকে উমর ইবনুল খত্তাবের নিকট আনা হলো। উমর রা: তখন ব্যস্ত। বিভিন্ন জায়গায় তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে পাঠাচ্ছেন। তিনি হুরমুজানকে প্রশ্ন করলেন যে, আমরা মুশরিকদের ভূমিতে অভিযান পাঠাচ্ছি। এ ব্যাপারে তোমার কী মতামত?

জবাবে হুরমুজান বললো, এই ভূমি এবং এই ভূমির অধিবাসীদের অবস্থা হলো একটা পাখির মতো। পাখির দুইটা ডানা, দুইটা পা, একটা মাথা। একটা ডানা ভেঙে ফেলবেন, আরেকটা ডানা থাকবে। দুইটা ডানা ভেঙে ফেলবেন, পায়ের উপর ভর দিয়ে থাকবে। কিন্তু যদি মাথা কেটে ফেলেন, তাহলে আর কোনোকিছু কোনো কাজে আসবে না। মুসলিমদের শত্রুদের অবস্থা হলো, একটা ডানা হলো রোমের কায়সার, রোমের সম্রাট। আরেকটা ডানা হলো পারস্য। দুইটা পা আর মাথা হলো খসরু (কিসরা/পারস্য সম্রাট)। আপনি যদি খসরুকে আক্রমণ করেন, এ পাখি শেষ হয়ে যাবে। আপনি মুসলিমদের বলেন খসরুকে আক্রমণ করতে। উমর রা: এই পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং ইতিহাস সাক্ষী যে এই স্ট্র্যাটেজি (কৌশল) সফল হয়। ওমর ইবনুল খাত্তাব রা: এর খেলাফতের সময় অর্ধেক পৃথিবীর উপর ইসলামী শাসন কায়েম হয়। যেকোনো লড়াইয়ে, যেকোনো রাজনৈতিক প্রকল্পে, যেকোনো তাশদিদের প্রক্রিয়ায় সঠিক পলিসি থাকা, সঠিক স্ট্র্যাটিজি থাকা এবং শত্রুকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি ছাড়া কখনো আমরা সফল হতে পারবো না এবং এই জিনিসটা করতে হবে বাস্তবতার নিরিখে, শরিয়তের আলোকে এবং নিজের সামর্থ্য অনুসারে। এটা জজবা দিয়ে করলে হবে না, এটা আবেগ দিয়ে করলে হবে না, এটা উইশফুল থিংকিং[1] (Wishful Thinking) দিয়ে করলে হবে না অথবা হিকমাহর নামে সুবিধাবাদের মাধ্যমে করলে এটা হবেনা।

[[1](Wishful Thinking (উইশফুল থিঙ্কিং) বলতে এমন একটি মানসিক প্রবণতাকে বোঝায় যেখানে কোনো ব্যক্তি বাস্তবতা বা যুক্তি উপেক্ষা করে নিজের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী চিন্তা করে বা বিশ্বাস করে। সহজভাবে বললে, এটি হলো —"যে জিনিসটি আমি চাই, সেটাই ঘটবে, যদিও বাস্তবে এর সম্ভাবনা কম থাকে" — এই ভেবে বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করা।]

প্রিয় ভাই! "আল কুদসের মুক্তি কোন পথে?"- বিষয়টি আলোচনার ক্ষেত্রে এই কথাগুলো মাথায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর বর্তমান প্রেক্ষাপটে "আল কুদসের মুক্তি কোন পথে" এই আলোচনাটাও অত্যন্ত জরুরি। আমাদের সকলের সামনে চিরতরের জন্য এবং চূড়ান্তভাবে এটা স্পষ্ট হওয়া জরুরি যে, আল কুদস কিভাবে মুক্ত হবে। কেননা, দীর্ঘ দিন ধরে গাজায় আমাদের মুসলিম ভাইবোনদের হত্যা করা হচ্ছে। তাদের উপর হত্যাযজ্ঞ চলছে, তাদের উপর ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে, নারীদের হত্যা করা হচ্ছে, বৃদ্ধদের হত্যা করা হচ্ছে, পুরুষদের তো হত্যা করা হচ্ছেই। তারা মারা যাচ্ছেন বুলেটের আঘাতে, বোমার আঘাতে, ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, জ্যান্ত আগুনে পুড়ে, চিকিৎসার অভাবে, ওষুধের অভাবে, অনাহারে, না খেতে পেয়ে। বাসাবাড়ি থেকে শুরু করে হাসপাতাল, ইউনিভার্সিটি, রিফিউজি ক্যাম্প কোনকিছুই বাকি নেই।

গাজার গণহত্যার ব্যাপারে বিশ্ববাসীর নীরবতা:

পৃথিবীর টপ মেডিক্যাল জার্নাল 'দ্যা ল্যান্সেট' (The Lancet) বলছে, গাজায় (২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আল কাস্সাম ব্রিগেডের 'তুফানুল আকসা'/(Al-Aqsa Flood) অপারেশনের পর হতে ইহুদীবাদী আগ্রাসনে ৪০৯ দিনে) প্রায় দুই লক্ষ মানুষ মারা গেছে, কিন্তু এই সংখ্যাটা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না কারণ ধ্বংসস্তূপের নিচে বহু লাশ চাপা পড়ে আছে। (অর্থাৎ সংখ্যাটি আরো বেশি হতে পারে)। [https://bit.ly/langaza]

এটা পুরো পৃথিবীর কাছে স্পষ্ট যে, ইহুদিরা গাজায় জেনোসাইড (গণহত্যা) চালাচ্ছে, এথনিক ক্লিনসিং (Ethnic Cleansing/ জাতিগত নিধন) করছে। খোদ আইসিজে (ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস) এবং এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলছে, গাজায় যা হচ্ছে তা গণহত্যা। [https://bit.ly/gazaicj, https://bit.ly/aintgaza]

কিন্তু তারপরো আজ পর্যন্ত কেউ কিছু করে নি। সবকিছু সবার চোখের সামনে হচ্ছে। এটা কোন পাথরের নিচে হচ্ছে না, কোন গর্তের ভিতর হচ্ছে না, কোন অন্ধকার কোনায় হচ্ছে না। এটাকে বলা হচ্ছে দ্যা ওয়ার্ল্ড'স মোস্ট টেলিভাইসড্ জেনোসাইড (The World's Most Televised Genocide)। (যে গণহত্যা চ্যানেলগুলোতে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে)। এটা লাইভ স্ট্রিমিং (Live Streaming) হচ্ছে, আমরা চোখের সামনে দেখছি কী হচ্ছে, লাইভ আপডেট পাচ্ছি, বাকি কেউ কিছুই করতে পারিনি। আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার সংস্থাসমূহ, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, জাতিসংঘ কেউই কিছু করেনি। তারা এখানে নিষ্ক্রিয় দর্শক। পশ্চিমা বিশ্ব, আমেরিকা, ইউরোপ, তারা সক্রিয়ভাবে এই গণহত্যায় মদদ দিচ্ছে। তারা ইসরাইলকে অস্ত্র দিচ্ছে, অর্থেনৈতিকভাবে সহযোগিতা করছে, কূটনৈতিকভাবে মদদ যোগাচ্ছে। আর মুসলিম বিশ্বের শাসকদের কী অবস্থা? তাদের অবস্থা হলো তারা একদিকে কিছু বিবৃতি দিচ্ছে আর পেছনে তলে তলে ইসরাইলের সাথে তাদের সম্পর্ককে নরমালাইজেশন (স্বাভাবিকীকরণ) করছে। এটা হল বাস্তবতা এবং এই সবকিছুর পরে যে কথা হলো মসজিদ আল-আকসা আজ বনি ইসরাইলের দখলে। হ্যাঁ ভাই, এটাই হল বাস্তবতা। কালকে যদি বনি ইসরাইল মসজিদ আল আকসা ধ্বংস করে দেয়, আগামীকাল যদি তারা ওখানে থার্ড টেম্পল (তাদের তৃতীয় মন্দির) বানানো শুরু করে দেয়, কে কী করবে বলুন? যাদের কথা এতক্ষণ বললাম এরা কে কী করবে? কেউ কিচ্ছু করবে না। এটাই প্রকৃত বাস্তবতা। এর চেয়ে খারাপ আর কোন পরিস্থিতি হতে পারে না।

কাজেই এই অবস্থায় এই প্রশ্নের উত্তরটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, আল কুদসের মুক্তি কোন পথে হবে এবং এই প্রশ্নের উত্তর খুব কঠিন নয়। এ প্রশ্নটাও যেমন সহজ, উত্তরও তেমনি। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। আমাদের ইতিহাসেও এ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট এবং এই সময়েও- এই যুগেও- সাম্প্রতিক সময়েও এই প্রশ্নের উত্তর অনেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু স্পষ্ট উত্তর, সহজ উত্তর আমরা সহজে মানতে পারিনা। উত্তর অনেক সহজ, কিন্তু উত্তরটা গ্রহণ করা কঠিন। তবুও এই প্রশ্নের উত্তরটা স্পষ্ট করা দরকার।

ইতিহাসে মুসলিমদের উপর এমন নিষ্ঠুরতা নতুন নয়:

প্রিয় ভাই! আল কুদসের মুক্তি কোন পথে সে আলোচনাটায় প্রবেশ করার আগে কয়েকটি বিষয় একটু পরিষ্কার করে নেয়া দরকার। একটি বিষয় হলো শত্রুর নির্মমতা বা শত্রুর নিষ্ঠুরতা, এটা আসলে এখানে মূল সমস্যা না। কারণ এর চেয়েও নির্মম, এর চেয়েও নিষ্ঠুর ঘটনা আমাদের ইতিহাসে ঘটেছে, এই উম্মাহর সাথেই ঘটেছে। (এর কিছু আলোচনা আমরা ইতোমধ্যে 'কিতাবুত তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল' দ্বিতীয় পর্ব 'তাওহীদ ও জিহাদ'- এর "জিহাদের অপর নাম 'জীবন' !! - একটি ইতিহাস ভিত্তিক পর্যালোচনা" অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখান থেকে দেখে নেয়া যায় ইনশাআল্লাহ।)

প্রথম ক্রুসেডের কথা একটু চিন্তা করুন, যখন খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা জেরুজালেম দখল করে নিলো ১০৯৯ সালের জুলাইয়ের ১৫ তারিখ, আজ থেকে ৯২৫ বছর আগের কথা। খ্রিস্টান ইতিহাসবিদরা লিখেছে, তারা এমনভাবে ম্যাসাকার করেছে যে, রাস্তায় কিছু কিছু জায়গায় পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত মানুষের রক্ত ছিল। আর কিছু কিছু জায়গায় রক্ত ছিল হাঁটু পর্যন্ত, মুসলিমদের রক্ত এবং তারা জেরুজালেম পর্যন্ত যাওয়ার সময় যতগুলো শহর পার হয়েছে, প্রত্যেকটা শহরে ম্যাসাকার করেছে, ধর্ষণ করেছে, লুট করেছে, আগুন লাগিয়ে দিয়েছে এবং এখানেই শেষ না। তারা ক্যানিবলিজম (Cannibalism) করেছে, ক্যানিবলিজম হচ্ছে 'মানুষের মাংস খাওয়া।' এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত, সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমে দুটি শহর আছে আল-মারা (Al-Mara) এবং মারাতুন নোমান (Maraat al-Numan)। এই শহরে ১০৯৮ সালে খ্রিস্টান হিস্টোরিয়ানদের লিখার মধ্যে আছে যে, তারা মুসলিমদের লাশ সিদ্ধ করে খেয়েছে। বড়দের লাশ, প্রাপ্তবয়স্কদের লাশ এবং শিশুদের লাশ স্পিড রোস্ট (Speed Roast) করেছে। স্পিড রোস্ট মানে হচ্ছে একটা বড় লোহার শিক থাকে, সেই শিকের মধ্যে একটা জন্তুকে এফোড় ওফোড় করা হয়। মনে করেন একটা কবুতর কিংবা একটা মুরগি, তারপর এই শিকটিকে আগুনের উপর ঝুলানো হয়। তারপর এটিকে ঘোরানো হয়, তখন আগুন দিয়ে ঝলসিয়ে মাংসটা রান্না হয়। আপনারা অনেক সময় দেখবেন যে গ্রিল চিকেন এভাবে রান্না করে। এভাবে মুসলিম শিশুদের রান্না করে খেয়েছে ঐ হায়েনারা। আমি বানিয়ে বলছি না, 'ক্যানিবলস এন্ড ক্রুসেডার্স' নামক একাডেমিক পেপার রয়েছে, যেখানে প্রাইমারি সোর্স দেওয়া আছে। ১২টি খ্রিস্টান সোর্স থেকে এটা প্রমাণিত। হ্যাঁ ভাই, এই ঘটনা আমাদের সাথেই ঘটেছে।

তাতারদের কথা চিন্তা করুন, বলা হয় যে মোঙ্গলরা যখন বাগদাদ আক্রমণ করেছিল, ৪০ দিন মুসলিমদের হত্যা করেছে। দজলা নদীর পানি লাল আর কালো হয়ে গিয়েছিল। লাল হয়েছিল মুসলিমদের রক্তে, কালো হয়েছিল ছাই দিয়ে। সবকিছু পুড়িয়ে দিয়েছিল ওরা আর ছাই গিয়ে নদীর পানির সাথে মিশেছিল, ফলে পানি কালো হয়ে গিয়েছিল।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের কথা চিন্তা করুন। খাব্বাব ইবনে আরাত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে এসে কথা বলছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, তোমাদের আগে এমন উম্মাহ ছিল যাদের হাড় থেকে মাংস লোহার চিরুনি দিয়ে আলাদা করা হয়েছে, তাদের মাথা থেকে দ্বিখন্ডিত করা হয়েছে। এবং সাহাবীদের উপরে তো অনেক অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে, তা তো আমরা জানিই। কাজেই অত্যাচার, নির্যাতন এটা এখানে মূল ইস্যু না।

প্রিয় ভাই! আমার কথা ভুল বুঝবেন না! আমাদের গাজার ভাই-বোনরা যে কোরবানি করছেন, যে কষ্ট করছেন সেটিকে আমি খাটো করে দেখছি না। আমি আসলে বিষয়টা বোঝাতে চাচ্ছি যে, মুসলিমদের উপর এমন বর্বরতা আগে ঘটে নাই ব্যাপারটি এমন নয়, এরকম ঘটনা আগেও ঘটেছে। সমস্যা এখানে না, সমস্যাটা অন্য জায়গায়।

তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

সমস্যাটা হলো যে, ক্রুসেডারদের সময় যখন আগ্রাসন হয়েছে, তাতাদের সময় যখন আগ্রাসন হয়েছে তখন মুসলিমরা ক্রুসেডারদের সামরিক শক্তিকে সমীহ করতো। তারা তাতারদের যে হিংস্রতা এটা নিয়ে সচেতন ছিল। কিন্তু ওদের নিয়ে ফ্যাসিনেশন (Fascination)/আকর্ষণ ছিল না, তাদের নিয়ে মুগ্ধতা ছিল না। আপনি তাদের লেখা যদি পড়ে দেখেন দেখবেন যে ক্রুসেডের সময় যে সব মুসলিম ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, তারা ক্রুসেডারদের নিয়ে মজা করেছেন যে তাদের কাজকর্ম এমন কেন, তাদের বিশ্বাস এমন কেন, তাদের সংস্কৃতি এমন কেন। তাদের সময়ের একটা বিখ্যাত ঘটনা আছে, অনেক আলেমদের আলোচনায় শুনেছেন হয়ত, তাতারদের নেতা হালাকু খানের মেয়ে বাগদাদ শহরে বের হয়েছে। সে একজন আলেমকে দেখেছে এবং তাকে গিয়ে প্রশ্ন করছে, এই তোমাদের কোরআনে না লেখা আছে, আল্লাহ তোমাদের বিজয়ী করবেন, আল্লাহ তোমাদের কর্তৃত্ব দিবেন, তোমরা সম্মানিত হবে? তাহলে কোরআন তো ভুল। কারণ আমরা তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করছি, তোমরা আমাদের অধীনস্থ হয়ে গিয়েছ। তখন সেই আলেম বললেন, রাখাল যখন ভেড়া নিয়ে যায় তখন সাথে কিছু কুকুর নিয়ে যায়, গার্ড ডগস। কেন নেয়? কারণ ভেড়া যখন পাল থেকে বের হয়ে যায় তখন কুকুর ছেড়ে দিতে হয়, কুকুরের ধাওয়া খেয়ে ভেড়াগুলো আবার পালে ফেরত আসে। তোমরা তাতাররা হলে ঐ কুকুর, আল্লাহ তোমাদের পাঠিয়েছেন কারণ আমরা দ্বীন থেকে সরে গিয়েছি। তোমাদের ধাওয়া খেয়ে আমরা দ্বীনের দিকে যখন ফিরব, তখন যিনি তোমাদের ছেড়েছেন তিনি তোমাদের আবার বেঁধে ফেলবেন।

সুবহানআল্লাহ! এই বুঝটা খুবই পরিষ্কার। তাদের মধ্যে অনুশোচনা ছিল, দুঃখ ছিল, কিন্তু কোন কনফিউশন বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না, শত্রুকে নিয়ে কোন মুগ্ধতা ছিল না। তাদের সামনে এটা স্পষ্ট ছিল যে, আমরা দ্বীন থেকে সরছি এজন্য আজকে আমাদের এই অবস্থা, আমাদের দ্বীনে ফেরত আসতে হবে। কিন্তু ভাই, আজ আমাদের কী অবস্থা? আমাদের অবস্থাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যারা আমাদেরকে হত্যা করছে, যারা আমাদের উপর আগ্রাসন চালাচ্ছে তাদের নিয়ে

আমাদের মধ্যে মুগ্ধতা কাজ করে। তাদের নিয়ে আমাদের মধ্যে ফ্যাসিনেশন কাজ করে এবং আমরা মনে করি যে, আমাদের আরো বেশি করে কুফ্ফারদের মত হতে হবে, আমাদেরকে কুফ্ফারদের অনুকরণ করতে হবে, তাহলে মনে হয় আমরা জিততে পারবো, তাহলে মনে হয় আমাদের দুরবস্থা দূর হবে এবং আমরা মনে করি যে, কুফফারের যে তন্ত্র মন্ত্র আছে, কুফফারদের যে বাদ মতবাদ আছে এগুলোর মাধ্যমে মনে হয় দ্বীনের খেদমত হবে। হ্যাঁ, ভাই! আমরা এমনই চিন্তা করছি।

এগুলো কেন হচ্ছে? কারণ শত্রুর দ্বীন নিয়ে আমাদের মধ্যে মুগ্ধতা আছে এবং আমাদের দ্বীন নিয়ে আমাদের মধ্যে আছে হীনমন্যতা। ইবনে খালদুন একটা কথা বলেছিলেন, যারা পরাজিত জাতি তারা সবসময় বিজয়ী জাতির অনুকরণ করে। ঠিক এই জিনিসটাই আমাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে। ক্রুসেডের সময়, মোঙ্গলদের আগ্রাসনের সময় আমরা সামরিক এবং রাজনৈতিকভাবে পরাজিত ছিলাম কিন্তু আদর্শিকভাবে পরাজিত ছিলাম না। এখন আমরা সামরিক রাজনৈতিকভাবেও পরাজিত, আদর্শিকভাবেও পরাজিত, মনস্তাত্ত্বিকভাবেও পরাজিত। এই কারণে সহজ যে উত্তর, সহজ যে সমাধান এটা আমরা গ্রহণ করতে পারি না। আল-কুসদের মুক্তি কোন পথে হবে? আল কুদসের মুক্তি হবে জিহাদের মাধ্যমে, কিতালের মাধ্যমে, তরবারির ধারালো অগ্রভাগ দিয়ে আল কুদসের মুক্তি হবে। আর কোন কিছু দিয়ে হবে না। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন আল কুদসের জন্য আপনার আমার করণীয় কী!

সূরা নিসার এই আয়াতে বলা হয়েছে: আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

"আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে যালেম, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অভিভাবক (অলী) নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী (নাসীর) নির্ধারণ করে দাও।" (৪ সূরা নিসা: ৭৫)

কথাগুলো ভাই খুবই স্পষ্ট, আল্লাহ তা'আলা আরো বলছেন:

وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُم وَآخَرينَ مِن دونِهِم لا تَعلَمونَهُمُ اللَّهُ يَعلَمُهُم وَما تُنفِقوا مِن شَيءٍ في سَبيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيكُم وَأَنتُم لا تُظلَمونَ

"আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলম করা হবে না।" (সূরা আনফাল ৮:৬০)

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"আর তোমরা তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করতে থাকো, যে পর্যন্ত না (পৃথিবীর সকল) ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" (৮ সূরা আনফাল: ৩৯)

প্রিয় ভাই! আল কুদস ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সময় কিভাবে ফাতাহ (বিজয়) হয়েছে, আল কুদস সালাউদ্দিন আইয়ুবীর সময় কিভাবে ফাতাহ হয়েছে, এই ইতিহাস আমাদের সামনে সুস্পষ্ট, এতে জটিলতার কিছু নেই। তবুও আমরা অনেকে উত্তরটা নিতে পারছি না এবং আমাদের মধ্যে এখনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাজ করছে। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, ইতিপূর্বে আল কুদস কখনোও জিহাদ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে মুক্ত হয়নি।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, জিহাদের ধরণ কী হবে বা জিহাদ কিভাবে হবে? আমরা কি ফিলিস্তিনে গিয়ে জিহাদ শুরু করবো? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে কি ফিলিস্তিনে জিহাদ শুরু হয়েছিল, নাকি ফিলিস্তিনে গিয়ে জিহাদ শেষ হয়েছিল? সালাউদ্দিন আইয়ুবীর সময় জিহাদ কি ফিলিস্তিনের দরজায় শুরু হয়েছিল, না জিহাদ ফিলিস্তিনের ভেতর গিয়ে শেষ হয়েছিল? প্রশ্নের উত্তর সোজা। আমরা কি জিহাদ ফিলিস্তিনে গিয়ে শুরু করবো, নাকি জিহাদ করতে করতে গিয়ে আল্লাহ এক সময় আল আকসা কে আমাদের হাতে দিবেন ইনশাআল্লাহ, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর ভাই খুব সোজা। কিন্তু আবারো এই সহজ উত্তরটা আমরা নিতে পারি না, কারণ এই যে, আমাদের পরাজিত মানসিকতা আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এর বাহিরে আমরা বের হতে পারছি না। আমাদের চিন্তার মধ্যে কিছু জট লেগে আছে, যখনই আমরা সুস্পষ্টরূপে একটা জায়গায় যেতে চাচ্ছি, ওই জটগুলোর জন্য আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছি না। সুফিদের একটা কথা আছে যে, আপনি যখন কোন গ্লাসে বিশুদ্ধ পানি দিবেন, তার আগে ঐ গ্লাস থেকে ময়লা ফেলে দিতে হবে। সুতরাং আমি যদি ঠিক উত্তরটা দিতে চাই তার আগে ভুল উত্তরটা সরিয়ে নিতে হবে। এজন্য আমি মূল উত্তরে যাচ্ছি। তার আগে অল্প কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, আমাদের মাথায় যে কিছু জট লেগে আছে সে জটগুলো পরিষ্কার করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আল কুদস কি তথাকথিত কোনো 'বৈধ' পন্থায় মুক্ত হবে?

প্রিয় ভাই! আমাদেরকে প্রথম যে জটটা খুলতে হবে সেটা হল আল-কুদসের ইস্যুর নিয়মতান্ত্রিক কোনো সমাধান নেই, এর কোন অনুমোদিত সমাধান নেই, এর কোন বৈধ সমাধান নাই, বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার (World Order) অধীনে যতগুলো নিয়মতান্ত্রিক পথ আছে, যতগুলো বৈধ পথ আছে, যতগুলো উপায় আছে এগুলোর কোনটা দিয়ে ফিলিস্তিন মুক্ত হবে না। সেটা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। আর যেই পথে ফিলিস্তিন মুক্ত হবে, আল কুদস মুক্ত হবে এটি কোনদিনও এই বিশ্ব ব্যবস্থায় বৈধ পথ হবে না, এটি কখনোই তারা মেনে নিবে না। যে পথে আল কুদস স্বাধীন হবে, সেটি সব সময়ই তাদের চোখে অপরাধ থাকবে, সব সময়ই তা তাদের চোখে অবৈধ থাকবে এবং এটি সব সময়ই তাদের চোখে তথাকথিত 'সন্ত্রাস' হিসেবে গণ্য হবে। আর এটিই হল প্রকৃত বাস্তবতা। একটু চিন্তা করুন ভাই, যে জাতিসংঘ আর যে আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা হল, সেই জাতিসংঘ আর সেই আন্তর্জাতিক আইন দিয়ে আপনি কিভাবে আল কুদস মুক্ত করবেন? ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিভাবে? আন্দোলনের মাধ্যমে, ব্রিটিশদের সাহায্যে, আমেরিকার সাহায্যে, আন্তর্জাতিক আইন আর জাতিসংঘের ফ্রেম ওয়ার্ক এর মধ্যে। নতুন এই বিশ্ব ব্যবস্থা (New World Order) ইসরাইলকে জন্ম দিয়েছে এবং এই বিশ্ব ব্যবস্থা ইসরাইলকে টিকিয়ে রেখেছে এবং শেষ পর্যন্ত রাখবে। তাহলে এই বিশ্ব ব্যবস্থার অধীনে যতগুলো সম্ভাব্য সমাধান আছে কোনোটা দিয়ে আপনি ইসরাইলকে সরাতে পারবেন না। এটা একটা অলীক চিন্তা ভাই!

নতুন এই বিশ্ব ব্যবস্থা (New World Order) ফিলিস্তিন প্রশ্নে সম্ভাব্য সমাধান কী দিয়েছে? ওয়ান স্টেট সলিউশন (ইসরাঈল-ফিলিস্তিন মিলে একটি মাত্র রাষ্ট্র হবে- ইহুদি রাষ্ট্র, সেখানে ইহুদি মুসলিম সবাই থাকবে), অথবা টু স্টেট সলিউশন (একটা ইহুদি রাষ্ট্র আরেকটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র)। এইতো তাদের প্রস্তাবিত সলিউশন, দুই ক্ষেত্রেই তো ইসরাইল থাকছে শুধু সীমানার হেরফের হচ্ছে। কাজেই এইভাবে আপনি যদি পুরো আল কুদসকে মুক্ত করতে চান, আপনি বিশ্ব ব্যবস্থার অধীনে নিয়ম তান্ত্রিক কোন বৈধ পন্থা পাবেন না, এই কথাটি আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে।

তথাকথিত আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার এসব মেনে আমরা আল কুদসকে মুক্ত করতে পারবো না। এগুলো মানা আপনার আমার জন্য বাধ্যতামূলক, ওদের জন্য অপশনাল (ঐচ্ছিক)। ইসরাইল কতগুলো মানবাধিকার ভঙ্গ করেছে, ইসরাইল কতগুলো আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেছে, আমেরিকা ইরাক আর সিরিয়াতে কী করেছে, ফ্রান্স এখন আফ্রিকাতে কী করছে, এমনকি জাতিসংঘের যে শান্তিরক্ষী বাহিনী এর আগে সুদান, হাইতি, লাইবেরিয়া, কঙ্গো এসব জায়গায় গিয়ে মা-বোনদেরকে ধর্ষণ করেছে, এগুলো কি মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়? আন্তর্জাতিক আইনের ভঙ্গ হয় না এখানে? কার কী হয়েছে? কিচ্ছু হয়নি। আন্তর্জাতিক আইন ওরা বানাবে আর আপনি আমি মানবো, এসব আইন ওরা মানার জন্য বানায়নি। আপনি আমি যদি ওদের কথা বিশ্বাস করে বসে থাকি, তাতে আমাদের কিছুই লাভ নেই। এগুলো দিয়ে ওরা আপনার আমার দুই হাত পেছনে বেঁধে রাখবে, তারপর ইসরাইল এসে আমাদেরকে জবাই করবে। এরা আমাদেরকে নারী অধিকারের কথা বলবে, শিশু অধিকারের কথা বলবে, মানবাধিকারের কথা বলবে, পর্দার সমালোচনা করবে, নিকাবের সমালোচনা করবে, শরিয়ার সমালোচনা করবে, তারপর আমাদের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে এলজিবিটিকিউ ঢোকাবে। কিন্তু যখন প্রকাশ্যে হাজার হাজার নারী শিশু বৃদ্ধ মারা যাচ্ছে, জেনোসাইড হচ্ছে, এথনিক ক্লিনসিং হচ্ছে, তখন এরা এসে বলবে- ইসরাইল হ্যাজ দ্যা রাইট টু ডিফেন্ড ইটসেল্ফ (ইসরাঈলের নিজের আত্মরক্ষার অধিকার আছে)। এইতো অবস্থা, এটাই হলো আন্তর্জাতিক আইন এবং তথাকথিত মানবাধিকারের আসল চেহারা, এটাই হল নতুন বিশ্বব্যবস্থার (New World Order) ধোঁকা।

আমেরিকাতে একজন বিখ্যাত দাঈ ছিলেন মালিকা শাহবাজ। মেলকাম এক্স (Malcolm X) এই নামে চিনবেন অনেকে। উনার একটি উক্তি আছে খুব বিখ্যাত এবং আমি মনে করি, এই উক্তিটি আমাদের সবার বোঝা উচিৎ। তার এই উক্তিটি **"By Any Means Necessary"** স্লোগান হিসেবে পরিচিত। উনি বলেছেন,

"We want freedom by any means necessary, we want justice by any means necessary, we will strike at injustice by any means necessary."

"আমরা স্বাধীনতা চাই যেকোনো উপায়ে প্রয়োজন হলে, আমরা ন্যায় চাই যেকোনো উপায়ে প্রয়োজন হলে, আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে আঘাত করব যেকোনো উপায়ে প্রয়োজন হলে।"

অর্থাৎ মুক্তির জন্য, মর্যাদার জন্য, সম্মানের জন্য, অন্যায় বন্ধ করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন তার সবই করতে হবে। ম্যালকোম এক্স আফ্রিকান আমেরিকান ছিলেন, পশ্চিমা বিশ্বের বাস্তবতা উনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন, উনার মধ্যে হীনমন্যতা ছিল না এবং উনার এই চিন্তা ছিল না যে আমার কৈফিয়ত দিতে হবে। তাই উনি এই সহজ কথাটা

সহজ ভাবে বলে দিয়েছেন। তো এই কথাটা আপনার আমারও বুঝতে হবে যদি আমরা মুক্তি চাই, যদি আপনি আমি মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই, তাহলে ইউ হ্যাভ টু গেট ইট বাই এনি মিনস নেসেসারী (আমাদেরকে অবশ্যই তা পেতে হবে যে কোনো প্রয়োজনীয় উপায়েই হোক) অর্থাৎ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মাধ্যমে।

প্রিয় ভাই! এথাটি আমরা মাথার মধ্যে গেঁথে নেই, মনের মধ্যে খোদাই করে নেই যে, আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসংঘ, মানবাধিকার আইন এগুলো কিয়ামত পর্যন্ত মেনে আমরা আল-আকসা কে মুক্ত করতে পারব না।

আল কুদস কি তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলো মুক্ত করবে?

অনেক ভাই আছেন তারা এটি বুঝেন যে, জাতিসংঘ দিয়ে আল আকসা মুক্ত হবে না, কিন্তু তারা মনে করেন যে, পৃথিবীতে বর্তমানে অনেক মুসলিম দেশ আছে, এই মুসলিম দেশগুলোকে অর্থনৈতিক-সামাজিকভাবে শক্তিশালী করতে হবে, সামরিকভাবে শক্তিশালী করতে হবে, তাহলে মনে হয় কোন এক সময় এদের মাধ্যমে আল কুদস মুক্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু না ভাই, এভাবে কখনোই হবে না। এরকম রাষ্ট্র যতগুলো আছে, 'তুফানুল আকসা' পরবর্তী ইসরাঈলী আগ্রাসন মোকাবেলায় কে কী করেছে বলুন? ইউ এ ই (সংযুক্ত আরব আমিরাত), কাতার, সৌদি আরাবিয়া, তুরস্ক, মিশর-এরা কে কী করেছে বলেন? সর্বপ্রথম যে রাষ্ট্র ইসরাইলের সাথে সম্পর্ককে নরমালাইজেশন (স্বাভাবিকীকরণ) করেছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইউ এ ই। ইসরাইলকে সবচেয়ে বেশি অস্ত্র সরবরাহ করে আমেরিকা, সেই অস্ত্র ইসরাইলে পৌঁছায় কিভাবে? যে রুটগুলো ব্যবহার করে পৌঁছায় তার একটা হলো কাতারে। গাজায় যে অস্ত্র দিয়ে আপনার আমার ভাই বোনকে হত্যা করা হচ্ছে সেই অস্ত্র প্রথম এসে পৌঁছাচ্ছে কাতারে। সৌদি আরব কী করছে, একদিকে ইসরাইলের সাথে নরমালাইজেশন এর চেষ্টা করছে আর অন্যদিকে মরুভূমিতে পশ্চিমা নগ্ন নর্তকীদের কনসার্ট আর ফিল্ম ফেস্টিভালের আয়োজন করছে।

ইসরাঈলের চ্যানেল থার্টিন এ একটি প্রতিবেদন আছে, সেখানে বলা হয়েছে যে, ইয়েমেনের হুথিরা যখন লোহিত সাগরে ব্লকেড দিল তখন ইসরাইলে কার্গো গিয়েছে কিভাবে! হুথিদের লোহিত সাগরে জাহাজ আটকানোর পর ইসরায়েল বিকল্প রুট হিসেবে **ল্যান্ড ব্রিজ (দুবাই → সৌদি আরব → জর্ডান → ইসরায়েল)** ব্যবহার করছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা এগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলার মত মানুষ, সেই সকল শত শত হকপন্থী ওলামায়ে কেরাম গত সাত-আট বছর ধরে তাদের জেলে বন্দী হয়ে আছেন।

আর, অনেক ভাই ইসরাঈলের বিরুদ্ধে তুরস্কের ভূমিকার প্রশংসা করেন, এবং আশা করেন যে, তুরস্ক হয়ত আল কুদস এক সময় মুক্ত করবে। এজন্য তুরস্কের বিরুদ্ধে কোনো কথা বললে অনেক ভাই আছেন যারা মন খারাপ করেন। প্রিয় ভাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আপনিই বলুন, তুরস্কের বাস্তবতা কী? তুরস্ক কী করেছে বলুন? তুরস্কের বাস্তবতা হলো, তুরস্ক ন্যাটো সদস্য। তুরস্কের বাস্তবতা হলো, তুরস্কের মিলিটারি ইসরাঈলের আইডিএফ (Israel Defense Forces) এর সাথে 'জয়েন্ট মিলিটারি এক্সারসাইজ' করে। সুতরাং আমরা যদি মনে করি আল কুদসের মুক্তি তুরস্কের মাধ্যমে হবে, এটি আসলে একটি অবাস্তব চিন্তা।

প্রিয় ভাই! আমাদেরকে বুঝতে হবে, এই তাগুত রাষ্ট্রগুলো, মুসলিম দেশের এই সকল শাসনব্যবস্থা (গণতন্ত্র/রাজতন্ত্র) গুলো নতুন আন্তর্জাতিক বিশ্বব্যবস্থার (New World Order) অংশ। আমেরিকা, রাশিয়ার মতো বৈশ্বিক কিংবা আঞ্চলিক পরাশক্তিগুলোর (Super Power) সাথে আপোষ করে তারা টিকে থাকে। এবং তথাকথিত আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর যে শাসন ব্যবস্থা এটা হল ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার ধারাবাহিকতা। আমাদের মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী শাসনব্যবস্থা ছিল, ফিরিঙ্গিরা এসে তাদের শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে, এখন এই রাষ্ট্র এবং এই শাসকরা সেটারই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। এটাই হলো ভাই চরম বাস্তবতা। এরা আমেরিকা কিংবা রাশিয়াকে সন্তুষ্ট রেখে তাদের ক্ষমতা ধরে রাখে। জনগণের চাওয়া এখানে মোটেও কোনো ভূমিকা রাখে না। দেশের মানুষ যতই চাক এই সকল তাগুত সরকারগুলো কখনোই ফিলিস্তিনের পাশে এসে দাঁড়াবে না। কেননা এতে তাদের প্রভু আমেরিকা নাখোশ হবে, ক্ষমতার মসনদ উল্টে যাবে। সুতরাং ভাই, আমেরিকাকে খুশি রাখতে হলে এদেরকে অবশ্যই ইসরাইলের সাথে সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করতেই হবে। তাহলে আমরা কী করে আশা করতে পারি যে, এসকল তাগুত সরকার, পশ্চিমের পা-চাটা গোলাম তথাকথিত মুসলিম নেতৃবৃন্দ আল-কুদস মুক্ত করবে? এটি কী অরণ্যে রোদন নয় ভাই?

যেহেতু এই সকল তথাকথিত মুসলিম(?) তাগুত সরকারের অস্তিত্ব নতুন বিশ্বব্যবস্থার (New World Order) উপর নির্ভরশীল, সেহেতু বিশ্বব্যবস্থা যদি দুর্বল হয় এই শাসকদের মসনদ ইনশাআল্লাহ কেঁপে উঠবে এবং বিশেষ করে আরবের যে রাজতন্ত্রগুলো আছে, তারা ক্ষমতায় টিকে আছে প্রথমে বৃটেনের সাথে আপোষ করার মাধ্যমে এবং এখন আমেরিকার সাথে আপোষ করার মাধ্যমে, এগুলোও একে একে ভেঙ্গে পড়বে ইনশাআল্লাহ। এটাই হলো বাস্তবতা, আর এই বাস্তবতাগুলো অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই ভাই। এগুলো ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য কথা।

মোটকথা তথাকথিত মুসলিম(?) তাগুত সরকারগুলো এমন কোনো কাজ করবে না যেটা এই বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে যায়। আর যদি আন্তরিকভাবে চায়ও, তাহলেও তারা এটা করতে পারবে না। তারা বেশির থেকে বেশি এটা ম্যানেজ করতে পারবে এবং এটিই তারা চেষ্টা করে ম্যানেজ করা যে, ২ লক্ষ মানুষ মারা গেছে তো আমরা কেবল একটি বিবৃতি দিব (এতে জনগনও খুশি হয়ে ঠান্ডা হয়ে বসে থাকবে, আর প্রভু আমেরিকাও অসন্তুষ্ট হবে না- এভাবেই তারা ম্যানেজ করে) এবং এটুকুই তারা করছে, এভাবেই করছে এবং ভবিষ্যতেও এর বেশি তারা কখনোই কিছু করতে পারবে না।

কাজেই, এটা সত্য যে মুসলিমদেরকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে, রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে, সামরিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে। কোন প্রশ্ন নেই, কিন্তু পরাধীন অবস্থায় না। আমরা মনে করি যে, আমরা স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু আমরা স্বাধীন হইনি, আমরা এখনো পরাধীন অবস্থায়ই রয়েছি। পরাধীন অবস্থায় আপনার জিডিপি যত হোক, আপনার দেশের রাস্তা যত সুন্দর হোক, সেটা কোনো বিষয় নয়। আপনি পরাধীন, ওই টাকা আপনার হাতে নেই, ওই অস্ত্র আপনার হাতে নেই, এই শক্তি আপনার হাতে নেই। সুতরাং, এই জিনিসটা বুঝতে হবে, আগে মুক্ত হতে হবে, তারপর শক্তি।

[বি.দ্র: বাহ্যিকভাবে যদিও মুসলিম দেশগুলো স্বাধীন কিন্তু যেহেতু তারা সুপারপাওয়ারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে না, তাছাড়া তারা ইসলামকে অবলম্বন না করায় বা রাষ্ট্রযন্ত্রে ইসলামী শরীয়তকে বাস্তবায়ন না করায়, তারা ইসলাম থেকে দূরে, ফলে তারা কার্যত পরাধীন, চাইলেই তারা ইসলামের নামে কিংবা ইসলামের জন্য কিছু করতে পারবে না। তাই এরকম পরাধীন অবস্থায় তারা যতই অর্থনৈতিক কিংবা সামরিকভাবে শক্তিশালী হোক না কেন, আমেরিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে তারা ইসরাইলের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না।]

আল কুদস কি তথাকথিত মুসলিম সেনাবাহিনীগুলো মুক্ত করবে?

এবং এখানে আরেকটি অবস্থান আছে, অনেকে যেটা মনে করেন, ঠিক আছে জাতিসংঘ দিয়ে হবে না, মুসলিম রাষ্ট্র দিয়ে হবে না, মুসলিম সেনাবাহিনীগুলো দিয়ে হবে। এই সেনাবাহিনী গুলো বিশেষ করে আরবের যে সেনাবাহিনীগুলো আছে ফিলিস্তিনের কাছাকাছি, এরা হয়তোবা সাহায্য করবে এবং আমরা দেখতে পাই যে, যখনই এই ম্যাসাকারগুলো হয়, ইসরাইল কিছুদিন পর পরই ফিলিস্তিনে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, তখনই এরকম হ্যাশট্যাগ দেখতে পাওয়া যায়, যেমন, "আর্মি টু আল-আকসা" (#ArmyToAlAqsa) বা "আর্মি ফর আল-আকসা" (#ArmyForAlAqsa), (এগুলো দ্বারা হয়ত এটি বুঝানো হয় যে, এই আর্মিগুলো গিয়ে আলআকসা কে মুক্ত করবে)। এটা অবাস্তব চিন্তা ভাবনা ভাই।

আপনাকে ইয়েমেনের তাগুত আলী আবদুল্লাহ সালেহর একটা কথা বলছি। আলী আব্দুল্লাহ সালেহ একটি সাক্ষাৎকারে বলেছে যে, এইসব আর্মির কাজ হল মানুষকে দমন করা। যদি জনগণ আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, আমি আর্মি দিয়ে জনগণকে দমন করব। বাইরে এদের আর কোনো কাজ নেই, এটা স্রেফ লোকদেখানোর জন্য। জনগণকে রক্ষা করা সেনাবাহিনীর কাজ না। এটা হলো আলী আব্দুল্লাহ সালেহর কথা। সে একটা মিথ্যাবাদী কিন্তু সে এখানে সত্য বলেছে। এটা হলো বাস্তবতা। আপনি দেখেন যে, এই আর্মিগুলোকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, অস্ত্র দেওয়া হয়েছে, অর্থায়ন করা হয়েছে, কেন? এই আরব শাসকদের মসনদ টিকিয়ে রাখার জন্য এবং মুসলিমদের পায়ের নিচে রাখার জন্য, ইসলামকে দমন করার জন্য, এটাই হল বাস্তবতা। এবং এই আর্মিগুলো কিভাবে আল আকসা পর্যন্ত যাবে বলুন তো? প্রকৃতপক্ষে, ইসরাঈলের চারপাশে যে মুসলিম দেশগুলো আছে এগুলোতো ইসরাইলকে রক্ষা করছে। আপনি যাবেন কিভাবে ইসরাইলে জিহাদ করতে? আপনি তো অনেক দূরের দেশ থেকে যেতে পারবেন না ওখানে তাই না? ফিলিস্তিনের আশেপাশের জায়গা থেকেই ওখানে যেতে হবে। যাওয়ার চেষ্টা করে দেখুন, যারা সর্বপ্রথম আপনাকে বাধা দিবে তারা হলো এই সকল তাগুত বাহিনী। এবং যখন আমরা বলছি যে, এই আর্মিগুলো ক্ষমতা নিবে বা তারা কাজ করবে, আল কুদস জয় করবে, আসলে ওরা কতটুকু করছে বা করবে এটার বাস্তবতা তো আমরা দেখছি।

মিশরে কী হয়েছে জামাল আব্দুল নাসেরের সময়? জামাল আব্দুল নাসের ইখওয়ানুল মুসলিমিন বা মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে একটা ওয়াদা করেছিল। সে কোরআনের উপর হাত রেখে ওয়াদা করেছিল যে, মুসলিম ব্রাদারহুড রাজপথে আন্দোলন করবে, জনমত গঠন করবে, জামাল আব্দুল নাসের আর তার বন্ধুরা সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্যু করবে, সামরিক অভ্যুত্থান করবে। তারপর তারা ক্ষমতায় যাবে, ক্ষমতায় গিয়ে কোরআনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে।

কোরআনের উপর হাত রেখে সে ওয়াদা করেছে। এরপর ক্যু হয়েছে, মুসলিম ব্রাদারহুড তার ওয়াদা পূরণ করেছে, সে ক্ষমতায় গিয়েছে। ক্ষমতায় গিয়ে কী করেছে? গাইরুল্লাহর আইন দিয়ে দেশ শাসন করেছে, মুসলিম ব্রাদারহুড কে জবাই করেছে। উস্তাদ সাঈদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ সহ অনেক মানুষকে তারা শহীদ করেছে। এটা হল বাস্তবতা, এরা যখন আসে তখন কী করে এটি আমাদের চোখের সামনে আছে। কাজেই আরব রাষ্ট্রগুলো বা এই রাষ্ট্রগুলোর যে শাসনব্যবস্থা রয়েছে বা শাসকরা আছে বা সেসকল দেশের সেনাবাহিনীগুলো- এরা হলো ইসরাইলের ঘনিষ্ঠতম মিত্র এবং এই বাহিনীগুলো হয় ইসরাইলের বর্ডার গার্ড অথবা জাতিসংঘের ভাড়াটে সৈন্য। এটা হল বাস্তবতা আর এদেরকে দিয়ে আপনি ফিলিস্তিনমুক্ত করবেন এটা হল ডিলিউশন (Delusion/অবাস্তব বিশ্বাস) ভাই।

আল কুদস কি ইরান মুক্ত করবে?

এবার আসেন ইরানের কথায়। আমরা অনেকে মনে করি যে, ইরান ফিলিস্তিনকে মুক্ত করবে।

প্রিয় ভাই! আল কুদসের মুক্তি ইরানের মূল উদ্দেশ্য নয়, ইরানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে শিয়াদের যে ক্ষমতা এটাকে বৃদ্ধি করা। **শিয়া অ্যাক্সিস (Shia Axis)** যেটাকে বলে, আর এই অক্ষটি মূলত ইরান, ইরাক, সিরিয়া, লেবাননের হিজবুল্লাহ, ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহী এবং কিছু শিয়া মিলিশিয়া গোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত। একটা কথা আছে গেম থিওরিতে, জিরো সাম গেম। তার শক্তি যত বাড়বে আপনার শক্তি তত কমবে। এটা হল বাস্তবতা, ইরানের সাথে ইসরাইলের স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে, ইরানের সাথে আমেরিকার স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে। ইরান তার এই অক্ষকে শক্তিশালী করবে অ্যাট ইউর কস্ট (আপনার আমার ক্ষতি সাধন করে)। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, ইরানের সাথে আপনার-আমারও দ্বন্দ্ব আছে। যে ইরান আজকে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার জন্য বুলি আওড়াচ্ছে, তারাই আজকে সিরিয়াতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে হত্যা করছে, তারাই আজকে আহওয়াজে [(Ahvaz), ইরানের খুজেস্তান (Khuzestan) প্রদেশের রাজধানী] আহলুল সুন্নাহ ওয়াল জামাতকে হত্যা করছে, তারাই আজকে ইরাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে হত্যা করছে, এখনো নির্যাতন করছে। এটা হল বাস্তবতা, ইরানের স্বার্থ এবং আহলুল সুন্নাহ ওয়াল জামাতের স্বার্থ কখনই এক না। ইরান সক্রিয়ভাবে এই মুহূর্তে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। আগে কখনো ছিল, পরে কখনো হবে- এগুলো বলছি না। ঠিক এই মুহূর্তেও তারা আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, এই মুহূর্তেও তারা আমাদেরকে হত্যা করছে। আমেরিকা যখন আফগানিস্তানে আক্রমণ করেছে, আমেরিকা যখন ইরাকে আক্রমণ করেছে, ইরান আমেরিকা কে সহায়তা করেছে। এটা তাদেরই মুখের কথা, আমি বানিয়ে বলছি না ভাই।

মোহাম্মদ খাতামী ইরানের প্রেসিডেন্ট ছিল ১৯৯৭ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত। ২০০৯ সালে The New Yorker ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে খাতামী বলেন:

> "I tried hard, during my two terms as President, to improve relations with America and spoke about my government's behind-the-scenes support for the U.S. campaign to overthrow the Taliban in Afghanistan in 2001, after the September 11th attacks. 'Then the neocons came and destroyed everything."

আমি আমার সরকারের পক্ষ থেকে ২০০১ সালে আফগানিস্তানে তালিবান উৎখাতে যুক্তরাষ্ট্রকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছি। তারপর (যুক্তরাষ্ট্রের) নব্য রক্ষণশীল (নীতিনির্ধারক)-রা এসে সবকিছু ধ্বংস করে দেয়।" [https://bit.ly/irangaza]

এটি একটি স্পষ্ট বক্তব্য, এতে লুকোচুরির কিছু নেই।

তবে, সবচেয়ে বড় যে বিষয়, ইরানের থেকে সতর্ক হওয়ার সবচেয়ে বড় কারন হলো, তাদের সাথে আমাদের আকিদার দ্বন্দ্ব রয়েছে। তাওহিদের ব্যাপারে দ্বন্দ্ব আছে। তারা আল্লাহর উলুহিয়্যাত, আল্লাহর রুবুবিয়্যাত, আল্লাহর সিফাতের বিরুদ্ধে শিরক করে। তারা আমাদের মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার ব্যাপারে জঘন্য কথা বলে, যেটা কোনদিন কেয়ামত পর্যন্ত মানা সম্ভব না আমাদের পক্ষে। তারা সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আজমাইন এর ব্যাপারে তাকফির করে। এটা কোনদিন মানা সম্ভব না, এটা কোনো ফুরুই (শাখাগত মামুলি) বিষয় না ভাই। এই জিনিস মেনে আপনি কোন কিছু করতে পারবেন না। এই শির্ক এর সাথে মিলিয়ে আপনি আল কুদসকে মুক্ত করতে পারবেন না। ইরানকে আমাদের দেখতে হবে ক্রুসেড এর সময়ে উবাইদি সাম্রাজ্যের মতো করে। ক্রুসেড এর সময়ে একটা সাম্রাজ্য ছিল উবাইদি সাম্রাজ্য, যেটাকে আমরা 'ফাতেমি খিলাফত' নামে চিনি। এরা আকিদার দিকে ছিল ইসমাইলি শিয়া, মানে ইমামি শিয়াদের চেয়েও খারাপ। তারাও জেরুজালেমকে মুক্ত করার কথা বলতো, তারাও ঐক্যের কথা বলতো। কিন্তু ইতিহাস খুলে দেখেন আহলুল সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সাথে তাদের ভূমিকা কী ছিল! এটা শুধু তখন না, এখনও এবং এর আগেও ছিল এরকমই, আর ভবিষ্যতেও এর ব্যতীক্রম হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কাজেই ইরানকে উবাইদিদের একটি আধুনিক সংস্করণ হিসেবে দেখতে হবে।

তবে ইরানের কিছু অর্জন আছে যেটা আমাদের নেই, এটা আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে। শিয়া স্বার্থের জন্য ইরান গত চার বছরে যেটা করতে পেরেছে, কোন সুন্নি শক্তি সেটা এখনো করতে পারেনি। শিয়াদের আজকে একটা রাষ্ট্র আছে, তাদের একটা জিওপলিটিক্যাল প্রজেক্ট আছে। মধ্যপ্রাচ্যে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের এখনো এরকম কিছু নেই। বৈশ্বিকভাবে ফিলিস্তিন ইস্যুকে ব্যবহার করে ইরান প্রতিরোধের একটি রেটরিক তৈরি করেছে, এক ধরনের সফট পাওয়ার তৈরি করেছে, এটা আমরা করতে পারিনি। এই ক্রেডিট আমরা তাদেরকে দিতে পারি, এই অর্জন স্বীকার করতে আমাদের কোন সমস্যা নেই। কিন্তু এই রেটরিকে মজে গিয়ে আমাদের একথা মনে করলে চলবে না যে, তারা হল উম্মাহর অগ্র সেনানী। আমাদের মনে করার কোনো কারণ নেই যে, ইরান এসে আপনার-আমার সহযোগী হবে। এটা যদি আমরা মনে করি তাহলে এটা ভুল হবে এবং এই ভুলের মাশুল আমাদেরকে দিতে হচ্ছে এবং দিতে হবে।

আল কুদস কখনো অপবিত্রদের দ্বারা মুক্ত হবে না:

আরেকটা বিষয় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, সেটা হলো আল কুদস পবিত্র, এটা ইসলাম ছাড়া আর কোন কিছু দিয়ে মুক্ত হবে না। বাংলাদেশে একটি দল আছে জাসদ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল। আশির দশকে এই দলের অনেক মানুষ ফিলিস্তিন গিয়েছিল লড়াই করার জন্য। মেজর জলিল জাসদের সদস্য ছিল, উনার মাধ্যমে অনেকে

তখন সেখানে গিয়ে লড়াই করেছে। ইয়াসির আরাফাতের যে দল ছিল পিএলও, এটার সাথে তারা ওখানে গিয়ে লড়াই করেছিল। এগুলো ডকুমেন্টেড। তো এই জাসদ বা এই পিএলও এর হাতে আল্লাহ কখনো আল কুদসের মুক্তি দিবেন না। মুলহিদ, কমিউনিস্ট, সেক্যুলারিস্ট, ন্যাশনালিস্টদের হাতে আল্লাহ আল কুদসকে দিবেন না। আল কুদস মানে কি? আল কুদস মানে পবিত্র। পবিত্র জিনিস আল্লাহ অপবিত্রদের হাতে দিবেন না, অসম্ভব। যেই বিজয় আল্লাহ তায়ালা প্রথম দিয়েছেন আল ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে, যে বিজয় আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন সালাউদ্দিন আইয়ুবী রহ. এর কাছে, এই বিজয় আল্লাহ কোনো কমিউনিস্টকে দিবেন না। এটা আল্লাহ কোন জাতিয়তাবাদীকে দিবেন না। এটা যদি মুক্ত হয় তাহলে এটা ইসলামের নামে মুক্ত হবে। যতদিন পর্যন্ত ইসলামের নাম না আসবে এটা যদি আমাদের কাছে বাহ্যিকভাবে মনেও হয় মুক্ত হয়েছে, বুঝতে হবে 'আসলে এটা মুক্ত হয়নি' ।

ফিলিস্তিনের মুসলমানরা কি আল কুদস জয় করতে পারবে?

প্রিয় ভাই! এখানে এটাও বুঝা দরকার যে, ফিলিস্তিনের মানুষেরা নিজে নিজে আল কুদসকে মুক্ত করতে পারবে না। আমরা সবাই ফিলিস্তিনের জিহাদ সমর্থন করি, সবাই সমর্থন করে এটি। কমিউনিস্টরাও সমর্থন করে। কিন্তু ফিলিস্তিনের মানুষ/গাজার মানুষ কেবল গাজার জন্য লড়াই করছে, আল কুদস মুক্ত হবে না। পশ্চিম তীরের মানুষ শুধু পশ্চিম তীরে লড়াই করছে, ফিলিস্তিন মুক্ত হবে না। এটা সম্ভব না। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়, আবারো চিন্তা করুন, ইতিহাসের কথা চিন্তা করুন, ফিলিস্তিন কি ভেতর থেকে মুক্ত করা হয়েছিলো, না বাহির থেকে গিয়ে মুক্ত করা হয়েছিলো? সালাউদ্দিন আইয়ুবীর সময়ের কথা চিন্তা করুন, ফিলিস্তিন কি ভেতর থেকে মুক্ত করা হয়েছিল না বাইরে থেকে গিয়ে মুক্ত করা হয়েছিল? বাইরে থেকে গিয়ে মুক্ত করতে হবে। ঠিক তাই এখন আপনাকে আমাকে করতে হবে। বাইরে থেকে যোদ্ধা বাহিনী গিয়ে ফিলিস্তিনকে আপনার মুক্ত করে আনতে হবে। একথার ইঙ্গিত আমরা পরের আলোচনা থেকে পাব ইনশাআল্লাহ।

আল কুদস বিজয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ:

প্রিয় ভাই, আল কুদস মুক্ত করার পথে অনেকগুলো প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান রয়েছে। সমস্যাটা হল, বাইরে থেকে যারা যাবে, তারা যাবেটা কিভাবে? ইসরাইল একটা ৪/৫ লেয়ারের সিকিউরিটি কমপ্লেক্সের ভেতরে বসে আছে। সহজ করে বলি, ইসরাইল যেতে হলে আপনার চারটা বা পাঁচটা পাহাড় টপকাতে হবে। এভাবে চিন্তা করুন, মনে করুন আফ্রিকার কোন অঞ্চলে আপনি টাইম মেশিনে করে সালাউদ্দিন আল আইয়ুবী এবং নুরুদ্দিন জিঙ্গি রহিমাহুল্লাহ তাদেরকে নিয়ে আসলেন। তাদের বাহিনীকে নিয়ে আসলেন এবং তাদেরকে অত্যাধুনিক অস্ত্র দিলেন, তাদেরকে একটা মিশন দিলেন, তোমাদের কাজ হল তোমরা আবার জেরুজালেম মুক্ত কর। আগে একবার করেছিলে এখন আবার কর। তারা যদি এই কাজটা করতে চায় তাদেরকে কে বাধা দিবে এবং তারা কী কী বাধার সম্মুখীন হবেন একটু চিন্তা করি। প্রথমে ওইখানকার তথাকথিত মুসলিম শাসক বাধা দিবে, এদের বাহিনীগুলো বাধা দিবে, সেই শাসকদের কিছু অনুগত নামধারী আলেম থাকবে তারা বাধা দিবে। তারা বলবে এরা খারেজি, এরা তাকফিরি, তারা বলবে এরা উগ্র, জঙ্গী ইত্যাদি। এগুলো বললে অনেকে কষ্ট পান, অথচ এগুলো বাস্তবতা।

কিছুদিন আগে মিশরের **গ্র্যান্ড মুফতি ড. শাওকি আল্লাম** বলেছেন যে, অক্টোবরের ৭ তারিখ হামাস যে আক্রমণ করেছিল (প্রথম তুফানুল আকসা) তা খারেজিদের মতো আক্রমণ করা হয়েছে। যাদের সামনে বলেছে সেই তরুণরা তাকে ভয়ংকর এগ্রেসিভ একটা স্লোগান দিয়েছে তখন, আসলে তাকে গালি দিয়েছিল।

এগুলো বাস্তবতা ভাই, প্রথমে ঐ শাসকরা, তারপর তার বাহিনীরা তাঁদের বাধা দিবে, তারপর তাদের অনুগত নামধারী আলেমরা, অবশ্যই হকপন্থী আলেমরা না, নামধারী আলেমরা তাদেরকে বাধা দিবে। তারপর আন্তর্জাতিক বিশ্ব আসবে। এসে তাদেরকে অর্থনৈতিক অবরোধ করার চেষ্টা করবে, নিন্দা প্রস্তাব দিবে। তারপর যদি কোনভাবে তারা অগ্রসর হতে পারে তখন তাদেরকে লড়াই করতে হবে আমেরিকার সাথে। তারপর আপনি ইসরাইলের সাথে ফাইট করতে পারবেন, তার আগে না। এটাই হল বাস্তবতা! আজকে যদি কোন সুন্নি রাজনৈতিক শক্তি তৈরি হয়, মনে করেন উত্তর-পূর্ব আফ্রিকাতে কোন সুন্নি দল ইসলামী ইমারত কায়েম করলো, তারা এখন আল কুদস পর্যন্ত যেতে চায়। তাদেরকে এই চার পাঁচটা পাহাড় টপকে ওখানে যেতে হবে। কাজেই আল কুদসের মুক্তির যে ইস্যু এটা কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের ইস্যু না, এটা কোন লোকাল ইস্যু না, এটা একটা গ্লোবাল ইস্যু। এটার সম্পর্ক পুরো বিশ্ব ব্যবস্থা (World Order)-এর সাথে।

আল কুদসকে মুক্ত করতে হলে নতুন বিশ্বব্যবস্থা (New World Order)-কে পরাজিত করতে হবে

প্রিয় ভাই, একটু চিন্তা করে দেখি, ইসরায়েল রাষ্ট্র অস্তিত্বে আসলো কিভাবে? ১৯৪৭ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো, যখন মিত্র বাহিনী যুদ্ধে জিতলো, যখন আমেরিকার নেতৃত্বে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা (New World Order) তৈরি হলো তখন ইসরাইলের জন্ম হয়েছে। কাজেই যেই আল কুদস দখল হওয়ার সাথে, ইসরাইলের জন্ম হওয়ার সাথে সম্পর্ক এই বিশ্ব ব্যবস্থার, আমরা যদি সেই আল কুদসকে মুক্ত করতে চাই, সেই ইসরাইলের মোকাবেলা করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম এই বিশ্ব ব্যবস্থাকে পরাজিত করতে হবে। এর সহজ কোনো উপায় নেই আসলে। আর যখন আমরা এই বিশ্ব ব্যবস্থাকে চেঞ্জ করতে যাবো সেটি কী রকম হবে? এটা কি একটা নীট এন্ড ক্লিন (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন) প্রক্রিয়া হবে? সহজ প্রক্রিয়া হবে? না ভাই কক্ষনো নয়, এটা একটা রক্তাক্ত প্রক্রিয়া হবে, ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী প্রক্রিয়া হবে। পরিবর্তন যত বেশি হয় সেই প্রক্রিয়াটা তত বেশি রুক্ষ হয়, তত বেশি কঠিন হয়, এটা হল বাস্তবতা। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন পলিটিক্যাল সিস্টেমের পরিবর্তন শান্তিপূর্ণভাবে হয়নি। পলিটিক্যাল সিস্টেম? আমরা একটা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের কথা বলছি, ওয়ার্ল্ড অর্ডারের কথা বলছি, এটার পরিবর্তন কি শান্তিপূর্ণভাবে হবে? আর এছাড়া তো আল কুদসের মুক্তি অসম্ভব।

কিন্তু আমরা ভিন্নভাবে চিন্তা করি। আমি চিন্তা করি আমার চাকরি ঠিক থাকবে, ক্যারিয়ার ঠিক থাকবে, আমার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং (জীবনযাত্রার মান) ঠিক থাকবে, সব ঠিক থাকবে, আমার জিডিপি ঠিক থাকবে, আমার দেশের ইনকাম পার ক্যাপিটা ঠিক থাকবে, সব ঠিক থাকবে, মাঝখান দিয়ে আল কুদস মুক্ত হয়ে যাবে। এভাবে হবে না। আপনার আমার সবাইকে কুরবানী করতে হবে, এটা সস্তা কিছু না ভাই। আপনি ইসলামের ইতিহাস দেখেন, ওহীর

আলোকে দেখেন, আকলের দিক দিয়ে দেখেন, বাস্তবতার নিরীখে দেখেন, আপনি আল কুদসকে এভাবে মুক্ত করতে পারবেন না। এই পুরো বিশ্ব ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে এটা জড়িত।

এতক্ষণের আলোচনার সারাংশ:

আমি এই আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরছি, আমি অনেকগুলো না না না না করলাম এগুলোর মূলকথা তুলে ধরছি। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার অনুমোদিত কোনো পথে আল কুদস মুক্ত হবে না। জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার এগুলো দিয়ে আল কুদস মুক্ত হবে না। মুসলিম বিশ্বের শাসক এবং এদের অধীনস্থ যে সেনাবাহিনী এদেরকে দিয়ে আল কুদস মুক্ত হবে না। ইরানের যে অক্ষ এটা দিয়ে আল কুদস মুক্ত হবে না। আল কুদসের অধিবাসীরা একা একা নিজেরা চেষ্টা করে ভেতর থেকে আল কুদস মুক্ত করতে পারবে না, তাকে অবশ্যই বাইরে থেকে সহযোগিতা করতে হবে। কিন্তু বাইরে থেকে কেউ যদি সহযোগিতা করতে যায় তাহলে তাকে চার থেকে পাঁচটা পাহাড় ডিঙে যেতে হবে। কাজেই ফিলিস্তিনের মুক্ত এ বিশ্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন কিংবা বিশ্ব ব্যবস্থাকে দুর্বল করার সাথে সম্পর্কিত। আল কুদসকে মুক্ত করতে হলে অবশ্যই এই নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা (New World Order)-কে দুর্বল করতে হবে কিংবা পরিবর্তন করতে হবে। না হলে এটা সম্ভব না, ইন্না মা শা আল্লাহ। এবং অবধারিতভাবে এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে অরাজকতা, অস্থিতিশীলতা এবং রক্তক্ষয়ী একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এগুলো হলো বাস্তবতা।

তাহলে আল কুদসের মুক্তি কিভাবে, সমাধান কী?

প্রিয় ভাই! আল কুদসের মুক্তি কিতাল এর মাধ্যমে, জিহাদের মাধ্যমে হবে। এটাই বাস্তবতা এবং এটাই শেষ সিদ্ধান্ত। শুধু আমরা নই, যে ছেলেটা মদ খায়, যে মেয়েটা বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরে, সেও দেখেন মনে করে যে আল কুদস যুদ্ধের মাধ্যমে মুক্তি হবে। আমেরিকার যে কমিউনিস্টরা আছে, এলজিবিটির যে একটিভিস্টরা আছে, এদের মধ্যেও অনেকে মনে করে আল কুদস যুদ্ধ ছাড়া মুক্ত হবে না। আপনারা দেখবেন যে ওদের অনেকে স্লোগান দেয়, ফ্রম দ্য রিভার টু দ্য সি, প্যালেস্টাইন উইল বি ফ্রি, অর্থাৎ "জর্ডান নদী থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত পুরো ভূখণ্ডটি ফিলিস্তিন হিসেবে মুক্ত হবে।" ৭ই অক্টোবরের ঘটনাকে তারা প্রশংসা করে। তারা মনে করে এটা হল ডিকলোনাইজেশন (Decolonization)। ডিকলোনাইজেশন (উপনিবেশমুক্তকরণ) এর সবচেয়ে ভালো রূপ হল এটা।

ওদের বুঝ আর আমাদের বুঝের বোঝার তফাৎটা কী? তফাৎটা হল যে, আপনি আমি মনে করছি, আল কুদস যুদ্ধ দিয়ে মুক্ত হবে। আমাদের কাছে উত্তরটা আছে, আমাদের কাছে গন্তব্যটা আছে, কিন্তু গন্তব্য পর্যন্ত কিভাবে যাবো এই উত্তরটা আমরা অনেকে জানি না। আমি হয়ত একটা অংকের উত্তর জানি বা কেউ আমাকে বলে দিয়েছে আমি লিখেছি, কিন্তু আমি হয়ত অংকটা মিলিয়ে আনতে পারছি না, এটিই হল সমস্যা। এই কথাগুলো এতক্ষণ আমি যেগুলো বললাম, যে এভাবে হবে না, এভাবে হবে না, এভাবে হবে, এটা বলার কারণ হল এসকল চিন্তার জটগুলো মুক্ত করা, খুলে দেওয়া, যাতে করে আমাদের চিন্তাটা স্পষ্ট হয়।

আল কুদসকে মুক্ত করতে হলে অবশ্যই জিহাদ করতে হবে এবং এটা একটা উম্মাহ কেন্দ্রিক প্রচেষ্টা হতে হবে। এটা কোন নির্দিষ্ট এক জায়গায় জিহাদ করে আল কুদস মুক্ত করা সম্ভব নয়। জিহাদটা শুরু ফিলিস্তিনে হবে না, এর শেষটা গিয়ে ফিলিস্তিনে হবে। ইতিহাসে এভাবেই বারবার হয়েছে। ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় কী হয়েছিল চিন্তা করুন, সালাউদ্দিন আল আইয়ুবীর সময় কি হয়েছিল চিন্তা করুন, শুরুটা কখনো ফিলিস্তিনে গিয়ে হয়নি, শেষটা ফিলিস্তিনে গিয়ে হয়েছে।

এইজন্য মুসলিম মেজরিটি যে দেশগুলো আছে সেই দেশগুলোকে আমাদেরকে প্রথম স্বাধীন করতে হবে। সেকুলার সিস্টেম থেকে বের হয়ে সেখানে ইসলামী শরিয়াহ আনতে হবে। উই মাস্ট রিপ্লেস দিস টাইরেনিকেল পাপেটস উইথ ম্যান ওফ গড। মুত্তাকিদের দিয়ে ওই জায়গায় ইসলামী শরিয়াহ আনতে হবে, তা না হলে আমরা আল কুদস মুক্ত করতে পারবো না। এটা হল বাস্তবতা এবং এই পরিবর্তনটা হবে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এটা ব্যালট বাক্স দিয়ে আসবে না, এটা কোনদিনও ব্যালট বাক্সে ভোট দিয়ে আসবে না। অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, আসবে না। সেটা আফগানিস্তানে যেভাবে এসেছে, সব জায়গায় একইভাবে আসবে সেটা জরুরী না। স্থান কাল পাত্র প্রেক্ষাপট ভেদে পরিবর্তন আসতে পারে। কিন্তু পরিবর্তনটা বৈপ্লবিক ও জিহাদের মাধ্যমে হতে হবে। এটা আপোষের কোন পরিবর্তন হলে হবে না।

মূল বিষয়টা খুবই সাধারণ। কিছু ভূখণ্ডের ওপর আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত এর তামকিন লাগবে, শাসন কর্তৃত্ব লাগবে, তারপর সেই ভূখণ্ডগুলোকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে, আমাদেরকে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে, তারপর ধাপে ধাপে জিহাদের মাধ্যমে আমরা আল কুদসকে মুক্ত করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। এটাই হল মূল উত্তর। এবং এই তামকিন অর্জনের কাজটা আমরা সব মুসলিম ভূখণ্ডে একসাথে করতে পারবো না। কারণ সব মুসলিম ভূখণ্ডের অবস্থা এক না। একটু চিন্তা করি, বাংলাদেশে ইসলামী ইমারত হওয়া এবং সিরিয়াতে ইসলামী ইমারত হওয়া কখনো একরকম না।

বাংলাদেশ আর ইসরাইলের মধ্যে বা আল কুদসের মধ্যে ছয়টা দেশ আছে। জর্ডান, ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং মোদীর ভারত। আনরিয়েলিস্টিক, আপনি এখান থেকে ওখানে যেতে পারবেন না। কিন্তু সিরিয়ার সাথে ডিরেক্ট বর্ডার আছে। কাজেই এই বাস্তবতা বুঝতে হবে যে কোন্ জায়গায় ফোকাস করতে হবে, কোন্ ভাবে কাজ করতে হবে।

তবে মূল সমাধান ওই জায়গাতেই যেটা আমি আবারও বলছি, আল কুদসের নিকটবর্তী মুসলিম ভূখণ্ডের তামকিন অর্জন করতে হবে, শাসন কর্তৃত্ব অর্জন করতে হবে। তারপর সেগুলোকে কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। তারপর ধাপে ধাপে জিহাদের মাধ্যমে আল আকসার দরজায় গিয়ে পৌঁছাতে হবে। এটা অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে ফ্যান্টাসি, অনেকের কাছে মনে হতে পারে এটা অনেক কঠিন একটা সলিউশন। কিন্তু এটাই সবচেয়ে প্র্যাগমেটিক একটা সলিউশন এবং এটার উদাহরণ ইতিহাস থেকে আছে এবং ভবিষ্যতেও এমনি হতে হবে।

আমি আবারও বলছি, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ের কথা চিন্তা করেন কিভাবে মুসলিমরা আল আকসা মুক্ত করেছিল? প্রথমে মদিনার উপরে শাসন কর্তৃত্ব তামকিন, তারপর জাজিরাতুল আরবের উপরে, তারপর সিরিয়ার কিছু অঞ্চলে, তারপর আল আকসায়। সালাউদ্দিন আল আইয়ুবীর সময় কিভাবে হয়েছে? প্রথমে সিরিয়ার কিছু অঞ্চলে, তারপর মিশরে, তারপর আল আকসায়। এভাবেই হয়েছে। এবং আপনি যদি বলেন এটা তো ঠিক আছে অনেক আগে হয়েছে, কিন্তু বর্তমান সময়ে এভাবে হবে কিনা? বর্তমান সময়েও হবে আপনার সামনে উদাহরণ আছে। ইরানের কথা চিন্তা করেন। ইরানের ব্যাপারে আমরা বলেছি যে ইরানের মাধ্যমে এটা মুক্ত হবে না, ইরানের স্বার্থ আমাদের স্বার্থ এক না, ইত্যাদি। বাকি গত এক বছরে কেউ যদি ইসরাইলের সাথে কিছু লড়াই করে থাকে, দুই একটা গুলিও করে থাকে এটা কে করেছে? ইরান-ই তো করেছে। তো এই যে প্রতিরোধ করার সামর্থ্য এটা সে অর্জন করলো কিভাবে? তারা তিনটা বা চারটা জায়গাকে ব্যবহার করে এটা করেছে। একটা হল তেহরান বা ইরান, একটা হল লেবাননের হিজবুল্লাহ বা হিজবুস শয়তান, একটা হল ইয়েমেনে হুথিরা, আরেকটা হল ইরাকে তাদের যে মিলিশিয়াগুলো আছে আল বদর ব্রিগেড এর মাধ্যমে তো তারা এটা করেছে। তো এই শক্তিটা তারা তৈরি করেছে কিভাবে? নিয়মতান্ত্রিকভাবে করেছে?

ইরানের এই ক্ষমতাটা তৈরি হয়েছে কিভাবে? **১৯৭৯** এ একটা বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে, তারপর আশির দশকে আইআরজিসি (ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস) নামে একটি ইরানী সেনাবাহিনী গঠন করে। তারা লেবাননে গিয়ে লেবাননের যে শিয়া ফ্যাকশনগুলো ছিল সেগুলোকে একত্রিত করেছে, তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, তাদেরকে ট্রেনিং দিয়েছে, এইটা পরবর্তীতে গিয়ে হিজবুল্লাহতে পরিণত হয়েছে এবং হিজবুল্লাহ কি কোন নিয়মতান্ত্রিক দল? এটা একটা ডেজিগনেটেড টেররিস্ট অর্গানাইজেশন (আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী)। ইয়েমেনে হুতিরা কিভাবে তৈরি হয়েছে? হুতিদেরকে গিয়ে অর্থ দিয়েছে, প্রশিক্ষণ দিয়েছে, অস্ত্র দিয়েছে কারা? ইরান। হুতিরা কী? ডেজিগনেটেড টেরোরিস্ট দল। সুতরাং এই বাস্তবতা আপনার আমার চোখের সামনে আছে এবং এটা কোনোটা কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক মাধ্যমে হয়নি। এরা শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে, শক্তির মাধ্যমে জায়গা করে দিয়েছে এবং নিজেদের পলিটিক্যাল এজেন্ডা দিয়ে তারা করেছে। আমি বলতেছি না রাফিজি (শিয়াদের) মাধ্যমে ফিলিস্তিন মুক্ত হবে। আবারো বলছি আমি কেবল আপনাদের উদাহরণ দিচ্ছি যে, বর্তমান সময়েও কিভাবে এই প্রসেস কাজ করে, কিভাবে তামকিন অর্জনের পর আপনি ধাপে ধাপে শক্তি অর্জন করতে পারবেন এবং প্রতিরোধ করার সামর্থ্য অর্জন করতে পারবেন।

এবং এটার আরো অনেক উদাহরণ আছে। বিশ্ব ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে কিউবা কি টিকে নাই? বিশ্বব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে নর্থ কোরিয়া কি টিকে নাই? ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন রেজিম বিভিন্ন সময় কি টিকে ছিলো না? এই উদাহরণ শিয়াদের কাছ থেকে নেওয়ার দরকার নেই। আপনি পারস্য বিজেতা ওমর ইবনুল খাত্তাবের কাছ থেকে উদাহরণ নিন, আপনি আহলুল সুন্নাহ ওয়াল জামাত এর গর্ব নুরুদ্দিন জিংগি, সালাউদ্দিন আইয়ুবীর কাছ থেকে উদাহরণ নিন, কোন সমস্যা নেই তো। তাঁরা সবাই কী করেছে দেখেন, যেই কথাটা আমি বলছি তাঁরা সবাই এটাই করেছেন। তারা প্রথমে একটা জায়গায় তামকিন অর্জন করেছেন, শাসন কর্তৃত্ব অর্জন করেছেন, তারপর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেছেন, তারপর ধাপে ধাপে আল কুদস পর্যন্ত গিয়েছেন জিহাদ করতে করতে। এটার বাইরে আর কোন প্র্যাগমেটিক

সলিউশন (বাস্তবভিত্তিক, ব্যবহারিক ও কার্যকর সমাধান) নেই। এটিই সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পদ্ধতি, এটাই সবচেয়ে টাইম টেস্টেড পদ্ধতি, এটা হিস্টরিকাল প্রুভেন পদ্ধতি, এটা শরীয়াহ সম্মত পদ্ধতি, এটা আকলসম্মত পদ্ধতি।

আমাদেরকে বাস্তববাদী হতে হবে, বাস্তবতা অনুধাবন করে পদক্ষেপ নিতে হবে:

প্রিয় ভাই! এটি ঠিক আছে যে, জিহাদ একটি কঠিন পদ্ধতি, রুক্ষ পদ্ধতি, বিপদ সংক্রান্ত পদ্ধতি কোন সন্দেহ নেই। এটি সহজ পথ নয়। কিন্তু সহজ পথ নেয়ার নাম তো ভাই বাস্তববাদী হওয়া না, বাস্তববাদী হলো যেটা করা প্রয়োজন সেটা করা। আপনি একটা গন্তব্যে যাবেন, একটা কঠিন পথ একটা সহজ পথ। সহজ পথ আপনাকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাবে, আপনি ওটা নিলে তো হলো না। সুতরাং আমরা কিন্তু বাস্তববাদিতার নামে অতীতে অনেক পদ্ধতি গ্রহণ করেছি, এখনো করে যাচ্ছি, এগুলো আমাদের কী দিয়েছে বলুন? কী অর্জন দিয়েছে আমাদের? জিল্লতি ছাড়া আমাদের কী অর্জন হয়েছে বলুন? এসব অবলম্বন করে প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রকৃতপক্ষে দ্বীন থেকে সরে গিয়েছি।

আরো উদাহরণ দেখুন, চীনের কথা ধরুন, চীন যে গ্লোবাল সুপার পাওয়ার হয়েছে, কিভাবে হয়েছে ভাই? লিবারাল ডেমোক্রেসি মেনে হয়েছে? মানবাধিকার মেনে হয়েছে? ভায়োলেন্ট রেভুলেশনের মাধ্যমে চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি শাসন কর্তৃত্ব অর্জন করেছে, তামকীন অর্জন করেছে, তারপর একটা ওয়ান পার্টি স্টেট বানিয়েছে, ব্রুটালি শক্ত হাতে শাসন করেছে, আজ সে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। এটা বাস্তবতা ভাই। চীন, তারা কি বিশ্বাস করত যে জনগণ সব ক্ষমতার উৎস? চীনের বিপ্লবের স্থপতি মাও সে তুং, তার একটা বিখ্যাত উক্তি রয়েছে। সেটা হলো- **"Political power grows out of the barrel of a gun."** অর্থাৎ, বন্দুকের নল সকল ক্ষমতার উৎস। শক্তির উৎস বুলেট, ব্যালট কখনোই নয়! ইয়েস, পাওয়ার কামস ফ্রম দা ব্যারেল অফ দা গান। এটা বাস্তবতা, এটা পলিটিক্যাল পাওয়ার, এটা দুনিয়ার বাস্তবতা। আমরা বাস্তবতা বুঝতে পারলেই কেবল বাস্তবসম্মত পলিসি নিতে পারব। এই পলিসি আমাদেরকে নিতে হবে বাস্তবতার নিরিখে, শরীয়াহর আলোকে এবং সামর্থ্য অনুসারে। এবং আমাদের শত্রুকে আমাদের চিনতে হবে।

নতুন বিশ্বব্যবস্থা (New World Order)- কে কিভাবে পরাজিত করা সম্ভব?

আমরা শুরুতে হুরমুজানের কথা বলেছিলাম। মুসলিমদের শত্রুদের তুলনা হলো পাখির মত। পাখির দুটো ডানা, দুটো পা, একটা মাথা। একটা ডানা ভেঙ্গে ফেলবেন আর একটা ডানা থেকে যাবে, দুটো ডানা ভেঙে ফেলবেন পা থেকে যাবে, মাথা কেটে ফেলবেন পাখি শেষ, ঠিক আছে? তো আজকে ১৪০০ বছর পরে বাস্তবতা কী? মুসলিমদের শত্রুদের অবস্থা একটা পাখির মত। এক ডানা নেটো, এক ডানা ইসরাইল, আর দুই পা হল মুসলিম বিশ্বের শাসকেরা, মাথা কে? আমেরিকা। ইসরাইলকে সবচেয়ে বেশি সামরিক সমর্থন কে দেয়? আমেরিকা। ইসরাইলকে সবচাইতে বেশি অর্থনৈতিক সমর্থন কে দেয়? আমেরিকা। ইসরাইলকে সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক সমর্থন কে দেয়? আমেরিকা। বারবার জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলে ভেটো কে দেয়? আমেরিকা। এইসকল তাগুত মুসলিম শাসকদের মসনদ কে টিকিয়ে রাখে? আমেরিকা। এই হল পাখির মাথা। এই আমেরিকাই সেই বিষাক্ত সাপের মাথা যা তার বিষাক্ত

ছোবলে সারাবিশ্বের মানবতাকে গ্রাস করছে। কাজেই আমেরিকা কে রাজি-খুশি রেখে, আমেরিকার মনের মতো কাজ করে, আমেরিকার বানানো ছকে খেলে, তাদের ঠিক করা নিয়ম মেনে কোনদিন আল কুদস মুক্ত হবেনা, এটা সম্ভবপর নয়। ইল্লা মা শা আল্লাহ্।

ফিলিস্তিনের ভাই-বোনদের করুন অবস্থা একটু চিন্তা করুন ভাই!

প্রিয় ভাই! সত্য আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। এবং সেটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই হয়েছে। আমাদের উপর মহান রবের হুকুম, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর বিধান চলে এসেছে। এখন আমাদের হুকুম মাথা পেতে নেয়ার সময়। এখন আমাদের সময় হয়েছে জিহাদের জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করার। এখন আমাদের সময় হয়েছে আল্লাহর একটি ফরযে আইন হুকুম আদায় করার, যেমন ভাবে আমরা নামায-রোযাকে আদায় করে থাকি।

ফিলিস্তিনিদের উপর অভিশপ্ত ইহুদীবাদের আগ্রাসনের কথা একটু চিন্তা করি ভাই। তাদের সাথে যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেগুলোর কথা একটু চিন্তা করি।

আপনি ঐ ছেলেটার কথা চিন্তা করুন যে হাফেজ, আপনি হয়ত ভিডিও দেখেছেন, রিফিউজি ক্যাম্পের ভিতরে আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছে সে। ছেলেটির নাম শাবান। কুরআনের হাফেজ, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছিলো।

আপনারা রূহার রুহ রিম এর কথা চিন্তা করেন, ওই যে ছোট্ট মেয়েটা, বিল্ডিং ধ্বসে গিয়ে মারা গিয়েছে। তার দাদা তার নিথর দেহটি বুকে নিয়ে কান্না করে ডাকছে, রিম রুহার রুহ।

তার কথা চিন্তা করুন, তাদের কষ্টের কথা একটু চিন্তা করুন। আপনি ওই বাবার কথা চিন্তা করুন, সে বিস্কুট কিনতে গিয়েছিল বাচ্চার জন্য, ফিরে এসে দেখে যে তার স্ত্রী সন্তান মারা গিয়েছে। সে কান্না করছে আর বিস্কুটটা তার বাচ্চার হাতে দিয়ে বলছে, বাবা তুমি এটা নিয়ে যাও।

আপনি ওই মার কথা চিন্তা করুন, যে বাচ্চার জন্য আটা আনতে গিয়েছে, কারণ বাচ্চা ক্ষুধায় কান্না করছে, ছোট্ট শিশু, বোঝে না তো। আটা আনতে গিয়েছে, এসে দেখে বাসার সবাই মারা গিয়েছে।

আপনি হিন্দ রজাবের কথা চিন্তা করুন, ছয় বছর বয়সী মেয়ে। ওরা গাজা থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল ৭ জন পুরো পরিবার। ইসরাইলি ট্যাংক ওদের ঘিরে ফেলেছে, গুলি করেছে, সবাই মারা গিয়েছে, ও বেঁচে আছে। তখন ও রেড ক্রিসেন্টে ফোন করেছে, ভিডিও কলটা ইউটিউবে আছে আপনারা শুনতে পারবেন। ও বলছে যে, আমাকে তোমরা বাঁচাও আমার খুব ভয় লাগছে। ওর পাশে সবাই মারা গিয়েছে, বাবা-মা সবাই মারা গিয়েছে। ছয় বছর বয়সী একটা মেয়ে। এবং শেষ পর্যন্ত ১২ দিন পরে ওর মৃতদেহ যখন পাওয়া গিয়েছে, দেখা গিয়েছে যে, ওর পুরো পরিবার মারা গিয়েছে এবং ওর আশেপাশে যে প্যারামিডিকগুলো ওকে বাঁচাতে এসেছিল, তারাও মারা গিয়েছে, তাদেরকেও হত্যা করেছে ইসরাইলিরা।

ঐ তিন বোনের কথা চিন্তা করুন, তিন বোন তিনটা ছবি। প্রথম ছবিটা হলো যুদ্ধের আগে, তিন বোন সেলফি তুলেছে হাসিখুশি। পরের ছবিটা হল যুদ্ধের সময়, দুই বোন! পেছনে ধ্বংসস্তূপ, এক বোন মারা গিয়েছে। তারপরের ছবি,

এক বোন! তার হাতে একটা বড় পলিথিন, গার্বেজ ডিসপোজাল ব্যাগ, কালো রঙের বড় পলিথিন। পলিথিনে কী? তার বোনের ডেড বডি। পুরো বডি নেই, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ওই ডেড বডি।

গাজায় একটা হাসপাতাল আছে খান ইউনুস। খান ইউনুসে একটা অ্যাম্বুলেন্স এসেছে, অ্যাম্বুলেন্স থেকে একটা বাচ্চা নেমেছে **১০-১১** বছর বয়স। ওর কাছে একটা ব্যাগপ্যাক, ওখান থেকে রক্ত পড়ছে। আল জাজিরা সাংবাদিক প্রশ্ন করছে তোমার এখান থেকে রক্ত পড়ছে কেন? তোমার ব্যাগে কি? ও বলছে এটা আমার ভাই। ডাক্তাররা ব্যাগ খুলে দেখেছে যে একটা পাঁচ বছর বয়সী বাচ্চার ডেড বডি, পুরো বডি নেই, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন একটা বডি।

প্রিয় ভাই! ওই মার কথা চিন্তা করুন, যার পুরো ফ্যামিলি মারা গিয়েছে। তিনি এসে বলছেন, আমাকে লাশগুলো দাও, আমি দাফন কী করব? তাকে তিনটি পলিথিন দেয়া হয়েছে। কারণ ডেড বডি নেই, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে সব। কেবল তিনটা পলিথিনে দেহের কিছু অবশিষ্টাংশ দেয়া হয়েছে।

আপনি ওই বাচ্চাটার কথা চিন্তা করুন, বিল্ডিং ধ্বসে পড়েছে, খুলি ফেটে গিয়েছে, কোটর থেকে চোখ বের হয়ে এসেছে এবং ওই নিষ্প্রাণ চোখ এই নিষ্প্রাণ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে।

এদের কষ্টের কথা চিন্তা করুন, এই কষ্ট কি শুধু তাদের? এই কষ্ট আমাদের না? আমরা না এক উম্মাহ! এক উম্মাহ এক দেহের মত, আমরা না এরকম? কষ্ট আমাদের স্পর্শ করে না? এদের এই কষ্টটা কি আমাদের যেই কষ্টটা হবে তার চেয়ে বেশি কষ্ট নয়? আমাদের যেই কষ্টটা হবে ওই কষ্টটা কি এর চেয়ে বেশি কষ্ট? যদি এটা বেশি কষ্ট মনে হয় তাহলে আমি আরেকটা কষ্টের কথা বলি শুনুন।

ওই দিনের কথা স্মরণ করুন, যেদিন আল্লাহর সামনে আপনার আমার দাঁড়াতে হবে।

كَلّا إِذا دُكَّتِ الأَرضُ دَكًّا دَكًّا

পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, বালির মত হয়ে যাবে,

وَجاءَ رَبُّكَ وَالمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

আপনার প্রতিপালক আসবেন এবং ফেরেশতারা আসবে সারিবদ্ধভাবে

وَجِيءَ يَومَئِذٍ بِجَهَنَّمَ

এবং জাহান্নামকে সেদিন উপস্থাপিত করা হবে। (সূরা ফজর ৮৯: ২১-২৩)

হ্যাঁ ভাই, সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে আপনার আমার সামনে। ঐদিন আল্লাহ আপনাকে আমাকে প্রশ্ন করবেন, আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন। কী জবাব দিবো আমরা সেদিন আল্লাহর কাছে বলুন?

فَيَومَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ

আল্লাহ ঐদিন যেভাবে আজাব দিবেন, ঐভাবে আর কেউ দিতে পারবে না।

وَلا يوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ

আল্লাহ যেভাবে বাঁধবেন, ঐভাবে আর কেউ বাঁধতে পারবে না। (সূরা ফজর ৮৯: ২৫-২৬)

কী বলবো আমরা আল্লাহকে তখন? আল্লাহ যদি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কী করেছিলে? কী জবাব দিবো বলুন? এই কষ্ট বেশি, না দুনিয়াতে আপনার আমার জিহাদের জন্য যে কষ্ট হবে সেটা বেশি? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

এত কিছুর পরেও দেখুন আল কুদসের মানুষ ঈমান, ইস্তিকামাত এবং সবরের কী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

একজন বৃদ্ধা বলছেন, আমাদের জানমাল সন্তান সবকিছু আল্লাহর জন্য কোরবান, মৃত্যু যদি আল কুদসের জন্য হয় তাহলে এটা সুন্দর মৃত্যু। ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত আমরা রিবাত করে যাব। এটা সস্তা কিছু না, এটা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসরা ওয়াল মিরাজ এর জায়গা। আমরা বায়তুল মাকদিসের অধিবাসীরা প্রস্তুত আছি, কুরবানী করার জন্য প্রস্তুতি আছে। যত কুরবানী লাগে আমরা করব।

ওই বাবার কথা চিন্তা করেন, হাসপাতালে একই দিনে দুই বাচ্চা মারা গিয়েছে, দুই ছেলে মারা গিয়েছে। উনি বলছেন, আলহামদুলিল্লাহ। এটা জিহাদের ভূমি, এটা রিবাতের ভূমি, আমাদের যা কিছু আছে সব আল্লাহর জন্য। আল্লাহ আমাদের খালিক। উনি আমাদের তৈরি করেছেন, উনি আমাদের পাঠিয়েছেন, উনি নিয়ে যাবেন, উনার যা খুশি উনি করবেন। আমরা এটাতে খুশি, আমরা এটার ওপর সবর করব।

ওলামায়ে কেরাম হাদিসের আলোকে বলেছেন, বান্দা যখন বিপদের মধ্যে পড়ে তখন আল্লাহ এটার মাধ্যমে তার গুনাহ গুলো মাফ করে দেন অথবা তাকে পরিশুদ্ধ করেন। কারণ আল্লাহ তাকে আখেরাতে বড় পুরস্কার দিতে চান। আমি মনে করি, আমাদের গাজার ভাই-বোনদের সাথে, ফিলিস্তিনের ভাইবোনদের সাথে এরকমই হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস আল 'আলার জন্য প্রস্তুত করছেন। আমি মনে করি আল্লাহ তা'আলা এই বান্দাদের উপর রাজি খুশি হয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ।

লক্ষের উপরে শহীদ, আলহামদুলিল্লাহ এটা উম্মতে মুহাম্মাদের গর্ব। আমাদের মৃতরা জান্নাতে ইনশাআল্লাহ, ওদের মৃতরা জাহান্নামে।

ওই বৃদ্ধের কথা চিন্তা করুন, যিনি ধ্বংসস্তূপ এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলছেন, আমরা আজও এখানে দাঁড়িয়ে আছি এবং আমরা এখানে মৃত্যু পর্যন্ত থাকবো। এই ভূখণ্ড বরকতময়, এই ভূখণ্ডের অধিবাসীরা বরকতময়। আমাদের চারপাশে চূড়ান্ত ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে, কিন্তু তাও আমরা এখান থেকে নড়বো না। আমরা আল্লাহর দ্বীন থেকে নড়বো না। আমরা অটল পাহাড়ের মত, আমরা উজ্জ্বল তারকার মত।

এবং আমি বলব হ্যাঁ, পুরো বিশ্ব সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তারা ঈমানের ক্ষেত্রে অটল পাহাড়ের মত, পুরো বিশ্ব সাক্ষ্য দিচ্ছে তারা ইস্তিকামাতের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল তারার মত এবং পুরো বিশ্ব সাক্ষ্য দিচ্ছে আপনি এবং আমি কাপুরুষ। পুরো বিশ্ব সাক্ষ্য দিচ্ছে আপনি আর আমি অক্ষম, পুরো বিশ্ব সাক্ষ্য দিচ্ছে আপনি আর আমি নিষ্ক্রিয়।

ইসরায়েলের এক সৈনিকের ভিডিও আছে, সে ইংলিশে বলছে, আমরা গাজা কে পরিষ্কার করছি, আমরা গাজা কে প্রস্তুত করছি। কারণ আমাদের রাজা আসবে, আমাদের মাসীহ আসবে। আমরা তাকে মুকুট পড়ানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমরা তৃতীয় মন্দির (থার্ড টেম্পল) বানানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। তাদের মাসীহ কে? আল মাসিহাদ্ দাজ্জাল।

ইসরাইল মসজিদ আল আকসার সামনে নাচছে, উল্লাস করছে, স্লোগান দিচ্ছে। তারা বলছে "মুহাম্মাদ মারা গিয়েছে, কিছু রমনী রেখে গিয়েছে।"

এটা কী অবস্থা ভাই? কোথায় আমাদের আত্মমর্যাদা, কোথায় আমাদের গাইরত? এমন অপমান মানা সহজ, নাকি আল কুদসের জন্য যুদ্ধ করা সহজ? অথচ এই পথটা আমাদের কাছে বেশি কঠিন মনে হচ্ছে। কোন পথটা আমাদের কাছে বেশি কঠিন মনে হয়, এটা ঠিক করে দিবে যে আমাদের ঈমানের অবস্থাটা আসলে কী?

عَنْ اِبْنِ عُمَر قَالَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْل، اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهٗ حَتىّٰ تَرْجِعُوْا اِلىٰ دِيْنِكُمْ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, "যখন তোমরা 'ঈনাহ' পদ্ধতিতে (এক ধরনের সুদ ভিত্তিক ব্যবসা) ক্রয় বিক্রয় এবং ব্যবসা বাণিজ্যে পুরাপুরি মশগুল হয়ে যাবে এবং গরুর লেজ ধরে খেত খামারে মগ্ন হয়ে যাবে আর জিহাদ করা ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দিবেন, যা ততক্ষণ পর্যন্ত দূর হবে না যতক্ষণ না তোমরা আপন দ্বীনের (জিহাদের) দিকে ফিরে আসবে।" (আবু দাউদ ৩৪৬২, বায়হাকী ১০৪৮৪, জামেউল আহাদীস ১৬০৩, কানযুল উম্মাল ১০৫০৩, বুলুগুল মারাম ৮৪১)

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْل، مَا تَرَكَ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اِلَّا ضَرَبَهُمْ اللهُ بِذِلٍّ وَلَا أَقَرَّ قَوْمٌ الْمُنْكَرَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ اِلَّا عَمَّهُم اللهُ بِعِقَابٍ

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন যে, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি ﷺ বলেছেন, যদি কোন জাতি জিহাদ ছেড়ে দেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সবার উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন। আর যদি কোন জাতি তাদের মধ্যে কোন অন্যায়কে আশ্রয় দেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করেন।" (জামে'আ আহাদীস ২৭০৩৫, মুজামুল আওসাত ৩৮৩৯, কানযুল উম্মাল ৮৪৪৭)

রাসুলুল্লাহ ﷺ সত্য বলেছেন। এর চেয়ে বড় লাঞ্ছনা, এর চেয়ে বড় অপমান আর কী আছে?

আল কুদস জিহাদের মাধ্যমে মুক্ত হবে, কিন্তু এই জিহাদের দরজা কেউ এসে আপনার আমার জন্য খুলে দিবে না। আসমান থেকে ফেরেশতা নেমে এসে আপনার আমার জন্য জিহাদের দরজা খুলে দিবে না। জিহাদের দরজা খুলতে হবে তাওহীদ আর হাদিদের শক্তি দিয়ে। খুলতে হবে না, ভাঙতে হবে এটা। এই রাস্তা আপনি আমি কি মনে করছি খুব সহজ হবে? আল কুদস পর্যন্ত কি ভাই আপনার আমার জন্য একটা লাল গালিচা বিছানো রাস্তা তৈরি করে দেয়া হবে যে, আমরা আল কুদসে গিয়ে জিহাদ করব? না, আপনার আমার রক্ত, আপনার আমার হাড়, আপনার আমার মাংস, লাশের সারি, খুলির পাহাড় পার হয়ে আপনাকে আমাকে আল আকসায় যেতে হবে। এটা ছাড়া আর কোন অপশন নেই।

আল কুদস এর দাম অনেক বেশি, এটা সস্তা না। বাইতুল মাকদিস এর মানুষেরা বলে দিয়েছেন, আল্লাহ আপনি আমাদের কাছ থেকে নিন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি খুশি না হন আপনি আমাদের কাছ থেকে নিন, আমরা প্রস্তুত আছি। এই কথাটা যখন আমরা বলতে পারব এবং এই কথার উপর যখন আমরা আমল করতে পারব। যখন আমরা বলবো, ইয়া আল্লাহ আপনি নিন। ততক্ষণ পর্যন্ত নিন, যতক্ষণ আপনি সন্তুষ্ট না হন। তারপর আপনি আমাদেরকে

আল আকসা দিন। তখন আল কুদস আমরা মুক্ত করতে পারবো, তার আগ পর্যন্ত পাব না। আল কুদস এমন এক দুলহান, যার মাহার আমাদের রক্ত। মাহার পরিশোধ করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। কোন বিকল্প নেই।

আল্লাহ আমাদেরকে আল কুদস মুক্ত করার প্রক্রিয়ায় শামিল হওয়ার তৌফিক দান করুন, আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন আল কুদসকে মুক্ত করার। আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়ার ভালবাসা আর মৃত্যুকে অপছন্দ করার রোগ থেকে মুক্ত করে দিন। আল্লাহ আমাদের মাসজিদ আল আকসাতে সালাত আদায় করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ আমাদের চোখগুলোকে প্রশান্তি দিন। আল্লাহ আমাদেরকে খাইবারের মতো একটা দিন দেখান। আল্লাহ আমাদের বনু কুরাইযার মত একটা দিন দেখান। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ আমাদের মাফ করে দিন। আল্লাহ আমাদের নিফাক দূর করে দিন। আল্লাহ আমাদের নিষ্ক্রিয়তা দূর করে দিন।

আলাহুম্মার ঝুক্বনি শাহাদাতান ফি সাবীলিক। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন!

[আসিফ আদনান হাফিজাহুল্লাহর বয়ান অনুসারে প্রবন্ধটি লিখিত, লিংক: https://bit.ly/asifadnan]

দ্বিতীয় অংশ

অগ্নিস্ফূলিঙ্গ হতে দাবানল

১৩০০ বছর পূর্বের কথা.....

ঘটনা ০১:

উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের শাসনামলে ৯০ হিজরি সনে একটি আরব বণিক কাফেলা সরনদ্বীপ (সিলন/বর্তমান শ্রীলংকা) থেকে আঠারটি জাহাজে করে ইরাকে ফিরছিল। পথিমধ্যে সিন্ধুর দেবল বন্দর (বর্তমানে পাকিস্তানের করাচী) অতিক্রম করার সময় একদল দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। দস্যুরা জাহাজগুলোকে লুট করে ও মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুদের দেবলে নিয়ে কারাগারে আটকে রাখে।

তৎকালীন সময়ে হিন্দুস্তানের সিন্ধু অঞ্চলের হিন্দু রাজা ছিল দাহির। এই ঘটনার পিছনে দাহিরের সরাসরি মদদ ছিল। সে মুসলিম নারী ও শিশুদের উপর যুলুম নির্যাতন করে। যার প্রেক্ষিতে মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে জাত্যাভিমানী এক মুসলিম বোন হিন্দুস্তান থেকে নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে একটি শ্বেত রুমালের উপর এক ঐতিহাসিক চিঠি লিখেন; চিঠিটি লিখে তৎকালীন বসরার শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বরাবর প্রেরণ করেন। চিঠিটি ছিলো এই-

"দূতের মুখে মুসলমান শিশু ও নারীদের বিপদের কথা শুনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বসরার শাসনকর্তা স্বীয় সৈন্য বাহিনীর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সৈনিককে অশ্ব প্রস্তুত করার আদেশ দিয়ে দিয়েছেন। সংবাদ বাহককে আমার এ পত্র দেখাবার প্রয়োজন হবে না। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের রক্ত যদি শীতল হয়ে জমে গিয়ে থাকে তবে হয়তো আমার এই পত্রও বিফল হবে। আমি আবুল হাসানের কন্যা। আমি ও আমার ভাই এখনো শত্রুর নাগালের বাইরে। কিন্তু আমাদের অন্য সমস্ত সঙ্গী এখন শত্রুর হাতে বন্দী- যাদের বিন্দুমাত্র দয়া নেই। বন্দীশালার সেই অন্ধকার কুঠুরীর কথা কল্পনা করুন- যেখানে বন্দীরা মুসলিম মুজাহিদদের অশ্বক্ষুরের শব্দ শোনার জন্য উৎকর্ণ ও অস্থির হয়ে আছে।
আমাদের জন্য অহরহ সন্ধান চলছে। সম্ভবতঃ অচিরেই আমাদেরকেও কোনো অন্ধকার কুঠুরীতে বন্দী করা হবে। এও সম্ভব যে, তার পূর্বেই আবার যখন আমাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছিয়ে দিবে, আমি সে দূরদৃষ্ট হতে বেঁচে যাব। কিন্তু মরবার সময় আমার দুঃখ থেকে যাবে যে, যেসব ঝঞ্ঝা-গতি অশ্ব তুর্কিস্তান ও আফ্রিকার দরযায় ঘা মারছে, স্বজাতির এতীম ও অসহায় শিশুদের সাহায্যের জন্য তারা পৌঁছতে পারল না! এও কি সম্ভব, যে তলোয়ার রোম ও ইরানের গর্বিত নরপতিদের মস্তকে বজ্ররূপে আপতিত হয়েছিল, সিন্ধুর উদ্ধত রাজার সামনে তা ভোঁতা প্রমাণিত হলো। আমি মৃত্যুকে ভয় করিনা। কিন্তু হাজ্জাজ, তুমি যদি বেঁচে থাক, তবে আত্মমর্যাদাশীল জাতির এতীম ও বিধবাদের সাহায্যে ছুটে আস।"
-নাহীদ,
আত্মাভিমানী জাতির এক অসহায়া কন্যা। (ইন্টার্নেট থেকে সংগৃহীত)

চিঠিটি পড়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খঞ্জর বের করে তার অগ্রভাগ সিন্ধুর মানচিত্রে বিদ্ধ করে বললেন- আমি সিন্ধুর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করছি। এ ঘোষণা দিয়ে তিনি পুরো যুদ্ধের দায়িত্বভার তার নব বিবাহিত জামাতা এবং ভাতিজা মুহাম্মাদ বিন কাসিম আস্ সাকাফিকে দিলেন। এই চিঠির বার্তা পৌঁছে গেল প্রতিটি মুসলিম যুবকের দ্বারে দ্বারে। তাদের মাঝে জাগ্রত পৌরুষত্ব যেন বিস্ফোরিত হলো। মুসলমান এতীম শিশু ও নারীদের উপর অত্যাচারের কাহিনী শুনে, জাত্যাভিমানী মুসলিম যুবকেরা সেদিন ঘরে বসে থাকতে পারেনি, নববধূদের রেখেই ছুটেছিলেন জিহাদের উত্তপ্ত ময়দানে। শিশুদের ক্রন্দনের আওয়ায যার কাছেই পৌঁছেছে সেই ইসরাফিলের শিঙ্গার মতো গর্জে উঠেছে আর সিন্ধু রাজা ও তার বাহিনীর জন্য আযরাঈল হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

মুহাম্মাদ বিন কাসিম মাত্র বার হাজার মুসলিম সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে সিন্ধু অভিমুখে রওয়ানা হন এবং পথিমধ্যে অনেক অঞ্চল জয় করে অবশেষে ৯৩ হিজরীতে দেবল নগরী ও দেবল দুর্গ জয় করেন। আর উদ্ধার করেন মুসলমান নর-নারী আর শিশুদের ।

আল্লাহ তা'আলা এভাবে বীর মুজাহিদদের দ্বারা মুসলিম শিশু ও নারীদের উদ্ধার করলেন এবং বিজয় দিয়ে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের বাহিনীকে প্রতিটি মুসলিম যুবকের জন্য দৃষ্টান্ত বানালেন, ইতিহাসে চির ভাস্বর করে রাখলেন।

ঘটনা ০২:

আব্বাসী খিলাফতের সময় বাইজান্টাইন সম্রাট থিওফেল (Theophilos) আব্বাসী রাষ্ট্রের সীমান্ত নগরী যিবাতরায় হামলা চালিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালানোর পাশাপাশি অনেক মুসলিম মা-বোনকে বন্দি করে নিয়ে যায়। জনৈক হাশিমি বোন রোমানদের হাতে বন্দি অবস্থায় 'হায় মু'তাসিম!' বলে চিৎকার করেছে, খলিফা মুতাসিম যখন এই সংবাদ জানতে পারলেন, তখন সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন ও অস্থির চিত্তে বলে উঠলেন, লাব্বাইক! আমি উপস্থিত আছি, হে আমার বোন। এরপর তিনি নফীরে আম-এর ঘোষণা দেন এবং যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন। রোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত নগরী 'আম্মুরিয়া'কে পঞ্চান্ন দিন অবরোধ করে রাখার পর মুজাহিদ বাহিনী তা জয় করে এবং অপহৃত হাশিমি মুসলিম বোনকে উদ্ধার করে।

১৩০০ বছর পর.....

ইরাকের আবূ-গারীব কারাগার থেকে ধর্ষিতা ও নির্যাতিতা 'আমার এক বোন' ফাতিমা নূরের চিঠি:

"আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ -قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- اللَّهُ الصَّمَدُ-لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ-وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

"বল, তিনি আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তিনি কারো জাতও নন। তার সাথে তুলনীয় কোনো কিছুই হতে পারে না।" (আল-কুরআন, সূরা নং-১১২, "আল-ইখলাছ")

আমি আল্লাহ তা'আলার মহাগ্রন্থ থেকে এই সূরা পছন্দ করেছি, কারণ এই সূরাটি আমার উপর এবং আপনাদের সকলের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব ফেলে এবং সূরাটি একজন মুমিনের অন্তরে এক প্রকারের ভীতি সঞ্চার করে।

আল্লাহর রাহের আমার মুজাহিদীন ভাইয়েরা!

আমি আপনাদের আর কী বলব? আমি আপনাদের বলি: আমাদের গর্ভগুলো ঐসব বানর এবং শূয়োরের বাচ্চাদের সন্তান দ্বারা ভরে গেছে, যারা আমাদেরকে ধর্ষণ করেছে। কিংবা আমি আপনাদের বলতে পারি: তারা আমাদের দেহকে বিকৃত করেছে, লাঞ্ছিত করেছে, আমাদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করেছে, এবং আমাদের গলায় ঝুলানো যে কুরআন ছিলো তা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছে।

আল্লাহু আকবার!

আপনারা কি আমাদের অবস্থা অনুধাবন করতে পারছেন না? এটা কি সত্য, আমাদের উপর যা ঘটছে তা আপনারা জানেন না? আমরা কি আপনাদের বোন নই? আগামীকাল (কিয়ামতের দিন আমাদের ব্যাপারে) আপনাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

কুখ্যাত আবুগারীব কারাগারে মা-বোনদের উপর নির্যাতনের একটি দৃশ্য। (সূত্র: ইন্টারনেট)

আল্লাহর কসম! আমাদের উপর কারাগারে এমন একটি রাত অতিবাহিত হয়নি, যাতে এই বানর ও শূয়োরেরা আমাদেরকে বিবস্ত্র করে তাদের উদ্ধত কামনা চরিতার্থ করতে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি। আর আমরা ছিলাম সেই মুসলিম নারী, যারা তাদের সতীত্বকে আল্লাহর ভয়ে সবসময় হেফাযত করে রাখতাম।
আল্লাহকে ভয় করুন! তাদেরকে সহ আমাদেরকে হত্যা করুন। তাদেরকে সহ আমাদেরকে ধ্বংস করে দিন! আমাদেরকে ধর্ষণ করে মজা লুটার জন্য তাদের হাতে আমাদেরকে ফেলে রাখবেন না। আপনাদের এই কাজে আরশের অধিপতি আল্লাহ তা'আলা খুশি হবেন। আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করুন। বাহিরে তাদের কামান এবং ট্যাংকে আক্রমণ না করে আবু গারীব কারাগারে আমাদের কাছে আসুন।
আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি, আমি আপনাদের বোন (ফাতিমা)। তারা একদিনে আমাকে নয় বারের বেশি ধর্ষণ করেছে। আপনারা কি (আমাদের অবস্থাটা) বুঝতে পারছেন?

আমার জায়গায় আপনার কোনো এক বোনকে কল্পনা করুন। কেন আপনারা সকলে তা ভাবতে পারছেন না, অথচ আমি আপনাদের একজন বোন? আমার সাথে আরো তেরজন মেয়ে আছে, তাদের সকলেই অবিবাহিতা। তাদের সকলকে প্রত্যেকের চোখ এবং কানের সামনে ধর্ষণ করা হয়েছে। তারা আমাদেরকে নামায আদায় করতে দেয় না। তারা আমাদের দেহের পোশাক কেড়ে নিয়েছে, আমাদেরকে পরার জন্য কোনো কাপড় দেয় না।
আমি যখন এই চিঠিটি লিখছি, তখন একজন বোন আত্মহত্যা করেছে। তাকে নিষ্ঠুরভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে। একজন সৈন্য তাকে ধর্ষণ করার পর তার বুক এবং উরুতে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছে। সৈন্যটি বোনটির উপর অবিশ্বাস্য রকম অত্যাচার করেছে। বোনটি কারাগারের দেয়ালে তার মাথা বার বার আঘাত করতে থাকে, যতক্ষণ না মৃত্যু এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

যদিও ইসলামে আত্মহত্যা নিষেধ, আসলে বোনটি কোনোভাবেই আর সহ্য করতে পারেনি। কিন্তু আমি সেই মেয়েটিকে মাফ করে দিয়েছি। আমি আশা করি, আল্লাহ তা'আলাও তাকে মাফ করে দিবেন, কেননা তিনি তো পরম করুণাময়, অতিশয় ক্ষমাশীল।
ভাইয়েরা আমার! আমি আপনাদেরকে আবারো বলছি, আল্লাহকে ভয় করুন! তাদের সাথে আমাদেরকে হত্যা করুন, যেন আমরা শান্তি লাভ করি। আমাদেরকে সাহায্য করুন! আমাদেরকে সাহায্য করুন! আমাদেরকে সাহায্য করুন!"
(ইন্টার্নেট থেকে সংগৃহীত)

উম্মাহ এলবাম
প্লেট-২৭
আবু গারীব কারাগার অধ্যায়
AP
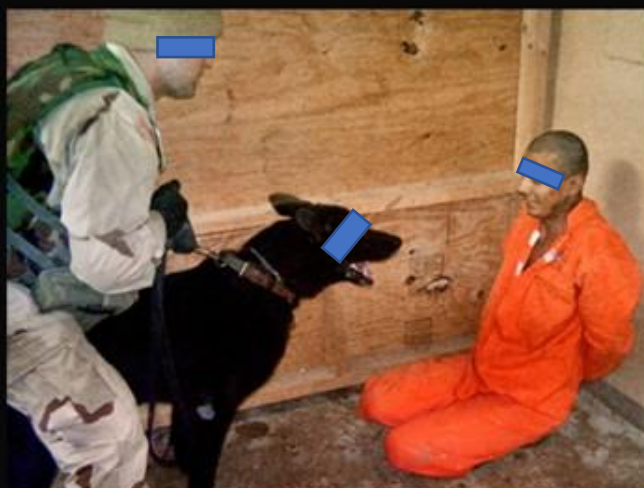
প্রিয় ভাই!

চিঠিটি এখানেই শেষ। কিন্তু ফাতেমার মতো আমার লাখো মুসলিম বোনদের উপর ধর্ষণ ও নিযার্তন আজও শেষ হয়নি। আমার মা ও বোনদের উপর ধর্ষণ ও নির্যাতন এখনো চলছে, তা চলছে ফিলিস্তিনে, সিরিয়ায়, ইরাকে, ইয়েমেনে, চলছে চীনে, ভারতে, কাশ্মীরে, চলছে মায়ানমারে, ...

কেন জানেন?

কারণ, আমরা এখনো ঘরে বসে আছি! আমাদের মাঝে পৌরুষত্ব জাগ্রত হচ্ছে না! আমরা বোনের ডাকে 'অলী ও নাসির' হয়ে ময়দানে ছুটে যাই নি! আমরা জিহাদ করছি না! এমনকি জিহাদ করার জন্য এতটুকু প্রস্তুতিও নিচ্ছি না! আমরা আল্লাহকে ভয় করছি না! জাহান্নামের আগুনকে ভয় করছি না! নিজের আরাম-আয়েশ আর ফূর্তির যিন্দেগী ছাড়তে পারছি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু আমাদের তকদীর হয়ে যায়!................

...........হ্যাঁ ভাই! আমার বোনদের চিৎকার ও আর্তনাদে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে, কিন্তু আমার, আপনার কর্ণকুহরে পৌঁছছে না! তাইতো আল্লাহ তা'আলা আহ্বান করছেন-

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

"আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে যালেম, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।" (৪ সূরা নিসা: ৭৫)

إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"তোমরা যদি (আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য) না বের হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দিবেন, তোমরা তার কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (০৯ সূরা তাওবা: ৩৯)

كَيْفَ الْقَرَارُ وَكَيْفَ يَهْدَأُ الْمُسْلِمٌ * وَالْمُسْلِمُاتُ مَعَ الْعَدُوِّ الْمُعْتَدِىْ

اَلضَّارِبَاتُ خُدُوْدَهُنَّ بِرَنَّةٍ * اَلدَّاعِيَاتُ نَبِيَّهُنَّ مُحَمَّد

اَلْقَائِلَاتُ إِذَا خَشِيْنَ فَضِيُحَةً * جُهْدَ الْمُقَالَةِ لَيْتَنَا لَمْ نُوَلّدُ

مَا تَسْتَطِيْعُ وَمَا لَهَا مِنْ حِيْلَة * إِلَّا التَّسَتُّرُمِنْ أَخِيهَا بِالْيَد

কিভাবে একজন মুসলিম স্থিরচিত্তে বসে থাকতে পারে, যখন মুসলমান নারীগণ শত্রু পরিবেষ্টিত?

যারা তাদের গাল চাপড়িয়ে কাঁদে এবং তাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে ডাকে।

যখন তাদের সম্ভ্রম বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখন তারা অস্থির হয়ে বলে, হায়! আমরা যদি ভূমিষ্টই না হতাম!

তারা এতই অসহায় যে, শত্রুর কবল থেকে হাত দিয়ে নিজেকে আড়াল করা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার থাকে না।

(সিয়ারু আলামিন নুবালা- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ)

ওহে মুসলিম ভাই!

ওহে মুসলিম যুবক! ওহে ভাই!

ওহে ইসলামের সিংহপুরুষ!

ওহে আল্লাহর বাঘ!

ওহে আল্লাহর তরবারি!

জেগে উঠুন!

কিসের ভয়?

কিসের পিছুটান?

প্রস্তুতি গ্রহন করুন মহাযুদ্ধের!

প্রিয় ভাই!

আমাদের রক্ত কি খালিদ বিন ওয়ালিদের রক্ত নয়?

আমাদের রক্ত কি সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস, ইকরামা, মুসান্না আর আমর ইবনুল আস এর রক্ত নয়?

আমাদের রক্ত কি জাবের, যায়েদ আর আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার রক্ত নয়?

আমরা কি মুআজ বিন জামূহ আর মুআজ বিন আফরাদের কথা ভুলে গিয়েছি?

আমরা কি তাদের সন্তান নই? (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আযমাইন)।............

ওহে একই উম্মাহর সহোদর ভাই আমার!

একটু ভাবুন তো-

আমাদের রক্ত কি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের রক্ত নয়?

আমরা কি দিগ্বিজয়ী সিপাহসালার কুতায়বা বিন মুসলিম আল বাহিলি কিংবা মাসলামা বিন আব্দুল মালিক আল মারওয়ানির সন্তান নই?

আমাদের রক্ত কি সালাহ উদ্দিন আউয়ুবীর রক্ত নয়?

আমাদের রক্ত কি নুরুদ্দিন জঙ্গীর রক্ত নয়?

আমাদের শিরায়-উপশিরায়, ধমনীতে কি তারিক বিন যিয়াদ, ইউসুফ বিন তাশফিনের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে না?

আমরা কি কন্সট্যান্টিনোপল বিজয়ী মুহাম্মাদ আল ফাতিহর উত্তরসূরী নই?

আমরা কি সিন্ধু বিজেতা মুহাম্মাদ বিন কাসিমের প্রজন্ম নই? (রাহিমাহুমুল্লাহু আযমাঈন)।..................

আমরা কি সেই উম্মাহ নই, যারা ছিল প্রতাপশালী, বিশ্বজয়ী, সারা বিশ্বের রক্ষক ও পরিচর্যাকারী?

আমরা কি সেই মহাবীরদের সন্তান নই, যারা মাত্র তেইশ বছরে অর্ধপৃথিবী জয় করেছিল?

আমরা কি সেই একই উম্মাহর সন্তান নই?

যেই বীরাঙ্গনা মায়ের সন্তানেরা কিসরা-কায়সারের (পারস্য-রোম) সাম্রাজ্যকে লণ্ড-ভণ্ড করে দিয়েছিল, আমরা কি সেই একই মায়ের সন্তান নই?

আমরা কি তাদের সন্তান নই, যারা অবজ্ঞাভরে পায়ে মাড়িয়েছিল পারস্যের মুকুটকে?

আমরা কি সেই একই উম্মাহর কোলে প্রতিপালিত হইনি?

সেই একই মায়ের ভালোবাসার আঁচলে কি আমরা বড় হয়ে উঠিনি?

হায়! পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া আমানত (খিলাফত)-কে আমরা আজ হারিয়ে ফেলেছি! ফলে আসমান থেকে পাতালপুরীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছি! জিহাদ ত্যাগ করে অপমান ও জিল্লতীর যিন্দেগী যাপন করছি। সারা দুনিয়ায় কুফ্ফারদের হাতে কেবল মার-ই খাচ্ছি!

হায়! এজন্য আমাদের হৃদয়ে কি আজ একটুও আফসোস হয়না?............

তাহলে কেন আমরা জেগে উঠছি না?

আমরা কি অনুভব করিনা, আসমানের সেই ঝরে পড়া তারাগুলোর মধ্যে আমরাও ছিলাম একেকটি তারকা? আমরাও তো হতে পারতাম পৃথিবীর শাসক, আমরাও হতে পারতাম দিগ্বিজয়ী সিপাহসালার! কেননা আমরা তো তাদেরই সন্তান, তারাই তো আমাদের পিতা!

কিন্তু হায়! আমাদের রক্ত আজ কেন এমন হিম শীতল হয়ে গেল?

যে গর্ভ আমাদের ধারণ করেছিল, তা কি হিমাগার ছিল?

নাকি আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত আমাদের পিতার রক্ত সাদা হয়ে গিয়েছে?

আমাদের রক্তের বারুদ কেন অগ্নিস্ফূলিঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে না?

আমাদের অন্তরে কেন প্রতিশোধের দাবানল সৃষ্টি হচ্ছে না?

আমরা কি অপেক্ষা করছি, কুকুর আর শুয়োরেরা আমাদের চোখের সামনে আমাদের মা, বোন আর স্ত্রী-কন্যাকে ধর্ষণ করবে, এরপর আমরা ময়দানে ঝাঁপ দিবো?

আমাদের সন্তানকে আমাদের চোখের সামনে কেটে টুকরা টুকরা করবে, এরপর আমরা ময়দানে যাবো?

আমাদের পিতা আর ভাইকে হায়েনাগুলো আগুনে পুড়িয়ে মারবে, এরপর আমরা ময়দানে দৌঁড় দিবো? (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

পৃথিবীর দেশে দেশে যে সকল মালাউন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান আর ইহুদীরা আমাদের মা-বোন আর মেয়েদের ইজ্জত-আব্রু নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন ও ধর্ষণ করছে, নির্মমভাবে হত্যা করছে, এই মালাউন শয়তানদেরকে কি আমরা এমনি এমনি ছেড়ে দিবো? প্রতিশোধ নিবো না?

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ- إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.»

[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح مسلم - 2586]

হযরত নু'মান ইবনে বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

'মুমিনদের পরস্পরের ভালোবাসা, অনুগ্রহ, হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার উদাহরণ হচ্ছে একটি দেহ বা শরীরের মতো। যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ আহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তখন সারা দেহের সবগুলো অঙ্গই নিদ্রাহীন হয়ে পড়ে এবং কষ্ট-যন্ত্রণায় জরাগ্রস্ত ও কাতর হয়ে পড়ে।' (সহীহ বুখারী -৬০১১, সহীহ মুসলিম- ২৫৮৬)

প্রিয় ভাই! তাই যদি হয়, বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত-নিপীড়িত, ধর্ষণ আর গণহত্যার শিকার মুসলমান মা-বোন আর শিশুদের জন্য আমাদের হৃদয়ে ব্যথার ঝড় কেন বইছে না? প্রতিশোধের আগুন কেন জ্বলছে না? আমরা কি তাহলে প্রকৃত মুমিন নই???

ফিলিস্তিনের মা-বোনেরা কি আমাদের মা-বোন নন? তাদের সন্তানেরা কি আমাদের সন্তান নয়?

ইরাক-সিরায়ার মা-বোনেরা কি আমাদের মা-বোন নন? তাদের সন্তানেরা কি আমাদের সন্তান নয়?

উইঘুরের মা-বোনেরা কি আমাদের মা-বোন নন? তাদের সন্তানেরা কি আমাদের সন্তান নয়?

কাশ্মীরের মা-বোনেরা কি আমাদের মা-বোন নন? তাদের সন্তানেরা কি আমাদের সন্তান নয়?

আরাকানের মা-বোনেরা কি আমাদের মা-বোন নন? তাদের সন্তানেরা কি আমাদের সন্তান নয়?...................

হায়! আমরা কিভাবে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারি, কিভাবে আমোদ-প্রমোদ আর আরাম-আয়েশের মাঝে জীবন কাটাতে পারি, কিভাবে শান্তিতে ঘুমাতে পারি, যখন সেই সকল ভূমির মুসলমানরা বোমার নীচে ঘুমাচ্ছে, আহারের জন্য শত্রুর নিক্ষিপ্ত বোমা ছাড়া আর কিছুই তারা পাচ্ছে না? বোমার আঘাতে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে?

সেসকল অসহায়, মজলুম মুলমানদের জন্য আমাদের জীবন, আমাদের পিতা-মাতা আর স্ত্রী-সন্তানরা কুরবান হোক!............

হ্যাঁ ভাই, আমাদের হৃদয়ে কেন অনুশোচনার ঝড় বইছে না?

আমাদের অন্তর হতে কেন প্রতিশোধের লাভা উত্থিত হচ্ছে না?

আর কতদিন নারীত্বের মালা পরে ঘরে বসে থাকবো?

আর কতদিন হাতে চুড়ি, মাথায় ঘোমটা পরে অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে থাকবো?

কাপুরুষের যিন্দেগী ভাই আর কতদিন?

ইঁদুরের মতো হাজার বছর বাঁচার চেয়ে সিংহের মতো একদিন বাঁচা কি উত্তম নয়?..............

ওহে ভাই!

ওহে উম্মাহর অগ্নিপুরুষ!

ওহে যৌবনের অগ্নিস্ফূলিঙ্গ!

জেগে উঠুন!

জ্বালিয়ে দিন আপনার লেলিহান অগ্নিশিখা!

দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক জিহাদের দাবানল!

পুড়িয়ে দিন বাতিলের সকল শিবির!..............

হায়! আমরা কি মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছি?

আরে শাহাদাত তো মৃত্যু নয়, চির জীবন! অনন্ত কাল বেঁচে থাকার নাম! তাতো জীবিত থাকার চেয়ে আরো উত্তম! আরো উত্তম!

চেয়ে দেখুন ভাই! কত মানুষ বাতিল ধর্ম ও মতবাদের জন্য, তাগুতের জন্য আপন জীবন দিয়ে দিচ্ছে। আমরা কি সত্যের অনুসারী হয়েও মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছি?

আমরা কি সুউচ্চ জান্নাতের কথা ভুলে গিয়েছি? আমরা কি ভুলে গিয়েছি জান্নাতুল ফিরদাউসের কথা? যার ছাদ হবে রহমানের আরশ? যাতে রয়েছে আমাদের হাবীবের ﷺ প্রতিবেশ?

আমরা কি মৃত্যুর সাথে সাথে জান্নাতে যেতে চাইনা? জান্নাতী হূরের সাক্ষাৎ চাই না? আমরা কি হূরে ঈন, হূরে লূ'বা, হূরে মার্জিয়াদের কথা ভুলে গিয়েছি?

তাদের সাথে মিলনের আনন্দের কথা কি ভুলে গিয়েছি? তাদের ডাক কি আমরা শুনতে পাচ্ছি না?

চেয়ে দেখুন ভাই, মুসলিম ভূমিগুলোতে জান্নাতের বাজার এখন রমরমাট হয়ে উঠেছে? আল্লাহর বান্দারা দলে দলে জান্নাতের দিকে ছুটে যাচ্ছে, প্রিয় প্রভুর সান্নিধ্যে!

সুবহানাল্লাহ, উত্তপ্ত ভূমিগুলোতে আজ জান্নাতী হূরদের আনাগোনা বৃদ্ধি পেয়েছে? তারা আসছে-যাচ্ছে, আসছে-যাচ্ছে; তারা আসছে জান্নাতী সবুজ রুমাল সাথে নিয়ে- আর জান্নাতুল ফিরদাউসে ফিরে যাচ্ছে তাদের প্রিয়তম স্বামীদেরকে, আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতবরণকারী মুজাহিদদেরকে সাথে নিয়ে! কি ভাই, তাদের পদচারণা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি না???

আহ! কী মনোমুগ্ধকর সেই দৃশ্য!!! আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না ভাই???

আমরা কি চাইনা সে সকল শহীদী কাফেলায় শরীক হতে? শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিতে? হূরে ঈ'নদের হাতে হাত রেখে সবুজ পাখি হয়ে জান্নাতে উড়ে যেতে?

প্রিয় প্রভু আল্লাহ তা'আলার দীদারের কথা কি আমরা ভুলে গিয়েছি? তার মহাসন্তুষ্টির কথা? তাঁর দীদার-সুখের সামনে অন্য কোনো সুখের তুলনা চলে কি?...........

তাহলে ভাই, কেন আর দেরী?...............

আর নয় ঘুম!

এবার জেগে উঠার পালা!

সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে যাবার পালা!

কাঁধে কাঁধ রেখে মোকাবিলা করার পালা!

হাতে হাত রেখে প্রতিশোধ নেবার পালা!

এবার দেনা পরিশোধের পালা!

এবার রণসাজে সজ্জিত হয়ে মরুসিংহের ন্যায় গর্জে উঠার পালা!

এবার ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার পালা!

এবার ক্রুসেডার খ্রিস্টান আর ইহুদীদের 'টমেটো আর গাজরের ন্যায়' টুকরা টুকরা করার পালা!

এবার হানাদার হিন্দুত্ববাদী আর বৌদ্ধদের 'আলু আর শসা'র ন্যায় চাক চাক করার পালা!

এবার নাস্তিক-মুরতাদদের যমের ঘরে চালান দেয়ার পালা!

এবার আল্লাহর দুশমনদের 'পাউডার' বানানোর পালা!...................

প্রিয় ভাই! যুদ্ধের দামামা বাজে ঐ, শিরে বাঁধুন আমামা!

জিহাদের আযান শুনুন, ডাকছে আপনাকে যামানা!

উচ্চ কণ্ঠে তুলুন তাকবীর, দিন তার জওয়াব!

জেগে উঠুন, ঝেড়ে ফেলে নিষ্ফল খোয়াব!

আপনার আওয়ায যেনো হয় ইসরাফিলের শিঙা!

আপনার তাকবীর আর রণহুংকারে বাতিলের শিবিরে শুরু হোক কিয়ামতের বিভীষিকা!

আপনাকে হতে হবে বাতিলের যম, আযরাঈলের থাবা!

আপনি যেন হন জীবরাঈলের বাহুবল, আগ্নেয়গিরির লাভা!

বাতিলের উপর আপনি পতিত হন যেন কালবৈশাখীর বজ্রপাত!

আপনাকে হতে হবে টর্নেডো, সাইক্লোন; হতে হবে গর্জিত অগ্নুৎপাত!..............

এবার মুসলমানদের প্রতিটি রক্ত-ফোটার প্রতিশোধ নেবার পালা,

প্রতিটি মা-বোনের হৃত ইজ্জত-সম্ভ্রমের বদলা নেবার পালা,

এক হাতে নিয়ে কুরআন, আরেক হাতে মেশিনগান,

এবার তাকবীরে তাকবীরে আসমান-যমীন প্রকম্পিত করার পালা,

"লিল্লাহি তাকবীর, আল্লাহু আকবার!

লিল্লাহি তাকবীর, আল্লাহু আকবার!

লিল্লাহি তাকবীর, আল্লাহু আকবার!".............

ওহে মুসলিম শিশু কিশোরের দল!

ওহে সিংহ শাবকের দল!

তোমরাই হলে আগামী দিনের তরূণ যুবক, মিল্লাতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক!

আজ হতে নাও তোমরা সামরিক প্রশিক্ষণ ।

রপ্ত কর যাবতীয় সমর কৌশল।

ট্যাংক ও অস্ত্রই হোক তোমাদের নিত্য দিনের খেলনা।

বিলাসবহুল জীবন নয়, তোমাদের প্রয়োজন কষ্টসহিষ্ণু মুক্ত-বিহঙ্গের জীবন।

এড়িয়ে চল ফুলশয্যা, বরণ কর কণ্টকপূর্ণ গৃহাঙ্গন।

সঙ্গীতের সুরের চেয়ে তরবারির ঝংকার হোক তোমার অধিক প্রিয়!

ছুড়ে দাও তুমি শত্রুর প্রতি চ্যালেঞ্জ, তোমার কিসের ভয়?

ইনশাআল্লাহ্, একদিন তোমার দ্বারাই সূচিত হবে মুসলিম মিল্লাতের ঐতিহাসিক বিজয়।

বজ্রনাদ!!!

(সারা দুনিয়ার আগ্রাসী কুফ্ফারদের প্রতি 'চরমপত্র')

ওহে বাতিল শক্তি!

ওহে আমেরিকা ও তার দালালেরা!

ওহে মুসলমানদের উপর তরবারি উত্তোলনকারী যত ক্রুসেডার সম্প্রদায়!

ওহে ইহুদী-খ্রিস্টান হায়েনার দল!

ওহে আগ্রাসী হিন্দু আর বৌদ্ধের দল!

ওহে নাস্তিক-মুরতাদ আর মুনাফিকের দলেরা!

ওহে দুনিয়ার যত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমনেরা!

সময় থাকতে তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, কুরআনের প্রতি আর পরকালের প্রতি। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নাও। শয়তানের উপাসনা করো না, এক আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি তোমাদের ও আমাদের প্রতিপালক, আসমান-যমীন, তার মধ্যবর্তী ও তার বাহিরের সকল কিছুর প্রতিপালক এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যার উপাসনা কর তিনি তাদেরও প্রতিপালক।

না হয় জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবাদের জামাতের প্রকৃত অনুসারী এমন এক জামাত 'কালো পতাকার বাহিনী'কে প্রস্তুত করছেন, তোমাদেরকে সহ এই যামানার সমস্ত বাতিল শক্তিকে জিন্দা অথবা মুর্দা দাফন করার জন্য, তোমাদের সমস্ত শক্তি মিলে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ্। কেননা আমাদের সাথে রয়েছে আমাদের মাওলা, আমাদের অভিভাবক মহাপরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান আল্লাহ! কিন্তু তোমাদের কোন মাওলা নেই, নেই কোনো সাহায্যকারী!

ওহে মুসলিম মা-বোনের সম্ভ্রম নিয়ে ক্রীড়াকারী যত সম্প্রদায়! ওহে হানাদার হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান আর নাস্তিক-মুরতাদেরা!

ওহে নিকৃষ্ট জানোয়ারের দল! তোমাদের হায়েনাগিরির হায়াত বেশি দিন আর বাকী নেই, ইনশাআল্লাহ্। যত পার করতে থাক, শীঘ্রই তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া হবে ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায়, তখন তোমরা পালাবার জায়গা পাবে না। (ইনশাআল্লাহ)

ওহে ইসরাইল! ওহে আমেরিকার জারজ সন্তান! ওহে জায়নবাদী কুকুরের দল!

ওহে আল্লাহর লা'নতপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! কুকুরও তো তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট! বরং তোমাদের তুলনা তো কোনো পশুর সাথেও চলেনা!

ওহে মানবতার নিকৃষ্টতম দুশমন! ওহে নিকৃষ্টতম কুলাঙ্গারের দল! খুব শীঘ্রই তোমরা দেখতে পাবে, তোমাদের আয়রন ডোম, বোমা আর কামান-ট্যাংকের শক্তি আল্লাহর গযব থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে কিনা!

আস তোমরা! সকলে ইসরাইলে জড়ো হও! তোমাদের প্রতীক্ষিত সময় খুব নিকটে, ইনশাআল্লাহ!

خيبر خيبر يا ياهود - جيش محمد سيعود

খাইবার খাইবার হে ইহুদীরা (খাইবারের স্মৃতি স্মরণ কর!)-

মুহাম্মাদের ﷺ বাহিনী আবারো শীঘ্রই ফিরে আসছে!

মদীনার মত ইসরাইল থেকে এবার তোমাদেরকে কেবল বিতাড়ন করা হবে না, ইসরাইলকে তোমাদের গোরস্তানে পরিণত করা হবে! (ইনশাআল্লাহ)

আল্লাহর ইচ্ছায়, আমরা আসছি তোমাদের ঘরে ঘরে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য, এমন ধ্বংসযজ্ঞ যা ইতিহাস কোনোদিন দেখেনি, ইতিহাস কোনোদিন শুনেনি, কোনো ঐতিহাসিক কোনোদিন কল্পনাও করেনি, যেই ধ্বংসযজ্ঞ চলবে যেখানেই তোমাদের পাওয়া হবে সেখানেই! (ইনশাআল্লাহ)

তোমাদের 'গ্রেটার ইসরাইল' গড়ার স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করতে আমরা আসছি! তোমরা অপেক্ষা কর "চূড়ান্ত হলোকস্ট" (Final Holocaust) দেখার জন্য, যেদিন তোমাদেরকে ভয়ঙ্কররূপে 'কঁচুকাটা' করা হবে। আর এটিই হবে ইহুদী প্রশ্নের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সমাধান। (ইনশাআল্লাহ).........

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا- إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

"অতঃপর আমি তোমাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম। তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদের জন্যেই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।" (সূরা বনি ইসরাইল ১৭:৬-৭)

ওহে অভিশপ্ত জায়নিস্ট ইহুদী সম্প্রদায়! ওহে দাজ্জালের দক্ষিণ বাহু! তোমাদের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী! আর শোনে রাখ, বিজয় হবে ইনশাআল্লাহ আমাদেরই! কেননা প্রিয়নবী ﷺ এর সত্য বাণী বাস্তবায়িত হবেই, ইনশাআল্লাহ। তিনি ﷺ বলেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ . إِلاَّ الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ "

"ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ না ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হবে। যুদ্ধে ইহুদীদেরকে হত্যা করা হবে। কোনো ইহুদী পালিয়ে গাছ বা পাথরের পেছনে আত্মগোপন করলে সেই গাছ বা পাথর মুসলমানকে ডেকে বলতে থাকবে- ওহে মুসলিম! ওহে আল্লাহর বান্দা! আমার পিছনে ইহুদী লুকিয়ে আছে, এদিকে এসো! একে হত্যা কর। তবে গারকাদ বৃক্ষ একথা বলবে না। কারণ, সে ইহুদীদের বৃক্ষ।" (মুসলিম)

একটু চিন্তা কর্! তোমরা কতটুকু অভিশপ্ত! তোমরা সৃষ্টি জগতের মধ্যে কতটুকু ঘৃণিত! তোমরা সৃষ্টিজগতের সকলের অভিশাপে অভিশপ্ত! সেদিন গাছ-পাথরও তোমাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে, যেদিন আমরা তোমাদেরকে চূড়ান্ত পাকড়াও করবো! (ইনশাআল্লাহ)

ইসরাইলে ইহুদী কর্তৃক রোপিত সারি সারি গারকাদ বৃক্ষ।

হ্যাঁ, তোমরা বেশি বেশি গারকাদ বৃক্ষ রোপন করতে থাক্! আমরা আসছি তোমাদের গারকাদসহ তোমাদেরকে শামের ভূমিতে জীবন্ত কিংবা মৃত পুতে ফেলতে! সুতরাং আরেকটু অপেক্ষা কর, ওহে হারামী সম্প্রদায়......................!!!

ওহে ক্রুসেডার খ্রিস্টান সম্প্রদায়! ওহে আমেরিকা-ইংল্যান্ড-রাশিয়ার সহচরের দল!

খুব শীঘ্রই তোমাদের দম্ভকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে! (ইনশাআল্লাহ)

তোমাদের শয়তানীর হিসেব কড়ায়-গণ্ডায় পরিশোধ করা হবে। (ইনশাআল্লাহ)

তোমরা তো সেই পাপী সম্প্রদায়, যারা মদ ও কামরিপুর দাস!

তোমরাই তো সেই জাতি, যারা নিজেদের মা ও মেয়েদের সাথে হারাম সম্পর্ককেও হালাল করে নিয়েছ!

তোমরাই তো সেই জাতি যারা সমকামিতার বৈধতা প্রদানকারী..............

শুনে রাখ-

মিশনের নামে মুসলিম ভূমিতে স্কুল, কলেজ আর হাসপাতালের জন্য জমি ক্রয় না করে গোরস্তানের জায়গা কিনতে থাক! কেননা, খুব শীঘ্রই তোমাদের লাশের বহর আসছে! (ইনশাআল্লাহ)

আমার হৃদয়পটে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি- তোমাদের লাশগুলো কবরে জায়গা না পেয়ে শকুন আর কুকুরের খাদ্যে পরিণত হয়েছে!

তোমাদের নেতাদের বিগলিত হাড্ডিগুলো কুকুর আর শূকরেরা মজা করে ভক্ষণ করছে!

ইনশাআল্লাহ, তোমাদের সাথে দেখা হবে **জেরুজালেমে, পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ 'মালহামাতুল কুবরা'র (মহাযুদ্ধের) ময়দানে**। যেটি হবে পৃথিবীর শেষ মহাযুদ্ধ, হক-বাতিলের সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ। এরপর শুধু বিজয়ী ধর্ম ইসলাম বাকী থাকবে, দুনিয়াব্যাপী শরীয়াহর শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, খিলাফাহ্ 'আলা মিনহাজিন্নুবুয়্যাহ' প্রতিষ্ঠিত হবে। (ইনশাআল্লাহ)

ইনশাআল্লাহ, এ যুদ্ধে তোমাদের লাশে যমীন ভরে যাবে, আসমান-যমীন বিষাক্ত হয়ে যাবে.............

ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের কারণে ভূমিতে কেবল লাশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না। এমনকি একটি পাখি ধ্বংসযজ্ঞের এক প্রান্ত হতে উড়া শুরু করলে শেষ প্রান্তে পৌঁছার আগেই পাখিটি মারা যাবে। যে যুদ্ধের কেন্দ্রভূমি হবে শাম। (ইনশাআল্লাহ) আমরা আসছি শামে............... অপেক্ষায় থাক.............

ওহে আগ্রাসী মালাউন হিন্দুত্ববাদীদের দল!

তোমাদের বর্বরতা আর নির্যাতনের ফিরিস্তি আমরা ভুলে যাইনি............

মুসলিম মা-বোনের উপর তোমাদের অত্যাচার আর সম্ভ্রমহানি- আমরা কখনো ভুলে যেতে পারি না............

ওহে নাপাক গোমূত্র পানকারীর দল! শুনে রাখ-

ইনশাআল্লাহ, মুসলমানের প্রতিটি রক্তফোটার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে...........

মা-বোনের প্রতিটি আর্তনাদ ও সম্ভ্রমের মূল্য তোমাদের কাছ থেকে আদায় করা হবে.........

তাই, তোমাদের শ্মশানগুলোকে প্রশস্ত করতে থাক, চিতার সংখ্যা বাড়াতে থাক!

তোমাদের শ্মশানঘাটগুলোকে 'মহাশ্মশানে' রূপান্তরিত করা হবে। তোমাদের শবদাহে পরিবেশ দূষিত হয়ে যাবে! (ইনশাআল্লাহ)

তোমাদের লাশের স্থান শ্মশানেও হবে না!

আমার কল্পলোকে যেন দেখতে পাচ্ছি- তোমাদের শবদাহ আর লাশের দূর্গন্ধে আকাশ-বাতাস বিষাক্ত হয়ে গেছে, তোমরা পোকা-মাকড়ের আহার্যে পরিণত হয়েছ!

ইনশাআল্লাহ, তোমাদের সাথে মোকাবেলা হবে **গায্ওয়াতুল হিন্দে**। একজন মুসলমান জীবিত থাকা পর্যন্ত তোমাদেরকে শান্তিতে ঘুমাতে দেয়া হবে না।

তোমাদের চূড়ান্ত পতন না হওয়া অবধি এ যুদ্ধ বন্ধ হবে না..............

দিল্লীর লালকেল্লায় কালেমার পতাকা উড্ডীন না হওয়া পর্যন্ত এ জিহাদ বন্ধ হবে না......... (ইনশাআল্লাহু আয্যা ওয়া জাল্)

তোমরা প্রস্তুত থাক্ আমাদের কুরবানীর পশু হওয়ার জন্য......................

ইনশাআল্লাহ, তোমাদের সীমালঙ্ঘনের দিন ফুরিয়ে এসেছে, ওহে নাপাক, পৌত্তলিক সম্প্রদায়.........

খুব ভালো করে শুনে রাখ!

ইনশাআল্লাহ, শীঘ্রই তোমাদের জাহান্নামে পাঠানোর পয়গাম আসছে............

ইনশাআল্লাহ, তোমাদের **রামরাজত্ব আর 'অখণ্ড ভারতে**'র স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করতে আমরা আসছি......

ইনশাআল্লাহ, কাশ্মীরকে তোমাদের শ্মশানঘাটে পরিণত করা হবে........ যে কোনো মূল্যে কাশ্মীরকে আজাদ করা হবে..........

ডাক তোমাদের সহযোগীদের, তোমাদের সকল উপাস্যদের, দেখ তারা এক আল্লাহর সামনে টিকতে পারে কিনা! তোমাদের পারমানবিক অস্ত্রগুলো তোমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয় কিনা!.....................

ওহে আগ্রাসী মালাউন বৌদ্ধ সম্প্রদায়! ওহে ন্যাড়া কুত্তার দল!

আরাকানে রোহিঙ্গা ভাই-বোনদের সাথে তোমাদের আচরণ আমরা ভুলে যাইনি.........

ধর্ষিতা বোনের চিৎকারের আওয়াজ এখনো বাতাসে মিলিয়ে যায়নি..........

জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা মুসলিমদের আর্তনাদ ও মৃত্যুযন্ত্রনা আমরা বিস্মৃত হইনি........

জীবন্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে দেয়ার দৃশ্য হতে আমাদের দৃষ্টি এখনো সরে যায়নি.........

ওরে হারামীর বাচ্চারা! ওরে ন্যাড়া হায়েনার দল!

ইনশাআল্লাহ, এবার তোমাদের চামড়া খসিয়ে দেয়া হবে............

তোমাদেরকে মর্মান্তিক মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করানো হবে........... (ইনশাআল্লাহ)

তরবারি তোমাদের মাথার উপর চলে এসেছে, একটু মাথা উঁচু করে দেখ, ওহে খোদার শত্রুদল! আল্লাহর গযব আস্বাদনের জন্য প্রস্তুত হও!

আযরাঈলের পায়ের আওয়াজ যেন পাওয়া যায়...........

ওহে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শানে কটুক্তিকারী মালাউন নাস্তিক সম্প্রদায়!

ওহে জারজ সম্প্রদায়! ওহে সমকামী সম্প্রদায়!

ওহে সৃষ্টির নিকৃষ্ট কুলাঙ্গারেরা!

তোমরা যেই আল্লাহকে অস্বীকার করে থাক, সেই আল্লাহর ফরমান চলে এসেছে।

ইনশাআল্লাহ, তোমাদেরকে কুরবানির গরু বানানো হবে। রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যে জবাই করা হবে। তোমাদের মস্তকগুলোকে কেটে রাস্তার মোড়ে মোড়ে প্রদর্শনী করা হবে। তোমাদের কর্তিত মস্তকে 'পিরামিড' বানানো হবে! (ইনশাআল্লাহ)

আল্লাহর দুনিয়াতে থাকার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। এমন কেউ আছে কি তোমাদেরকে আল্লাহর রোষানল থেকে রক্ষা করবে?

সুতরাং প্রস্তুত হও!................

ওহে মুসলিম দেশের মুনাফিক ও মুরতাদ শাসক গোষ্ঠী!

আল্লাহর বিধানের বিপরীতে নিজেদের মনগড়া আইন প্রণয়নের কারণে তোমরা মুরতাদ সাব্যস্ত হয়েছ।

তোমরাই তো মুসলমানদের উপর 'গণতন্ত্র' নামক কুফুরী ও শিরকী ধর্ম চাপিয়ে দিয়েছ।

তোমরাই তো নেককার ও খাঁটি মুসলমানদের টুটি চেপে ধরেছ। অন্যদিকে নগ্নতা, বেহায়াপনা, অধর্ম ও ধর্মহীনতাকে প্রমোট করছ।

মুসলমানদের ঈমান আমল ধ্বংস করছ। মুসলমানদের ধন-সম্পদকে তোমাদের পশ্চিমা প্রভুদের দেশে পাচার করে দিচ্ছ।

পশ্চিমা প্রভুদের সন্তুষ্ট করতে তোমরাই তো মুজাহিদদের সাথে দুশমনী করছ। রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে বাঁধা দিচ্ছ। দেশের সীমানাগুলোকে সীল করে দিয়েছ।

তোমরাই তো এক উম্মাহকে শতধাবিভক্ত করে রেখেছ। জাতীয়তাবাদের সবক শিখাচ্ছ। কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে এক উম্মাহকে সাতান্ন ভাগ করেছ।

সময় থাকতে তোমরা আমেরিকা-রাশিয়া আর তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের পা-চাটা বন্ধ কর।

ইহুদী-নাসারা আর মালাউন হিন্দুত্ববাদীদের গোলামী বন্ধ কর। তাদের সাথে বন্ধুত্বের নীতি পরিহার কর।

তাদের প্রদত্ত এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা বন্ধ কর।

নতুবা, দেশে দেশে মুসলমানদের মাঝে যে জিহাদী জাগরণের সূচনা হয়েছে, তা তোমাদের মসনদকে গুড়িয়ে দিবে ইনশাআল্লাহ। তোমরা পালাবার সময় পাবে না ইনশাআল্লাহ।

বৈশ্বিক জিহাদের আগুনে জ্বলে-পুড়ে তোমরা ছারখার হয়ে যাবে, যেমনভাবে হয়েছে আফগানিস্তানের পুতুল সরকার!!

জেনে রাখ! নিষ্ঠাবান মুজাহিদরা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছেন। জিহাদের এ আগুন তোমাদেরকে অবশ্যই স্পর্শ করবে, খুব শীঘ্রই স্পর্শ করবে ইনশাআল্লাহ।

সুতরাং, অপেক্ষায় থাক..................

ওহে দুনিয়ার তাবৎ তাগুত ও বাতিল সম্প্রদায়!

ওহে পাপিষ্ঠের দলেরা!

তোমরা আল্লাহর কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছ।

তোমরা তো সেই সম্প্রদায়, যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে থাক, তাকে অস্বীকার কর, আল্লাহর পবিত্রতাকে অপছন্দ কর, যারা আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়া থেকে বিদায় জানাতে চাও, মুসলমানদেরকে পৃথিবী থেকে নিঃশ্চিহ্ন করে দিতে চাও।

তোমরাই তো সেই সম্প্রদায় যারা আল্লাহ তা'আলার বিধানগুলোর তোয়াক্কা কর না, উপরন্তু চরম সীমালঙ্ঘন করে থাক।

সকলেই শুনে রাখ!

খুব শীঘ্রই পৃথিবীতে তোমাদের যমদূতের আবির্ভাব ঘটবে, তোমাদের আযরাঈলের আত্মপ্রকাশ খুব নিকটবর্তী। (ইনশাআল্লাহ)

তোমাদের রাজ্যগুলোতে টর্নেডো আর সাইক্লোন চালানো হবে, মহাপ্রলয়ের বিভীষিকা শুরু করা হবে, তোমাদেরকে টমেটো আর মূলার মতো কাটা হবে, তোমাদের নারীদেরকে দাসী-বাঁদী বানানো হবে! (ইনশাআল্লাহ)

হয়তো তোমরা আল্লাহর বিধান মেনে জান্নাতের পথে আসবে, নয়তো তোমাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দেয়া হবে। (ইনশাআল্লাহ)

খুব শীঘ্রই তোমাদের পরিণতি তোমরা দেখতে পারবে!

প্রতিশ্রুত সেই সময় ইনশাআল্লাহ খুবই নিকটে!............

ইনশাআল্লাহ, আমরা আসছি.......

তোমাদের সকল পাওনা মিটিয়ে দেয়ার জন্য আমরা খুব শীঘ্রই আসছি.........

শুনে রাখ-

আমরা তো সেই যোদ্ধা,

যারা বাতিলের গোশতকে জন্তু জানোয়ারের আহার্যে পরিণত করি.........

আমরা তো সেই যোদ্ধা, তাগুতের রক্ত প্রবাহিত করে যারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ি.........

আমরা তো সেই যোদ্ধা, ঘুম যাদের চক্ষুকে ক্লান্ত করে না, কিন্তু কুফ্ফারদের ঘুমকে হারাম করে রাখি.........

আমরা তো সেই যোদ্ধা, যারা অনর্থক কথা বলে না, কিন্তু রণহুঙ্কারে আসমান যমীন প্রকম্পিত করি........

আমরা তো সেই যোদ্ধা, যারা ক্রীড়া-কৌতুক করি না, তবে দুশমনের উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে তাকবীর ধ্বনিতে আনন্দ প্রকাশ করি.......

আমরা তো সেই যোদ্ধা, যারা তোমাদের সর্বনাশ ঘটিয়ে অন্তরকে প্রশান্ত করি..........

আমরা তো সেই যোদ্ধা, যারা মৃত্যুকে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসি যতটুকু তোমরা বেঁচে থাকতে ভালোবাস........

আমরা তো সেই যোদ্ধা, যারা শাহাদাতকে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসি যতটুকু তোমরা মদ আর নারীকে ভালোবাস........

যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে......... আমাদেরকে যদি এখনো চিনে না থাক......... তাহলে পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখ, আমরা কারা??

কারা তারা, যারা মাত্র তেইশ বছরে অর্ধপৃথিবী জয় করেছিল?

কারা কিসরা-কায়সারের গর্বিত মস্তককে ভূপাতিত করেছিল?

কারা রোম-পারস্যের অহংকারী মুকুটকে পদদলিত করেছিল?

কারা উদ্ধত তাতারীদের কঁচু-কাটা করেছিল?

তারা কারা, যারা মাত্র তিন দশকের ব্যবধানে রাশিয়া আর আমেরিকার মত সুপার পাওয়ারকে লজ্জাজনক পরাজয়ের গ্লানি আস্বাদন করিয়েছে?

হ্যাঁ, আমরাই তারা, তারাই হলাম আমরা ......

আমরা একই জাতি......

একই যোদ্ধা..........

আমরা একই মায়ের সন্তান................

আমাদের সাথে মোকাবেলার জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়ে প্রস্তুত থাক.........

ইনশাআল্লাহ! আমরা আসছি.........

ভালো করে জেনে রাখ- আমরাই সেই যোদ্ধা যারা শেষ পরিণামে অবশ্যই সফল ও বিজয়ী হবো। (ইনশাআল্লাহ) কেননা, এই ওয়াদা আমাদের মহাশক্তিশালী ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ আমাদের সাথে করেছেন, এবং যুগে যুগে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন।

هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"তিনি তাঁর রসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্যধর্ম নিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সবধর্মের উপর বিজয়ী করে দেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" (সূরা সফ ৬১:৯)

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

"আল্লাহ লিখে দিয়েছেনঃ আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।" (সূরা মুজাদালাহ ৫৮:২১)

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ

"এটা এজন্যে যে, আল্লাহ মুমিনদের হিতৈষী বন্ধু এবং কাফেরদের কোন হিতৈষী বন্ধু নেই।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১১)

সুতরাং তোমরা সকলেই মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও!

ইনশাআল্লাহ, তোমাদের সাথে মোকাবেলা হবে খুব শীঘ্রই.....

তোমরা অপেক্ষা করতে থাক, আমরাও তোমাদের সাথে সেদিনের অপেক্ষায় রইলাম।...........

ওহে তারিক বিন যিয়াদ আর ইউসুফ বিন তাশফীনের বোনেরা!

এবার খুশি হয়ে যাও। কান্নার মাতম বন্ধ কর।

এবার হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান আর ইহুদিদের বসতিগুলোতে মাতম শুরু হওয়ার পালা।

তাই, বুকে পাথর বেঁধে, তোমাদের ভাই আর স্বামীদেরকে ময়দানে পাঠিয়ে দাও। তাদের বিচ্ছেদে সবর কর!

আল্লাহ্ তোমাদের সাথে আছেন, তিনিই তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের হেফাযত করবেন। তিনিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। সুউচ্চ জান্নাতে তোমাদেরকে আবার একত্রিত করবেন। (ইনশাআল্লাহ)

সেদিন খুব দূরে নয়!..............

ওহে মুহাম্মাদ বিন কাসিম আর মুহাম্মাদ আল ফাতিহ'র মায়েরা!

এবার আপনি নিজের সন্তানকে সবর্শেষ ও চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য সাজিয়ে তুলুন। কেননা, বরযাত্রীর লোকেরা এখন দিল্লী আর বাইতুল মুকাদ্দাস রওয়ানা হতে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সকল বাদশাহর বাদশাহীর খতম হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

এক আল্লাহর রাজত্ব কায়েমের সময় চলে এসেছে।

সুতরাং সময় এখন আমাদের, তাদের নয়।

এখন চিন্তামগ্নতা নয়, আল্লাহর ওয়াদার উপর ভরসা থাকা চাই!

এখন সময় আনন্দের, হতাশার নয়।

চেহারায় উদাসীনতা নয়, বরং উৎফুল্লতা থাকা চাই।

চোখ মুছে ফেলুন। দু'চোখে অশ্রু নয়, এখন বিজয়ের চমক থাকা চাই......

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٣٢﴾ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

"৩২. তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূর (ইসলাম)-কে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে। ৩৩. তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" (০৯ সূরা তাওবা:৩২-৩৩)

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

"আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, আমি (আল্লাহ) এবং আমার রাসূলগণ (ও তাঁদের অনুসারীরা) অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।" (৫৮ মুজাদালাহ: ২১)

وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾

"আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে (তারাই আল্লাহর দল), আর নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।" (০৫ সূরা মায়েদাহ: ৫৬)

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

"এ দল তো (কাফেররা) সত্ত্বরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।" (সূরা ক্বমার 54:45)

نَصۡرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتۡحٌ قَرِيبٌۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿١٣﴾

"(শীঘ্রই আসছে) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।"
(৬১ সূরা ছফ: ১৩)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে যমীনে প্রতিনিধিত্ব (খিলাফত/রাজত্ব/শাসনক্ষমতা) দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক (পাপিষ্ঠ)।" (সূরা নূর ২৪: ৫৫)

قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

"যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দিবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।

(০৯ সূরা আত্-তাওবাহ: ১৪)

দুআ

(কুনুতে নাযেলা)

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيْمَنْ هَدَيْتَ- وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ- وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ- وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا أَعْطَيْتَ- وَقِنَا وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتَ- إِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ- إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ- وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ -تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

"হে আল্লাহ, আমাদেরকে হেদায়াত দান করুন, তাদের মাঝে যাদেরকে আপনি হেদায়াত দান করেছেন। আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন, তাদের মাঝে যাদেরকে আপনি নিরাপত্তা দান করেছেন। আমাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করুন, তাদের মাঝে যাদের দায়িত্বভার আপনি গ্রহণ করেছেন। আপনি আমাদেরকে যা কিছু প্রদান করেছেন, তাতে বারাকাহ দিন। আমাদেরকে রক্ষা করুন, আপনার মন্দ ফায়সালা থেকে এবং আমাদের থেকে তা দূরে সরিয়ে দিন । নিশ্চয়ই আপনি ফায়সালা করেন, আপনার উপর কেউ ফায়সালা করতে পারে না। আপনি যার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তাকে কেউ অপদস্থ করতে পারে না। আপনি যার সাথে শত্রুতা করেন, তাকে কেউ ইজ্জত দিতে পারে না। আপনি বরকতময় এবং সুমহান, হে আমাদের প্রতিপালক।" (সুনানে আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি)

نَسْتَغْفِرُكَ اللّٰهُمَّ وَنَتُوْبُ إِلَيْكَ -اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ- وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ- وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ- وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ.

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছে তওবা করছি। হে আল্লাহ, আমাদেরকে এবং ঈমানদার নর-নারী ও মুসলিম নর-নারীদেরকে ক্ষমা করুন। আর তাদের অন্তরগুলোকে 'এক' করে দিন। এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিন।

اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ أَوْلِيَائَكَ -اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَدَمِّرْ دِيَارَهُمْ وَشَتِّتْ شَمْلَهُمْ وَمَزِّقْ جَمْعَهُمْ- اَللّٰهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْهِمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ-

হে আল্লাহ, অভিশাপ দিন সেসকল কাফেরদের যারা আপনার পথ থেকে বাধা দেয়, আপনার রাসূলদের অস্বীকার করে এবং আপনার বন্ধুদের হত্যা করে/তাদের সাথে যুদ্ধ করে। হে আল্লাহ, তাদের কথার বিরোধিতা করুন, তাদের পাগুলো প্রকম্পিত করুন, তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করুন, তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিন এবং তাদের ঐক্য বিনষ্ট করে দিন। হে আল্লাহ, তাদের উপর আপনার শাস্তি নাযিল করুন, যা আপনি অপরাধীদের থেকে টলাবেন না।

اَللّٰهُمَّ خُذْهُمْ أَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ- اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِمْ جُنُوْدًا لَّمْ يَرَوْهَا- اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ- اَللّٰهُمَّ أَهْلِكْهُمْ كَمَا أَهْلَكْتَ عَادًا وَّثَمُوْدًا- اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ

হে আল্লাহ! মহাপরাক্রমশালী ও মহাশক্তিশালীরূপে তাদের পাকড়াও করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের বিরুদ্ধে এমন বাহিনী প্রেরণ করুন যা তারা দেখতে পাবে না। হে আল্লাহ, আমরা আপনাকে তাদের মোকাবিলাকারী বানিয়েছি এবং তাদের অনিষ্ট

থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি তাদের ধ্বংস করে দিন, যেভাবে আপনি আদ ও সামুদ জাতিকে ধ্বংস করেছিলেন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের প্রতি প্রলয়ঙ্করী বন্যা প্রেরণ করুন।

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ.

“হে আল্লাহ, কুরআন অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, সৈন্য দলকে পরাজয় দানকারী, আপনি কাফের সম্প্রদায়কে পরাজিত করুন এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন।” (সহীহ বুখারী: ৩০২৪, সহীহ মুসলিম: ১৭৪২)

اللَّهُمَّ وَفِّقْنا لِما تُحِبُّ وَتَرْضَى وَخُذْ مِنْ دِمائِنا حَتَّى تَرْضَى . اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا . اللَّهُمَّ إِنَّا وَنَسْئَلُكَ الثَّباتَ فِي الأَمْرِ وَنَسْئَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ وَنَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبادَتِكَ. اَللّهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَّصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ

“হে আল্লাহ, আপনি আমাদের এমন কাজে তাওফীক দান করুন, যা আপনাকে সন্তুষ্ট করবে। এবং আপনার সন্তুষ্টির পথে আমাদের রক্তগুলোকে কবুল করুন। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের জন্য নেয়ামতকে বাড়িয়ে দিন, কমিয়ে দিবেন না। আমাদের সম্মানিত করুন, লাঞ্ছিত করবেন না। আমাদেরকে দান করুন, বঞ্চিত করবেন না। আমাদেরকে বিজয় দান করুন, আমাদের উপর কাউকে কর্তৃত্ব দিবেন না। আমাদেরকে সন্তুষ্ট করুন, আমাদের উপর আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান। হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে সকল ক্ষেত্রে দৃঢ়তা এবং সঠিক পথের অবিচলতা কামনা করি। আর আমরা আপনার কাছে তাওফীক চাই- নেয়ামতের শোকর আদায়ের, উত্তম ইবাদাতের। হে আল্লাহ, আপনি সাহায্য করুন, যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনকে সাহায্য করবে; আর আমাদেরও তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনি লাঞ্ছিত করুন, যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনকে লাঞ্ছিত করবে; আপনি আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।

اَللّهُمَّ احْفَظِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ كُلِّ بِلَادٍ- اَللّهُمَّ انْصُرِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ- وَصَلَّى الله تَعَالىٰ عَلَى خَيْرِ خَلْقِه مُحَمَّدٍ وَّاٰلِه وَأَصْحَابِه أَجْمَعِيْنَ- وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - آمين يا رب العالمين!

হে আল্লাহ! সকল দেশের মুসলমানদেরকে আপনি হেফাজত করুন। হে আল্লাহ, মুজাহিদীনদের সর্বত্র সাহায্য ও বিজয় দান করুন। সর্বশক্তিমান আল্লাহর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক তাঁর সৃষ্টির সেরা মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর সমস্ত সাহাবীদের উপর। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তার জন্য। হে বিশ্বজগতের পালনকর্তা! আপনি আমাদের দুআগুলোকে কবুল করুন।

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا ❖ عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

মুহাম্মদের সা. হাতে করেছি শপথ জিহাদের,

পিছু হটবনা কভূ পূর্বে মউতের ।

কিতাবুত তাহরীদ: দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হওয়ার পর **"দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্ ফোরাম"** এর মুহতারাম মুজাহিদ ভাইদের রিভিউ: নির্বাচিত স্ক্রীনশট্ (পোস্ট লিংক: https://bit.ly/tahrid6)

01-14-2025, 07:31 AM

#2

> *সেই মোবারক কাফেলায় আমাদেরকে যুক্ত হওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যারা শেষ যামানায় বাতিলের গর্বকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে, বিশেষতঃ আমাদের হিন্দুস্তানে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করবে।*
> *সেই সাথে আমাদের কিশোর ও তরুণ প্রজন্ম-জেন যী কে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবতা ও ফলপ্রসূতা বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে।*

ইয়া রব্বাল আলামীন! আপনি মুহতারাম লেখকের দিলের সকল নেক তামান্না গুলো পূরণ করে দিন। আমাদেরকেও কাফেলায় শামীল করে নিন আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

হয় শাহাদাহ নাহয় বিজয়।

'দাওয়াহ ইলাল্লাহ' ফোরামে প্রকাশিত মুহতারাম মুস'আব ইলদিরিম ভাইয়ের লিখিত কিতাবুত্ তাহরীদের বিভিন্ন পর্বের পোস্ট লিংক:

পর্ব-১: আগ্নেয়গিরি হতে অগ্নুৎপাত:

'দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্' ফোরাম পোস্ট লিংক-https://bit.ly/tahrid1

....

পর্ব ০২: তাওহীদ ও জিহাদ

'দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্' ফোরাম পোস্ট লিংক- https://bit.ly/tahrid2

....

পর্ব ০৩: ভালোবাসি তোমায় হে জিহাদ!

'দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্' ফোরাম পোস্ট লিংক- https://bit.ly/tahrid3

....

পর্ব ০৪: "তোমাকেই শুধু চাই, হে শাহাদাত!

'দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্' ফোরাম পোস্ট লিংক- https://bit.ly/tahrid4

....

পর্ব ০৫: "আর কতকাল আমরা নিজেদেরকে এমনিভাবে ধোঁকা দিব?"

'দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্' ফোরাম পোস্ট লিংক- https://bit.ly/tahrid5

....

পর্ব ০৬: "অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হতে দাবানল?"

'দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্' ফোরাম পোস্ট লিংক- https://bit.ly/tahrid6

****

ইসলামের সোনালি অতীত, উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যত বিজয়গাঁথা নিয়ে **মুস'আব ইলদিরিম** ভাইয়ের লিখিত একটি অনবদ্য কিতাব-

"কালজয়ী ইসলাম"

দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্ পোস্ট লিংক: https://bit.ly/kaljoyi-islam

পিডিএফ লিংক: https://bit.ly/kaljoie-islam

****

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান

কিতাবুত্ তাহরীদ্ ‘আলাল ক্বিতাল

মুস‘আব ইলদিরিম